জীবনীশতক

মণি বাগচি

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

JEEVANI SATAK :
Hundred Great Lives in Bengali
By Moni Bagchee

প্রকাশক : রবীন বল
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
লক্ষ্মী নারায়ণ প্রসেস
১৯, গোয়া বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

BIOGRAPHY is almost as necessary to human life as life is to biography. The business of the biographer is often to pass slightly over those performances and incidents which produce popular greatness, to lead the thoughts into domestic privacies, and display the minute details of daily life, where exterior appendages are cast aside and men excel each other only by prudence and by virtue···Biography is or should be, the study of personality, and the biographer has the right and duty to use every legitimate device to explain and interpret his subject. One of the fascinations of biography is that the reader can know the great, the near-great, the famous and the notorious of all time when their stories are unfolded by writers who are something more than mere chroniclers.

Samuel Johnson

প্রাক-কথন

মানব সভ্যতার ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে একটি অখণ্ড ও অনন্ত জীবনপ্রবাহের অভিব্যক্তি। সকল দেশের, সকল যুগের বিশিষ্ট মানুষের জীবনদৃষ্টির মধ্যেই আমরা যেন প্রত্যক্ষ করি এই দীপ্ত প্রকাশকে, সভ্যতার নিগূঢ় অভিপ্রায়কে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা রেখে গেছেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তাঁদের সঙ্গলাভ নিঃসন্দেহে আমাদের জীবনের এক উদ্দীপনাময়ী অভিজ্ঞতা। কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সমাজ-সংস্কারক, শিল্পী, রাষ্ট্রনায়ক—সভ্যতার রাজপথে মহাজীবনের মিছিলের মধ্যে আমরা এঁদের দেখতে পাই।

এইরকম একশোটি জীবন-কথা আলোচিত হয়েছে এই বইতে। আমার সাহিত্যজীবনের প্রায় তিন দশক কাল জীবনচরিত আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে। আজ, জীবনসন্ধ্যায়, জীবনীসাহিত্য অনুরাগী পাঠকদের এই 'জীবনী-শতক' গ্রন্থ উপহার দিলাম। ইংরেজি সাহিত্যে এই ধরনের বই অনেক আছে কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় প্রয়াস বোধহয় এই প্রথম। আগ্রহ ও যত্নসহকারে কাগজের এই দুর্মূল্যতার দিনে, বিশলায়তন এই বইটি প্রকাশ করার জন্য শৈব্যা পুস্তকালয়কে বিশেষ করে এই প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতিবান শ্রীরবিন বলকে আমি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মণি বাগচি

৯০ বাগুইআটি রোড

কলিকাতা-২৮

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'জীবনীশতক' বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকমহলে এর আশাতীত সমাদর দেখে লেখক বিস্মিত হয়েছেন। যে দেশে গল্প-উপন্যাসের পাঠক সংখ্যা শতকরা সত্তর, সে দেশে জীবন চরিত্রের যে পাঠক আছে সেটা আশার কথা, আনন্দের কথা। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর শতাধিক পাঠকের কাছ থেকে যেসব চিঠিপত্র এসেছে সেগুলির মধ্যে অভিনন্দন ও সমালোচনা দুই-ই আছে। এখনকার পাঠক যে রীতিমত সচেতন ও তথ্যাভিজ্ঞ, তার পরিচয় আছে এই চিঠিগুলির মধ্যে। বহু পত্রলেখকের অনুরোধক্রমে এই সংস্করণের সংযোজনী অংশে চারটি নতুন জীবনীর সংযোজন লেখকের অনিবার্য বলেই মনে হয়েছে।

মণি বাগচি

কলিকাতা-২৮

সূচীপত্র

সংযোজনী

গৌতম বুদ্ধ

(খ্রীঃ পূঃ ৫৬৮—৪৮৩)

বেদ ও বর্ণাশ্রমশাসিত আর্যসমাজের প্রথম বিদ্রোহীসন্তান গৌতম বুদ্ধ। অপূর্ব সেই বুদ্ধের জীবন-কাব্য। শান্তিপূর্ণ রাজ্য, স্নেহময় পিতা, রূপেগুণে অতুলনীয়া যুবতী পত্নী, শিশুপুত্র, রাজপ্রাসাদে বিলাসের অজস্র আয়োজন—এরই মধ্যে যুবক সিদ্ধার্থ সন্ধান পেলেন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের মূল সমস্যার। জীবসৃষ্টির স্তরে স্তরে রোগ শোক, জরা-মৃত্যুর যে দুঃখ, সেই দুঃখের সত্যরূপ, চিৎরূপ তিনি দেখলেন। দেখলেন দুঃখই সত্য, সুখ দু'দণ্ডের আত্মবিস্মৃতি। অসংখ্য দুঃখের অনন্ত কলরোল তুলে জীবনের স্রোতোধারা জলচর, ভূচর খেচর, চরাচর ক্রন্দনে ধ্বনিত করে বয়ে চলেছে—কারো পরিত্রাণ নেই। প্রশ্ন জাগল রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মনে—সত্যিই কি পরিত্রাণ নেই? দুঃখ আছে, দুঃখের নিরোধও আছে—কোন্ পথে? সেই মুক্তিপথের সন্ধানে রাজ্য ও রাজ-সিংহাসন, প্রিয়তমা পত্নী ও নবজাত পুত্র, ধনজনপূর্ণ বিশালপুরী পিছনে রেখে, মহামানব নৈশ অন্ধকারে হলেন অভিনিষ্ক্রান্ত।

তারপর একদা এক বৈশাখী পূর্ণিমায় শাক্যকুমার গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করে নবরূপান্তরে মনুষ্যজাতির মুক্তিদাতারূপে ধ্যানের আসন থেকে হলেন ব্যুত্থিত। পৃথিবীর মানুষকে দিলেন নূতন ধর্ম, নূতন নীতি আর নূতন সমাজ-বিন্যাস কৌশল। উদ্ধত ক্ষত্রিয় সম্রাটগণের আড়ম্বরপূর্ণ লক্ষ পশুবলির রুধিরাক্ত যজ্ঞাগ্নির ধূম্রে আচ্ছন্ন ভারতভূমিতে করুণার অবতার বুদ্ধদেব সৃষ্টি করলেন এক অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়াব—চমকিত হলো বেদ ও বর্ণাশ্রমশাসিত সমাজ—স্ত্রী ও শূদ্রের আত্যন্তিক ভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত সমাজ। প্রচলিত বিশ্বাস, আচরণের ধর্ম, গতানুগতিক লোকব্যবহার—এসবকে উপেক্ষা করে ধর্ম ও সংঘের নামে তিনি আহ্বান করলেন সকলকেই। বললেন—আমি ঈশ্বর নই, অথবা ঈশ্বরপ্রেরিত নই। আমি মানবসন্তান, সাধনাবলে জেনেছি জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য; জেনেছি দুঃখ কি, জেনেছি দুঃখের কারণ, এবং সেই কারণ দূর করবার উপায়ও জেনেছি। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্বিশেষে সকল নরনারীকেই তিনি মুক্তির পথে আহ্বান করলেন। আহ্বান করলেন তাদের সকলকে জীবনের পথে, জীবনের প্রসারের পথে, নির্মল বিচারবুদ্ধির পথে। ইতিহাসে বুদ্ধের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই। পঁচিশ শতাব্দী ধরে অক্ষুণ্ণ রয়েছে তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব। ইতিহাস ও কিম্বদন্তীকে অতিক্রম করে জগজ্জ্যোতিরূপে মানব-চিন্তায় এমন চিরস্থায়ী আসনলাভ পৃথিবীর আর কোনো মহাপুরুষের ভাগ্যে আজ পর্যন্ত ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটবে কিনা সন্দেহ!

শাক্যরাজ্যের রাজা তখন শুদ্ধোদন। রাজ্যের রাজধানী কপিলাবস্তু অবস্থিত ছিল হিমালয়ের সানুদেশে। সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যে অতুলনীয় ছিল কপিলবস্তু নগরী। শাক্যকুলের উপাধি গৌতম। রাজার প্রধানা মহিষী মায়াদেবী। এই মায়াদেবীর গর্ভে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় লুম্বিনী উদ্যানের পুষ্পভারানত এক বিশাল শালতরুমূলে জন্মগ্রহণ করেন কুমার সিদ্ধার্থ। কুমারের জন্মের সাতদিন পরেই মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সহোদরা ও সপত্নী মহাপ্রজাবতীকে তাঁর শিশুপুত্রকে লালনপালন করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। বিমাতা হলেও মহাপ্রজাবতী সিদ্ধার্থের মায়ের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছিলেন। উপযুক্তকালে কুমারের বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হলো। আচার্যের কাছে সিদ্ধার্থ অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করলেন বেদাদিশাস্ত্র, ধনুর্বিদ্যা ও রাজনীতি। ক্রমে তিনি মৃগয়া, অশ্বারোহণ ও রথচালনায় অর্জন করলেন দক্ষতা। রাজবংশের রীতি অনুযায়ী রাজা শুদ্ধোদন সকল দিক দিয়েই উপযুক্ত করে গড়ে তুললেন তাঁর একমাত্র সন্তান ও সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী রাজকুমার সিদ্ধার্থকে।

কৈশোর অতিক্রান্ত হলো। কুমার যৌবনে পদার্পণ করলেন। বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতি, কিন্তু প্রকৃতি প্রশান্ত। প্রশান্ত অথচ উদাস। রাজপুরীর ভোগ-বিলাসিতায় তিনি যেন কিছুমাত্র আকর্ষণ বোধ করেন না। শুদ্ধোদন কতো চেষ্টা করেন কুমারকে ভোগমুখী করতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। চারিদিকের বাদ্য শঙ্খধ্বনি ও নৃত্য মহোৎসবের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও কুমারের মন যেন সর্বদাই কি রকম উদাস দেখা যায়। একদিন কৃষি হলোৎসবের সময় তাঁকে এক জাম গাছের তলায় গভীরভাবে ধ্যানস্থ দেখা গেল। শুদ্ধোদন চিন্তিত হন ঋষি অসিতের সেই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে। কুমারের জন্মের অব্যবহিত পরে লুম্বিনীর উদ্যান-প্রাসাদে বেদজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি অসিত নবজাত শিশুকে সন্দর্শন করে বলেছিলেন—জগতের সমস্ত দুঃখ-সন্তপ্ত জনগণের ইনিই হবেন মুক্তিদাতা। বলেছিলেন, এই রাজকুমারই ভাবী বুদ্ধ যিনি বহু যুগ পরে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

রাজকুমারের মন যখন কিছুতেই সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হলো না, তখন মহাদেবী প্রজাবতী সিদ্ধার্থকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য স্বামীকে পরামর্শ দিলেন। কুমারের বয়স তখন আঠারো। দণ্ডপাণির কন্যা যশোধরার স্বয়ংবর সভায় দেশ-বিদেশের রাজপুত্র উপস্থিত হয়েছেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থও এসেছেন পিতার অনুমতি নিয়ে সেই সভায়। কুমারীর হাতে বরমাল্য লাভ করলেন সিদ্ধার্থ সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে। তারপর শাক্যকুললক্ষ্মীকে নিয়ে কুমার ফিরে এলেন রাজধানীতে। নিশ্চিন্ত হলেন শুদ্ধোদন আর মহাদেবী প্রজাবতী। আর কিছুকাল পরেই কুমারকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে তাঁর হাতে রাজ্যভার তুলে দেবেন, ঠিক করলেন শুদ্ধোদন।

আকণ্ঠ ভোগবিলাসের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও কুমারের মনে কিন্তু ছিল না সুখ। কিসের একটা অভাব যেন অনুভব করতেন তিনি। এইভাবে অতিক্রান্ত হলো একে একে দশটি বছর। ইতিমধ্যে সিদ্ধার্থের একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু শৃঙ্খলিত হস্তীর চিত্ত যেমন অরণ্যের দিকে ধাবিত হয়, রাজকুমারের মনও এখন মায়ার বন্ধন কাটবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। তারপর উপর্যুপরি চারদিন নগরভ্রমণে বহির্গত হয়ে কুমার পথে একে একে সন্দর্শন করলেন একটি পক্ককেশ শীর্ণদেহ বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত একটি লোক, একটি বিগতপ্রাণ দেহ—এইভাবেই জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর সঙ্গে ঘটল তাঁর পরিচয়। তারপর একদিন তিনি সাক্ষাৎ পেলেন দেবদূতের মতো এক সন্ন্যাসীর। সন্ন্যাসী তাঁকে বললেন, সিদ্ধার্থ, তুমি বোধিসত্ত্ব; জগতকে ধর্মের আলোক দেবার জন্যই তোমার জন্ম। এইটুকু সংকেতই যথেষ্ট ছিল। কুমার মনে মনে গ্রহণ করলেন গৃহত্যাগের সংকল্প! তারপর এক চৈত্র পূর্ণিমার নিস্তব্ধ রাত্রে নিদ্রিতা যশোধরা ও তার কোলে নিদ্রিত শিশুপুত্র রাহুলকে ত্যাগ করে, সারথি ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। মহাজীবনের সন্ধানে অগ্রসর হলেন এক মহামানব।

ভিক্ষাপাত্র হাতে বৈশালীর রাজপথে চলেছেন সৌম্যমূর্তি সিদ্ধার্থ গৌতম। রাজকুমার সিদ্ধার্থ এখন শাক্যমুনি। শ্রাবস্তীর পথে চলেছেন তিনি। শুধু চলা আর চলা। নির্বাণপথের পথিক তিনি এখন। যেখানে যত তপস্বী দেখতে পান তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁদের পদপ্রান্তে বসে আহরণ করেন ধর্মজ্ঞান। অবগত হন নানা বিষয়—কর্ম, জন্মান্তর, আত্মস্বরূপ, ঈশ্বরতত্ত্ব এবং শাস্ত্রের আরো কত নিগূঢ় বিষয়। জ্ঞানার্জনের সঙ্গে চলে কঠোর সাধনা। শ্রাবস্তী ছেড়ে তিনি এলেন বিম্বিসারের রাজগৃহে। আরো শ্রেষ্ঠতর ধর্মের সন্ধানে রাজগৃহ থেকে তিনি এলেন উরুবিল্বে (বর্তমান নাম বুদ্ধগয়া)। নির্জন তপস্যার উপযুক্ত স্থান। এখানে অন্তঃসলিলা নৈরঞ্জনা নদীর পশ্চিমতটে ছায়া সুনিবিড় একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় গৌতম পাতলেন তাঁর তপস্যার আসন। উরুবিল্বের সেই গভীর অরণ্যে শ্রমণ গৌতম আরম্ভ করলেন দুশ্চর তপস্যা। ক্রমে উপবাসে ও অনাহারে শীর্ণ হয় তাঁর সুবর্ণকান্তি বলিষ্ঠ শরীর। কিছুদিন যায় এইভাবে।

পবিত্র মহাতরুর মূলে চলে সিদ্ধার্থের একাগ্র তপস্যা—সত্যের সন্ধানে এমন তপস্যা পৃথিবীতে আর কেউ কখনো করেনি। সেদিন ছিল বৈশাখের উজ্জ্বল পূর্ণিমা, যেদিন মন ও বুদ্ধির সেই ভীষণ সংগ্রামে বিজয়ী হলেন গৌতম। পূর্ণজ্ঞানের বিপুল বৈভব তাঁর করায়ত্ত প্রায়। ধ্যান-নিমীলিত নয়নে নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো বসে আছেন গৌতম। তাঁর মন ক্রমশঃ ধ্যানের স্তর ভেদ করে সুখ-দুঃখের অতীত, স্মৃতি-পরিশুদ্ধময় চতুর্থ স্তরে উপনীত হলো। উত্তোলিত হয় জন্ম-জন্মান্তরের রহস্যযবনিকা। এলো রজনীর দ্বিতীয়

যাম। আরম্ভ হলো দ্বিতীয় বিদ্যা—চ্যুতোৎপত্তিজ্ঞান। উদঘাটিত হলো জন্ম-মৃত্যুর রহস্য। তৃতীয় যামে তিনি উপলব্ধি করলেন জগতের স্বরূপ। তখন কল্পকল্পান্তরের সাধনাপ্রসূত বুদ্ধত্ব লাভ করে, ভগবান তথাগত বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে নৈরঞ্জনাসৈকত প্রতিধ্বনিত করে উচ্চারণ করলেন—'সংস্কার বিগতবিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।' বৈশাখী পূর্ণিমার সেই শেষ যামে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা বিলোকন করে, দুঃখের মূলতত্ত্বে উপনীত হলেন বুদ্ধদেব। দুঃখর দ্বাদশ নিদান আবিষ্কার করলেন তিনি। এই-ই তাঁর নিজস্ব দর্শন।

এইবার তথাগত তাঁর দর্শন প্রচারে ব্রতী হলেন। প্রথমেই এলেন তিনি বারাণসীর উত্তরে সারনাথে। এক অনুচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই সারনাথ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মানুশীলন ও জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থান ছিল। সারনাথের এই মৃগদাবেই বুদ্ধদেব তাঁর প্রথম পঞ্চ শিষ্যের কাছে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। দিনে দিনে প্রচারিত হতে লাগল বুদ্ধবাণী। ধর্মচক্রে আকৃষ্ট হতে থাকে শত শত নর-নারী। তারপর একদিন তিনি ষাট জন ভিক্ষুককে একত্র করে বললেন—তোমরা বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় হয়ে পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ঘুরে বেড়াও। ধর্ম-প্রচারের জন্য এই ছিল বুদ্ধের প্রথম নির্দেশ। বুদ্ধত্বলাভের পর প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল তিনি প্রচার ব্রতে লিপ্ত ছিলেন। বহু জনপদ-নগর পরিভ্রমণ করে উত্তর ভারতের সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন প্রাকৃতজনের ভাষায়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তিনিই প্রথম ধর্মকে প্রচারের বিষয় করে তুলেছিলেন। ধনী-দরিদ্র সকলেই তাঁর সমান অনুকম্পার পাত্র ছিল।

আশী বছর বয়সে আর এক বৈশাখী পূর্ণিমা রাত্রে কুশীনগরে হিরণ্যবতী নদীর তীরে একটি শালবৃক্ষমূলে তাঁর জীবনব্রত সফল করে মহাপরিনির্বাণ শয়নে শায়িত হলেন পুণ্যপুরুষ বুদ্ধদেব।

বুদ্ধ মহাপুরুষ। নিখিল মানবের কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর কাম্য। আর সমগ্র মানবজাতির উদ্ধারসাধনই ছিল তাঁর জীবনব্রত। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, পরম প্রেম, সর্বদর্শী শক্তি আর পরিপূর্ণ পবিত্রতা—বুদ্ধমানসের এই ছিল প্রধান উপাদান। এমন অজাতশত্রু মহামানব ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই। বুদ্ধ মহাজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানের গরিমা তাঁর ছিল না। সরলতা, উদারতা আর সৎচেষ্টা —এই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন অতিবাহিত হয়েছিল মানুষের হিতের জন্যেই। সংঘ আর সামাজিক সাম্য—এই হলো বুদ্ধের অসামান্য অবদান। বুদ্ধের পঞ্চশীল মনুষ্যত্বলাভের শ্রেষ্ঠ সোপান বলে ইতিহাসে স্বীকৃত হয়েছে। মানবমনের স্বর্ণ সিংহাসনে গৌতম বুদ্ধের আসন শাশ্বত। আজো তাই নিখিলমানবচিত্তে ঝংকৃত হয় এই প্রার্থনা—

'শান্ত হে মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।'

কনফুসিয়াস

(খ্রীঃ পূঃ ৫৫০—৪৭৯)

একজন প্রজ্ঞাবান দার্শনিক হিসাবে পৃথিবীতে কনফুসিয়াস আজও স্বীকৃত ও সম্পূজিত। শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে তাঁর নৈতিক আচরণ-বিধি চীন উপমহাদেশের মানুষকে তাদের জীবনের পথে চলার সঠিক নির্দেশ জুগিয়ে এসেছে। তিনি ছিলেন একাধারে একজন ঋষি, শিক্ষক ও সংস্কারক। তাঁর চিন্তা থেকে একদা নীতি-নৈতিকতার যে আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল তা কেবলমাত্র চীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি—সারা পৃথিবীতেই তা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। 'কনফুসিয়াজিম'—এই অভিধায় আজ সুপরিচিত তাঁর মতবাদ।

যুগের প্রয়োজনেই আবির্ভাব ঘটে থাকে যুগপুরুষদের। এই আপ্ত বাক্যটি চিরকালের শাশ্বত সত্য। কনফুসিয়াসের জীবনেও এটি নিঃসংশয়ে সত্য ছিল, কারণ ষষ্ঠ শতাব্দীর চীনের অবস্থা বা পরিবেশ এমন হয়ে উঠেছিল দেখা যায় যা একজন তীক্ষ্ণধী যুগমানবের আবির্ভাবের পক্ষে নিতান্তই অনুকূল ছিল। কনফুসিয়াসের জন্মকালে চীন ছিল পুরোহিত-তন্ত্র শাসিত একটি রাষ্ট্র। শাঙ বংশের পুরোহিত-সম্রাটগণই এক হাজার বছরের চেয়ে কিছু বেশি কাল রাজত্ব করে আসছিলেন। কনফুসিয়াস নিজেকে এই রাজবংশেরই সন্তান বলে গণ্য করতেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১১২৫ সালের পর শাঙ বংশের আর কোন অস্তিত্বই রইল না। তখন থেকে পাঁচশো বছর পর্যন্ত চীনে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। এমনি করে চলতে চলতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে—যে শতাব্দীটিকে চীনের লোকেরা 'বিপর্যয়ের যুগ' বলে অভিহিত করে থাকে—সমস্ত চীন ভূ-খণ্ডে এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পাঁচ থেকে ছয় হাজারে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন একটি দেশে যুগপৎ এমন বিপুলসংখ্যক রাষ্ট্রের প্রাদুর্ভাব কখনো দেখা যায়নি।

এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটির নাম ছিল লু; আধুনিক শাঙটুঙ প্রদেশের কিছু অংশ জুড়ে লু রাষ্ট্রটি অবস্থিত ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৫৫১ অথবা ৫৫০ সালের শীত ঋতুতে এই রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কনফুসিয়াস। তাঁর বাবা, সু-লিয়াঙহে ছিলেন সাউ জেলার সেনাধ্যক্ষ। রীতিমতো সম্পত্তিসম্পন্ন। তাঁর অনেকগুলি মেয়ে, কিন্তু একটিও উত্তরাধিকারী ছিল না। তাই একটি বংশধর লাভের প্রত্যাশায় সত্তর বছর বয়সে তিনি আবার একটি বিয়ে করলেন। যথাসময়ে এই নব-পরিণীতা স্ত্রী চিঙ-সাই তাঁর স্বামীকে উপহার দিলেন একটি পুত্র সন্তান—সেই পুত্রই কনফুসিয়াস।

খুব অল্প বয়সেই অসাধারণ ক্ষমতার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা গিয়েছিল কনফুসিয়াসের

মধ্যে; তিন বছর বয়স হওয়ার আগেই তাঁর বাবা মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারটি হয় দারিদ্র্য-কবলিত। ফলে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই বালককে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করতে হয়। কিন্তু তাঁর মনটি ছিল লেখাপড়ার দিকে এবং কথিত আছে যে, পনর বছর বয়সেই তিনি একজন ঋষি হওয়ার সংকল্প করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হওয়ার সংকল্প করেছিলেন। উনিশ বছর বয়সে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং যথাসময়ে একটি পুত্র ও দুইটি কন্যার তিনি জনকও হন। কিন্তু এই বিবাহ ও সাংসারিক জীবনের বন্ধন নিতান্তই শিথিল মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। কারণ যতই দিন যেতে থাকে কনফুসিয়াস যেন ততই দুইটি বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন—তিনি শুধু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে উঠবেন না, একজন প্রজ্ঞাবান শাসকও হবেন।

বিয়ের অল্পদিন পরেই কনফুসিয়াস একটা চাকরি নিলেন—স্টোরকীপার বা ভাঁড়ার রক্ষকের চাকরি। কিছুকাল পরে তাঁর খুব পদোন্নতি হয়—তিনি শহরের উদ্যানগুলি ও গবাদি পশুর অধিকর্তার পদে নিযুক্ত হলেন। বাইশ বছর বয়সে আরম্ভ হয় তাঁর যথার্থ জীবন। এইবার শুরু হয় তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়। এইবার তাঁর মধ্যে দেখা গেল একজন লোকশিক্ষক ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে; তিনি স্থাপন করলেন একটি একাদেমি (Academy) বা বিদ্যালয়। এইখানে বসেই তিনি যথার্থ জীবনাচরণবিধি ও দেশ শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তাঁর ছাত্রবৃন্দ সবাই তরুণ। যদি তাদের মধ্যে কেউ বড়লোকের ছেলে থাকত, কনফুসিয়াস তার কাছ থেকে বেতনবাবদ প্রচুর অর্থ নিতেন; কিন্তু দরিদ্র বলে তিনি কোন ছাত্রকেই ফিরিয়ে দিতেন না। আগ্রহ আর ক্ষমতা দেখেই তিনি ছাত্র নির্বাচন করতেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতিটা কি ধরনের ছিল তা জানা যায় কনফুসিয়াসের এই উক্তিটি থেকে—'কোন একটি বিষয়ের একটি দিক আমি ছাত্রদের সামনে তুলে ধরি, বাকী তিনটি দিক ছাত্রকে নিজে থেকে বুঝে নিতে হবে। যে পাঠ আমি একবার প্রদান করি, তার আর পুনরুক্তি করি না।'

একাদেমি খোলার পর থেকে শিক্ষক ও শাসক হিসাবে কনফুসিয়াসের খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে লাগল। সরকারী প্রশাসক হিসাবে, উৎসাহী সংস্কারক হিসাবেও তিনি গণ্য হয়ে উঠলেন এবং প্রচলিত কুসংস্কারগুলিকে আক্রমণ করে সমাজের বুক থেকে দূর করতে তিনি দ্বিধা বোধ করলেন না। একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে তিনি ইতিহাস ও দর্শন গভীরভাবেই অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মনের মধ্যে এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় যে, সুশাসন ও সুনীতি—এই দুটিই মানব সমাজের প্রকৃত বনিয়াদ। অতীতকালের ইতিহাস পাঠ করে এবং শাসনবিধি ও নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তাতেই তিনি অটল ছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ ৫১৭ সালের কথা। লু প্রদেশ থেকে দু'জন উচ্চপদস্থ তরুণ তাঁর শিষ্য হলেন এবং তাদের সঙ্গে কনফুসিয়াস সাম্রাজ্যের রাজধানী পরিদর্শনে

গেলেন। সেইখানে রাজকীয় গ্রন্থাগারে চলতে থাকে ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গবেষণা। তাঁর ছিল আবাল্য সংগীতে অনুরক্তি। রাজধানীতে এসে তিনি সংগীত বিষয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন ও রাজদরবারে সংগীতের আলোচনায় যোগদান করতেন। পরবর্তী কালে তাঁর জীবনে সংগীতের অসীম প্রভাব দেখা যায়।

রাজধানী পরিদর্শন কালেই তিনি তাঁর সমকালীন প্রখ্যাত দার্শনিক লাওৎসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে জানা যায়। কনফুসিয়াস আর লাওৎসে যেন বিপরীত মেরুদণ্ডে অবস্থিত দুটি চরিত্র। আবার দু'জনেই ছিলেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। চীন মহাদেশে তিনজন ধর্ম প্রবর্তকের মধ্যে একজন ছিলেন এই দার্শনিক লাওৎসে। তাঁর ধর্মের অনুসরণকারীদের বলা হয় তাওইস্ত (Taoists) এবং আজও চীনের কোটি কোটি মানুষ এই ধর্মাবলম্বী। এ হেন দুই ব্যক্তির মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটল। চরিত্র ও মনের দিক থেকে দু'জনের মধ্যে ব্যবধান ছিল দুস্তর; উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও পার্থক্য ছিল অনেক। লাওৎসে ছিলেন স্বাপ্নিক, আদর্শবাদী ও মরমী; এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব-নিয়ন্তার অস্তিত্বে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। তাঁর ধর্মের মূল কথাটি এই ছিল যে, পরম সত্যকে লাভ করতে হলে পার্থিব কামনা-বাসনা থেকে দেহকে মুক্ত করতে হবে এবং একটি বিশেষ মার্গ বা পন্থার (Tao) চেতনাকে এমনভাবে আশ্রয় করতে হবে যাতে করে মানুষের আত্মা এর দ্বারা অভিসিঞ্চিত হয়ে যেতে পারে।

অন্যদিকে, কনফুসিয়াস ছিলেন প্রখর বাস্তববাদী, বস্তুবাদী এবং তিনি কোন ব্যক্তি-ঈশ্বরকে স্বীকার করতেন না, তবে সকল বিষয়ে তিনি অপার্থিবলোকের অর্থাৎ স্বর্গের দোহাই দিতেন, যদিও এর অবস্থান সম্পর্কে তিনি সঠিক কিছু বলতেন না। যদি কেউ তাঁকে প্রশ্ন করতো, আচার্যদেব, আপনার এই স্বর্গ কোথায়?—তখন এর উত্তরে বুকের মাঝখানটিতে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী রেখে বলতেন—এইখানে, আর কোথাও নয়। আধ্যাত্মিকতা বলতে তিনি বুঝতেন যাবতীয় বাহ্যবিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে চলতে ও নিজের চারিদিকে সব সময় একটি ধর্মীয় পরিবেশ রচনা করতে। তা হলেই মানুষ পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

এক আশ্চর্য প্রকৃতির মানুষ ছিলেন কনফুসিয়াস।

দীর্ঘদেহী মানুষ, যখন হাঁটতেন তখন হাত দু'খানি পাখীর ডানার মতো দু'পাশে প্রসারিত করে রাখতেন; তাঁর পৃষ্ঠদেশ দেখতে ছিল ঠিক যেন একটি কালো কচ্ছপের মতো। পান-ভোজন দুই-ই ছিল তাঁর পরিমিত। আচারে-আচরণে তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখতে পাওয়া যেত না। সকলপ্রকার উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁর নিয়মানুবর্তিতা ছিল প্রশংসার যোগ্য। কনফুসিয়াস এমনই একটি চরিত্র যাঁর প্রতি কেউ সহজে আকৃষ্ট হতো না—তাঁকে দূর থেকে বরং ভালোবাসতে পারা যেত, কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে এসে আদৌ নয়।

তবু কনফুসিয়াসকে চীনের কোটি কোটি নর-নারী না ভালোবেসে থাকতে পারত না, কারণ তাদের কাছে এই মানুষটির মুখের উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য ছিল মুক্তার মতো দামী। তাঁর সর্ব অবয়বে জ্ঞানের আভা যেন ঝলমল করত; তিনি যেন প্রজ্ঞার বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে ধর্মাচরণে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। তাই তো তাঁর ও জনসাধারণের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। বাহান্ন বছর বয়সে তাঁর আবার ডাক পড়ল দেশের সরকারের কাছ থেকে। তাঁর নিজস্ব দেশের চুঙ-তু নামক একটি শহরের রাজ্যপালের পদে নিযুক্ত হলেন তিনি। শাসক হিসাবে এই সময় তিনি তাঁর প্রতিভার ও জ্ঞানের এবং বিচার-বিবেচনার যথেষ্ট পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিছুকাল বাদে তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ লাভ করেন। তাঁর শাসনপদ্ধতির ফলে শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা চিরকালের মতো বিদূরিত হয়েছিল; ফিরে এসেছিল পুরুষদের মধ্যে আন্তরিক রাজানুগত্য, আর স্ত্রীলোকদের মধ্যে সতীত্ব ও সংসার-ধর্ম পালনে নিষ্ঠা। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতা হ্রাস করে দিয়ে, সাধারণ মানুষকে অত্যাচার থেকে মুক্ত করে দিয়ে, ন্যায়ের চক্ষে সকলকে সমান করে দিয়ে, কনফুসিয়াস চীনের জনসাধারণের জীবনে যেন এক নবযুগের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। সমাজ ও রাষ্ট্রে তিনি যেসব সংস্কার নিয়ে এসেছিলেন সেগুলির রচনা ও পরিকল্পনায় আধুনিকতার ছাপ ছিল।

সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কনফুসিয়াসের জীবন ছিল খুবই কর্মব্যস্ত। জীবনের পরবর্তী পাঁচটি বছর তিনি একান্তে অবসর জীবনযাপন করেন লেখার কাজে; শিষ্যদের উপদেশ প্রদানে তিনি তখনো পর্যন্ত ছিলেন ক্লান্তিহীন। এই সময়েই তিনি রচনা করেন তাঁর একমাত্র গ্রন্থ 'চুন্ চিউ কিঙ' ('বসন্ত ও শরৎ'); এর মধ্যে বিবৃত হয়েছে আড়াইশ বছরের কাহিনী। চীনের আড়াইশ বছরের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ততার এই গ্রন্থটি, চীনা পণ্ডিতদের মতে ইতিহাস রচনার একটি আদর্শ গ্রন্থ। খ্রীঃ পূর্ব ৪৭৮ সালে ছিয়াত্তর বছর বয়সে মৃত্যুকালে এই ঋষিকল্প অথচ ভগ্নমনোরথ মানুষটির মুখের উচ্চারিত শেষ কথাটি ছিল এই, "আমাকে কেউ চিনতে পারল না।" তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান শিষ্যরা তিন বছর ধরে কনফুসিয়াসের সমাধি পার্শ্বে শোক পালন করেছিল। মৃত্যুর পরে চীনের ভৌগোলিক গণ্ডী অতিক্রম করে সমগ্র পৃথিবীতে যেমন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল কনফুসিয়াসের খ্যাতি, তেমনি ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর উপদেশাবলী। তাঁর দুটি উপদেশ খুব বিখ্যাত—(১) দেবতাদের শ্রদ্ধা করো, কিন্তু তাদেরকে তফাতে রেখে দিও এবং (২) 'শ্রেষ্ঠ মানুষ সে-ই যার জীবনাচরণে কোন ফাঁকি নেই।'

সক্রেটিস

(খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯—৩৯৯)

খ্রীষ্ট পূঃ ৪৬৯ সালে সক্রেটিসের জন্ম। প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম, আর এথেন্সের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তাঁর জন্মকালটা ছিল এথেন্সের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। তখন গ্রীসের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্স ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র। শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে এথেন্স তখন সকলের পুরোভাগে ছিল এবং সক্রেটিসের জন্মকালেই এই তিনটি বিষয়ে এথেন্সের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বললেই হয়। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ভাস্কর; তরুণ সক্রেটিস; কিছুকাল পিতার পেশার অনুসরণ করেছিলেন। মা ছিলেন ধাত্রিবিদ্যার চিকিৎসক। পরবর্তিকালে সক্রেটিস বলতেন যে, তিনি তাঁর বিচার-পদ্ধতিতে মায়ের এই পেশার অনুসরণ করতেন। নিজেকে তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে একজন ধাত্রী (Midwife) বলে মনে করতেন। এর থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে তিনি একজন পরিহাসপটু মানুষ ছিলেন।

এথেন্সের নাগরিকদের অধিকাংশকেই সামরিক কর্মে নিয়োগ করা হতো। সক্রেটিসের জীবনেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরেই তাঁকে পোতিদিয়া অভিযানে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং তিনি বেশ সাহসের সঙ্গে ও উত্তমরূপেই যুদ্ধ করেছিলেন। একবার একটা বড়ো রকমের যুদ্ধে তিনি প্রখ্যাত য়্যালসিবিয়াডস-এর জীবন রক্ষা করেছিলেন। পরবর্তিকালে ইনিই সক্রেটিসের বন্ধু ও শিষ্য হয়েছিলেন। ডেলিয়াস ও য়্যামফিপোলিশ নামক দুটি স্থানেও তাঁকে যুদ্ধ-বিগ্রহে বেশ কিছুদিন লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। রণক্ষেত্রে তিনি নির্ভীকতার পরিচয় রেখেছিলেন—যেমন নির্ভীকতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তাঁর নাগরিক জীবনে।

যুদ্ধ পরবর্তী জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য সাধনে অর্থাৎ উপদেশ প্রদানের কাজে নিরলসভাবে নিযুক্ত ছিলেন। এমন কথা-বলিয়ে (talker) মানুষ সভ্যতার ইতিহাসে বোধ করি আর দুটি দেখা যাবে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে অনর্গল বাক্যস্রোত নির্গত হয়েছে সক্রেটিসের মুখ থেকে। সে কি যেমন তেমন কথা—তাঁর মুখের উচ্চারিত প্রতিটি কথার মধ্যে থাকত গভীর জ্ঞানের পরিচয় আর সেইসব জ্ঞানগর্ভ কথাগুলিই তাঁকে তাঁর জীবিতকালে পৃথিবীর বিজ্ঞতম ব্যক্তি বলে খ্যাতিমান করে তুলেছিল। অতি প্রত্যূষে তিনি মুক্তাঙ্গনে পরিভ্রমণে বেরুতেন। জীর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত তাঁর কুৎসিত চেহারাটি এথেন্স শহরের প্রতিটি মানুষের কাছে ছিল সুপরিচিত।

কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কোনো ঋতুতেই তাঁর গায়ে জামা থাকত না—পদযুগল অনাবৃত। কিন্তু তাঁর এই দারিদ্র্যের মধ্যে কোনো রকম অহমিকার ভাব কখনো দেখা যেত না। তিনি সব রকম শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন করতেন, কারণ তিনি বাস করতেন তাঁর মনের জগতে এবং আত্মা ও মনোজগতের বিষয়সমূহ নিয়েই তিনি চিন্তাভাবনা করতেন। বিশেষ করে আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন থাকতে তিনি ভালোবাসতেন। কোনো মানুষ, এমন কি কোন ক্রীতদাসও এমন জীবনযাপন করতে পারে কিনা সন্দেহ।

দেশের কথা তিনি আদৌ চিন্তা করতেন না—তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল নর-নারী। সমাজের উচ্চ পদস্থ বা নিম্ন পদস্থ লোক, বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ইতর সাধারণ—সকলেই মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনতেন। সে সব কথার মধ্যে থাকত সুতীক্ষ্ণ প্রশ্ন; শ্রোতাগণ সে সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করতেন। প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত থাকত তাঁর বক্তব্য।

জাগতিক সকল বিষয়ে তিনি যেসব উপদেশ দিতেন, ব্যক্তিগত জীবনাচরণ সম্পর্কে যেসব ভালো কথা বলতেন সেগুলি যাচাই করে নেবার জন্য তিনি শ্রোতাদের বলতেন। মানুষ যাতে ভালো হয় এই তাঁর লক্ষ্য ছিল। সৎ আচরণ ব্যতিরেকে কোনো মানুষই মনুষ্যপদবাচ্য হতে পারে না—এই ছিল সক্রেটিসের সুস্পষ্ট অভিমত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এই বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকলেই প্রত্যেক মানুষ এইটির সন্ধান করে থাকে। যার মধ্যে যত পরিমাণে সৎ আচরণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, সে সেই পরিমাণ ধার্মিক আর এই জিনিসটির অভাবই হলো অধর্ম বা পাপ—এই তাঁর প্রধান উপদেশ।

এথেন্স শহরের অধিকাংশ লোক য়্যারিস্টোফেনস্-এর মতের সমর্থক ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ধনী ও দরিদ্র একদল শিষ্য সর্বদা সক্রেটিসকে ঘিরে থাকত। কেউ আসত তাঁর কাছ থেকে তর্ক-নৈপুণ্য ও প্রতিবাদ-পদ্ধতি শিখবার জন্য, আর অন্যরা আসত তাদের জীবনকে উন্নত করার প্রণালী জানবার জন্য। নানা ধরনের মানুষ আসত তাঁর কাছে। সক্রেটিসের চরণতলে বসে জ্ঞানলাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ক্রিটিয়াস, য়্যালসিবিয়াডস, ক্রিটো, প্লেটো, জেনোফোন, সিরীস ও ইউরিপিদিস। আচার্যদের কাছে শিষ্যদের আগমন ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও অনিয়মিত। দর্শনের কোন নিয়মিত বিদ্যালয় সক্রেটিস খোলেন নি। তিনি শুধু প্রশ্ন করতেন, বিচার করতেন ও মানুষকে আলোকের পথে উত্তীর্ণ করে দেবার প্রয়াস পেতেন।

খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯ সাল। সক্রেটিসের বয়স তখন সত্তর বছর। সারা পৃথিবীতে যেমন পরিব্যাপ্ত হয়েছে তাঁর খ্যাতি একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও দার্শনিক হিসাবে, তেমনি তাঁর শত্রুসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর বিরোধীরা একটা চক্রান্তের জাল বিস্তার করলেন তাঁর চারদিকে। তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়ে বিচারার্থে আনীত হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল দুটি; প্রথম—তিনি

প্রচলিত ঠাকুর-দেবতায় অবিশ্বাসী ; দ্বিতীয়—তিনি নগরের তরুণ সম্প্রদায়কে শুধু বিপথগামী করেন নি, তাদের চিত্তকে করেছেন কলুষিত। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সক্রেটিস নিজের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন এই বলে—'হে এথেন্স-এর নাগরিকবৃন্দ, আমি জানি না আমার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ এনেছেন তাদের দ্বারা তোমরা কতদূর প্রভাবিত হয়েছ। আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করো তাহলে আমি বলব যে, তাঁদের বিচিত্র যুক্তি শ্রবণ করে আমি প্রায় আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম ; যাই হোক এখানে দাঁড়িয়ে আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছি যে, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন।' সরকার পক্ষে যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপিত করা হলো, সক্রেটিস তার একটিরও প্রতিবাদ করলেন না। তিনি শুধু তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলির একটি সরল ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। তাঁর যা কিছু সম্পদ ছিল সবই তিনি এথেন্স-এর সেবায় দান করেছিলেন। নাগরিকদের সুখী করাই তাঁর জীবনের ইচ্ছা। দেবতাদের বিশেষ আদেশ ক্রমেই তিনি এই কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। তারপর বিচারকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—আপনাদের বিধানের চেয়ে এই সব দেববিধানই আ ি মান্য করে থাকি।

জবানবন্দীর শেষে সক্রেটিস বলেছিলেন 'সত্যের সন্ধান থেকে আমি বিরত থাকব, এই শর্তে আমাকে যদি মুক্তি প্রদান করা হয়, তাহলে আমি বলব—হে এথেন্সবাসিগণ, তোমাদের ধন্যবাদ ; কিন্তু আমি ঈশ্বরের আদেশই মান্য করব, কারণ তিনিই তো আমাকে এই মহৎ কর্মে প্রণোদিত করেছেন এবং যতদিন পর্যন্ত আমার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হবে, আমার ক্ষমতা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমি আমার আরব্ধ ব্রত থেকে বিরত থাকব না, দর্শনের আলাপ-আলোচনা থেকেও প্রতিনিবৃত্ত হব না। যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাকেই আমি জিজ্ঞাসা করব ; জ্ঞান ও সত্যের অনুসন্ধান না করে, আত্মার উন্নতিবিধানে সচেষ্ট না হয়ে, ঐশ্বর্য ও খ্যাতির প্রতি প্রলুব্ধ হতে তুমি লজ্জা বোধ কর না ? আমি জানি না মৃত্যু কি—এ হয়ত ভালো জিনিস হতে পারে ; আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। তবে আমি এইটুকু জানি যে নিজের কর্তব্যসাধনে বিরত থাকা অত্যন্ত অন্যায় ; যা আমি মন্দ বলে জানি তা বর্জন করে উত্তমকে গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর বলে মনে করি।'

বিচার শেষ হয়ে গেল। ঠিক বিচার নয়, বিচারের প্রহসন। বিচারকরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। এথেন্স-এর প্রচলিত আইন অনুসারে দণ্ডিত ব্যক্তি বিকল্প দণ্ডের যেমন নির্বাসনের প্রস্তাব করতে পারত। সক্রেটিস এই আইনের বিষয় অবগত ছিলেন। তিনিও বিকল্প দণ্ডের প্রস্তাব রাখলেন বিচারকদের সামনে। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, যেহেতু তিনি জনসাধারণের হিতার্থী, সেইজন্য তাঁর সঙ্গে ঠিক সেই প্রকার ব্যবহার করতে হবে। জনসাধারণের খরচে তাঁর জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা করতে হবে সাড়ম্বরে, ঠিক যেমনটি করা হয়ে থাকে

ওলিম্পিক ক্রীড়া-বিজয়ীর ক্ষেত্রে। পরিশেষে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে তিনি জরিমানাস্বরূপ এক মিনা প্রায় তিন পাউণ্ড) দিতে সম্মত হলেন।

আদালত সক্রেটিসের এই আবেদনে ক্রুদ্ধ হলেন। শুধু আদালতের অবমাননা করা নয়, তাঁর উক্তি দ্বারা সক্রেটিস তথাকথিত জ্ঞানের প্রতি চরম ঘৃণা প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং আদালত তাঁর প্রতি মৃত্যুদণ্ডই বহাল রাখলেন—স্বহস্তে হেমলক বিষপান করে তাঁকে এই দণ্ড গ্রহণ করতে হবে। এই ছিল এথেন্স-এর মৃত্যুদণ্ডবিধি। প্রশান্ত মনে দার্শনিক গ্রহণ করলেন এই দণ্ড।

সক্রেটিসের জীবনের সেই চরম দৃশ্যটি প্লেটোর বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে আছে। তাঁর সর্বশেষ দিনটিতে সকালের দিকে কয়েকজন শিষ্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তখন তাঁকে শৃঙ্খলভার থেকে মুক্ত করা হয়েছে। শৃঙ্খলমুক্ত চরণ দুটি দু'হাত দিয়ে বুলোতে বুলোতে সক্রেটিস ধীরে ধীরে শিষ্যদের সঙ্গে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হন ; সেই মুহূর্তটিতে তিনি তাদের বুঝিয়ে দেন আনন্দের সঙ্গে যন্ত্রণার কী সম্পর্ক। তাঁকে গোল হয়ে ঘিরে বসে তারা। আশ্চর্য হয়ে তারা শুনতে থাকে মৃত্যু পথযাত্রী সক্রেটিসের মুখে জীবন এবং মৃত্যুর প্রসঙ্গ, আত্মার অবিনশ্বরতার কথা। তারপর অপরাহ্ণকালে শিষ্যদের বিদায় দিয়ে সক্রেটিস স্নান করতে গেলেন। স্নান শেষ করে যখন তিনি কক্ষে ফিরে এলেন তখন দিনের সূর্য অস্তাচলে বসেছে—এলো তাঁর দণ্ড গ্রহণের সময়।

একজন রাজকর্মচারী দণ্ড দানের কাজ সম্পন্ন করতে এসে কেঁদে ফেলেন। ক্রিটো বলেন, সূর্য এখনো অস্তগত হননি ; আপনি কেন তাড়াতাড়ি করছেন ? সক্রেটিসের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন—যার ওপর বিষ দেবার ভার আছে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। বিষ পাত্র হাতে জল্লাদ প্রবেশ করে কারাকক্ষে। সক্রেটিস তার হাত থেকে পাত্রটি গ্রহণ করেন শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে। তারপর কিছুটা বিষ দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করে বাকীটা এক চুমুকে পান করেন। ধীরে ধীরে আরম্ভ হয় বিষের প্রতিক্রিয়া সর্ব অঙ্গে, শরীরের সমস্ত শিরায়। মুহূর্ত মধ্যে লুপ্ত হয় সকল চৈতন্য। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন সক্রেটিস। প্লেটো লিখেছেন—'আমাদের যিনি বন্ধু ছিলেন, যিনি তাঁর সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন—এই ছিল তাঁর জীবনের পরিণতি।' তথাপি মানব সভ্যতার ইতিহাসে সক্রেটিস বেঁচে আছেন, কারণ স্বর্গ থেকে তিনিই এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন দর্শন (Philosophy)। তিনিই ছিলেন পৃথিবীতে নীতি-নৈতিকতার প্রবর্তক। রাজদণ্ড অপেক্ষা বড়ো ন্যায়দণ্ড। ন্যায়ের বিধান সর্বোত্তম বিধান। এই বিধান অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কারো নেই। সক্রেটিসের এই বাণী আজও তার মূল্য হারায় নি।

প্লেটো

(খ্রীঃ পূঃ ৪২৭—৩৪৭)

গ্রীসীয় দর্শনের বিশাল আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনটি—সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল্। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এই তিন জনকেই গ্রীকদর্শনের মূলাধার পুরুষ বলা হয়েছে। এঁরাই একে একে গ্রীকদর্শনকে একটি পূর্ণ বৈজ্ঞানিক রূপ দান করেছিলেন। প্লেটো-এ্যারিষ্টটলের যুগকেই সুসম্বদ্ধ দর্শন-চিন্তার যুগ বলা হয়ে থাকে। আর প্লেটো-এ্যারিস্টটল প্রবর্তিত গ্রীকদর্শনই বিশেষভাবে যুরোপের নূতন দর্শন ও সংস্কৃতিকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে এবং যুরোপীয় সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের মধ্যেই তা শাশ্বত হয়ে আছে।

যুরোপের মানসলোকের ভাস্বরতম প্রকাশ প্লেটো। প্লেটোকে জানা মানেই যুরোপ মহাদেশের আত্মাকে জানা। পৃথিবীর সর্বকালের নয়জন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে প্লেটো অন্যতম, মানব-চিন্তার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতিতে এই নয়জনের অবদানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও প্রণিধানযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্লেটোকে এঁদের মধ্যমণি বলা হয়েছে, বলা হয়েছে যুরোপের মানস-লোকের প্রতীক তিনি। কারণ, স্পেংলারের মতে—"Plato is the expression of the human demand for permanence in a universe of process." নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে তাঁর একটি অনন্য স্থান আছে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় আইডিয়ালিজম বা অধ্যাত্মবাদের প্রথম উদ্ভাবক প্লেটোই। বহুমুখী তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক ও নাট্যকার। মানব-শিক্ষক তিনি। র্যাফেলের আঁকা একখানি চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে—ঊর্ধ্বদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে দাঁড়িয়ে আছেন প্লেটো। এই অবিস্মরণীয় আলেখ্যটির প্রতি কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করলেই প্লেটোকে জানা যায়, বোঝা যায়। ইন্দ্রিয় জগতের ঊর্ধ্বে, এক পবিত্র আদর্শ লোকের সন্ধানেই সার্থক এই দার্শনিকশ্রেষ্ঠের জীবন। গ্যেটে তাই বলেছেন—"প্লেটোর প্রতিভা সর্বদাই নিত্যের দিকে ধাবমান। তাঁর প্রতিটি বাক্যের লক্ষ্য—সত্য, শিব ও সুন্দর। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে সত্য-শিব-সুন্দরের ভাব জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা"।

এথেন্সের এক বিষম দুর্দিনে প্লেটোর জন্ম। এক অভিজাত-বংশেই প্লেটোর জন্ম হয়েছিল। পিতা—এ্যারিস্টন, পুত্রের নাম তাই রাখা হয়েছিল এ্যারিস্টক্লিজ। কিন্তু পৃথিবীর মানুষের কাছে তিনি 'প্লেটো' নামেই পরিচিত। প্রশস্ত বক্ষ আর বিস্তৃত ললাটের জন্য তাঁকে প্লেটো বলা হত। পিতার পদমর্যাদা ও অবস্থার অনুরূপ শিক্ষা পেলেও তিনি কখনো রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আকৃষ্ট হননি।

রাজনীতির কোলাহল অপেক্ষা দার্শনিকের শান্ত সংযত জীবন ও জীবনাচরণের প্রতি তিনি প্রবল আকর্ষণ বোধ করতেন। তাঁর বয়স যখন পনর তখন সিসিলির বিরুদ্ধে এথেন্সের বিরাট অভিযান প্লেটো প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তখন থেকেই এথেন্সের গৌরব, পেরিক্লিজ-যুগের গৌরব অন্তর্হিত হয়। এথেন্সের অর্থ নৈতিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটল। বিপ্লবের ফলে সমস্ত দেশ হয়ে উঠল অশান্তিপূর্ণ। সমাজের সর্বস্তরে দেখা দিল নৈতিক অবনতি। এইসব দেখে শুনে মর্মাহত হলেন প্লেটো। এথেন্সের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই, ভাবলেন তিনি। তখন থেকেই তিনি বেছে নিলেন জ্ঞানানুশীলনের পথ। কুড়ি বছর বয়সে প্লেটো গ্রহণ করলেন জ্ঞানের অবতার সক্রেটিসের শিষ্যত্ব, একাদিক্রমে আট বছরকাল তিনি অতিবাহিত করেছিলেন গুরুর সাহচর্যে। তরুণ প্লেটোর জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সক্রেটিস্।

ত্রিশ বছর বয়সে দেশান্তরী হলেন প্লেটো। দশ বছর অতিক্রান্ত হলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই সময়ের মধ্যেই প্লেটোর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। প্লেটো ফিরলেন এথেন্সে; দলে দলে লোক আসতে থাকে তাঁর কাছে জ্ঞান লাভের জন্য। অতঃপর গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণে আরম্ভ হয় তাঁর নূতন জীবন—আচার্যের বেদীতে বসলেন তিনি। তবে সক্রেটিস যেমন উন্মুক্ত স্থানে সর্বসাধারণের সম্মুখে দার্শনিক আলোচনায় নিযুক্ত থাকতেন, প্লেটোর পদ্ধতি ছিল ঠিক এর বিপরীত। নির্জনতাপ্রিয় প্লেটো নগরের কোলাহলের বাইরে নির্বাচিত করলেন একটি নির্জন উদ্যান; এটি ছিল তাঁরই পৈতৃক সম্পত্তি। এইখানেই তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। এরই নাম তিনি দিয়েছিলেন আকাদেমী। প্লেটোর এই চতুষ্পাঠীতে সেদিন প্রজ্ঞার যে আলোক প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, ত্রয়োদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত সেই আলোকের শিখা অম্লান ছিল। জ্ঞানালোচনার এই ধারা পরবর্তিকালে য়্যারিস্টটলের সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। প্লেটোর আকাদেমী য়্যারিস্টটলের সময়ে লাইসিয়মে রূপান্তরিত হয়।

প্লেটোর এই সময়কার জীবনের প্রধান ঘটনা সিসিলি দ্বীপে গমন। সেখান থেকেই আহ্বান এসেছিল। তাঁর বিখ্যাত 'রিপাবলিক' গ্রন্থে যে আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা তিনি করেছেন, ঠিক সেই আদর্শে সিসিলি রাষ্ট্র গঠন করাই ছিল তাঁর সিসিলি গমনের উদ্দেশ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে আসতে হয়। অতঃপর স্বীয় নিভৃত আকাদেমীতে শিষ্যদের সঙ্গে জ্ঞানালোচনা নিয়ে তিনি কালযাপন করতে থাকেন। তাঁর পূর্ববর্তীযুগে দর্শনালোচনায় কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী বা পদ্ধতি ছিল না। প্লেটোই দর্শনকে একটি সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত প্রণালীর ভিত্তির ওপর স্থাপন করে তাকে একটি শাস্ত্রের রূপ দিলেন। তখন থেকেই দার্শনিক চিন্তায় একটি গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা হয়।

বিরাশি বছর বয়সে প্লেটো পরলোকগমন করেন। তাঁর জীবিতকালেই তিনি ঐশ্বরিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন মহাজ্ঞানী বলে স্বীকৃত ও সম্পূজিত হয়েছিলেন।

প্লেটো কেবল দার্শনিক নন, তিনি একাধারে দার্শনিক, কবি ও ঋষি। চিন্তার গভীরতা ও মৌলিকতা যেমন তাঁর প্রতিভার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য তেমনি পারিপাট্য পরিদৃষ্ট হয় তাঁর ব্যাখ্যায়। যখন তিনি লেখনী ধারণ করেন, তখন যৌবনের সতেজ উৎসাহ ছিল না সত্য, কিন্তু অপরিসীম বিস্তৃতি লাভ করেছিল তাঁর অন্তঃকরণ। যৌবনোত্তীর্ণ কালের যে প্লেটো তাঁরই মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি যে, জ্ঞান গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে আর বিচার-বিবেচনা হয়ে উঠেছে প্রগাঢ়। শুধু কি তাই? সেইসঙ্গে জাগতিক জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যা নানা দিক থেকে দেখবার সামর্থ্যও তিনি অর্জন করেছিলেন। যৌবনের উত্তাপ নেই, অথচ যে ভাষায় তিনি তাঁর চিন্তা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, একদিকে তা যেমন জ্ঞানগর্ভ, অন্যদিকে তেমনি অনুপম সৌন্দর্য-বিলসিত আর উচ্চাঙ্গের কবিত্বে উদ্ভাসিত—যে কবিত্ব অনুভব করে শেলী পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্লেটোর অনবদ্য রচনাশৈলীর মাধুর্য এ পর্যন্ত কেউই আয়ত্ত করতে পারেন নি।

তাঁর আগে বা পরে দর্শন কখনো এমন উজ্জ্বল বেশে সজ্জিত হয়ে আত্ম-প্রকাশ করে নি। প্লেটোর যাবতীয় রচনা যেন অপূর্ব সুষমায় স্বচ্ছ, অকল্পিত সৌন্দর্যে দীপ্যমান। ভাষান্তরিত হয়েও তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের হানি হয় না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল যথার্থই বলেছেন—"প্লেটো কেবল ভাবুক ছিলেন না, কলা-কৌশলীও ছিলেন। তাঁর গ্রন্থরাজি কলা-কৌশলের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মানুষ ও তদিতর পদার্থ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা তাঁর গ্রন্থে উজ্জ্বল নাটকীয় ভাবপ্রাপ্ত; আবার কোথাও ঐতিহাসিক বর্ণনাবহুল। প্রভাতের আলো ও ছায়ার ন্যায় করুণ, হাস্য ও গম্ভীর রস তাঁর গ্রন্থে পরস্পরের অনুগামী। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, বর্ণনার ঔজ্জ্বল্য ও প্রসাদগুণে, সূক্ষ্ম বিচারসমন্বিত মনোহর চরিত্র-বর্ণনায়, শ্লেষ ও হাস্যরসের খেলায়, সর্বোপরি রচনাশৈলীর বিশুদ্ধি ও সৌন্দর্যে প্লেটোর নাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে অমর হয়ে রয়েছে"।

দর্শনকে একটি নূতন ব্যঞ্জনা দিয়েছেন প্লেটো। য়ুরোপ যেন এরই জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল সেদিন। জগতের স্বরূপের জ্ঞানলাভই দর্শনের উদ্দেশ্য, বললেন প্লেটো। মানবীয় জ্ঞানের মূল্য কি, তা কতটা সত্য, কতটা ভ্রান্ত, সত্য জ্ঞানলাভের উপায় কি, তার ভিত্তিই বা কি?—তাঁর চিত্তলোক উন্মথিত করে উঠতে থাকে এইসব প্রশ্ন। তিনি তখন উপলব্ধি করলেন যে, এই প্রশ্নগুলি অনুসন্ধান করে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই তাঁর জীবনব্যাপী অনুসন্ধিৎসার ফলে তিনি নির্দেশ দিলেন—সত্য জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় হল প্রজ্ঞা। দর্শনে প্লেটোর সর্বোত্তম দান 'আইডিয়াল থিওরি' বা সামান্যবাদ। পরবর্তী যাবতীয় অধ্যাত্ম-দর্শন এরই উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সত্য ইন্দ্রিয়গোচর

নয়, সেই অপরিণামী সত্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরেই তিনি এই মতবাদের উদ্ভাবন করেছিলেন। সম্ভবত তিনি জ্যামিতি থেকে তাঁর মতের ইঙ্গিত পেয়ে থাকবেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে গণিতের ভিত্তির উপর স্থাপন করে এর গবেষণার যে পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন, এখনও পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ তাই-ই অনুসরণ করে চলেছেন। গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল বিজ্ঞানই প্লেটোর নিকট অশেষভাবে ঋণী।

প্লেটো প্রতিভার আর একটি দান—'রিপাবলিক'। এই গ্রন্থে তিনি এক আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই আদর্শ রাষ্ট্র। সুবিচারই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালনা এমনভাবে হওয়া উচিত, যাতে সর্বত্র সুবিচার রক্ষিত হয়। এই সুবিচার কি? প্লেটো বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় কর্তব্য পালন এবং অন্যের কর্তব্যের হস্তক্ষেপ না করাই সুবিচার। সেই রাষ্ট্রকেই ন্যায়পরায়ণ বলে যে রাষ্ট্রের বণিক, সৈনিক ও শাসক, কেউ-ই অন্যের কাজে বাধা না দিয়ে নিজের নিজের কর্তব্য, একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে। প্লেটো নিজে একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁর ঈশ্বর মঙ্গলময়। জগৎ যে প্রজ্ঞার সৃষ্টি এবং এক আদর্শের অনুকৃতি, তাও তিনি বিশ্বাস করতেন। বিশুদ্ধ চরিত্র আর নির্মল জ্ঞান—একেই তিনি ঈশ্বরের উপাসনা বলে গণ্য করেছেন। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর দর্শনে কোনো আলোচনা না থাকলেও ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন। এই যে প্লেটো মানস, এর নির্মাণের পিছনে আছে হিরাক্লিটাস আর তাঁর গুরু সক্রেটিসের চিন্তাধারা। বলা যেতে পারে যে. হিরাক্লিটাস আর সক্রেটিস-মানসের সমন্বিত প্রকাশই প্লেটো। এ্যারিস্টটল তাই বলেছেন: "Plato is the result of the interaction of the Heraclitean doctrine and the Socratic demand for a universal ethic." কিন্তু সমন্বিত প্রকাশ হলেও প্লেটোর দার্শনিক চিন্তা সক্রেটিসের যুক্তি ও জ্ঞানের পথ অতিক্রম করে এক স্বতন্ত্র লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিরন্তন একাত্মীয়তার কথা প্লেটোর আগে আর কারো চিন্তায় ধরা দেয় নি। এই বোধ তাঁর সহজাত ছিল বলেই না তিনি ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলে মনে করতেন। সেইজন্য তাঁকে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের উদগাতা। ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বের ধারণার প্রবর্তক তিনিই। "Only the Permanent is Real"—"নিত্যই একমাত্র সত্য"—সমগ্র প্লেটো মানস আভাসিত হয়েছে তাঁর এই উক্তিটির মধ্যে।

আলেকজান্দার

(খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬—৩২৩)

পৃথিবীর দিগ্বিজয়ীদের তালিকায় প্রথম নাম—'আলেকজান্দার দি গ্রেট।' আবার বিশ্ব-ঐক্যের স্বপ্ন তিনিই প্রথম দেখেছিলেন। প্রাচ্যদেশের কিম্বদন্তীর মধ্যে তিনি আজো বেঁচে আছেন। পশ্চিম এশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে তাঁর অভিযানের চিহ্ন আজো খুঁজে পাওয়া যায়। মহাকালের বুকে এই দিগ্বিজয়ী নিজ নামের মুদ্রাঙ্কিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন আপন অজেয় পৌরুষ ও প্রতিভার বলে। তাইতো বিশ্ব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর নামটি জ্বল্ জ্বল্ করছে। তাঁর সময়ে পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিচয় যতটুকু জানা ছিল তার অর্ধেক অংশ তেরো বছরের মধ্যেই আলেকজান্দার জয় করেছিলেন; পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলেন পারস্য সাম্রাজ্যের বিপুল বাহিনী এবং অবশেষে পঞ্চনদ-বিধৌত পাঞ্জাব পর্যন্ত তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—একজন সেনাপতি অথবা সৈন্যবাহিনীর নেতা অপেক্ষাও তিনি অনেক বড় ছিলেন। অর্ধেক পৃথিবীকে তিনি যেমন পদানত করেছিলেন, তেমনি প্রত্যেকটি অধিকৃত অঞ্চলে তিনি সহৃদয়তাপূর্ণ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রত্যেকটি বিজিত জাতির আনুগত্য তিনি লাভ করেছিলেন। বাহুবলে এক-একটি অঞ্চলে রাজনৈতিক তথা সামরিক অধিকার স্থাপনের পর ঐসব বিজিত অঞ্চল তিনি পুনরায় জয় করেন গ্রীসের সংস্কৃতি দিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিপুল সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু যতদিন এই পৃথিবী, ততদিন পর্যন্ত এই দিগ্বিজয়ীর প্রভাব বিদ্যমান থাকবে। প্লুটার্কের মতে, পৌরুষ ও বীরত্বে তিনি তুলনীয় ছিলেন একমাত্র জুলিয়াস সীজারের সঙ্গে।

সম্রাট ফিলিপের পুত্র আলেকজান্দার খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আলেকজান্দারের গৃহশিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন আরিস্ততল—জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসাবে যাঁর খ্যাতি তখন পৃথিবীর বহুস্থানে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এঁরই শিক্ষার গুণে আলেকজান্দার আলেকজান্দার হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মানস গঠনে আরিস্ততলের প্রভাবই সমধিক পরিলক্ষিত হয়। রাজসিংহাসনের তারুণ্যমণ্ডিত এই উত্তরাধিকারীটি জীবনযাপনের উপযোগী সুশিক্ষা লাভ করলেও, গভীর মনোযোগ এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহের বিষয়টিও আয়ত্ত করেছিলেন। আলেকজান্দারের বয়স যখন মাত্র ষোল বছর তখন তিনি যুদ্ধে জয়লাভের প্রথম আনন্দ আস্বাদন করেন। সম্রাটের অনুপস্থিতিতে যুবরাজ নিজে রণক্ষেত্রে গমন করে বিদ্রোহী মিদিয়ানদের পরাজিত করেন ও তাদের প্রধান শহরটি প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেন। খ্রীঃ পূঃ ৩৩৮

সাল। এথেন্সবাসী এবং তাদের মিত্রশক্তি লিবানদের বিরুদ্ধে চেরোনিয়ার স্মরণীয় যুদ্ধে ফিলিপ জয়লাভ করলেন। এথেন্স ও থিবা তখন গ্রীসের দুটি পরাক্রমশালী রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য ছিল। এই যুদ্ধে যুবরাজ আলেকজান্দার ম্যাসিদনের অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করে, জয়লাভের ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। রাজা ফিলিপের মৃত্যুর পর আলেকজান্দার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর।

সিংহাসনে আরোহণ করার পর আলেকজান্দার দেখলেন তাঁর চারদিকে যেন শত্রুদের একটি চক্রব্যূহ রচিত হয়েছে। তাঁর এই সময়কার একটি উক্তি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন—তাঁর রাজত্বের প্রারম্ভে একজন শাসক যে রকম যোগ্যতার পরিচয় দেবেন তারই মানদণ্ডে তাঁর সারা জীবনের শাসনকর্ম যাচাই করা হবে। রাজ্যের বিদ্রোহী শক্তি সংহত হওয়ার আগেই তাদের বিনাশ করতে হবে।' থ্রেস, থিবস, ইলিরিয়া ও থেসালি—এই চারটি রাষ্ট্রে আলেকজান্দারের বিরোধীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়েছিল। আলেকজান্দার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দমন করতে সক্ষম হয়েছিল এই উত্তেজনা। থেসালির অধিবাসীদের বিরুদ্ধে তিনি যখন যুদ্ধ যাত্রা করেন তখন তাদের সৈন্যদের এড়াতে তিনি একটি সম্পূর্ণ নতুন পার্বত্য পথের মধ্য দিয়ে তাঁর অভিযান চালিয়েছিলেন এবং বিনা রক্তপাতেই জয়লাভ করেন। কেবলমাত্র থেসালিকে নয়, অন্যান্য গ্রীক রাষ্ট্রগুলিকেও তিনি স্ববশে নিয়ে এলেন। তারপর করিনথ্ শহরে এইসব বিজিত রাষ্ট্রের যে মহাসম্মিলন হয় তাতে সর্ববাদীসম্মতিক্রমে এশিয়া মহাদেশ আক্রমণের জন্য আলেকজান্দারকে গ্রীক সৈন্যবাহিনীর সর্বপ্রধান সেনাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়। এশিয়া মহাদেশ আক্রমণ করা সম্রাট ফিলিপেরই পরিকল্পনা ছিল।

এরপর শুরু হয় পারস্য-অভিযান। এই অভিযানে বহির্গত হওয়ার পূর্বে ম্যাসিদন অধিপতি থ্রেসের বিদ্রোহী অধিবাসীদের এমন চরম শিক্ষা দিয়ে যান যা তারা কোনো দিন ভুলতে পারেন নি। এক বৎসর কালের মধ্যে য়ুরোপ অভিযান সম্পন্ন হয় এবং—প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রে আলেকজান্দার যে নির্ভীকতা ও রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, উত্তরকালে নেপোলিয়ান তা স্মরণ করে পৃথিবীর সাতজন সেনাপতির মধ্যে তাঁরই প্রথম স্থান নির্দেশ করেছেন। এই সাতজন হলেন—'আলেকজান্দার, হান্নিবল, জুলিয়াস সীজার, গস্টাভস য়্যাডোলফস, টুরেন্নি, প্রিন্স ইউজিন ও ফ্রেডেরিক দি গ্রেট।'

এইবার তিনি প্রাচ্য অভিযানে যাওয়ার অবকাশ পেলেন। আলেকজান্দারের পরবর্তী জীবন এশিয়া ভূ-খণ্ডে অতিবাহিত হয়। এখানে তাঁর শিবির শুধু সামরিক সংগঠনের কেন্দ্র ছিল না, তা হয়ে উঠেছিল গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্র—শিল্প ও বিজ্ঞানের জীবন্ত শহরে পরিণত হয়েছিল যুদ্ধ শিবির।

দিগ্বিজয়ী বীর এইবার এশিয়া মাইনর দমনের জন্য সচেষ্ট হলেন। নতুন

অভিযানে যাত্রা করবার পূর্বে তিনি লুণ্ঠিত বহু অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষ করে পারসিক বর্ম, এথেন্স-এর পার্থেনদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 'এশিয়ার বর্বরদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত দ্রব্য'—এই কথাটি একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে নগর ও দুর্গগুলির পতন হতে থাকে। তিনি এশিয়ার দ্বারদেশে উপনীত হয়ে পারস্যসম্রাট দারিয়ুসের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

পারস্যসম্রাট দারিয়ুস ছিলেন একজন দুর্বলচিত্ত রাজা এবং অতি অপদার্থ সেনাপতি। কিন্তু তাঁর সৈন্যবাহিনী শত্রুসৈন্যের পাঁচগুণ ছিল। কিন্তু শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যের সামনে সংখ্যার মূল কিছুই নয়। ইসুস-এর সমতল ভূমিতে মোকাবিলা করবার জন্য উভয়পক্ষের সৈন্যবাহিনী সমবেত হলো। যুদ্ধে ম্যাসিদনীয় সৈন্যদের ভাগ্যেই বিপুল জয়লাভ হল। বিজেতার হাতে তার পরিবারবর্গকে সমর্পণ করে পরাজিত দারিয়ুস রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন। রাজপরিবারের বন্দিনীদের সম্পর্কে আলেকজান্দারের সৌজন্যমূলক ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করেছিল।

অতঃপর দিগ্বিজয়ী গ্রীকসম্রাটের অভিযান চললো সিরিয়ার অভিমুখে। সেখানকার সমুদ্রবেষ্টিত টায়ার শহরটি দখল করবার জন্য তাঁকে বাহুবল ভিন্ন যথেষ্ট পরিমাণ মস্তিষ্ক পরিচালনা করতে হয়েছিল। সমুদ্রের উপরে একটি অর্ধমাইল সেতু রচনা করতে হয়েছিল। প্রাচ্য ভূখণ্ডে এটাই ছিল তাঁর কঠিনতম অভিযান। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর প্রাচীন শহর টায়ারের পতন হয় ও সিরিয়া তাঁর অধিকারে আসে। একে একে তিনি প্যালেস্টাইন ও মিশর দখল করলেন। মিশরে তিনি স্থাপন করেন তাঁর একটি কীর্তিস্তম্ভ—ইতিহাসবিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া শহর ও বন্দরের পত্তন করেন। এই বন্দরের সৃষ্টি নিঃসন্দেহে দিগ্বিজয়ীর দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল।

খ্রীঃ পূঃ ৩৩১ সালের বসন্ত ঋতুতে মিশর ও সিরিয়ার নবীন সম্রাট আলেকজান্দার ফিরে এলেন টায়ারে এবং তাঁর সমস্ত সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে, নতুন পরাক্রমের সঙ্গে, আবার শুরু হয় তাঁর পারস্য অভিযান। তখনকার সময়ে এটাই ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য। দারিয়ুস তাঁর দশ লক্ষ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পাঁচলক্ষ সৈন্য নিয়ে গ্রীক আক্রমণকারীদের সঙ্গে মোকাবিলা করলেন। আলেকজান্দারের সৈন্যসংখ্যা ছিল অর্ধলক্ষের কম। আরবেলার রণক্ষেত্রে মাত্র অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে তিনি যে রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। দারিয়ুস আবার পলায়ন করলেন এবং আলেকজান্দার দখল করলেন পারস্যের রাজধানী পার্সেপোলিশ। পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী শহর বলে এই পার্সেপোলিশ তখন গণ্য ছিল। সাম্রাজ্যের সঙ্গে তিনি লাভ করলেন শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে সঞ্চিত বিপুল ধনসম্পদ। তাঁর কোনো অভিযানে এমন সম্পদ লাভ হয়নি।

খ্রীঃ পূ ৩২৮ সালের মধ্যে ম্যাসিদনের অধিপতি সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন। বিজিত দেশগুলির প্রতি তাঁর ধৈর্যমূলক আচরণ ও উদারতা তাঁকে জনপ্রিয় ও বিজেতার সম্মান দিয়েছিল।

তাঁর জীবনের শেষের দিকে আলেকজান্দার ভারত জয়ের পরিকল্পনা করেন—তখনো পর্যন্ত এই দেশের পরিচয় অনেকের কাছে অপরিজ্ঞাত ছিল। সিন্ধুনদ অতিক্রম করে, ঝিলম নদীর তীরে তিনি সম্রাট পুরুকে পরাস্ত করেন ও তাঁকে বন্দী করেন। যখন বন্দী পুরুকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—আপনি আমাব কাছে কি রকম আচরণ প্রত্যাশা করেন?—তখন এর উত্তরে পুরু বলেছিলেন, আমি রাজা—রাজোচিত আচরণ প্রত্যাশা করি। গ্রীক সম্রাট সন্তুষ্ট হয়ে পুরুকে তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন ও তখন থেকে এটি ম্যাসিদোনিয়ার অধীনস্থ করদ রাজ্যে পরিণত হয়। বীয়াস নদীর তীর থেকে অভিযানক্লান্ত গ্রীকসম্রাট স্বদেশে ফিরে যেতে চাইলেন। তাঁর সৈন্যরাও আর অগ্রসর হতে চাইল না। এই দীর্ঘকাল যাবৎ তারা বারো হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে শুধু যে রণক্লান্ত হয়েছিল তা নয়, জয়লাভের জন্যও তাদের আর উৎসাহ ছিল না। প্রচুরভাবে পুরস্কৃত হয়ে গ্রীকসৈন্যরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিল—এটা আলেকজান্দারের বদান্যতারই পরিচায়ক ছিল।

খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ সাল। প্রত্যাবর্তনের পথে ব্যাবিলনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাসাদে একটি ভোজসভার আয়োজন হয়। এর অব্যবহিত পরেই তিনি অসুস্থ হন ও মাত্র কয়েকদিন রোগভোগের পর তাঁর মৃত্যু হয়। ব্যাবিলনের সমতলভূমিতে তখন দিনের সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে—এই জনশ্রুতি রটে গিয়েছিল। কিন্তু এ জনশ্রুতি নিতান্তই ভিত্তিহীন ছিল। আসলে অতিরিক্ত পরিশ্রমই এই অকাল মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুকালে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কাকে তিনি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার করতে ইচ্ছুক তখন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে।' যে সাম্রাজ্য তিনি স্থাপন করেছিলেন তা আজ নেই সত্য, কিন্তু একথা সত্য যে মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে দেওয়ার পর সেই বিশাল সাম্রাজ্য অবলুপ্ত হয়েছিল। তবে ইতিহাসে এই কথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে যে আলেকজান্দারের তুল্য বিজেতা, উপনিবেশ স্থাপনকারী ও সভ্যতার বাহক পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নন। সত্যিই তিনি একজন সার্থকনামা পুরুষ ছিলেন।

সম্রাট অশোক

(খ্রীঃ পূঃ ৩০০—২৩২)

'অশোক যাহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ।'

যে মহান সম্রাট সম্পর্কে কবি এই প্রশস্তি রচনা করেছেন, সেই 'দেবানাংপ্রিয় প্রিয়দর্শী' সম্রাট অশোক ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বিশ্বের ইতিহাসেও এমন কীর্তিমান সম্রাট বিরল! কিংবদন্তী আর জনশ্রুতির কুয়াশা ছিন্ন করে, একটি ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অশোকের অভ্যুদয় বিশ্ব-ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ভারতের শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম। আসমুদ্র হিমাচল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পর্বত গাত্রে ও স্তম্ভে তিনি যেসব লিপি উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন—যার মধ্যে আমরা পাই অশোকের অনুশাসন—তা আজো নিঃশব্দে সেই মহান সম্রাটের স্মৃতিকে দীপ্যমান করে রেখেছে। একপ্রকার বিনা বলপ্রয়োগে একটা বিরাট সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড সার্থকভাবে পরিচালনা করে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসে অদ্বিতীয় হয়ে আছে। প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট হিসাবে বৌদ্ধধর্মের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই দিয়ে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে সমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত করেছিলেন এবং তাঁরই ফলে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে এই সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল। প্রখর জ্ঞান, সুগভীর অনুকম্পা ও অপরিসীম বীর্যবত্তা—অশোক-চরিত্রকে এক দুর্লভ গৌরবে মণ্ডিত করেছে। তিনি যা করেছিলেন সে জন্য নয়, তিনি যা ছিলেন সেজন্যই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠদের তালিকায় তাঁর স্থান।

খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ সালে অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন ও চার বছর পরে যথারীতি তাঁর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

সিংহাসনে আরোহণের পর প্রথম কয়েক বছর অশোক তৎকালীন শাসকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জাঁকজমকপূর্ণ দরবার বসাতেন, স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে পরিচালনা করতেন শাসনদণ্ড এবং কারো পরামর্শ বড় একটা গ্রহণ করতেন না। শিকার, ভোজ-উৎসব ও যুদ্ধ-বিগ্রহ—এই দিকেই ছিল তরুণ সম্রাটের প্রবণতা। রাজকীয় রন্ধনশালার জন্য প্রত্যহ হাজার-হাজার জন্তু নিহত করা হতো; শিকারে নিহত জন্তুদের হিসাব এর মধ্যে গণ্য করা হতো না। যুদ্ধ-বিগ্রহের সুযোগ অবশ্য খুব কমই তিনি পেয়েছিলেন, কারণ পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত পৌত্রের জন্য অনধিকৃত রাজ্য বিশেষ কিছুই রেখে যাননি—তাঁর জীবিতকালেই প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ চন্দ্রগুপ্তের শাসনদণ্ডের অধীনে এসে গিয়েছিল। একটিমাত্র রাজ্য—কলিঙ্গদের রাজ্য অবশিষ্ট ছিল যা মৌর্যশাসনের বাইরে ছিল। তাঁর রাজত্বের নবম বর্ষে অশোক সেই রাজ্যটি অধিকার করতে

মনস্থ করলেন। আধুনিক ওড়িশা প্রদেশ ছিল কলিঙ্গদের রাজত্বের কেন্দ্র। কলিঙ্গ-অভিযানে অশোকের চূড়ান্ত জয়লাভ ঘটেছিল—কিন্তু যুদ্ধ হয়েছিল ভয়াবহ রক্তক্ষয় হয়েছিল প্রচুর আর জীবননাশ হয়েছিল অসংখ্য লোকের। অশোকের নিজস্ব শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, কলিঙ্গ যুদ্ধে একলক্ষ লোক মারা গিয়েছিল আর বন্দী হয়েছিল দেড় লক্ষ।

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল অশোকের মনে। হঠাৎ তাঁর মধ্যে দেখা গেল একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন। কলিঙ্গদের রক্তে ওড়িশার মাটি এমন রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল যা দেখে সম্রাটের অন্তরাত্মা শিউরে উঠেছিল এবং গভীর দুঃখ ও বেদনায় তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। জীবনে তিনি আর কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হবেন না —এমন প্রতিজ্ঞা নিয়েই তিনি রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।'

কলিঙ্গ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সম্রাট অশোক গ্রহণ করলেন বৌদ্ধ-ধর্ম। বছর দুই পরে, খ্রীঃ পূঃ ২৬০ সালে তিনি যথারীতি বৌদ্ধ ভিক্ষুরূপে গৃহীত ও স্বীকৃত হলেন এবং বৌদ্ধধর্মের যাবতীয় আচার-আচরণ অনুসরণ করতে থাকেন একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। তাঁকে সংসার ত্যাগ করতে হলো না, রাজবেশ পরিত্যাগ করে ভিক্ষুর চীবরবস্ত্র পরিধান করতে হলো না। এই উদার ধর্মের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে হৃদয়ে তিনি যেন পরম শান্তি অনুভব করলেন; প্রাত্যহিক জীবনে বৌদ্ধধর্মের আচরণবিধিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করার মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ সার্থক হয়েছিল তাঁর জীবনে। রাজবেশ পরিধান করেও, রাজদণ্ড পরিচালনা করেও অশোক মনে-প্রাণেই বুদ্ধের শরণ নিয়ে একজন যথার্থ ভিক্ষু হয়েছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি নিজে শুধু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেননি—সমগ্র রাজত্বে একেই তিনি রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দিয়েছিলেন। এর ফলে ভারতবর্ষের ধর্মজগতে এক অকল্পিত যুগান্তর এসে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের অল্পকাল মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে শিলালিপিতে খোদিত সম্রাটের অনুশাসনে বলা হয়েছিল সমস্ত রাজকর্মচারী যেন অতঃপর এই মর্মে সর্বত্র ঘোষণা করেন যে, আমার প্রজাপুঞ্জ এখন থেকে এই ধর্মে নির্দেশিত আচরণবিধির অনুসরণ করে। কারণ ইহাই উত্তম ধর্ম; তারা যেন সর্বদা পিতামাতাকে মান্য করে; বন্ধু ও পরিচিত জনের প্রতি উদার ব্যবহার প্রদর্শন করে; ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করে; জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র মনোভাব অবলম্বন করে; মনে-প্রাণে হিংসা বর্জন করে, ভগবান তথাগত বলেছেন যে এইগুলি উত্তম আচরণ।'

অশোকের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে জেলা শাসকগণের প্রতি এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা যেন প্রতি পাঁচ বছর, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে তিন বছর অন্তর তাঁদের এলাকায় ধর্ম-সমাবেশ আহ্বান করেন যেখানে বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হতো। এই কাজে সম্রাট এতদূর

উৎসাহী ছিলেন যে 'তিনি এজন্য পাটলিপুত্রে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলেছিলেন যেখান থেকে এই কাজের জন্য যথোচিত অর্থসাহায্য করা হতো। এইভাবেই বৌদ্ধ আচার্যদের অর্থ সাহায্য প্রদান করে, রাজ্যের প্রতিটি সংঘারামে ধর্মশিক্ষণ শিবির স্থাপন করে অশোক মৃতকল্প বৌদ্ধধর্মে যেন এক নবীন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু একমাত্র তাঁরই রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ প্রাধান্য লাভ করবে, তিনি এটা চাননি। তাই দূর-দূরান্ত প্রদেশে তিনি প্রচারকদের প্রেরণ করেছিলেন। ভারতের সুদূর দাক্ষিণে চোল পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যসমূহে যেমন তেমনি সিংহল দেশেও বৌদ্ধ প্রচারকগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। নেপাল ও কাশ্মীর যদিও অশোকের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না তথাপি এই দুটি দেশের অধিবাসিগণ এই উদার ও মানবিক ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এমনকি সিরিয়া, মিশর এবং সম্ভবত ম্যাসিদোনিয়া ও এপিরাস প্রভৃতি দেশসমূহেও অশোকের প্রেরিত বৌদ্ধ প্রচারকগণ গমন করেছিলেন। এইভাবেই ভারতবর্ষ থেকে একটা প্রবল ধর্মস্রোত দিগ্-দিগন্তরে প্রবাহিত হয়ে বিভিন্ন দেশের মানুষের মনকে এক নবীন ধর্মীয় চেতনায় অভিসিঞ্চিত করে দিয়েছিল।'

গ্রীকসম্রাট আলেকজান্দার যেখানে মানুষের শরীরকে জয় করবার জন্য তাঁর সেনাপতিদের পাঠাতেন সেখানে অশোক তাদের মনকে জয় করবার জন্য প্রেরণ করতেন তাঁর ধর্ম শিক্ষকদের। কালিঙ্গরাজ্যে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে সীমান্ত অধিবাসীদের প্রতি সেনাপতিদের কি রকম ব্যবহার হবে সেই বিষয়ে অশোকের নির্দেশ এই রকম ছিল, 'তোমরা তোমাদের কর্তব্য কর্মে উৎসাহীদের বিশ্বাস দ্বারা এমনভাবে অনুপ্রাণিত করবে যাতে তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সম্রাট তাদের প্রতি পিতার মতোই ব্যবহার করছেন এবং তাদের তিনি তাঁর সন্তানতুল্য মনে করেন।'

সম্রাট অশোকের সবচেয়ে বড় কীর্তি এই যে, বুদ্ধের মৈত্রী করুণার বাণী ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হয়েছিল দেশ-দেশান্তরে-- ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছেছিল দেশ-বিদেশের সকল জাতির মধ্যে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হয়েছিল সেইদিন যেদিন ভগবান বুদ্ধের পাদমূলে রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে অকপটে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর পাপ ঘোষণা করলেন অহিংস ধর্মের মহিমা; তার প্রমাণকে এইভাবেই তিনি চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গিয়েছেন শিলাস্তম্ভে। অশোকের সাম্রাজ্যের প্রতিটি সংঘারামে, প্রতিটি বিহারে সকাল ও সন্ধ্যায় ভিক্ষু ও শ্রমণদের কণ্ঠে করুণ গম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হতো 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

অশোকের আগেই বুদ্ধের ধর্ম কেবলমাত্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়েছিল, কিন্তু সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, নেপাল, কাবুল, গান্ধার, জাপান, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, সাইবেরিয়া, খোটান, পূর্ব তুর্কিস্থান প্রভৃতি দেশে এই

ধর্ম প্রসারিত হয়েছিল অশোকের রাজত্বকালে। প্রায় সমস্ত ভারতেই বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের যা কিছু কৃতিত্ব তা একমাত্র রাজাধিরাজ অশোকেরই। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ইতিহাসে তাঁর নাম তাই প্রকীর্তিত। গিরিপৃষ্ঠে বা গিরিগুহায় খোদিত এবং শিলাস্তম্ভে মুদ্রিত অশোকের অনুশাসন বুদ্ধের অনুশাসনের মতোই মর্যাদা পেয়েছে। অশোকের অহিংস দিগ্বিজয় প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধেরই দিগ্বিজয়। মনীষী এইচ. জি. ওয়েলস তাঁর 'বিশ্বইতিহাসের রূপরেখা' (An outline of the world history)গ্রন্থে অশোককে তাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট রূপে অভিনন্দিত করেছেন।

বৌদ্ধ অনুশাসনে তীর্থস্থান পরিভ্রমণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এই অনুশাসন অনুসরণ করে মৌর্য সম্রাটও এই তীর্থ ভ্রমণ অভ্যাস করেছিলেন। ভগবান গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থানেও তিনি একবার গমন করেছিলেন। সযত্নে রক্ষিত একটি স্তম্ভে তাঁর জীবনের এই ঘটনাটি স্মরণীয় হয়ে আছে। স্তম্ভটির শীর্ষদেশ একটি অশ্ব মূর্তির সুন্দর ভাস্কর্য দ্বারা সুশোভিত। এই স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ আছে 'মহামান্য সম্রাট প্রিয়দর্শিন তাঁর রাজত্বের একবিংশ বৎসর পদব্রজে ভগবান তথাগতের এই জন্মস্থান পরিদর্শনে এসেছিলেন ও অপরিসীম শ্রদ্ধাসহকারে এখানকার মৃত্তিকা স্পর্শ করেছিলেন। শাক্যমুনির জন্মস্থান লুম্বিনীকে তিনি শুধু করমুক্ত করেন নি, রাজভাণ্ডার থেকে বহু অর্থ তিনি প্রদান করেছিলেন।

প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেছিলেন অশোক। ঐতিহাসিকগণ তাঁর মৃত্যুকাল খ্রীঃ পূঃ ২৩২ সাল নির্ণয় করেছেন। একমাত্র কলিঙ্গ যুদ্ধ ভিন্ন এই দীর্ঘকাল তাঁর রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজমান ছিল। এই সময়ের মধ্যে কোন গৃহবিপ্লব অথবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ—এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সকল ঐতিহাসিক একবাক্যে তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করে বলেছেন যে, কি পূর্ব কি পশ্চিম পৃথিবীর কোথাও এমন কোনো শাসক নেই যিনি ক্ষমতায় মৌর্যসম্রাটের তুল্য বলে গণ্য হতে পারেন। অশোকের মৃত্যুর ষাট বৎসর কালের মধ্যে মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ভারতবর্ষে আবার শুরু হয় অনিশ্চয়তা ও বিপর্যয়ের যুগ। এজন্য দায়ী ছিলেন সম্রাটের উত্তরাধিকারিগণ। পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ আর উত্তরে হিমাচলের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য। তাঁর শাসনগুণে এই বিশাল সাম্রাজ্য ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ।

জুলিয়াস সীজার

(খ্রীঃ পূঃ ১০২-৪৪)

'Why, man, he doth bestride this narrow world, like a colossus' রোমের অদ্বিতীয় বীর জুলিয়াস সীজার সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছেন ক্যাসিয়াসের মুখ দিয়ে নাট্যকার সেক্সপিয়ার। কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অতুলনীয় শক্তির অধিকারী জুলিয়াস সীজারের কাছে এই সসাগরা ধরণী সত্যিই ক্ষুদ্র মনে হতো। তিনিই প্রথম সেনাপতি যিনি রোমের ক্ষমতাকে য়ুরোপের উত্তর অভিমুখে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন নিজের বাহুবলে। একদা রোম সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের অনুভূতির বিষয় করে তুলেছিলেন এই অধিনায়ক। তাঁর জীবনব্যাপী কর্মপ্রয়াস যেমন সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছিল তেমনি য়ুরোপীয় সভ্যতার সংগঠনে তার প্রভাব ছিল বহুমুখী; যতকাল এই সভ্যতা বিদ্যমান থাকবে তার কার্যকীর্তির প্রভাবও বিদ্যমান থাকবে ঠিক ততকাল। হ্যামলেট বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলেছিলেন,—সাম্রাজ্যবাদী সীজার তো কবেই মারা গেছেন এবং কবেই তাঁর দেহ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। কিন্তু সীজার বংশের এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির কীর্তিকলাপ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজো সমুজ্জ্বল। যদি তাঁর উচ্চাভিলাষ আর একটু সীমিত হতো, তাহলে য়ুরোপের ইতিহাস এবং এর সভ্যতা অন্যরূপ ধারণ করত।

ইতিহাসে এমন একটি চরিত্রের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে।

সীজার জানতেন যে নেতৃত্বপদের জন্য বাগ্মীতা প্রয়োজনীয়। তাই তিনি এই উদ্দেশ্যে রোডস্ পরিদর্শনে এসে বিখ্যাত বাগ্মী য়্যাপোল্‌লোনিয়াস মোলোনের কাছে এই বিদ্যাটি খুব যত্নের সঙ্গে আয়ত্ত করেন। এইখানে তিনি সামরিক জীবনের অসুবিধার সঙ্গে জ্ঞানীর জীবনের পার্থক্যটা উপলব্ধি করেন। এই সময় স্পেনের শাসনকর্তার পদ গ্রহণের সুযোগ তাঁকে দেওয়া হলো, কিন্তু তাঁর অধমর্ণগণ তাঁকে যেতে দিলেন না। ভাগ্যক্রমে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ক্র্যাসিয়াস।

অপরিসীম কৌশল সহকারে সীজার বিত্তবান ক্র্যাসিয়াসের সঙ্গে রোমের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পম্পের পুনর্মিলন ঘটিয়ে দিলেন। সামরিক প্রতিভায় পম্পে ছিলেন অপ্রতিরথ। খ্রীঃ পূঃ ৬০ সালে রোমের ইতিহাসে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল—সীজার, ক্র্যাসিয়াস ও পম্পে—এই তিনজন অংশীদার মিলে একটি শাসকগোষ্ঠী সংগঠিত হয়। রোমের ইতিহাসে এরই নাম প্রথম ত্রয়ী (First Triumvirate); সমগ্র রোমের শাসন তখন এঁদের করতলগত হয়েছিল। সীজার লাভ করলেন কনসুলসিপের দায়িত্বজনক পদ, কিন্তু সামরিক

ক্ষমতার পরিবর্তে তার ওপর সড়ক ও বনবিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। উত্তর য়ুরোপের ঘটনাবলী তখন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করছিল। রাইন নদীর বামতীরে জার্মান উপজাতিরা সমবেত হতে সক্ষম হয়েছে এবং গল্ প্রদেশে তারা রোমের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করল। অতীতকালে রোমের লক্ষ্য ছিল পূর্বাভিমুখে ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে অভিযান করা। সীজার এইবার চাইলেন উত্তর ও পশ্চিম দিকে অভিযান করতে। তার প্রতিভার স্ফুরণ দেখা দিল যখন য়ুরোপ একটি জাতি সংঘের পথে পদক্ষেপ করল। আলপস পর্বতমালা অতিক্রম করে যে সব ভূখণ্ড বিস্তৃত ছিল সেইদিকে অভিযান করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তাঁর ওপর যখন সেই দায়িত্ব ন্যস্ত হলো সীজারের আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তাঁকে কয়েকটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো।

সেইসব সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে সীজার যথেষ্ট পরিমাণে তাঁর সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন। তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ে এইরকম একের পর এক জয়লাভ কেবলমাত্র রোমের মর্যাদা বৃদ্ধি করল না, সীজারের মর্যাদাও যেন শতগুণে বৃদ্ধি পেল তখন। কিন্তু শুধু বিজেতার গৌরব নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তিনি একজন শাসকও ছিলেন এবং দূরদর্শিতার সঙ্গেই শাসন করতেন। একটি শাসন-পথা প্রবর্তন করে এবং বিজিতদের নাগরিক অধিকার প্রদান করে, সীজার য়ুরোপের বড় অংশে রোমক ঐতিহ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলিকে তিনি শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। বিজিত দেশগুলিতে তিনি জাতীয় সড়ক নির্মাণের প্রেরণা দিয়েছিলেন ও একটি শক্তিশালী কৃষক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন। এইসব বিবিধ সংস্কারের পেছনে যে আদর্শগুলি সক্রিয় ছিল, ঐতিহাসিকদের মতে, তারই ওপর গড়ে উঠে য়ুরোপীয় সভ্যতার মজবুত কাঠামো।

সীজারের ব্রিটেন আক্রমণ তাঁর সামরিক জীবনের একটি নিস্ফল কাহিনী। এই ঘটনার দু'তিন বছর পরে গলকে পদানত করার চেষ্টায় সীজার তাঁর সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করেন। এখানকার অধিবাসীরা বাধা দেবার চেষ্টা করে ও অবশেষে পরাজিত হয়। এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি বহুমুখী অভিযান চালিয়েছিলেন এবং তার প্রত্যেকটি ছিল কঠিন। কিন্তু সীজারের সৌভাগ্য রবি তখন যেন ক্রমশই মধ্যাহ্নগগনের দিকে উদিত হচ্ছিল। খ্রী: পূ: ৫২ সালে গলের নেতা ভারসিন জেটোরিক্সের সঙ্গে জরভোডিয়া নামক অঞ্চলে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে তাঁর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় এবং তিনি সাময়িকভাবে পিছু হটতে বাধ্য হন। তথাপি সীজার তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে য়্যালেসিয়া (মণ্ট-অক্সয়েস) অবরোধ ও অধিকার করেন এবং গলের সম্মিলিতবাহিনী চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। গলকে তিনি তাঁর অধীনস্থ একটি রাজ্যে পরিণত করলেন ও এখানকার অধিবাসীদের ওপর একটি বার্ষিক করের বোঝা চাপিয়ে দিলেন। জয়লাভের

পর রোমের ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি পরাজিত শত্রুদের তাঁর বন্ধু হিসাবে পরিণত করেন।

গলের যুদ্ধে জয়লাভ হলো বটে, কিন্তু এখন তাঁকে রোমের শত্রুতার সম্মুখীন হতে হলো। উৎকোচ প্রদানে শত্রুদের বশীভূত করা যেতে পারত, কিন্তু তারা সীজারের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তিনি নিজেও জানতেন, তিনি তাঁর ক্ষমতাকে এতদূর ছাড়িয়ে গেছেন যে, অকৃতকার্যতা বা অসাফল্যের বিপদের মুখোমুখী হওয়া একরকম অনিবার্য ছিল। ৬০ খৃঃ পূঃ সালে যে ত্রয়ীর মিলন ঘটেছিল, এবার তাঁদের মধ্যে যেন একটা ব্যবধান দেখা দিল। তিন বছর পরে সিরিয়াতে নিহত হলেন ত্রয়ীর অন্যতম—ক্র্যাসিয়াস। তখন ক্ষমতার আকাশে রইলেন মাত্র দুটি সূর্য—পম্পে আর সীজার, যদিও সেখানে স্থান ছিল মাত্র একজনের জন্য। পম্পে সিনেটের পক্ষ সমর্থন করলেন। যখন সীজারের সৈন্যবাহিনী পরিচালনার কার্যকাল শেষ হলো সিনেট থেকে ঐ বাহিনী ভেঙে দেবার জন্যে দাবী করা হলো। সীজার মুখে কিছু বললেন না, পঞ্চ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তিনি ইতালির সীমান্ত নির্দেশক রুবিকন নদীটি অতিক্রম করতে মনস্থ করলেন। 'পাশার দান পড়ল'—এই উক্তিটি তিনি এই সময়ে করে ছিলেন কারণ শাসনতন্ত্র বহির্ভূত এই রকম বেপরোয়া কার্য দ্বারা তিনি যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিলেন। ত্রয়ীশক্তির অন্যতম এবং প্রধানতম যিনি সেই পম্পের বিরুদ্ধেই তিনি এইবার যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

পম্পের সৈন্যবল ছিল না। তিনি মিশরে পলায়ন করলেন, সেখানেই তিনি নিহত হন। তাঁর পুরাতন শত্রুর পিছু নিয়ে সীজারও এলেন মিশরে। মিশরের শক্তিবৃদ্ধিতে সীজারকে তাই বাধ্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে হলো। প্রথমে তিনি এশিয়া মাইনর অভিমুখে অভিযান করলেন, এখানে তিনি পম্পের পুরাতন বন্ধু, পোন্টাসের রাজা, ফারনাসেসকে পরাজিত করলেন। সেখানে পোন্টাসের পিতা, মিথ্রাডেটস দি গ্রেট জয়লাভ করেছিলেন সেই জেলা নামক স্থানে এই যুদ্ধে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর সীজারের শক্তি বৃদ্ধি পেলো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই স্মরণীয় অভিযানের সময়েই তিনি এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন—Veni-Vidi—Vici অর্থাৎ—'আমি এলাম, দেখলাম ও জয় করলাম। লাতিনের প্রত্যেক ছাত্রই এই ভিনি, ভিডি ও ভিসি—কথা তিনটির সঙ্গে পরিচিত।

ইতালির মাটিতে পদার্পণ করা মাত্র একটি বিদ্রোহ দমন করার জন্য সীজারকে অনুরোধ করা হয়। বিদ্রোহ দমিত হলে পরে, আফ্রিকায় একটি সামরিক অভিযান করার জন্য তিনি ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করতে বাধ্য হন। সেখান থেকে ললাটে জয়ের গৌরব ধারণ করে তিনি ফিরলেন রোমে।

অতঃপর সীজার রোম সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হলেন। নিজেকে তিনি সম্রাট বা লাতিন কথায় 'Imperator' বলে অভিহিত করতে ভালবাসতেন।

সুনির্মিত একটি সিংহাসনের ওপর উপবিষ্ট হয়ে তিনি শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। তবু রোমকে একটি প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছিল! এমন বিচিত্র দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আর দেখা যায় নি।

কিন্তু সীজারের এই গগনস্পর্শী দম্ভ লক্ষ্য করে, সকলের অলক্ষ্যে ইতিহাস-বিধাতা নিশ্চয়ই হেসে থাকবেন। রোমের শাসনপরিষদ ভবনের (Senate House) পাদদেশে পম্পের একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত ছিল। সীজার একদিন সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিনের প্রকৃতি ছিল দুর্যোগপূর্ণ—রোমের আকাশে পুঞ্জীভূত কালো মেঘ; সেই মেঘের বুক চিরে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বাতাস বইছিল। সেই সময় হঠাৎ কয়েকজন আততায়ীর ছুরিকাঘাতে, পম্পের মূর্তির তলায় সীজারের বিগতপ্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়লো। কথিত আছে, আততায়ীদের মধ্যে তার শত্রু অপেক্ষা তাঁর বন্ধুর সংখ্যাই অধিক ছিল। সীজারের মুখে উচ্চারিত শেষ কথাটি ছিল, ক্রটাস, তুমিও!' এই ক্রটাস ছিলেন সীজারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম। ক্রটাসকে সামনে দেখতে পেয়েই তিনি সবিস্ময়ে এই উক্তিটি করে থাকবেন। তাঁর সিংহাসন আরোহণের সময় থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরবৃন্দ একে একে সীজারকে পরিত্যাগ করেছিলেন। এই বীরের জীবনের ট্র্যাজেডি এইখানেই। নিজের সফলতাই তাঁকে অবশেষে এনে দিয়েছিল পরাভব। সীজারের মৃত্যুর প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেছেন—ক্রটাসের ছোরা নয়, ক্রুদ্ধ জনমতই সীজারের শোচনীয় মৃত্যুর কারণ ছিল। ক্রটাস উপলক্ষ্য মাত্র।'

সীজারের সাফল্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সকল ঐতিহাসিকই তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনিই তো রোমের দৃষ্টি ভূমধ্যসাগর থেকে য়ুরোপের দিকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন; বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিবদমান জাতিগুলিকে তিনিই রোমের প্রভাব-বলয়ের মধ্যে এনেছিলেন। এ বড়ো কম কৃতিত্বের নয়। নিজে অসি চালনায় পারঙ্গম হয়েও অসি মুখে নয়, লেখনী মুখেই তিনি শাসন সংক্রান্ত যে সব ভাষ্য রচনা করে গিয়েছেন, উত্তরকালে সেগুলি ইতিহাস ও সাহিত্যের মূল্যবান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাঁর ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী অগস্টাস যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল সীজারের এইসব জ্ঞানগর্ভ রচনা। ঈশ্বরের অনুগৃহীত জুলিয়াস সীজার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একেশ্বর স্বর্ণরূপে তাই অমর হয়ে আছেন আপন বীরত্ব ও মহত্ত্বের গৌরবে।

(খ্রীঃ পূঃ ৬৯—৩০)

আলেকজান্দ্রিয়া শহরে রাজাদের প্রাসাদে সেনাপতি পরিবৃত হয়ে বসে আছেন জুলিয়াস সীজার। তাঁর সম্মুখে তখন একটি সমস্যা—রোমে যে সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, কেমন করে তিনি তার মোকাবিলা করে রোমের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবেন। তখন তেরো বছর বয়স্ক রাণীর ভাই চতুর্দশ টলেমির সঙ্গে একুশ বছর বয়স্কা তরুণী ক্লিওপাত্রার দারুণ বিবাদ আরম্ভ হয়েছে। এঁরা দু'জনেই মিশরের রাজসিংহাসন নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন। নির্বাসিতা ক্লিওপাত্রা সিরিয়াতে গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করে, তাঁর রাজ্য উদ্ধার করবার জন্য মিশরের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিলেন। ঠিক সেই সময় যুদ্ধে পম্পে দি গ্রেটের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে, সীজার উপনীত হয়েছেন মিশরে। আলেকজান্দ্রিয়া শহরে পৌঁছানমাত্র টলেমির দলের লোকরা আসন্ন গৃহযুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থী হলো। টলেমির অনুরোধ সীজার যেন তার সৈন্য দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। অনুরোধ বিবেচনা করে দেখা হবে;—এই কথা তাদের বলা হলো।

ঠিক সেই সময় একজন গ্রীক ব্যবসায়ীকে সীজারের সম্মুখে এনে উপস্থিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ সে কতকগুলি কম্বল সীজারকে প্রদান করিল। কিছুক্ষণের জন্য রাজপ্রাসাদের সেই প্রকাণ্ড হলঘরটি এক নিস্তব্ধ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যখন সেই কম্বলের বাণ্ডিলটি খোলা হলো। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন লাস্যময়ী ও হাস্যময়ী আলুলায়িতকেশা এক তরুণী।

যুদ্ধক্লান্ত ও অসংযত সেনাপতি সীজার দেখামাত্র সুন্দরী ক্লিওপাত্রার রূপে মুগ্ধ হলেন। যাঁর আনন্দায়মিষ্ট কণ্ঠস্বর মানুষের কর্ণকুহরকে তৃপ্ত ও মুগ্ধ করত, সেই কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে ক্লিওপাত্রার বক্তব্য বিষয়টি সীজারের কাছে এমনভাবে উপস্থাপিত হলো যে, প্রত্যুষেই টলেমি তাঁর প্রত্যাশিত মিত্রকে হারালেন। সীজার ক্লিওপাত্রার পক্ষ অবলম্বন করে, তাঁকে যথোপযুক্ত সামরিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন।

সীজার কেবলমাত্র ক্লিওপাত্রার রূপ আর যৌবনই দেখেন নি—তার চেয়ে বেশি কিছু তিনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। দেখে থাকবেন সেই নারীর মধ্যে প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি। বিশ্ব সাম্রাজ্যের যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন, সেই স্বপ্নকে চরিতার্থ করবার পক্ষে মিশরের এই তরুণী রাণী যে একজন যথার্থ অংশীদার হতে পারবেন সেটা তাঁর বুঝতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি।

অন্যদিকে ক্লিওপাত্রার চক্ষে রোমের এই বীর যোদ্ধা কিভাবে প্রতিভাত

হয়েছিলেন? তাঁর মনে হয়েছিল, ইনিই সেই প্রত্যাশিত পুরুষ যাঁর সহায়তায় তিনি তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে সক্ষম হবেন। ক্লিওপাত্রা সীজারকে স্বামীর তুল্যই জ্ঞান করতেন এবং সকল বিষয়ে তিনি একজন আদর্শ স্ত্রীর পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সীজারের অসামান্য বীরত্বের জন্য ক্লিওপাত্রা গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করে মিশরের সর্বময়ী কর্তৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সেই অনাবিল সুখ ও আনন্দের মধ্যে জন্ম হয় সীজার ও ক্লিওপাত্রার প্রথম সন্তান। পুত্রের নাম রাখা হলো সীজারিওন টলোমি—কারণ দুই বংশের উত্তরাধিকার নিয়েই সে জন্মগ্রহণ করেছিল। পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই সীজার আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করে চলে যান।

ক্লিওপাত্রা এক বছর অপেক্ষা করেছিলেন। সীজার তখন এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় বিজয় গৌরবের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত। তারপর, স্বামীর আহ্বানে, সর্ব কনিষ্ঠ ভাই, টলেমি ডায়োনাইসাস (পঞ্চদশ টলেমি) এবং শিশুপুত্রকে নিয়ে ক্লিওপাত্রা রোমের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

অতঃপর টাইবার নদীর ধারে সীজারের নিজস্ব ভবনে বাস করতে লাগলেন ক্লিওপাত্রা। রোমের রাজনৈতিক জীবনে তিনি কোন অংশগ্রহণ করতেন না। রোমে তিনি অনেক বছর অতিবাহিত করেন এবং সেই সময় সীজারের ওপর আরো অধিকসংখ্যক সম্মান অর্পিত হয়েছিল। অবশেষে খ্রীঃ পূঃ চুয়াল্লিশ সালের একদিন টাইবার নদীর ধারে সীজারের ভবনে বসে ক্লিওপাত্রা সংবাদ পেলেন আততায়ীদের হাতে তাঁর স্বামী নিহত হয়েছেন। ক্লিওপাত্রা জানতেন রোমে তাঁর কিছুমাত্র জনপ্রিয়তা নেই, তাই অনতিবিলম্বে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর সহোদর ভাই পঞ্চদশ টলেমিকে তাঁরই ইঙ্গিতে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। তিনি তাঁর পুত্র সীজারিওনকে তাঁর সঙ্গে মিশরের যুগ্মশাসক বলে ঘোষণা করলেন।

তারপর একদিন রোমের ত্রিমূর্তির মধ্যে তখন যিনি প্রধান সেই শক্তিশালী মার্ক য়্যাণ্টনির কাছ থেকে সংবাদ এলো ক্লিওপাত্রা যেন অবিলম্বে টারসাসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মিত্রশক্তি হিসাবে রোমকে মাঝে মাঝে সাহায্য না করার কৈফিয়ৎ প্রদান করেন। এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন তিনি এতদিন।

য়্যাণ্টনির চরিত্রের কথা ক্লিওপাত্রা অনেক শুনেছেন। দৈত্যের মতো ক্ষমতাশালী অথচ শিশুর মতো সরল মার্ক য়্যাণ্টনি। তাঁর রূপ, তাঁর যৌবন, তাঁর বুদ্ধি—সব কিছু দিয়ে এই মানুষটিকে আকৃষ্ট করবার জন্য তিনি এইবার সচেষ্ট হলেন।

অবশেষে ধনরত্ন পূর্ণ একটি সুসজ্জিত জাহাজে চড়ে ক্লিওপাত্রা এলেন রোমে। সঙ্গে অসংখ্য পরিচর। প্রেমাস্পদকে তিনি সানুরাগ আমন্ত্রণ জানালেন। য়্যাণ্টনি এসে মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হলেন তাঁর সঙ্গে। য়্যাণ্টনির সম্মানে

মিশর-লক্ষ্মী ক্লিওপাত্রা সেই রাত্রে যে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন তেমন জাঁকজমকপূর্ণ ভোজসভা তিনি জীবনে দেখেন নি। নিমন্ত্রিত অতিথিদের প্রত্যেককে উপঢৌকনে আপ্যায়িত করা হলো।

সেই স্মরণীয় সাক্ষাৎকারের পর অ্যান্টনি ক্লিওপাত্রার অনুসরণ করে আলেকজান্দ্রিয়া এলেন। তাঁরা দু'জনে এখানেই শীতঋতু যাপন করেন। কয়েক মাস ধরে রাণী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আনন্দোচ্ছলতার সঙ্গে অতিথির পরিচর্যা করলেন। মিশরের রাণীর আতিথেয়তায় পরিতৃপ্ত অ্যান্টনি আর বেশিদিন এখানে অবস্থান করতে পারলেন না—রাষ্ট্রকার্য তাঁকে আর আনন্দভোগের অবসর দিল না। তখন রোমের শাসক প্রকৃতপক্ষে ছিলেন দু'জন—অ্যান্টনি ও অক্টোভিয়ান। অক্টোভিয়ান ছিলেন ত্রিমূর্তির অন্যতম। প্রাচীন এই দুই শাসকের মধ্যে সম্প্রীতি না থাকলেও, তথাপি উভয়ের মধ্যে তখনো বিচ্ছেদ ঘটেনি। ব্রুণ্ডিসিয়ামে দু'জনের মধ্যে সাক্ষাৎ হলো এবং পুনরায় রোমের এই দুই প্রধানের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো। পৃথিবীটাকে তারা দু'জনের মধ্যে ভাগ করে নিলেন—অক্টোভিয়ান থাকবেন রোমে এবং এর পশ্চিম অংশ শাসন করবেন আর অ্যান্টনি নিযুক্ত থাকবেন পূর্বাংশ শাসনের কাজে। এই চুক্তিকে কার্যকর করবার উদ্দেশ্যে অ্যান্টনি বিয়ে করলেন অক্টোভিয়ানের ভগ্নী কুমারী অক্টোভিয়াকে।

এইবার পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন অ্যান্টনি। এই অভিযানে বিজয়লাভের পর তাঁরা দু'জনে মিলে—তিনি এবং ক্লিওপাত্রা—তাদের নিজস্ব সাম্রাজ্য স্থাপন করবেন আশা করলেন। এমন সময় দুঃসংবাদ এলো অ্যান্টনির অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। অ্যান্টনিকে সাহায্য করবার জন্য ক্লিওপাত্রা তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে যাত্রা করলেন। হোয়াইট ভিলেজ বন্দরে রাণীর জাহাজ এসে ভিড়ল। রাণী দেখলেন পরাজয়ের গ্লানি অ্যান্টনিকে বিমূঢ় করে ফেলেছে।

আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্যমণ্ডিত অভিযান অ্যান্টনিকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করল রাণীর কাছে। ইতিমধ্যে অক্টোভিয়ান ও অ্যান্টনির মধ্যে সম্পর্ক বেশ তিক্ত হয়ে উঠেছিল। স্ত্রী অক্টোভিয়ার প্রতি অ্যান্টনির আচরণই ছিল এর কারণ। অবশেষে রোমের এই দুই প্রধানের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান দেখা দিল। আর্মেনিয়া থেকে ফিরে এসে অ্যান্টনি বিজয়োৎসব অনুষ্ঠান রোমে না করে আলেকজান্দ্রিয়াতে করলেন। বিজয়ের গৌরব থেকে রোম বঞ্চিত হলো আর সেইসঙ্গে সূচিত হলো আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাধান্য। এই উপলক্ষ্যে আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি রীতিমত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়। রৌপ্যনির্মিত বেদীর ওপর কয়েকটি সোনার সিংহাসন রাখা হলো। তারপর আইনত রোমের প্রাপ্য রাজ্যগুলি ক্লিওপাত্রা ও তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন অ্যান্টনি। ফলে অক্টোভিয়ান ও অ্যান্টনির দলের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। শুরু হল সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধ। ঐতিহাসিকদের কাছে এই যুদ্ধ রহস্যজনক হয়ে আছে। দু'ঘণ্টা ধরে যখন যুদ্ধ চলছিল, যখন

কোন পক্ষই জয়লাভ করেনি তখন অ্যান্টনি দেখতে পেলেন যে জাহাজে ক্লিওপাত্রা ছিলেন পাল খাটিয়ে সেই জাহাজটি রণক্ষেত্র ত্যাগ করল এবং তার পিছনে চললো তাঁর বাটখানি জাহাজ। বিচলিত অ্যান্টনি ক্ষিপ্রবেগে তাঁর অনুসরণ করেন। রণক্ষেত্রে একা রইলেন বিজয়ী অক্টোভিয়ান। যাই হোক, এই বিচিত্র যুদ্ধের ফলে মিশর-রোম সাম্রাজ্যের কল্পনা শূন্যে বিলীন হয়ে যায়, এবং অক্টোভিয়ান হলেন অগস্টাস সীজার—রোমের প্রথম সম্রাট।

ক্লিওপাত্রা পালিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া এলেন। অ্যান্টনিও ফিরে এলেন আলেকজান্দ্রিয়াতে এবং দু'জনে একত্রে মৃত্যুকে বরণ করবার চুক্তি করলেন। আইসিস দেবীর মন্দিরের পাশে বহু অর্থব্যয়ে ক্লিওপাত্রা তাঁর নিজের জন্য একটি সমাধি মন্দির নির্মাণ করলেন। সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে তাঁর সমস্ত সম্পদ এবং মণিরত্ন নিয়ে এসে রাখা হলো। এদিকে অক্টোভিয়ান আলেকজান্দ্রিয়ার দ্বারদেশে উপনীত হয়েছেন। অ্যান্টনি, তাঁর পূর্ব সত্তা ফিরে পেয়ে অক্টোভিয়ানকে যুদ্ধে পরাস্ত করলেন। আর একটি শেষ যুদ্ধে মৃত্যু অথবা জয়লাভের জন্য তিনি অস্থির হলেন। এমন সময়ে তিনি সংবাদ পেলেন ক্লিওপাত্রা নিজের হাতে নিজের প্রাণ নিয়েছেন। অ্যান্টনির চক্ষে পৃথিবী শূন্য বোধ হলো; তিনি রোমের চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে নিজের তরবারি দিয়ে নিজের প্রাণসংহারে উদ্যত হলেন। এমন সময় দ্বিতীয় সংবাদবাহক এসে জানাল ক্লিওপাত্রা জীবিত আছেন ও সমাধি মন্দিরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। শোনা মাত্র অ্যান্টনি তাঁর এক বিশ্বস্ত অনুচরকে অনুরোধ করলেন তাঁকে সেইখানে নিয়ে যাবার জন্য। রক্তাপ্লুত দেহে তাঁকে আনা হলো সমাধি মন্দিরে। সেইখানে ক্লিওপাত্রার বাহুপাশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রোমের অন্যতম নায়ক।

অ্যান্টনি নেই, রাজ্য নেই, এমন অবস্থায় বিজেতার হাতে বন্দিনী হয়ে শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় রোমে নীত হওয়ার অগৌরব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ক্লিওপাত্রা সেই সমাধি মন্দিরে মৃত্যুকে বরণ করার সিদ্ধান্ত করলেন। তারপর একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য একটি ডুমুরের ঝুড়ি বহন করে নিয়ে এলো তাঁর কাছে। তাঁরই অনুরোধে ডুমুর পাতার মধ্যে একটি বিষধর সাপের বাচ্চা লুকিয়ে রাখা ডান হাতে চেপে ধরে বুকের ওপর ধরলেন সহাস্য বদনে। এই বিষধর সরীসৃপের দংশনে মুহূর্ত মধ্যে নীল বিবর্ণ হয়ে গেল সেই অনিন্দ্য রূপের প্রতিমা। টলেমি বংশের শেষ বংশধর ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

দান্তে

(১২৬৫—১৩২১)

য়ুরোপীয় রেণাশাঁর প্রথম সূর্যরশ্মি মহাকবি দান্তে। মোহাবিষ্ট য়ুরোপের তিনিই প্রথম ঘুম ভাঙিয়েছেন। বিশ্ব-সংস্কৃতির অগ্রনায়ক এবং পৃথিবীর প্রথম ধর্মসংস্কারক তিনি। হোমারের পর দান্তেই য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ কবি। নবজাগৃতির ইতিহাসে প্রভাতী শুকতারারূপেই ইতালির এই মহাকবির আবির্ভাব সেদিন যুগপৎ মধ্যযুগের অবসান ও নবযুগের অভ্যুদয় ঘোষণা করেছিল। তাঁরই মহাকাব্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল নূতন জীবনের গান, নূতন উপলব্ধি। য়ুরোপের কবি-কুল-সমাজে দান্তের শাশ্বত সমাদর এইজন্যই। আর তাঁর 'দিভিনিয়া কোম্মেদিয়া' বিশ্বের শাশ্বত শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে পরিকীর্তিত। দান্তের নামের সঙ্গে ত্রয়োদশ শতাব্দী ও মধ্যযুগ যুক্ত থাকলেও আমরা যখন তাঁর কাব্য পাঠ করি, আমাদের অনেক কাছে তাঁকে আমরা দেখতে পাই। এ হেন যে কবি, তাঁর জীবনকথাও অপূর্ব।

ফ্লোরেন্সের অভিজাত অঞ্চলের একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের এক সুসজ্জিত কক্ষের ভিতরে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সুখশয়নে নিদ্রিতা এক নারী। লাবণ্যের প্রতিমা সেই নারী তখন আসন্ন সন্তানসম্ভবা ছিলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখছেন—বিচিত্র স্বপ্ন। সবুজ পত্রে সমাকীর্ণ একটা লরেল গাছের তলায় নরম সবুজ ঘাসের ওপর তিনি প্রসব করেছেন এক পুত্রসন্তান। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, মাতৃবক্ষসুধা পান করে নয়, সেই লরেল গাছের পাতার রস পান করে বর্ধিত হয় শিশু এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই শিশু রূপান্তরিত হয় বিচিত্র বর্ণের পেখম তোলা একটি সুদৃশ্য ময়ূরে। স্বপ্ন ভেঙে যায়। এই নারী ছিলেন দান্তের মা। সন্তান তাঁর লরেল গাছের তলায় ভূমিষ্ঠ হয়নি, কিম্বা জন্মের পর সে ময়ূরে রূপান্তরিত হয়ে যায়নি। কিন্তু সেই বিচিত্র স্বপ্নের মধ্যে এক অসাধারণ প্রতিভাধর কবির জন্মের যে পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল, তা কিন্তু মিথ্যা হয়নি।

১২৬৫ সনে ফ্লোরেন্স নগরীতে এক অভিজাত পরিবারে দান্তের জন্ম। তখনকার ফ্লোরেন্স ছিল য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ নগরী। বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল আর সংস্কৃতির পীঠস্থান। দান্তের প্রকৃত নাম দুরান্তে আলিঘিয়ারি। আভিজাত্য আর শিক্ষা তাঁর যৌবনকালেই তাঁর জীবনকে সার্থকভাবে বিকশিত করে তুলেছিল।

তাঁর সময়ে ফ্লোরেন্সে দুটি দল ছিল। গুয়েলফ ও ঘিবেলীন—শ্বেত ও কৃষ্ণ, অর্থাৎ অভিজাত ও সাধারণ অধিবাসী। এই দুই দলের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ-বিসম্বাদ চলত, একদল ক্ষমতাশালী হলে অন্য দল নিগৃহীত হতো। দান্তে ছিলেন

অভিজাত দলভুক্ত। তাঁর সময়ে গুয়েলফ দলই ছিল ক্ষমতাশালী। শিক্ষা সমাপ্তির পর ফ্লোরেন্স নগর রাষ্ট্রের সৈনিকরূপে দান্তে দু'বার যুদ্ধে যোগদান করেন। তারপর রাষ্ট্র দূতাবাসের পদস্থ কর্মচারী রূপে কিছুকাল কাজ করেন। প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার গুণে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই তিনি ফ্লোরেন্স নগরীর অন্যতম প্রধান শাসকের পদ লাভ করেন। 'ভিতা নুওভা' কাব্যের কবিকে আমরা এই সময়ে কেবলমাত্র তাঁর মানসী বেয়াত্রীসের আরাধনা নয়, রাজ্য-শাসন সম্বন্ধেও দারুণ ভাবে লিপ্ত দেখতে পাই।

দান্তের বয়স যখন ছত্রিশ বছর তখন তাঁর জীবনে এলো বিপর্যয়। যদিও রাজকার্যে নগরীর মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠেছিলেন, তবু রাজ্যে তাঁর এত শত্রু হয়েছিল যে শীঘ্রই তাঁকে তাঁর জন্মভূমি ফ্লোরেন্স নগরী থেকে জন্মের মতো নির্বাসিত হতে হলো। তাঁর সব সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হলো।

চিরজন্ম নির্বাসনে পরদেশবাসী হয়ে তাঁকে কালযাপন করতে হয়েছিল। তাঁর ভ্রাম্যমাণ জীবনে তিনি কিছুকাল মিলানের ডিউকের আশ্রয়ে কাটিয়ে-ছিলেন। 'পথ কতো কঠিন'—কবির এই উক্তিটির মধ্যেই আভাসিত হয়েছে দান্তের এই সময়কার জীবনের তিক্ততম অভিজ্ঞতা। প্রীতিহীন, প্রেমহীন সংসারে তাঁর কেউ শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল না। সেই দুঃখ ও বেদনার মধ্যে দান্তের হলো নবজন্ম। জীবনের কঙ্করময় পথে চলতে চলতে অবশেষে কবি উপনীত হন র‍্যাভেন্না শহরে। এইখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এইখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ছাপান্ন বছর বয়সে। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে কবি তাঁর মহাকাব্য রচনা শেষ করেন।

দিন যায়। নির্বাসিত কবি ক্রমেই অন্তর্মুখীন হয়ে উঠতে থাকেন। সংসার বা পৃথিবী না থাক—এমন কি প্রিয় জন্মভূমি ফ্লোরেন্স না থাক—শাশ্বত জগৎ তো আছে। লোভহীন, দুঃখহীন, শোকহীন, চিরশান্তিময় সেই জগতের সন্ধান একদিন তিনি পেলেন। পেলেন তাঁর জীবনকাব্যের নায়িকার সন্ধান। এই নায়িকা বেয়াত্রীসে যাকে তিনি তাঁর নয় বছর বয়স থেকেই ভালোবাসতে আরম্ভ করেন। সেই তাঁর মানস উদ্ভাসনের মহালগ্নে বিরচিত হয় স্বর্গীয় মিলন কাব্য—যার ইংরেজী নাম Divine Comedy. এক কালের অভিজাত দান্তে আবির্ভূত হলেন সর্বরিক্ত মহাকবিরূপে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কারো জীবনে ঘটেনি। সেই কাব্যেই ধ্বনিত হলো নবযুগের জয়শঙ্খ।

ইতালির সাধারণ মানুষের ভাষা দান্তের হাতে হয়ে উঠলো এক অপরূপ সাহিত্যের ভাষা। এই মহাকাব্য রচনার জন্য কবিকে দিতে হয়েছিল কঠিন-মূল্য—জীবন মধ্যাহ্নেই নির্বাপিত হয় তাঁর জীবনদীপ। র‍্যাভেননা শহরে দান্তের সমাধিস্তম্ভে কবির নিজের লেখা এই বাণীটি উৎকীর্ণ আছে—'আমার স্বদেশ থেকে নির্বাসিত এই আমি, দান্তে আলিঘিয়ারি, এখানে—এই র‍্যাভেন্নার মৃত্তিকাতলে পরমসুখে সমাধিস্থ হয়েছি।'

বেয়াত্রীস পোর্সিনারি।

দান্তের জীবনেতিহাসে শাশ্বতী হয়ে আছে এই নারী। কিশোর দান্তের জীবনপথে যেদিন এলেন ওই কিশোরী বেয়াত্রীস, সেইদিন থেকেই জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এই নারী ছিলেন তাঁর ধ্যানের, আরাধনার বিষয়, অথচ বেয়াত্রীসের সঙ্গে কোনদিন তাঁর প্রেমের আদান-প্রদান হয়নি, এমন কি চোখে চোখে নীরব প্রেমের উত্তর-প্রত্যুত্তর পযন্ত হয় নি। এই বেয়াত্রীসে সম্পর্কে কবি পরবর্তিকালে লিখেছিলেন—বেয়াত্রীসেকে যখন প্রথম দেখলাম তখন তার সর্বাঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্যই দেখিনি, দেখেছিলাম তাকে পরিপূর্ণ মহত্ত্বের একটি প্রতিমারূপে। বালিকা বেয়াত্রীসের সঙ্গে বিয়ে হয় এক স্থানীয় ব্যাঙ্কারের এবং মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সেই নবোদ্ভিন্নযৌবনা বেয়াত্রীসের মৃত্যু হলো। দান্তে যাকে ধর্মপত্নী বলে গ্রহণ করেন সেই জেম্মা দোনাতি ছিলেন সাধারণ ঘরের একটি শান্তশিষ্ট মেয়ে। কিন্তু বেয়াত্রীসেকে তিনি ভুলতে পারেননি—সেই-ই ছিল তাঁর জীবনের সর্বস্ব—'The glorious lady of my mind.'—বলেছেন দান্তে। তাঁর প্রথম রচনা ভিতা নুওভা (Vita Nuova—New Life) কাব্যের নায়িকা বেয়াত্রীস।

জীবনের মধ্যপথে দান্তে এই কাব্য লিখতে আরম্ভ করেন। প্রথম কাব্যে তিনি যে প্রেমতত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন, পরিণত বয়সে রচিত মহাকাব্যে তিনি সেই তত্ত্বকেই একটি পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন। তাঁর দুই কাব্যদেহে একই দ্যুতি। দান্তে যেমন মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্বের রীতিমতো সমর্থক হয়েও এর পুরোপুরি সমর্থক তিনি ছিলেন না, ঠিক তেমনি দেখা যায় যে, ধর্মীয় প্রেমতত্ত্ব সাধারণভাবে মেনে নিলেও দান্তে তাঁর কাব্যের জন্য আলাদা একটি প্রেমতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। এই তত্ত্বে জাগতিক ও স্বর্গীয় প্রেমকে মিলানো হয়েছে, দেখানো হয়েছে যে, জাগতিক প্রেম থেকেই আত্মনিবেদনের ভাব অঙ্কুরিত হয় এবং এই নিবেদিত জাগতিক প্রেমই স্বর্গীয় প্রেমের পথ দেখায়। বলা বাহুল্য, বেয়াত্রীসের প্রতি লক্ষ্য রেখেই দান্তেকে এই তত্ত্বটি গড়তে হয়েছে। ঐতিহাসিক বেয়াত্রীসে ও রূপক বেয়াত্রীসের সমন্বয় ঘটিয়েছেন দান্তে।

'ডিভাইন কমেডি' যেন একটি স্বচ্ছ স্ফটিকের আধার যার মধ্যে বিধৃত হয়েছে মানবজীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতা। তিন খণ্ডে ও তেত্রিশ সর্গে সমাপ্ত এই মহাকাব্যখানি যেন দান্তেরই আধ্যাত্মিক আত্মচরিত। আবার কারো মতে মানবাত্মার ক্রমোত্তরণের কাহিনী এই 'ডিভাইন কমেডি'। কবির বেদনার্ত হৃদয় একাদিক্রমে বিশ বছর ধরে এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছে এবং এই বিশ বছরের একাগ্র চিন্তা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর আছে এর প্রতিটি খণ্ডে ও প্রত্যেকটি সর্গে। 'ডিভাইন কমেডি' শুধু কাব্য নয়—এ যেন বিশ্বের মানবাত্মার অস্ফুটিত একটি অম্লান কুসুম স্তবক। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে, মহাকাল আজো যেন মহাকবি দান্তের এই সৃষ্টিকে

সযত্নে বক্ষে ধারণ করে রেখেছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর পঞ্চাশটি ভাষায় এই অতুলনীয় কাব্যখানির অনুবাদ হয়েছে।

ডিভাইন কমেডিতে দান্তেকে পাই, শুধু কবি হিসেবে নয়, কাব্যের নায়ক-রূপেও। কবিকে কাব্যের মধ্যে এনে ফেলে দান্তে আধুনিক কালের এবং আধুনিক কালের কাব্যের সূচনা করে গিয়েছেন। জগৎ ও জীবনকে সুন্দর করে, পূর্ণ করে মানতেন দান্তে। তিনি পূর্ণতাকে অগ্রাহ্য করে নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন নি। সেইজন্য তাঁর কবিমানসের একাগ্রতার মধ্যে শান্ত-প্রতিভাতময় জীবন-সৃষ্টিরও পরিচয় আছে। সেই পরিচয়ের মধ্য দিয়েই দান্তের কবিস্বরূপের একটা বিশেষরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। মহাকাব্যের ঘটনা বিন্যাস, গঠন বৈশিষ্ট্য ও অখণ্ড ভাবসংহতি অক্ষুণ্ণ রেখে এক সুনির্দিষ্ট আধারে সমসাময়িক ইতিহাসের তীব্র মানস-বিক্ষোভ ও আদর্শ সংঘাত, স্বতঃস্ফূর্ত নৈসর্গিকপ্রবাহের মতো প্রবৃত্তির সমন্বিত উষ্ণ উচ্ছ্বাস, রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির অন্তরের সিংহনাদ—এক কথায় বাস্তবতার তপ্ত কটাহে আবর্তিত মানবাত্মার আর্ত আক্ষেপ ও অতৃপ্তি আশ্চর্য কলাকৌশলে ও সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। মহাকাব্যের প্রশান্ত, নিস্তরঙ্গ বেষ্টনী-রেখার মধ্যে রূপাবেগের আত্মলীন অনুভূতির কি উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস, বাইরে বিড়ম্বিত, কিন্তু অন্তরে আদর্শলোকের স্থির জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল, সার্থক প্রেমের কি মহিমামণ্ডিত, মর্মভেদী আনন্দ-বেদনা! মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাস ও যাজক-তন্ত্রের মধ্যে এক বিরাট আত্মার অধ্যাত্ম আকুতি, দার্শনিকের রহস্যভেদী দিব্য-দৃষ্টি, দৈব-বিড়ম্বিত মানবিকতার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা যে কেমন করে সংকীর্ণ আধারের মধ্যে ধূম্রপুঞ্জাকৃতি দৈত্যদেহের মতো অবলীলাক্রমে বিধৃত হলো তা শিল্প-প্রতিভার এক অপূর্ব বিস্ময়।

সাতটি শতাব্দী পরেও দান্তের মনের ময়ূর আজো তার সাতরঙা পেখম মেলে দিয়ে, নিখিল বিশ্বের ঊর্ধ্বাভিসারী মানবকে নিঃশব্দে আহ্বান করে এই কথা প্রতিনিয়ত বলে চলেছে—তোমার জীবনের ধ্রুবতারাকে অনুসরণ করে তুমি চলো, অপূর্ব আশ্রয় তোমার মিলবেই।' বলছে—'What I speak of is one simple flame.'—অর্থাৎ, 'আমি যার সম্বন্ধে বলছি সে শুধু একটি জ্যোতি মাত্র।' বলছে—'পিছনের চালক সেই প্রেম যে প্রতিদিন চালায় আকাশের সূর্যকে এবং তারাদলকে।' এমন কবির মৃত্যু নেই, আর এমন কাব্য শাশ্বত-লোকের সম্পদ।

যোয়ান অব আর্ক

(১৪১২-১৪৩১)

মাত্র উনিশ বছরের জীবন ছিল সেই চাষার মেয়েটির যিনি শুনতে পেতেন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, যিনি তাঁর স্বদেশকে বিজেতার নিগড় থেকে মুক্ত করেছিলেন আর একটি নির্বীর্য জাতির প্রাণে ও মেরুদণ্ডহীন এক রাজকুমারের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন এক নূতন উদ্দীপনা। ইতিহাসে সেই মেয়েটি 'যোয়ান অব আর্ক' এই বিচিত্র নামে পরিচিতা হয়েছেন। এই বীরাঙ্গনার জীবনের কাহিনী পৃথিবীর সকল দেশের লোকই জানে। কিন্তু যোয়ানের জীবনের কাহিনী এমনই সুন্দর যে তা কখনো পুরাতন হয় না, কিম্বা তার পুনরুল্লেখ ক্লান্তিকর বলে বিবেচিত হয় না। পৃথিবীর একাধিক শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার ও লেখক তার জীবন-কাহিনীকে কবিতায় ও সাহিত্যে রূপায়িত করে যেমন যশস্বী হয়েছেন, তেমনি কতো চিত্রকর ও ভাস্কর ঐ অমর কাহিনীকে রঙে ও রেখায় আর প্রস্তরে রূপায়িত করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। পৃথিবীর আর কোনো নারীর ভাগ্যে এমন গৌরবলাভ ঘটেনি। ইতিহাসের বিশাল গগনে 'যোয়ান অব আর্ক' এই নামটি নক্ষত্রের দীপ্তি নিয়ে আজো জ্বল্ জ্বল্ করছে। মহাজীবনের চিত্রশালায় বিশ্বাস ও সাহসের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই কৃষক কুমারীর নাম আজো ভাস্বর রয়েছে এবং থাকবেও চিরকাল। একটি সামান্য চাষীর মেয়ে গত পাঁচশত বৎসর যাবৎ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে দেবীর মতো পুজো পেয়ে আসছেন, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দুটি নেই।

ফ্রান্সের একটি নগণ্য পল্লীগ্রাম দরেমি। সেই গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে যোয়ান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তখন ঘরে-বাইরে চতুর্দিকে তার শত্রু। অথচ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম কয় দশকে তার অবস্থা ছিল ঠিক এর বিপরীত; একটি বিরাট জাতির সকল রকম সম্পদের চিহ্নই তখন তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল। তার জমি ছিল উর্বরা ও শস্যশালিনী আর কৃষকেরা ছিল সুখী ও পরিশ্রমী। সমগ্র য়ুরোপে ফ্রান্সই তখন শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল এবং ঐতিহাসিকদের মতে, ফ্রান্স ভিন্ন য়ুরোপের আর কোন দেশের জীবনযাত্রার মান এত উন্নত ছিল না, আর জনসাধারণ এমন সুখী ছিল না। সেদিনের য়ুরোপীয় চিন্তাধারায় একমাত্র ফ্রান্স ভিন্ন আর কোনো দেশই নানা বিষয়ে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে নি।

একশো বছর পরে ফ্রান্সের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গেল। তখন ঘরে ও বাইরে তার অনেক শত্রু। এই সুযোগে ইংলণ্ড ফ্রান্স আক্রমণ করল। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর যুদ্ধ চলতে থাকল দুই দেশে। প্রাচীন কালের সেই ধর্মযুদ্ধের

(Crusade) পর পৃথিবীতে এমন দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধ আর কোথাও চলে নি। ইতিহাসে এই যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছে 'The Hundred Years War' বা 'একশো বছরের যুদ্ধ'। ফ্রান্সের সিংহাসন তখন শূন্য; যুবরাজ সপ্তম চার্লস তখনো পর্যন্ত অনভিষিক্ত। তিনি তখন এক রকম রাজ্যহারা ও বন্ধুহারা অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন। তিনি যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না, এই বিপদে কি করা উচিত। চার্লসের জীবনের ঠিক এমনি সংকটকালে তাঁর কাছে আশার বাণী বহন করে এনেছিলেন ক্ষুদ্র দঁরেমি গ্রামের সেই কৃষক-কুমারী যোয়ান।

শতবর্ষের যুদ্ধের শোচনীয় ফল তখন জাতির জীবনের সর্বস্তরে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। রাজদরবারে চলেছে শুধু ষড়যন্ত্র, আর অসন্তুষ্ট রাজকর্মচারিবৃন্দ একে একে জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র চলে যেতে দ্বিধা বোধ করছিল না। সকলের উপরে দুর্বল দেহ ও অনভিষিক্ত এক তরুণ রাজা। এর আগে ফ্রান্সের আর কোনো রাজাকে এমন দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়নি। চার্লসের গর্ভধারিণী জননী পর্যন্ত তাঁর পুত্রকে এই সময় বর্জন করেছিলেন।

দেশের জনসাধারণের দুর্দশায় যোয়ানের মন বিষণ্ণ। এত বড়ো ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশের আজ কী শোচনীয় অবস্থা! তিনি যতই চিন্তা করেন ততই তাঁর কোমল হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকে। একদিন যোয়ান তাঁর স্বভাব মতো তাঁদের কুঁড়ে ঘরের পিছন দিককার গাছটির তলায় বসে নীল আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ যেন চারদিক আলোয় আলোকিত হয়ে গেল। আকাশ থেকে একটা দৈববাণী যেন ভেসে এল—'ফ্রান্সকে বিদেশীর হাত থেকে রক্ষা করবে তুমি। ঘর ছেড়ে তুমি বেরিয়ে পড়ো। যুবরাজের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিতে হবে তোমাকে।' কুমারী যোয়ানের সমস্ত সত্তা যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল এই দৈববাণীতে। কে যেন অলক্ষ্যে থেকে তাঁর হৃদয়ে অগ্নিময় প্রেরণা সঞ্চার করল। মায়ের কাছে এসে তিনি যখন সব কথা বললেন তখন মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে শিরচুম্বন করে তিনি বলেন—দৈববাণী আবার কি? এ তোর মনের ভ্রম, বাছা।'

যোয়ানের বয়স তখন মাত্র বারো বছর যখন তিনি এই দৈববাণী শুনেছিলেন এবং তখন থেকেই তিনি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি আজীবন কুমারী থাকবেন এবং পবিত্র জীবন যাপন করবেন। শতবর্ষের যুদ্ধের পর ফ্রান্সের সিংহাসন তখন ইংরেজদের করতলগত হবার উপক্রম হয়েছে এমন সময়ে এই নিরক্ষরা চাষীর মেয়ের আবির্ভাব ঘটল তার স্বজাতির ইতিহাসে। অতঃপর ক্রমাগত বালিকা সেই দৈববাণী শুনতে থাকেন এবং সেই সঙ্গে তিনি নানা রকম আশ্চর্য দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। তখন থেকেই তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো তাঁর জন্মভূমি ফ্রান্সকে রক্ষা করা, আর যুবরাজকে রীমস্ এর ক্যাথিড্রালে অভিষিক্ত করা।

কিন্তু তাঁর সঙ্গিনীদের কাছে, তাঁর পিতামাতার কাছে যোয়ানের এই ধারণা উদ্ভট বলেই মনে হতো। কিন্তু প্রত্যাদিষ্টা বালিকা তখন তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন।

অবশেষে যোয়ান যখন ষোল বছর বয়সে পদার্পণ করলেন তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। শয়নে-স্বপ্নে, জাগরণে, ধ্যানে তিনি সেই একই দৈববাণী শুনতেন; ফ্রান্সকে বিদেশীর হাত থেকে রক্ষা করবে তুমি; ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো; যুবরাজের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিতে হবে তোমাকেই।' যোয়ান আবার গেলেন জেলার শাসনকর্তার কাছে। এবার তিনি দিব্যপ্রেরণায় উদ্ভাসিত সেই কিশোরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করলেন যে, এ মেয়ে সত্যিই দৈবাদেশ শুনেছে। তিনি যুবরাজের নামে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন যোয়ানের হাত দিয়ে, আর তাঁর হাতে দিলেন একটি তলোয়ার। তারপর ১৪২৯ সনের জানুয়ারি মাসে, পুরুষের বেশে সজ্জিত হয়ে আর সঙ্গে ছ'জন অনুচর নিয়ে বালিকা এলেন যুবরাজের দরবারে।

যুবরাজ সপ্তম চার্লস তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে যুবরাজের মনে এই ধারণা হলো যে, এই কিশোরী দৈবশক্তির অধিকারিনী। তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরাও সেই কিশোরীর প্রশান্ত আনন ও উদ্দীপ্ত কথা শুনে তাঁকে দৈবশক্তিসম্পন্না এক নারী বলেই বিশ্বাস করলেন। যোয়ানের কথা চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। কাতারে কাতারে সৈন্যরা এসে দাঁড়াল ফ্রান্সের পতাকার তলায়। দেহে তাঁর বর্ম, কটিদেশে কৃপাণ, হাতে ফ্রান্সের পতাকা—অশ্বপৃষ্ঠে সকলের পুরোভাগে চলেছেন সেই কিশোরী। সেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে যোয়ান সোজা চলতে লাগলেন ওর্লেয়াঁর অভিমুখে। ওর্লেয়াঁ দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি মস্ত বড়ো শহর। বহুদিন ধরে শত্রুরা এই শহরটি অবরোধ করে রেখেছে। যোয়ান আসার সঙ্গে সঙ্গে অবরোধ ভেঙে পড়ল, শত্রুরা করল পশ্চাদপসরণ।

পর পর চারটি যুদ্ধে ইংরেজরা হার মানল। এতদিনে যেন কিশোরীর স্বপ্ন সত্য হলো। রীমস্ শহরের ক্যাথিড্রালে যুবরাজ চার্লসের অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হল। যোয়ান বললেন আমার কাজ শেষ হলো। এবার আমি গ্রামে ফিরে যাই।

কিন্তু তখনো ইংরেজরা সম্পূর্ণভাবে ফ্রান্স ত্যাগ করে যায়নি। তাই দুর্বলচিত্ত সম্রাট চার্লস যোয়ানকে ফিরে যেতে দিলেন না। যাই হোক, রাজার আদেশে তাঁকে আবার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হল। আবার দুঃসময় এল, প্রত্যেকটি যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটতে থাকে। বার্গাণ্ডি ফ্রান্সের একটা বড়ো জেলা, এখানকার ডিউক তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিলেন। ইংরেজ ও বার্গাণ্ডিয়ানরা তখন প্যারিস শহর দখল করে বসেছে। শত্রুর হাত থেকে রাজধানী রক্ষা করার ভার পড়ল যোয়ানের উপর। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে উভয়

পক্ষে, এমন সময় রণক্ষেত্রে শোনা গেল কুমারী যোয়ান নিহত হয়েছেন। আসলে সেটা নিছক গুজব ছিল। শত্রুর কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে তাঁরই কয়েকজন অনুচর এই কথা রটিয়ে দিয়েছিল।

এই গুজবের ফলে ফরাসী সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। যোয়ানকে তাঁর ঘোড়ার পিঠ থেকে টেনে নামিয়ে শত্রুসৈন্যরা নিয়ে গেল ডিউকের শিবিরে। বার্গাণ্ডির ডিউক প্রচুর অর্থের বিনিময়ে যোয়ানকে সঁপে দিলেন ইংরেজদের হাতে। বিচারে সেই কিশোরী ডাইনি বলে সাব্যস্ত হলেন। তখনকার দিনে আইনের ব্যবস্থা ছিল এই যে, ডাইনীদের পুড়িয়ে মারতে হবে। একটি প্রকাশ্য স্থানে তাঁকে অগ্নিদগ্ধ করে মারা হয়। একটি ক্রুশ বুকে নিয়ে যোয়ান দ্বিধামাত্র না করে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন। তখন তাঁর মুখে মাত্র একটি কথা উচ্চারণ হতে শোনা গিয়েছিল ; যীশু! দশ হাজার দর্শকের অশ্রুসিক্ত দৃষ্টিপথে যোয়ানের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আকীর্ণ হয়ে রইল সেই স্বর্ণভস্ম। যোয়ানের আত্মদান ব্যর্থ হয়নি। ঐতিহাসিকদের অভিমত এই যে, 'The martyrdom of Joan gave to France a sense of moral unity such as the country had never yet known.' এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এক অপূর্ব মনোবল নিয়ে স্বদেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে তিনি তাঁর জীবন ও যৌবনকে উৎসর্গ করেছিল। এক নিরক্ষর গ্রাম্য বালিকার এই আত্মত্যাগের প্রয়োজন ছিল।

কলম্বাস

(১৪৫১-১৫০৬)

অক্টোবর ১২, ১৪৯২। তখন মধ্যরাত্রি অতীত হয়েছে। কুল-কিনারাহীন অতলান্তিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে পশ্চিমাভিমুখে চলেছে পাল-তোলা একটি ছোট্ট জাহাজ। জাহাজটির নাম 'পিনটা'। সেই জাহাজটিতে যে কয়জন নাবিক ছিল তাদের মধ্যে একজন চাঁদের আলোয় দীর্ঘ প্রসারিত বালুকাপূর্ণ ভূখণ্ড দেখতে পেলেন। তবে কি অদূরে কঠিন মৃত্তিকা দৃষ্টিগোচর হলো। জাহাজ থেকেই তিনি একবার কামান দাগলেন এবং সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অবশেষে মাটি দেখা গিয়েছে। আমরা এইবার সেই মৃত্তিকার ওপর পা রাখতে পারব। কিছুদিন আগেও জাহাজের নাবিকদের কাছ থেকে এই রকম কথা শোনা গিয়েছিল, কিন্তু সেসব কথা শেষ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে—মাটি আর দেখা যায়নি; মাটির বদলে মেঘের মায়ায় নাবিকরা বিভ্রান্ত হয়েছে। য়্যাডমিরাল ঘোষণা করেছিলেন প্রথমে যার দৃষ্টিগোচর হবে মাটি, তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

এই য়্যাডমিরালের নাম ক্রিস্টোফার কলম্বাস। 'ইতিহাসের প্রথম দুঃসাহসী নাবিক যিনি আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকা মহাদেশ।' তিনিই কয়েকজন দুরন্ত প্রকৃতির সহচর নিয়ে অতলান্তিক পাড়ি দিচ্ছিলেন। ১৪৯২ সালের ১২ অক্টোবর, শুক্রবার সকালে রাজকীয় পতাকাধারী ক্রিস্টোফার কলম্বাস দু'জন ক্যাপ্টেনকে সঙ্গে করে, একটি দ্বীপের ওপর অবতরণ করলেন এবং এর নামকরণ করলেন সান সালভাডোর। এখনকার নাম ওয়াটলিং দ্বীপ। নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের এই ছিল প্রথম পর্যায়। মার্টিন আলোনসো পিনজোন ও ভিয়েনতে আনেজ পিনজোন—এই ছিল তাঁর সঙ্গী ক্যাপ্টেন দুটির নাম। জাহাজ থেকে অবতরণ করে এঁরা তিনজন মিলে দ্বীপটার চারিদিক নিরীক্ষণ করতে থাকেন। জল আর জল—দীর্ঘকাল জলপথে অবস্থান করার পর, এখন মাটির ওপর দাঁড়িয়ে তাঁদের মনে যে আনন্দ হলো তা ভাষায় বুঝিয়ে বলবার নয়।

এই কলম্বাস কে ছিলেন? কী তাঁর জন্মবৃত্তান্ত? এ বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছুই জানা যায় না। কথিত আছে, তিনি ছিলেন জেনোয়ার লোক—ডোমেনিকো কলম্বাসের পুত্র। ইনি জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন এবং সম্ভবত ১৪৫১ সালে তাঁর জন্ম হয়ে থাকবে।

কলম্বাসের নিজস্ব বিবরণ অনুযায়ী, ১৪৭৮ সালে তিনি লিসবনে ছিলেন এবং ঐখানেই তিনি ফেলিপা মোনিজ ড পেরেসট্রেল্লো নাম্নী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া এক তরুণীকে বিয়ে করেন। এইখান থেকেই কলম্বাসের জীবনের প্রকৃত

আরম্ভ, কারণ এই সময়েই তিনি সমুদ্রপথে অভিযান করে, এমন সব অনাবিষ্কৃত দেশ আবিষ্কার করার স্বপ্ন দেখেছিলেন যা ইতিপূর্বে কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব হয়নি এবং যা তাঁকে এনে দেবে সৌভাগ্য ও খ্যাতি। আর যে কোন দূরদর্শী সম্রাট তাঁকে এই ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা করবেন তাঁকেও তিনি এনে দেবেন অকল্পিত সম্পদ আর গৌরব।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অনিশ্চিত; সেই পরিবেশে স্বেচ্ছায় কেউ যে একজন অজ্ঞাতপরিচয় অভিযানকারীকে তার অবাস্তব অভিযানে, অর্থ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে এমন সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। তাছাড়া, তাঁর দাবীর বহরটা ছিল বিরাট; তার কারণ তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল প্রবল। তাঁর প্রথম দাবী তাঁকে য়্যাডমিরালের পদ দিতে হবে, দ্বিতীয় দাবীটা ছিল আরো বড়ো—তিনি যে দেশগুলি আবিষ্কার করবেন সেইগুলির শাসক তাঁকেই করতে হবে। তৃতীয় দাবী আবিষ্কৃত দেশগুলির খনিজ সম্পদের এক-দশমাংশ ভাগের অধিকার তাঁকে দিতে হবে। এমন অসম্ভব দাবী যে অভিযানকারী করতে পারে তার পক্ষে পৃষ্ঠপোষক পাওয়া সত্যিই সুকঠিন ছিল।

দশ বছর ধরে কলম্বাসের পৃষ্ঠপোষক লাভের চেষ্টা করছিলেন। স্পেনের রাণী ইসাবেলা কলম্বাসের পরিকল্পনার সম্ভাবনাটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। হাজার হাজার অবিশ্বাসীকে খ্রীষ্টধর্মে আনার এই সুযোগ তিনি কিছুতেই হারাতে চাইলেন না। স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ ও রাণী ইসাবেলা দু'জনেই কলম্বাসের অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতা করতে এগিয়ে এলেন। পৃষ্ঠপোষক মিললো, দু'খানা জাহাজ পালোস শহর থেকে সংগৃহীত হলো, কিন্তু সমস্যা তখনো সম্পূর্ণ দূর হলো না। জলপথে অভিযান তো একা করা চলে না; সঙ্গে আরো নাবিক দরকার। তখন দণ্ডিত অপরাধীদের ভেতর থেকে এই জাতীয় লোক সংগ্রহ করা হতো, অবশ্য সেই সঙ্গে কিছু খাঁটি নাবিকও প্রয়োজন হতো। অবশেষে প্রভাবশালী পিনজোন ভ্রাতৃদ্বয়ের সহায়তায় সাতাশী জন লোক নিয়ে একটি সুগঠিত নাবিকদল সহকারে সানটা মারিয়া (১০০ টন), পিনটা (৫০ টন) ও নিনা (৪০ টন) —এই তিনটি জাহাজে করে ১৪৯২ সালের ৩ অগস্ট কলম্বাস অভিযানে যাত্রা করলেন; শেষোক্ত জাহাজ দুটি ছিল পিনজোন ভ্রাতৃদ্বয়ের অধীনে।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সুদীর্ঘ জলপথ নানা বিপদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে ১২ অক্টোবর সেই সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে সান সালভাডোর দ্বীপে উপনীত হয়ে কলম্বাস নতজানু হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন। ক্যাথলিক সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর নামে তিনি সেই দ্বীপটির অধিকার গ্রহণ করেছিলেন। কলম্বাসের এই প্রথম ও প্রধান অভিযান সার্থক হয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের গুণে। তাদের জীবনযাত্রা তাঁকে তমত আনন্দিত করেছিল। এদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন—এখানকার

অধিবাসীদের স্বভাব বিনম্র, এরা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে থাকে। এদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের লেশমাত্র নেই। এরা খুব অতিথিপরায়ণ এবং যাদের সংস্পর্শে এরা আসে তাদের সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করে। কলম্বাস তাঁর অধীনস্থ নাবিকদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন এদের সঙ্গে সহৃদয়তা-পূর্ণ ব্যবহার করে। স্থানীয় অধিবাসীরা যদি উপঢৌকন প্রদান করে, তাহলে তার বিনিময়ে তাদেরকে যথাযোগ্য উপহার দিতে হবে।

বিনা রক্তপাতে ও এক রকম শান্তিপূর্ণভাবেই চলেছিল কলম্বাসের অভিযান। তখন থেকে তিনি তাঁর স্বপ্নের দেশ খুঁজে বেড়াতে থাকেন—সেই দেশ যেখানে প্রচুর পরিমাণে সোনা মিলবে আর জাহাজ বোঝাই করে সেই সোনার তাল নিয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। কিন্তু সামান্য পরিমাণ সোনাও তাঁর নাগালের মধ্যে এলো না। স্থানীয় লোকেদের ভাষা তিনি বুঝতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর কল্পনাকুশল মস্তিষ্ক এদের কথাবার্তা থেকে বুঝে নিয়েছিল যে, অদূরেই রয়েছে সেই বিরাট সম্পদশালী দেশ যেখানে চীনের সম্রাট একদা রাজত্ব করেছিলেন—এখানকার রাস্তা সোনা দিয়ে মোড়া তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল তিনি যদি আর একটু অগ্রসর হতে পারেন তাহলে তাঁর স্বপ্ন বুঝি চরিতার্থ হবে।

তাঁর প্রথম অভিযানের শেষ পর্বে ছিল হিসপানিওলা (হাইতি বা স্যান ডোমিনগো) আবিষ্কার। এইখানে তাঁর জাহাজ সানটা মারিয়া বালুবেলায় আটকে যায় এবং সেটি পরিত্যক্ত হয়। কলম্বাস একটি জাহাজে চড়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন ঠিক করলেন। সেই নতুন উপনিবেশে তিনি বিয়াল্লিশ জন য়ুরোপীয় রেখে গেলেন এবং খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য সঙ্গে করে ছ'জন দেশীয় লোককে স্পেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকগণ যথেষ্ট উদারতার সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করলেন। সকলের মুখে কলম্বাসের নাম। সেই ছয়জন দেশীয় লোক, কয়েকটি টিয়াপাখী, কিছু অজ্ঞাত পরিচয় জীবজন্তু ও অদ্ভুত ধরনের জল যা তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন সেগুলি সর্বত্রই কৌতূহল ও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। এই নিদর্শনগুলি থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে, তিনি সত্যিই অভিযানে গিয়েছিলেন। পোপ তাঁকে সাফল্যের জন্য আশীর্বাদ করলেন। সর্বত্র কলম্বাসের জয়ধ্বনি শোনা গেল।

১৪৯৩, ২৫ সেপ্টেম্বর। এই তারিখে কলম্বাস, দ্বিতীয় এবং বৃহত্তর অভিযানে বহির্গত হলেন। এই অভিযানের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা। কিন্তু কলম্বাসের গৌরবের ইতিহাস শেষ হয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রথম অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গেই। হিসপানিওলাতে পৌঁছে তিনি দেখলেন যে উপনিবেশ তিনি এখানে রেখে গিয়েছিলেন তা আর নেই—স্থানীয় অধিবাসীরা নিষ্ঠুরভাবে উপনিবেশে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের হত্যা করেছিল। এবারকার অভিযানে তিনি আর একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন ও

তার নাম রাখা হয় 'ইসাবেলা'। পরের বছরের অভিযানেও তিনি তাঁর স্বপ্নের সোনার দেশের সন্ধান পেলেন না, যদিও সব সময়ে তিনি কিছু না কিছু পরিমাণ এই মূল্যবান ধাতু সঙ্গে নিয়ে ফিরতেন। অবশেষে স্বর্ণপ্রসূ দেশের সন্ধান থেকে বিরত হয়ে, কলম্বাস ক্রীতদাসের ব্যবসা করবেন ঠিক করেন। এই ছিল তাঁর পতনের সূচনা। য়ুরোপে তখন দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং কেউ এর নিন্দা করত না। কিন্তু রাণী ইসাবেলা তার বিরুদ্ধে ছিলেন। দাসত্ব ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার ফলে কলম্বাসকে রাণীর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হতে হলো।

চতুর্থ অভিযানে তিনি কিউবার উপকূলে গিয়ে ডোমিনিকো ও পোর্টোরিকো আবিষ্কার করেন। এই সময় থেকেই কলম্বাসের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে ও মনের শক্তিও হ্রাস পায়। ১৪৯৬ সালের অভিযানে তিনি ত্রিনিদাদ গিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রধান ভূখণ্ড আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের পুরস্কারস্বরূপ তিনি পুনরায় রাণী ইসাবেলার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হন। তাঁকে 'ডিউক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি আবার তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ফিরে পান। ১৫০৬ সালে স্পেনের একটি নির্জন শান্ত গ্রামে সমুদ্রপথের এই দিগ্বিজয়ী অভিযানকারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অতি নগণ্য অবস্থা থেকে কলম্বাস ঐশ্বর্য ও খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন ও স্পেনকে তিনি এক দুর্লভ গৌরবে বিভূষিত করেছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ দুটি বছর উদ্বেগ ও নৈরাশ্যের মধ্যে অতিবাহিত হলেও তাঁকে আর দারিদ্র্যের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি, অথবা সম্ভ্রমচ্যুত হতে হয়নি।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

(১৪৫২-১৫১৯)

ফ্লোরেন্সের একটি সন্ধ্যা। বহু নাগরিক সমবেত হয়েছেন একটি গৃহে। সমবেত হয়েছেন বহু বিখ্যাত চিত্রকর, ভাস্কর, বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিক। তাঁরা সমবেত হয়েছেন নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য। কিন্তু আজ তাঁদের কাউকে কোনো কথা বলতে দেখা গেল না। তাঁরা সকলেই শ্রোতা। একাগ্রচিত্তে, উৎকর্ণ হয়ে তাঁরা শুনছেন এক প্রিয়দর্শন তরুণের কথা। আলোচনারত সেই তরুণটির মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত। সুঠাম তাঁর দেহশ্রী; মাথায় তাঁর অপর্যাপ্ত সোনালী রঙের চুল, সেই চুল এসে পড়ছে তাঁর কাঁধের চারদিকে, তাঁর গোলাপি রঙের পরিচ্ছদের উপর। পরিচ্ছদের তলায় একটি সুগঠিত দেহের পেশীগুলি ঢেউ খেলে যাচ্ছে। একটি বিশেষ ভঙ্গিতে বসে আছেন সেই তরুণ। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলেছে তাঁর কণ্ঠস্বরের মাধুর্য। সে অনিন্দ্য কণ্ঠস্বর তাঁর মুখের উচ্চারিত জ্ঞানগর্ভ ও অগ্নিময়ী বাণীরই যোগ্য। ফ্লোরেন্সের জ্ঞানীরা তন্ময় হয়ে শুনছেন তাঁর কথা। এই তরুণের নাম লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। ইতালি তথা য়ুরোপের নবজাগরণের উজ্জ্বলতম আলোক শিখা তিনি। বিশ্বের ইতিহাসে একটি অদ্বিতীয় বহুমুখী প্রতিভা। ফ্লোরেন্সের পশ্চিমে অবস্থিত ভিঞ্চি নামক একটি পার্বত্য গ্রামে ১৪৫২ সালে লিওনার্দো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পিয়েরো আন্তোনিও দ্য ভিঞ্চি। এই গ্রামের নাম থেকেই এই পরিবারটি এই 'ভিঞ্চি' পদবী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল ক্যাটেরিনা। অতি ভাগ্যবতী এই নারী, কারণ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোনো নারী তাঁর গর্ভে এমন পরিপূর্ণ মানুষকে সন্তানরূপে ধারণ করেননি যেমন ক্যাটেরিনা করেছিলেন। দেখতে তিনি অনিন্দ্যসুন্দর ছিলেন, তাঁর কথাবার্তাও ছিল বুদ্ধিদীপ্ত। বালক লিওনার্দো ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসপরায়ণ আর দিবাস্বপ্নচারী। তবে প্রতিভার পরিচয় তিনি ঐ বয়সেই দিয়েছিলেন এবং তা দিয়েছিলেন বিস্ময়কর রূপে। গণিতশাস্ত্রের প্রতি তাঁর অসাধারণ আকর্ষণ ছিল। সংগীতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি যখন গান গাইতেন তখন এক স্বর্গীয় সংগীত-স্রোত তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হতো।

কিন্তু লিওনার্দো তাঁর শৈশবে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন চিত্রাঙ্কন আর মডেলিং-এর প্রতি। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন সুদক্ষ চিত্রকর হয়ে উঠলেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি ফ্লোরেন্সের চিত্রকর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ঐ পেশা অবলম্বন করেন। কয়েকটি চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে তিনি মূর্তিনির্মাণ পদ্ধতিও আয়ত্ত করেছিলেন আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে এবং তিনি যে একজন

প্রতিভাবান ভাস্কর, অনেকের মনেই তখন থেকে এই ধারণাও বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। গ্রীক ভাস্কর্য ও ফ্লোরেন্সের শিল্প জগতে যাঁরা ঐতিহ্য রচনা করেছেন সেই সব পূর্বসূরীদের শিল্পকর্মগুলি লিওনার্দো গভীর ভাবেই অনুশীলন করেছিলেন।

চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, জ্যামিতি ও প্রাকৃতিক ইতিহাস—এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে লিওনার্দো অবিনশ্বর স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

তিনিই ইতালির প্রথম শিল্পী যিনি প্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন—পুরাতন ক্লাসিকাল নিয়ম-কানুন বা ধাঁচ, এসব থেকে তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নি। আবার লিওনার্দোই য়ুরোপের প্রথম চিত্রকর যিনি তাঁর ছবিতে আলো-ছায়ার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলেন। অদম্য ছিল তাঁর জ্ঞান-পিপাসা। তিনি শুধু আলো-ছায়ার সৌন্দর্যই নিরীক্ষণ করলেন না, অথবা চিত্রে তাকে রূপায়িত করে ক্ষান্ত হলেন না। তিনি জানতে চাইলেন কি নিয়মে এই জিনিস সম্ভব। তিনি অধ্যয়ন করলেন আলোক-বিজ্ঞান বা দৃষ্টি-বিজ্ঞান (optics) ও চক্ষু সম্পর্কিত শারীর-বিজ্ঞান। কি নিয়মে শব্দ-তরঙ্গ ও আলোক-তরঙ্গের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাও তিনি জানলেন এবং তাই নিয়ে কিছু পরীক্ষাও করলেন তিনি। তাঁর চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্যের মধ্যে দেখা দিল নূতনত্ব। অধ্যয়ন করলেন শারীরবিদ্যা—শুধু মনুষ্যদেহ সম্পর্কে নয়, প্রাণীদেহ সম্পর্কেও—পেশীসমূহের সঞ্চালন-প্রক্রিয়া সম্পর্কেও তিনি অনুসন্ধান চালালেন এবং তিনিই প্রথম চিত্রশিল্পী যিনি শারীরবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা করেন। এই দুটি বিষয়ে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি যেসব চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন, এবং অনুশীলনের ফলে যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তা লিওনার্দো-প্রতিভার আশ্চর্য নিদর্শন।

১৪৮৩ সালে লিওনার্দো মিলানে এলেন। এখানকার গুণগ্রাহী ডিউক শীঘ্রই তাঁর গুণমুগ্ধ হলেন। মিলানের শাসনকর্তার কাছে লিওনার্দো কর্মপ্রার্থী হয়ে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলেন। ঐ আবেদনপত্রের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ সুপরিচালনার জন্য সামরিক বিজ্ঞান সম্পর্কে নয়টি নূতন ও মৌলিক 'আইডিয়া' দিয়েছিলেন। তিনি কত রকমের কাজ জানেন তারো একটা তালিকা দিয়েছিলেন।

তাঁর আবেদনপত্র গ্রাহ্য হয়েছিল। তাঁর জীবনের পরবর্তী সতের বৎসর কাল মিলানেই অতিবাহিত হয়েছিল। ১৪৮৫ সনে মিলানে ভীষণ প্লেগ দেখা দিল। এই প্লেগ মহামারীরূপে ঐ রাজ্যের যখন যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করল তখন লিওনার্দো নগর পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করলেন এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে নূতনভাবে তিনি মিলান শহরের পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা বা নক্সা তৈরি করেন। এক বছর বাদে তিনি লুডোভিসোর কাছে মিলানের ক্যাথিড্রালের জন্য একটি নূতন নক্সা দিলেন, আবার সেই একই সময়ে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ়

ছাব্বিশ ফুট উঁচু একটি বিরাট মূর্তি নির্মাণের কাজেও লিপ্ত ছিলেন। এই মূর্তিট সম্পূর্ণ করতে তাঁর সময় লেগেছিল আট বছর এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অতিকায় মূর্তিটি ব্রোঞ্জের তৈরি ছিল না। ছ'বছর পরে মিলান যখন ফরাসীদের দ্বারা পর্যুদস্ত হয় তখন এই মূর্তিটি তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

১৪৯৪।

এই বৎসরটি শিল্পী লিওনার্দোর জীবনে বিশেষভাবেই স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছর তিনি তার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি—'শেষ ভোজ' (The Last Supper) চিত্রখানি আঁকতে আরম্ভ করেন। এটি একটি কনভেন্টের বদ্ধ দেয়ালে আঁকা হয়েছিল—রঙ ধরাবার পক্ষে ঐ দেয়াল আদৌ উপযোগী ছিল না। তাই অঙ্কিত হওয়ার কুড়ি বছরের মধ্যে দেয়ালের স্যাৎস্যাতানি লেগে ছবিটি নষ্ট হয়ে যেতে আরম্ভ হয়। তখন ঐ কনভেন্টের একদিকের দেয়াল কেটে আলোবাতাস চলাচলের জন্য একটি দরজা বের করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই জগদ্বিখ্যাত ছবিটির সংস্কার কার্য চলতে থাকে, যার ফলে মূলের সৌন্দর্য অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

'দি লাস্ট সাপার' শিল্পজগতের আজো একটি বিস্ময়, একটি দিক্‌চিহ্ন হয়ে আছে। যীশু খ্রীষ্টের জীবনের শেষ ভোজনের কাহিনীটি লিওনার্দো তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তুরূপে যেন গ্রহণ করলেন। এই নিয়ে শিল্প-সমালোচকগণ অনেক কথা বলেছেন, অনেক ভাষ্য রচনা করেছেন। তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে—'**The Last Supper** is more than illustration. It is a part of Leonardo's mind, containing his science, his understanding and his preferences. Throughout the ages it has remained not only the most famous picture in the world but the supreme expression of the artist's highest powers.'

এরপর ফরাসীদের হাতে মিলানের যখন ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল, লিওনার্দো মিলান ত্যাগ করে এলেন ভেনিসে। এখানে তাঁর অবস্থান স্বল্পকাল স্থায়ী ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর সূচনায় তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁর জন্মভূমি ফ্লোরেন্সে। এই সময়ে তিনি সান্তা মারিয়া গীর্জার অভ্যন্তরভাগ অলংকরণের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে যে ম্যাডোনা মূর্তিটি অঙ্কিত করেন তার ফলে ম্যাডোনা মূর্তি সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৫০৫ সনটি লিওনার্দোর জীবনে আর একটি স্মরণীয় বৎসর। ঐ বছর তাঁর পরিণত প্রতিভার দান 'মোনালিসা' ছবিটি অঙ্কিত হয়। কথিত আছে ১৫০২ সনে একদিন শিল্পীর দৃষ্টিপথে পড়লেন ফ্রানসেসকো গিয়োকোন্ডো নামক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের অনিন্দ্যসুন্দরী তৃতীয়া পত্নী—নাম তার মোনালিসা। নারী-সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন লিওনার্দো। মোনালিসার স্বামী শুধু বৃদ্ধই ছিলেন না, অতি নিষ্করুণ প্রকৃতির মানুষও ছিলেন তিনি। পত্নীর সমস্ত অলংকার তিনি

বাঁধা দিয়ে তাকে নিরাভরণা করে রেখেছিলেন। বিষাদের প্রতিমূর্তি সেই নারীকে দেখে শিল্পীর মনে তার একটি ছবি আঁকার ইচ্ছা জাগল। মোনালিসা রাজী হলেন—শুধু রাজী হওয়া নয়, শিল্পীর ওপর সেই নারী এমন এক অপ্রতিরোধ্য মায়াজাল বিস্তার করলেন যে লিওনার্দো তাঁকে তাঁর উপপত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। শুধু বৃদ্ধ স্বামীর আচরণ নয়, তাঁর একমাত্র কন্যাটিকে হারিয়ে মোনালিসার মনে বিষণ্ণতার যে ভাবটি জেগেছিল তাই-ই যেন সর্বদা তাঁকে ঘিরে থাকত। মনের এই দুঃসহ শোকভার লাঘব করবার জন্য তিনি অর্কেস্ট্রা ভাড়া করে রেখেছিলেন, আর হাসাতে পারে এমন সব লোকও মাইনে করে রেখেছিলেন। বিষাদময়ী মোনালিসার মুখের সেই হাসিটি তিন বছর ধরে প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করতে করতে ১৫০৫ সনের একদিন সন্ধ্যায় মোনালিসার রক্তিম অধরে শিল্পী রহস্যময় সেই মৃদু হাসির রেখাটি দেখতে পেলেন যা দেখবার জন্য তিনি এতকাল উদ্‌ভ্রান্তের মতো অপেক্ষা করেছিলেন। সেই হাসিটিকেই তিনি তাঁর দৈবদত্ত তুলির টানে ধরে রাখলেন এমন সজীবতার সঙ্গে যা শুধু অনুভবের বিষয়, বর্ণনার বিষয় নয়। মোনালিসা নেই, তার মুখের হাসিটুকু আছে: শিল্পী নেই, কিন্তু তার সৃষ্টি আছে। একটি নারীর রহস্যমণ্ডিত মৃদু হাসির মধ্যে কেমন করে একটি শিল্পীর আত্মা সমাহিত হয়ে যায়, লিওনার্দোর এই অনুপম শিল্পসৃষ্টিটি তারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কালের পটে নক্ষত্রদ্যুতিতে মোনালিসার হাসিটি আজো অম্লান, ভাস্বর।

তাঁর জীবনের পরবর্তী চৌদ্দ বৎসরকাল লিওনার্দো কখনো ফ্রান্সে, কখনো রোমে অতিবাহিত করেছেন। অবশেষে ১৫১৯ সনের ২রা মে মৃত্যু এসে হানা দিল তাঁর দরজায়। শিল্পী তাঁকে স্বাগত জানালেন এই বলে—"I knew how to live, I know how to die." প্রকৃতি তাঁর আপন সৃষ্টিকে যেন নিজের কোলে তুলে নিলেন। কালজয়ী এই শিল্পী সম্পর্কে গ্যেটের সেই উক্তিটি স্মর্তব্য—'একটি সুগঠিত মানবীয় দেহাধারে একটি পরিপূর্ণ বিকশিত মন।'

মার্টিন লুথার

(১৪৮৩—১৫৪৬)

জার্মানির সংস্কার যুগের বিদ্রোহী সন্ন্যাসী ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের স্রষ্টা ডক্টর মার্টিন লুথার একজন ইতিহাস বিখ্যাত মানুষ। রোমের পরাক্রমশালী মহামান্য পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একদা তিনি সমগ্র য়ুরোপ কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই য়ুরোপে ধর্মের ক্ষেত্রে যখন অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, যখন ইতালিয় রেনেসাঁ ও তার পরবর্তী আন্দোলনগুলি একে একে স্তিমিত হয়ে এসেছে, উত্তর য়ুরোপে তখন আর একটি রেনেসাঁর আবির্ভাব আসন্ন হয়ে এসেছিল। লুথারের জন্মকালের পরিবেশ সকল দিক দিয়েই ছিল একটি বিরাট পরিবর্তনের পক্ষে অনুকূল।

১৪৮৩, ১০ই নভেম্বর।

লোয়ার স্যাক্সনির অন্তর্গত ইসলবেন নামক একটি ক্ষুদ্র শহরতলীতে এক রোমান ক্যাথলিক পরিবারে মার্টিন লুথার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জন লুথার ছিলেন একটি খনির মালিক; মা মার্গারেট একজন বিখ্যাত সংস্কার-সমর্থকের কন্যা এবং বহু গুণের অধিকারিণী। লুথারের জন্মক্ষণেই, কথিত আছে, তাঁর পিতা তাঁকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এবং জন্মের ঠিক পরের দিনেই শিশু মার্টিনকে চার্চে নিয়ে যাওয়া হয় ও খ্রীস্টধর্মের প্রথা মত তাঁর নামকরণ হয় এবং ঐ দিন যাঁকে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয় তাঁরই নামানুসারে পুত্রের নাম রাখা হয় মার্টিন লুথার। পিতামাতার ধর্মবোধ বালক মার্টিন উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পূর্ণভাবেই লাভ করেছিলেন। অল্প বয়সেই মার্টিনকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। শৈশবেই তাঁর মধ্যে প্রবল আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং পুত্রের মনের এই ভাবটি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ও উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়, সেদিকে জন লুথারের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিছুকাল পরে যখন তাঁদের সংসারে অর্থাভাব ঘটল, তখন দৈবক্রমে বালক লুথার এক সহৃদয়া নারীর দৃষ্টিপথে পড়েন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তাঁর ছাত্রজীবন নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হয়েছিল।

আঠারো বছর বয়সে লুথার এরফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন; সেখানে তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছানুসারে দর্শন ও আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন লুথার। জার্মান ভাষা ব্যতীত, তিনি ইংরেজী ও ল্যাটিন ভাষা অতি সুন্দররূপেই আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁকে জার্মান গদ্যের অন্যতম জনক বলা হয়েছে। ঐ বয়সেই লুথার বাঁশি বাজাতে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। কুড়ি বছর বয়সে লুথার স্নাতক হলেন দর্শনশাস্ত্রে এবং ঐ একই সময়ে তিনি

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর ছিল অদম্য জ্ঞানপিপাসা ; বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাকারে তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হতো। তাঁর জীবনে এই সময়টা স্মরণীয় হয়ে আছে একটি বিশেষ ঘটনার জন্য—যে ঘটনা তাঁর জীবনে সূচিত করেছিল একটি গভীর পরিবর্তন। ভবিষ্যতে বিধাতা-নির্দিষ্ট যে ভূমিকাটি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, তারই সুস্পষ্ট আভাস তিনি যেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন এই ঘটনাটির মধ্যে। একদিন গ্রন্থাগারে তিনি লাতিন ভাষায় লেখা একটি পবিত্র বাইবেলের সন্ধান পেলেন। গ্রন্থটি তিনি অধ্যয়ন করলেন খুব যত্নের সঙ্গে, আগ্রহের সঙ্গে। তখন তিনি এই সত্যটি উপলব্ধি করলেন যে, সারা বছর ধরে প্রতি রবিবার গীর্জার বেদী থেকে জনসাধারণের কাছে যেসব উপদেশ পঠিত হয় তার চেয়ে ঢের বেশি জিনিস আছে মূল বাইবেলের মধ্যে। অতঃপর তিনি এই সংকল্প গ্রহণ করলেন যে, তাঁর মাতৃভাষায় বাইবেলের অন্তর্নিহিত সম্পদ জনসাধারণের কাছে বিতরণ করবেন এবং তাদের চিত্তকে করবেন সর্বপ্রকার ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত। তেইশ বছর বয়সে লুথার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। সতর জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একদিন রাত্রিবেলায় তরুণ লুথার গৃহত্যাগ করলেন, সঙ্গে নিলেন শুধু ভার্জিল ও প্লুটার্কের বই। সোজা চলে গেলেন অগষ্টাইনদের কনভেন্ট। সেখানে তিনি সাদরে গৃহীত হলেন। পুত্রের এই সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ তাঁর পিতামাতাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত দিল। তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু লুথারকে তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করা যায় নি।

কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোরতা ও তাঁর প্রতি সন্ন্যাসীদের হীন আচরণ তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলল। সাধু আগস্তিনের স্মৃতিপূত আশ্রমের স্বরূপ দেখে লুথার স্তম্ভিত হলেন। কিছুকাল পরে তিনি আশ্রম-জীবন ত্যাগ করে নব-প্রতিষ্ঠিত উটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনার কর্ম গ্রহণ করলেন। তবে যে মহান উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তিনি সংসার ও স্বজন ত্যাগ করেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সমান ভাবেই তাঁর অন্তরে জাগ্রত ছিল। জার্মানীর ইতিহাসে যিনি জ্ঞানীপুরুষ বলে স্বীকৃত সেই ফ্রেডরিক এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানদের এখানে আহ্বান করেছিলেন। তাই যখন রাজকুমার ফ্রেডরিকের কাছ থেকে তিনি আমন্ত্রণ পেলেন তখন লুথার কালবিলম্ব না করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। এইভাবেই সেদিন ভবিষ্যতের সংস্কারকের জীবনে শুরু হয়েছিল একটি নূতন অধ্যায়। উটেনবার্গে এসে তিনি একটি কনভেন্টেই বাস করতে লাগলেন ও অধ্যাপনার কাজে মনোনিবেশ করলেন। তিনি তখন (১৫০৯) যাজকের কাজে স্নাতক হয়েছেন এবং এরই ফলে তিনি প্রকাশ্যে ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে বক্তৃতা

দেবার অধিকারও লাভ করেছিলেন। এই বক্তৃতাগুলি চিরাচরিত ধরনের বক্তৃতা ছিল না; তিনি এক নতুন ধরনের উপদেশ তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে পরিবেশন করতে থাকেন—খ্রীষ্টের বাণীর মর্মকথাকে তিনি এমন প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে লাগলেন যা শুনে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে নূতন আলোকরশ্মির সঞ্চার হতো এবং এরই মধ্যে আভাবিত হয়েছিল রোমান ক্যাথলিক ধর্মের সংস্কারের উপায়। অধ্যাপনা আর বক্তৃতা প্রদান, এই দুটো কাজই কিন্তু তিনি করতেন বিনা পারিশ্রমিকে।

১৫১১।

লুথার এলেন রোমে। তাঁর শৈশবের স্বপ্নের রোম, খ্রীষ্টান ধর্মের পবিত্র পীঠস্থান রোম। এখানে তিনি ধর্মের নির্মল ও উজ্জ্বল মূর্তি, মহামান্য পোপের অধীনস্থ সাধু-সন্তদের সংযম-শুদ্ধ আচরণ আর খ্রীষ্টধর্মের কঠোর বিধান অনুসারে যাপিত উন্নত ও পবিত্র জীবনধারা দেখতে পাবেন—এই আশা নিয়েই লুথার এসেছিলেন রোমে। রোমে এসে এখানকার ধর্মজীবনের যে পরিচয় তিনি পেলেন, পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভোগলিপ্সার যে কদর্য চিত্র তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, তাদের আচারে-আচরণে যে নৈতিক শৈথিল্য তিনি এখানে চাক্ষুষ করলেন, লুথার তার প্রতিবাদ না করে পারলেন না। পাপ করলে টাকা দিয়ে পাপমুক্ত হওয়া যায় এবং পোপ স্বয়ং উচ্চমূল্যে জনসাধারণের কাছে সেই পাপমুক্তির ফতোয়া বিক্রী করেন—এই ব্যবস্থা দেখে তিনি স্তম্ভিত হলেন। ধর্মের নামে এ যেন একটা ব্যবসা।

রোমান ক্যাথলিক ধর্মের অধঃপতন লুথারের জীবনের গতি নির্দেশ করে দিল। তিনি স্বদেশে ফিরে এসে শুরু করলেন এক প্রচণ্ড ধর্মসংস্কার আন্দোলন এবং রোমের গীর্জার বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করলেন বিদ্রোহ। এই বিরোধী আন্দোলনের গর্ভ থেকেই জন্ম নিয়েছিল প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম যার মূল ভিত্তি ছিল য়িহুদী ভাষায় লেখা মূল বাইবেল এবং খ্রীষ্টের বাণী। প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ সংস্কার সম্ভব নয় বুঝে, লুথার বর্জন করলেন খ্রীষ্টীয় ভজনালয় বা গীর্জা এবং স্বয়ং সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৫১৭, ১লা নভেম্বর, উটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর মার্টিন লুথার যখন জার্মানির একটি গীর্জার দ্বারপ্রান্তে তাঁর ঘোষণাপত্রটি সংলগ্ন করে দিলেন—ঐ ঘোষণাপত্রে তিনি কঠোর ভাষায় পোপ কর্তৃক পাপমুক্তি বিক্রয় করার কথা বর্ণনা করেছিলেন—তখনই য়ুরোপের সমগ্র খ্রীষ্টান জগতে এক তুমুল ঝটিকা দেখা দিয়েছিল। এক জলন্ত এবং প্রত্যয়দীপ্ত আধ্যাত্মিক চিন্তায় উদ্ভাসিত লুথারের সেই ঘোষণাপত্রটি সেদিন য়ুরোপের ধর্মজগতে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। মানুষের ধর্মজীবনের বনিয়াদ হলো বিশ্বাস—ঐকান্তিক বিশ্বাস। সেদিনকার য়ুরোপের ধর্মনৈতিক জীবনে এই বিশ্বাসেরই অবক্ষয় প্রকট হয়ে উঠেছিল।

দশম লিও তখন রোমের পোপ। তাঁর কাছে যখন লুথারের বিদ্রোহের সংবাদ পৌছল, তখন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে এক ফতোয়া জারি করে লুথারকে তাঁর এই উন্মত্ত আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতে বললেন। ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করে গীর্জার দ্বারে তিনি যে ঘোষণাপত্র সংলগ্ন করে দিয়েছিলেন, তা প্রত্যাহার করতে নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ অমান্য করলে তাঁকে ক্যাথলিক ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত করা হবে বলে জানিয়ে দিলেন। লুথার প্রকাশ্যে পোপের সেই হুকুমনামা অগ্নিদগ্ধ করলেন এবং বললেন, "Pope has no Divine right to excommunicate anyone." এই ঘটনার পর থেকেই সংস্কার আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠতে থাকে।

এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একা লুথার। তাঁর সমগ্রশক্তি তিনি নিয়োগ করেছিলেন একে সফল করবার জন্য। ১৫২৩ থেকে ১৫৪০— একাদিক্রমে সতের বৎসরকাল তিনি এই কর্মে ব্রতী থেকে য়ুরোপের একাংশে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের বিজয়পতাকা সগর্বে তুলে ধরেছিলেন। ১৫২৫ সালে তিনি ক্যাথেরিণ ভন বোরা নাম্নী এক ভিক্ষুণীকে (Nun) বিবাহ করেন। সংস্কার-আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি ওল্ড টেস্টামেণ্ট ও নিউ টেস্টামেণ্ট গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন; এছাড়া, তাঁর এই সময়কার রচিত অন্যান্য রচনাবলী রিফর্মেশন যুগের জার্মান সাহিত্যের চিরায়ত সম্পদরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। তাঁর 'Table-Talks' একটি বিখ্যাত ও বহু আলোচিত বই। ১৫৪৬, ১৮ই ফেব্রুয়ারি তেষট্টি বছর বয়সে লুথারের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে বিশ্বাস নিয়ে তিনি সংগ্রাম করেছেন, তাঁর প্রতি তাঁর আস্থা আছে কিনা, তখন তার উত্তরে লুথার শুধু বলেছিলেন 'হাঁ'। এই ছিল য়ুরোপের সংস্কার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়কের উচ্চারিত শেষ কথা।

জার্মান তথা য়ুরোপের মানসকে ধর্মীয় কুসংস্কার ও পুরোহিততন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত করে দিয়ে লুথার প্রকৃতপক্ষে একটি নবযুগ এনে দিয়েছিলেন। সেদিন খ্রীষ্টান জগতের পক্ষে এর প্রয়োজন ছিল।

ফ্রান্সিস বেকন

(১৫৬১—১৬২৬)

ফ্রান্সিস বেকনের প্রভাব আজো পৃথিবীর মানুষের ওপর সমানভাবেই রয়ে গেছে। কারণ, তাঁর বই, তাঁর রচনাবলী যুগ যুগ ধরে চিন্তাশীলদের চিন্তার খোরাক জুগিয়ে আসছে। তাঁর মস্তিষ্কটাই ছিল অসাধারণ—তেমন মস্তিষ্ক নিয়ে খুব কম লোকই আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেছে। সেই মস্তিষ্কের সাহায্যেই তো তিনি আধুনিককালের পৃথিবীর জন্য একটি নূতন দর্শন সৃষ্টি করে গিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপায়, পরীক্ষা লব্ধ ফল থেকে বিচার-বিবেচনা—এসবই তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবেই আভাসিত হয়েছে। মধ্যযুগের অন্ধকার আর বিপর্যয়ের মধ্য থেকে আজকের এই পৃথিবীকে তিনিই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃতিবোধের পরিচয় এমন বিস্ময়কর ও ব্যাপক ছিল যে, অনেক সমালোচক এলিজাবেথীয় যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রচয়িতা হিসাবে বেকনকেই সাব্যস্ত করেছেন।

ধনীর গৃহে তাঁর জন্ম হয়েছিল। পিতা স্যার নিকোলাসের লণ্ডনের বাসভবনে ১৫৬১ সালের ২২ জানুয়ারি ফ্রান্সিসের জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তাঁর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না এবং এই জন্য বয়োপ্রাপ্ত হয়েও তিনি বাইরের কঠিন খেলাধূলায় আদৌ অংশ গ্রহণ করতে পারতেন না। ছোটখাটো মানুষটি হাঁটতেন গম্ভীর চালে, দেখলেই মনে হতো তিনি যেন গভীর চিন্তামগ্ন।

তাঁর বয়স যখন তেরো বছর তখন বেকনকে কেমব্রিজে ভর্তি করে দেওয়া হলো। যে তিন বছর তিনি ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন তখন মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ শিক্ষাধারা সম্পর্কে তিনি প্রচণ্ড ঘৃণার ভাব পোষণ করতে থাকেন। আরম্ভ হয় বেকনের মানসজগতে এক নিদারুণ বিপ্লব। তখন থেকেই চিন্তায় বিপ্লব-বিষয়ক দার্শনিক গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি পরিকল্পনা করতে থাকেন। উত্তরকালে এই গ্রন্থ তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র কূটনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয়, এবং সেই উদ্দেশ্যে স্যর নিকোলাস ১৫৭৬ সালে বেকনকে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যর আমিয়াস পলেটের তত্ত্বাবধানে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিলেন। তিন বছর পরে, পিতার মৃত্যুতে বেকনকে দ্রুত ইংলণ্ডে ফিরে আসতে হলো। তখন তাঁর সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল জীবিকা অর্জন। আইন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন তিনি, গ্রে'জ ইন্-এ প্রবিষ্ট হলেন, কঠিন পরিশ্রম করতে লাগলেন এবং যথাসময়ে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৫৮৪ সালে তিনি ডরসেটশ্যায়ার থেকে নির্বাচিত হয়ে সদস্যরূপে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তেইশ বছরের যুবক মাত্র।

কিন্তু প্রভাব ব্যতিরেকে রাজনীতি নিষ্ফল, এবং বেকন সেটা বিলক্ষণ জানতেন। তাঁর এক খুল্লতাত ছিলেন রাণীর একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী; বেকন তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হলেন, কিন্তু তাঁর নিজেরই একটি ছেলে ছিল। তাই বেকনের আবেদন নিষ্ফল হলো।

এসেক্সের আর্ল ছিলেন রাণী এলিজাবেথের খুব প্রিয়। বেকন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। ১৫৯১ সালের শেষভাগে তিনি আর্লের বিশিষ্ট পরামর্শদাতা হলেন। ক্রমে উৎসাহী, উগ্র প্রকৃতির আর্লের সঙ্গে হিসাবী এবং ঠাণ্ডা মেজাজের বেকনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হলো। ১৫৯৩ সালে যখন মহাসভার অধিবেশন বসল তখন দেখা গেল মিডল্‌সেক্সের সদস্য হিসাবে বেকন তাঁর আসন গ্রহণ করেছেন। সদস্য হিসাবে তিনি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ব্যাপারে দ্বিগুণ অর্থ সাহায্যের জন্য যথোপযুক্ত কর আদায়ের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব নিয়ে এলেন। যদিও বেকনের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ছিল সাধু, তথাপি এই প্রস্তাবে রাণী বিরক্ত হলেন এবং কিছুকালের জন্য তাঁর দরবারে আসা বন্ধ হলো।

অ্যাটর্নি জেনারেলের পদটি খালি হলো; আর্ল আপ্রাণ চেষ্টা করলেন যাতে করে ঐ দায়িত্বপূর্ণ পদটিতে বেকন নিযুক্ত হন। কিন্তু তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ আইনজীবী এডওয়ার্ড কোককে রাণী ঐ পদে নিযুক্ত করলেন। তারপর বন্ধুর জন্য তিনি আবার চেষ্টা করলেন যাতে বেকন সলিসিটর জেনারেলের পদটি লাভ করেন, কিন্তু এবারও বেকনকে অগ্রাহ্য করা হলো। তারপর এলো আর্ল ও হাওয়ার্ড এর নেতৃত্বে কাডিজ অভিযান। সাফল্যমণ্ডিত এই অভিযান এসেক্সের আর্লকে জনপ্রিয়তার শিখরে তুলে দিয়েছিল—তিনি যেন সকলের 'idol' হয়ে উঠলেন। দূরদর্শী বেকন আশংকা করলেন যে, ঈর্ষাকাতর রাণীর চক্ষে এই জনপ্রিয়তা আর্লের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। তাই তিনি একটি চিঠিতে আর্লকে সাবধান করে লিখে পাঠালেন যে, তিনি যেন রাণীর সঙ্গে আরো নিবিড় বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। আর্ল কিন্তু এই উপদেশ গ্রাহ্য করলেন না, এবং এর অল্প কয়েক বছর পরেই তাঁর পতন হলো। তাঁকে আয়ার্ল্যাণ্ডে পাঠানো হলো লর্ড ডেপুটি করে; তিনি অকৃতকার্য হলেন। শুধু তাই নয়; রাণীর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁকে সংশ্লিষ্ট করা হলো। তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হলেন; তাঁর বিচার হলো। আর্লের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন বেকন ও কোক।

তাঁর প্রতি আর্ল যে রকম সদয় ব্যবহার করেছিলেন, সে কথা বিস্মৃত হয়ে বেকন কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করলেন না। বন্ধুর পক্ষ সমর্থনের পরিবর্তে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেছিলেন যার ফলে আর্ল অভিযুক্ত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। এজন্য বেকনই দায়ী ছিলেন। পরে রাণীর নির্দেশে আর্লের দুষ্কর্মের তালিকা প্রস্তুত করে তিনি একটি পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন। ১৬০১। আর্লের ফাঁসী হলো। তিন বছর পরে বেকন প্রকাশ করলেন 'আর্ল অব

এসেক্স-এর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে 'আমার বক্তব্যের সমর্থন' (Apology in certain Imputations concerning Earl of Essex)। এই পুস্তিকায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে, তিনি লিখেছিলেন—'এই ব্যাপারে আমি যা কিছু করে থাকি না কেন, তা রাষ্ট্র ও রাণীর প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্য প্রণোদিত হয়েই করেছি এবং কারো জীবিত থাকার অজুহাতে আমি কিছুমাত্র হৃদয়-দৌর্বল্য বা মিথ্যাচরণ করিনি।' কিন্তু সিংহাসনের প্রতি বেকনের কর্তব্য ও আনুগত্য সম্পর্কে তাঁর এই উক্তি তাঁর সমসাময়িকদের অনেকেই অগ্রাহ্য করেছিলেন।

রাণী এলিজাবেথ ১৬০৩ সালে মারা গেলেন। ইংলণ্ডের সিংহাসনে তখন আরোহণ করলেন প্রথম জেমস। বেকন দেখলেন এই সুযোগ। সুযোগ জেমসই করে দিলেন। তখন থেকেই সৌভাগ্য ও ক্ষমতার সোপানে সোপানে তিনি আরোহণ করতে থাকেন। লাভ করতে লাগলেন খেতাবের পর খেতাব। ১৬১৩ সালে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেলের পদে নিযুক্ত হলেন; চার বছর পরে লাভ করলেন 'Keeper of the Great Seal'-এর পদ; ১৬১৮তে হলেন লর্ড চ্যান্সেলার ও ভেরুলামের ব্যারণ; ১৬২১ সালে তিনি হলেন আলবানস-এর ভাই কাউন্ট। এই সময়ে একটি ঘটনার ফলে বিপর্যয় আসে তাঁর জীবনে। ঘটনাটি তাঁরই চরিত্রের নৈতিক দুর্বলতার পরিচায়ক। তাঁর জীবনীকারগণ এটিকে পিচ্‌হ্যাম ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। পিচ্‌হ্যাম নামে একজন রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত বয়স্ক গোঁড়া ধর্মযাজক ছিলেন। রাজাদেশে ঠিক হলো তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী প্রমাণ করার কাজে সুদক্ষ ছিলেন বেকন; তিনি এই কাজ করতে স্বীকৃত হলেন। পিচহ্যামের বিচারকে উপলক্ষ্য করে উন্নতির সোপান থেকে বেকনের পতন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিয়োগান্ত ঘটনা। বেকনের অপমানের সীমা-পরিসীমা রইল না। আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর নীচতাই প্রকাশ পেলো।

একটি বিষয় কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বেকন যখন সোপানে সোপানে কৃতকার্যতার শিখরে আরোহণ করেছিলেন তখন তিনি জ্ঞানের অনুশীলন ও বুদ্ধির চর্চা থেকে বিরত ছিলেন না। নতুন শতাব্দীর সূচনা থেকেই তিনি প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করতে থাকেন এবং ১৬০৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ 'Proficience and Advancement of Learning'; তৎকালীন প্রচলিত বিদ্যা বা জ্ঞান সম্পর্কে একটা ব্যাপক সমীক্ষা আছে এই বইটিতে এবং তাঁর যুগের যাবতীয় অসঙ্গতি ও ভ্রান্তি সম্পর্কেও তিনি চিন্তাগর্ভ সমালোচনা রেখেছেন এখানে। ১৬২০ সালে প্রকাশিত হলো বেকনের পরিণত প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান 'Novum Organum or New Logic'; এই বইটিতে দর্শন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। বস্তুত য়ুরোপীয় চিন্তা-জগতে যুগান্তর এনে দিয়েছিল বেকনের 'নিউ লজিক'।

খ্যাতির সঙ্গে পৃথিবীর ঈর্ষাও এই মানুষটির শিরে বর্ষিত হয়েছিল। বস্তুত

বেকন ছিলেন একাধারে খ্যাতিমান ও বহুনিন্দিত মানুষ, এবং সম্ভবত এই জন্য বেকনের মনে শান্তি ছিল না। এর কারণও অবশ্য ছিল—প্রতিনিয়ত তিনি বিবেকের দংশন অনুভব করতেন। ভীষণ অমিতব্যয়ী ছিলেন তিনি—এই ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিরথ ছিলেন বললেই হয়। তাঁর জাঁক-জমক ও আড়ম্বর-প্রীতি প্রসিদ্ধ ছিল এবং এর নিদর্শন দেখা গিয়েছিল বেকনের বিয়ের সময়। ১৬০৬ সালে জনৈক অল্ডারম্যানের প্রিয়দর্শিনী কন্যা এলাইস বার্ণহামের সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

১৬২১। ইংরেজী নববর্ষে সম্রাট বেকনকে সম্মানিত করলেন, তাঁকে ভাই-কাউন্ট করে। অদৃষ্টের পরিহাসে এর পাঁচ মাস পরেই বেকনের ভাগ্যচক্র ঘুরে গেল। সে মানুষ আর নেই, এখন তিনি অতীতের ভগ্নাবশেষ বললেই হয়—লণ্ডন টাওয়ারে তিনি এখন বন্দীজীবন-যাপন করছেন। নৈতিক দুর্বলতাই ছিল তাঁর এই শোচনীয় পতনের কারণ—সরকারী উচ্চ পদের সুযোগে তিনি উৎকোচ গ্রহণ করতেন—এই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। এই অভিযোগের জন্য হাউস অব লর্ডসের সম্মুখে তাঁর বিচার হয়। বেকন তাঁর দোষ স্বীকার করলেন ও দয়া ভিক্ষা করলেন। বিচারে বেকনের চল্লিশ হাজার পাউণ্ড জরিমানা হয় ও টাওয়ারে নির্বাসন। মহাসভা ও রাজদরবারের দরজা বেকনের জন্য চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল—উচ্চপদ লাভের পথও রুদ্ধ হয়ে গেল। তাঁর বন্দী-জীবনের মেয়াদ ছিল মাত্র চারদিন; তারপর তিনি দেশের বাড়ীতে চলে যান। তাঁর অবশিষ্ট জীবন ছিল দারিদ্র্যের জীবন এবং সেই একই সঙ্গে নব নব জ্ঞানের পথে ছিল বেকনের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। 'অ্যাডভান্সমেণ্ট অব লার্নিং' বইটি লাতিন ভাষায় অনুবাদ করলেন; প্রবন্ধাবলীর একটা নতুন সংস্করণ প্রকাশ করলেন এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণগুলি একত্র করে লিখলেন 'Sylva Sylvarum' এবং সব শেষে বেকন জগৎকে উপহার দিলেন 'New Atlantis' নামক একটি মৌলিক চিন্তাগর্ভ বই। একজন 'Experimental Philosopher'—উত্তরকালের মানুষের কাছে বেকনের পরিচয় রয়ে গেছে এই ভাবে। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ নিন্দনীয় ছিল সত্য, কিন্তু তাঁর সময়ে তিনিই ছিলেন একজন চিন্তানায়ক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তক; অনুমান ও অনুসন্ধিৎসার পুরোধা ছিলেন তিনি। বেকনের চিন্তার মধ্যেই য়ুরোপীয় নবজাগরণ সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল।

উইলিয়াম শেক্সপীয়র

(১৫৬৪—১৬১৬)

"Shakespeare was a freak of Nature—a demigod born out of the race of men. No critic as yes has been able to probe to the depth's of Shakespeare's mind." শেক্সপীয়র সম্পর্কে সমালোচকের এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাঁর প্রতিভা বিশ্বের একটি চিরন্তন বিস্ময় হয়ে আছে। পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের মধ্যে এই প্রতিভা হচ্ছে একটি কঠিনতম বিষয়। সেইজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, শেক্সপীয়রকে অনুধাবন করা মানেই সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি করা। কবি-প্রকৃতি সম্পর্কে আজ পর্যন্ত বহু বিচার বিতর্ক হয়ে গেছে এবং সেসব বিচার-বিতর্কের সার কথা এই যে জীবনের সঙ্গে গভীর যোগ ব্যতিরেকে কোনো কবি-প্রতিভা সার্থক হয় না। শেক্সপীয়রের মধ্যে আমরা এই জিনিসটি পরিপূর্ণভাবে পাই, তাই তিনি শুধু মহৎ কবিই নন, আন্তর্জাতিক আবেদনের দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ আর কোনো লেখক আছেন কিনা সন্দেহ। এইজন্যই তিনি সব যুগের সব দেশের পাঠকের কাছে সমানভাবে বরণীয়।

পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ যেমন ইংরেজদের ধর্মের প্রতীক, শেক্সপীয়র তেমনি তাঁদের সংস্কৃতির প্রতীক। তাই একখানি বাইবেল আর এক গ্রন্থ শেক্সপীয়রের রচনাবলী ব্যাতিরেকে কোন ইংরেজের গৃহ ঠিকমতো সজ্জিত বলে গণ্য হয় না। এই সম্মান ওরা আর কোন লেখককে দেয়নি এবং আজ পর্যন্ত শেক্সপীয়রের রচনা নিয়ে যত আলোচনা সমালোচনা গ্রন্থ লেখা হয়েছে ও তাঁর সম্পর্কে যত জীবনী রচিত হয়েছে, য়ুরোপের আর কোন লেখক এই মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি। তাঁর প্রতিভার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের উপর আজো পূর্ণচ্ছেদ পড়েনি, আজো তাঁর সম্পর্কে কেউ শেষ কথা বলতে পারেন নি। আমি শেক্সপীয়রকে বুঝেছি—'এই সাড়ে তিন শো বছরে একথা কারো পক্ষেই বলা সম্ভব হয়নি। তিনি নিঃসন্দেহে 'demigod', এবং সেইজন্যই বোধ হয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বিশিষ্ট সমালোচক মরিস মর্গান শেক্সপীয়র সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে। "It is safer to say that we are possessed by him that we possess him' ইংলণ্ডের কবি আজ সত্য সত্যই পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির মানস সত্তার সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবেই মিশে আছেন।

য়ুরোপে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণেই শেক্সপীয়রের জন্ম। য়ুরোপের মানসলোক থেকে তখনো মধ্যযুগের অন্ধকার একেবারে মিলিয়ে

যায়নি যখন ইংলণ্ডের ওয়ারইক্‌শায়ারের অন্তর্গত এভন্‌-নদীর তীরে স্ট্রাট্‌ফোর্ড শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের তৃতীয় সন্তানরূপে উইলিয়াম শেক্সপীয়রের জন্ম হয়। স্ট্রাট্‌ফোর্ডের হোলি ট্রিনিটি চার্চে ১৫৬৪ সনের ২৬শে এপ্রিল তারিখে এই জন্মের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। পিতা জন্‌ শেক্সপীয়র ও মাতা মেরি আর্ডেনের তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র। জন শুধু বিচক্ষণ ব্যবসায়ীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্ট্রাট্‌ফোর্ডের একজন বিশিষ্ট নাগরিক। শেক্সপীয়রের মা মেরি এসেছিলেন আর্ডেন পরিবার থেকে। তাঁর As You Like It নাটকে শেক্সপীয়র এই আর্ডেন নামকে অমর করে রেখে গেছেন।

স্ট্রাট্‌ফোর্ডের স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন। লাতিন ভাষা তিনি নিশ্চয়ই মোটামুটি শিখেছিলেন, তবে গ্রীক বোধ হয় বিশেষ শিখতে পারেন নি। ১৫৭৭ সনের কাছাকাছি তাঁর পিতা আর্থিক অসুবিধায় পড়েন। কথিত আছে যে, শেক্সপীয়রকে বাধ্য হয়ে স্কুলের পাঠ এই সময় বন্ধ করতে হয় যাতে তিনি পিতার ব্যবসায়ে যোগ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। ১৫৮২ সনে আঠার বছর বয়সে তিনি অ্যান্‌ হ্যাথওয়েকে বিবাহ করেন। তাঁর জীবনীকারদের মতে অ্যান্‌ পার্শ্ববর্তী শটারিগ্রামের রিচার্ড হ্যাথাওয়ের কন্যা। স্বামীর চেয়ে ন'বছরের বড়ো ছিলেন অ্যান্‌।

১৫৮৪ থেকে ১৫৯২—এই আট বছর কাল পর্যন্ত শেক্সপীয়রের জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনা জানা যায় না। ১৫৯২ সনে তিনি লণ্ডনে এসেছিলেন জানা যায়। জীবনের বহু বিচিত্র দিনের অভিজ্ঞতার পরিচয় আমরা শেক্সপীয়রের নাটকে পাই। সেইসব অভিজ্ঞতা তিনি এই কয় বছরে আহরণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সমসাময়িক যেসব নাট্যকার এই সময় নাটক লিখছিলেন (মার্লো প্রভৃতি), শেক্সপীয়র ক্রমশ তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। ১৫৯২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে নাট্যকার গ্রীণের মৃত্যুশয্যা থেকে লেখা এক চিঠি থেকে এ খবর আমরা জানতে পারি। প্লেগ-রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য যে সময় রঙ্গালয় বন্ধ থাকে সেই সময় শেক্সপীয়র তাঁর কাব্য রচনা করেন, ১৫৯৩ সনে **Venus and Adonis** ও ১৫৯৪ সনে **The Rape of Lucrece** এবং সেই দুটি কাব্যই তিনি সাদাম্পটনের আর্লকে উৎসর্গ করেন। এই দুটি কাব্য রচনা করে তিনি কবি-খ্যাতিও অর্জন করেন।

একত্রিশ বছর বয়সে শেক্সপীয়রকে আমরা সর্বপ্রথম চেম্বারলিনের অভিনেতৃ-দলের অংশীদাররূপে দেখতে পাই। এর চার বছর পরে অর্থাৎ ১৫৯৯ সনের পর তাঁর অধিকাংশ নাটকই গ্লোব রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ১৫৯৫ থেকে ১৬০০ সনের মধ্যে শেক্সপীয়র তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলী (sonnets) রচনা করেন। তবে ১৬০৯ সনের পূর্বে এগুলি মুদ্রিত হয়নি। এই কবিতাবলীর মধ্যে আভাসিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত সনেটগুলি সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত এই যে—"They represent a unique combination of inspired

linguistic wit and depth of pasionate feeling." তাঁর সনেটের অন্তর্নিহিত কবিত্ব-সৌন্দর্য যেমন অপূর্ব, তেমনি এর ভাব ও ভাষা। তিনি যে গতানুগতিক কবি ছিলেন না তার অভ্রান্ত প্রমাণ বহন করেছে এই সনেটগুলি। শেক্সপীয়রের সনেট তাই ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

১৫৯৬ সনে শেক্সপীয়র পরিবারের কুল-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাঁরা নিজস্ব প্রাবরণ-চিহ্ন (coat-of-arms) লাভ করেন। এর পরের বছর শেক্সপীয়র New place নামে একটি বাগান-বাড়ি কেনেন। কিন্তু ১৫৯৭, ১৫৯৯, ও ১৬০৪ সনে তাঁকে লণ্ডনে থাকতে দেখা যায়। শেক্সপীয়র নিজেও মাঝে মাঝে অভিনয় করেছেন, প্রধানত ১৫৯৮ সনের পূর্বে। কথিত আছে, তিনি যেসব ভূমিকায় অভিনয় করতেন তার মধ্যে 'য়্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকের ভৃত্য 'এ্যাডাম'-এর চরিত্র অন্যতম। ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী প্রথম এলিজাবেথ তাঁর অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একবার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে সম্মানিত করেছিলেন বলে জানা যায়। এর আগে ইংলণ্ডের আর কোনো অভিনেতার ভাগ্যে এই রকম সম্মাননা ঘটেনি। ১৬১৫ সনের কাছাকাছি তিনি স্ট্রাট্‌ফোর্ডে ফিরে আসেন। ১৬১৩ সনের পরে বোধ হয় তিনি আর কিছু লেখেন নি। ১৬১৬ সনের ২৩শে এপ্রিল শেক্সপীয়রের মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধির উপর এই কয়েকটি পঙক্তি উৎকীর্ণ আছে :

> Good friend, for Jesus' sake forbear
> To dig the dust enclosed here ;
> Blest be the man that spares there stones,
> And curst be the that moves my bones.

অনেকের অনুমান এই লাইন কয়টি মহাকবিরই নিজের রচনা। শেক্সপীয়রের মৃত্যুর সঙ্গেই তাঁর বংশ লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি বেঁচে রইলেন তাঁর অনুপম নাট্যসৃষ্টির মধ্যে। শুধু বেঁচে থাকা নয়, বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিত করে মানুষের মনে পেয়েছেন শাশ্বত স্থান।

জীবনের বিভিন্ন পর্বে শেক্সপীয়রের বিশ্বজয়ী প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল। এই বিকাশের ইতিহাসই তাঁর জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। কালানুক্রমিক ভাবে বিচার করলে তাঁর নাটকগুলির রচনাকালকে চারটি যুগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম যুগের পরিধি হলো ১৫৮৮ থেকে ১৫৯৫ সনের কাছাকাছি। এযুগের নাটকগুলি হলো ঐতিহাসিক নাটক, কমেডি ও ট্রাজেডি। ১৫৯৫ থেকে ১৬০১ পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ। বিখ্যাত কমেডিগুলি ও ফলস্টাফের ভূমিকা-সংবলিত ঐতিহাসিক নাটক দুটি এই যুগের রচনা। এ যুগের নাটকগুলির মধ্যে ট্র্যাজেডি নেই। তৃতীয় যুগে (১৬০১—১৬০৮) রচিত হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ চারখানি ট্র্যাজেডি—হ্যামলেট, ওথেলো, কিং লীয়র ও ম্যাকবেথ এবং তিনখানি কমেডি। শেষ বা রোমাণ্টিক যুগ হচ্ছে ১৬০৮ থেকে ১৬১২, এই চার বছর।

এই পর্বের শ্রেষ্ঠ নাটক 'দি টেমপেস্ট'। এই নাটকেই আমরা দার্শনিক শেক্সপীয়রের সাক্ষাৎ পাই। এই নাটকের প্রোসপেরো চরিত্রটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি এবং এই চরিত্রটির মধ্যে আমরা শেক্সপীয়রকেই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।

We are such staft
As dreams are made of, and all our little life
Is rounded with a sleep.

প্রোসপেরোর এই কথা শেক্সপীয়রেরই নিজের কথা।

শেক্সপীয়রের নাটক থেকেই ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে নূতন যুগ এলো এবং এলিজাবেথীয় যুগের রঙ্গমঞ্চ তখন থেকেই এক নূতন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়ে উঠতে থাকে সকল দিক দিয়ে—কি অভিনয়ে, কি পরিচালনা নীতির দিক দিয়ে। তাঁর নাটকের রূপকল্প পরবর্তিকালের মঞ্চকে অপরূপ করে তুলেছে। রূপকল্প সৃষ্টিতে তিনি আজো অপরাজের নাট্যকার হয়ে আছেন। সম্ভবত এই কারণেই শেক্সপীয়রের নাট্যকলার ব্যাখ্যা তাঁর যুগের উপলব্ধির বৃত্তে সীমিত করা চলে না। একমাত্র তাঁর নাটকেই অভিনয় করে ইংলণ্ডের একাধিক অভিনেতা জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর নাট্যপ্রতিভা ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চকে নানাভাবে পুনরুজ্জীবিত করে দিয়ে গেছে, তাঁর নাট্যসৃষ্টি ইংরেজী সাহিত্যকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দুর্লভ গৌরব এনে দিয়েছে। অন্তরলোকের অপূর্ব শিল্পী শেক্সপীয়র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য :

'তারপর ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছে দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে ;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্র দেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া।'

অলিভার ক্রমওয়েল

(১৫৯৯-১৬৫৮)

ক্রমওয়েল। এই নামটি উচ্চারণ করলেই আমাদের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে একজন সরল গ্রাম্য ভদ্রলোকের ছবি যিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, যুদ্ধে নির্দয়, সংগঠনে কুশল এবং রণক্ষেত্রে অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে দক্ষ—যাঁর নেতৃত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতকের সেই স্মরণীয় যুদ্ধে যা সংঘটিত হয়েছিল রাজা এবং মহাসভার মধ্যে। মুখে বাইবেলের বাণী আর হাতে তরবারি নিয়ে তিনি তাঁর পক্ষাবলম্বীদের জয়ের পথে পরিচালিত করেছিলেন এবং পরে তিনি নিজেকে অধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কঠিনতম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি এবং এক সময়ে তিনিই ছিলেন ইংলণ্ডের ভাগ্যনিয়ন্তা। তাঁরই আদেশে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল।

ক্রমওয়েল প্রতিভাবান ছিলেন না, কিন্তু তিনি একজন উচ্চপদস্থ এবং প্রকৃত যশস্বী ব্যক্তি ছিলেন। ইতিহাসের তিনি একটি বিস্ময়কর চরিত্র। ইতিহাস-বিধাতা স্বয়ং তাঁর ললাটে জয়ের তিলক এঁকে দিয়েছিলেন। বহু বিপরীত-গুণের সমাবেশে গঠিত ছিল এই চরিত্র। একদিকে তিনি ছিলেন যেমন ধর্ম-পরায়ণ ও সহৃদয় প্রকৃতির মানুষ, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন নির্দয়, নির্মম ও কঠোর কর্তব্যপরায়ণ; যুগপৎ বিষণ্ণ ও প্রফুল্ল; সংগীতপ্রিয় ও কৌতুকপ্রিয়। তাঁর ধর্মবোধের ভিত্তি ছিল ওল্ড টেস্টামেণ্ট। দক্ষ সৈনিক, উত্তম বন্ধু ও নির্দয় শত্রু। করুণার সঙ্গে তিনি যেমন বিচারকার্য সমাধা করতে পারতেন, তেমনি নির্দয় নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে পারতেন। বিপরীত অথবা পরস্পরবিরুদ্ধ আচরণের একটি প্রতিমূর্তি—এই মানুষই ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর অন্তিমলগ্নে (এপ্রিল ২৫, ১৫৯৯) হানটিংডনে জন্মেছিলেন অলিভার ক্রমওয়েল। অলিভারের সত্যিকার নাম ক্রমওয়েল ছিল না। ছিল উইলিয়ামস—অলিভার উইলিয়ামস। ক্রমওয়েলের জীবনের প্রথম দিকের বিবরণ বিশেষ কিছু জানা যায় না। হানটিংডনে অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর স্কুল-জীবন; পরে তিনি প্রবিষ্ট হন কেমব্রিজের সিডনী সাসেক্স কলেজে। পুস্তক পাঠ করে জ্ঞানলাভ হয়, এটা তিনি খুব বেশি মানতেন না, যদিও তাঁর যৌবনকালে তিনি একজন উত্তম পড়ুয়া হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বই অপেক্ষা মানুষের চরিত্র অধ্যয়ন করে তিনি অনেক কিছু শিক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর সেই শিক্ষা উত্তরকালে খুবই কাজে এসেছিল। কুড়ি বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই তিনি অনেক

রকম আকাশকুসুম দেখেছিলেন। বিয়ের আগে পর্যন্ত তাঁর জীবনকাহিনীর অনেকটাই কল্পনার বিষয় হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে আশ্চর্য চরিত্রের এই মানুষটির জীবন আরম্ভ হয়েছিল যখন তিনি জীবনের মধ্য বয়সে উপনীত হয়েছিলেন।

১৬২৮। ক্রমওয়েল তখন আটাশ বছরের যুবক। হান্টিংডনের অধিবাসীবৃন্দের ইচ্ছানুসারে সেইখান থেকে পার্লামেন্টের নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ালেন তিনি। তখন থেকেই সর্বসাধারণের জন্য শুরু হয় তাঁর জীবন যাকে ইংরেজিতে আমরা 'public life' বলে থাকি। এর তিন বছর আগে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন প্রথম চার্লস এবং, তখন থেকে দু'বার নির্বাচন হয়ে গেছে। সম্রাটের আদেশে দু'দুবারই পার্লামেন্ট বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। এইবার তৃতীয় নির্বাচন হলো। এবারের পার্লামেন্টে সদস্য হয়ে এলেন যুবক ক্রমওয়েল। পাঁচ মাসের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে পার্লামেন্টের দু'বার বৈঠক বসেছিল (সেই বৈঠক দুটি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ছিল) এবং সম্রাটের সঙ্গে সদস্যদের প্রাথমিক সংঘর্ষের পর, পার্লামেন্ট বাতিল করে দেওয়া হয়। পার্লামেন্টে যখন বিতর্কের ঝড় উঠত তখন ক্রমওয়েলকে অধিকাংশ সময় চুপ করে বসে থাকতে দেখা যেত। বিতর্কে তিনি খুব কম অংশ গ্রহণ করতেন। ভাবনাতেও তাঁর মনের গতি ছিল খুবই মন্থর।

এরপর একটানা এগার বছর যাবৎ মহাসভার কোন অধিবেশন বসেনি। তাঁর নিজস্ব কেন্দ্রের জনগণের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল অলিভারের কর্মহীন জীবন। এর মধ্যে তাঁকে একবার প্রিভি কাউন্সিলের সামনে হাজির হতে হয়েছিল আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারি হয়। তিনি প্রিভিকাউন্সিলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ব্যাপারটা সেখানেই মিটে যায়। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁকে এর চেয়েও কঠিন ও কর্কশ বক্তৃতা দিতে হয়েছিল, কিন্তু সেজন্য তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়নি।

মহাসভার স্বল্পমেয়াদী অধিবেশন এলো, চলে গেল। কেমব্রিজ থেকে তিনি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু পার্লামেন্টের বিবরণীতে তাঁর নামের উল্লেখ নেই। তেইশ দিন অধিবেশন চলার পর, চার্লস এই চতুর্থ পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন। ১৬৪০, নভেম্বর ৩। মহাসভার স্মরণীয় পঞ্চম অধিবেশন বসল। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের ইতিহাসে এরই নাম 'Long Parliament' এবং এই অধিবেশনেও সদস্যরূপে তিনি তাঁর স্থান গ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশের কাছাকাছি—পিউরিট্যানদের নেতা তিনি। তাঁর শান্তিপূর্ণ জীবন এইবার শেষ হয়ে এলো। মহাসভার এই অধিবেশনে ক্রমওয়েল একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সকলেই নিবিষ্টচিত্তে আর উৎকর্ণ হয়ে শুনেছিল সেই বক্তৃতা। সভাগৃহ নিস্তব্ধ ছিল তাঁর ভাষণের সময়।'

'I belive that I am in direct communion with God, that my steps are guided by the Divine hand. চার্লসের পঞ্চম পার্লামেন্টে

প্রবক্তা ক্রমওয়েলের মর্মস্পর্শী বক্তৃতার মধ্যে এই উক্তিটি বিশেষভাবেই স্মরণীয় হয়ে আছে ইংলণ্ডের সংগ্রামের ইতিহাসে। ইতিপূর্বে আর কোন সংসদের মুখে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা এসব কথা শোনেন নি। এ প্রতিশ্রুতির বলেই তাঁর চরিত্রের কাঠিন্য যেন অনমনীয় ইস্পাতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ১৬৪১। গৃহযুদ্ধের রক্ত চাপা পড়ে প্রথম প্রথম সঞ্চারিত হতে থাকে। ক্রমওয়েল ও তাঁর অনুগামী পিউরিটানরা সম্রাট ও রাজের বিরুদ্ধে একজোট হলেন এবং নভেম্বর মাসে গৃহীত হল সেই স্মরণীয় প্রস্তাব—পরিচিত প্রস্তাব যা পার্লামেন্টের ইতিহাসে 'Grand Remonstrance' নামে অভিহিত হয়ে আছে। এটি শুধু প্রস্তাব ছিল না, পরন্তু এটা ছিল সেটি ম্যানিফেস্টো বা রাজার উদ্দেশে প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র। রাজার দুষ্কর্মের ফিরিস্তি এবং দুঃশাসনের উল্লেখ ও তার সম্বলিত এই ম্যানিফেস্টো জনসাধারণের মনে দেশপ্রেম চেতনা উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। এটি ছিল সংসদের রাজার প্রতি যুদ্ধের আহ্বান।

গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। দু'বছর চলেছিল এই যুদ্ধ এবং যুদ্ধের পরিণামে এসেছিল অনাহার, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ও দুঃখকষ্ট। প্রথম শুরু হয়েছিল সামান্য যুদ্ধ নিয়ে, কিন্তু পরে এমন দেখা গেল রাজকীয় বাহিনী ও সংসদের বাহিনী, সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে চলল পরস্পরের সঙ্গে এবং সেই উন্মত্ত পরিবেশে ক্রমওয়েল একজন সৈনিক হিসাবে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সবাইকে বিস্মিত করলেন—একজন অভিজ্ঞ সেনাপতির মতোই তিনি সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। তখনকার দিনে যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করত অশ্বারোহী সৈন্যের ওপর, পদাতিক বাহিনীর ওপর নয়। অশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনা করেই তিনি সেদিন খ্যাতিলাভ করেছিলেন। প্রধানত চাষী ও ক্ষেতখামারের লোক নিয়ে গঠিত হয়েছিল তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী। বিশ্বস্ত ও ধর্মপরায়ণ লোক তিনি নির্বাচন করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সৈন্যদের কণ্ঠে শোনা যেত ধর্মসংগীত আর সুদীর্ঘ ধর্মোপদেশ। ক্রমওয়েল জানতেন কেমন করে এদের পরিচালনা করতে হয়, তাঁর কথায় তারা আস্থা রাখত। এদের নিয়েই তিনি তৈরি করেছিলেন একটি সুশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যবাহিনী। অশ্বারোহী সৈন্য বাহিনী পরিচালনায় ক্রমওয়েলের প্রতিভা, ক্রমওয়েলের ওপর এদের বিশ্বাস এবং এদের ওপর ক্রমওয়েলের বিশ্বাস—এর ফলে তাঁদের জয়ের পর জয়লাভ হতে থাকে।

১৬৪৪। ক্রমওয়েল এখন লেফটেনেন্ট জেনারেল। মারস্টন মুরের রণক্ষেত্রে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য জয়লাভ হলো। দিনটি ছিল মেঘাচ্ছন্ন এবং বজ্রধ্বনিতে সমাকুল। উভয়পক্ষের সৈন্য জলাভূমিতে সমবেত হয়েছে। তাদের মাঝখানে পরিখা ও ঝোপঝাড়; দুইধারে দাঁড়িয়ে তারা পরস্পরের প্রতি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে পার্লামেন্টারি সৈন্যদলের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে উদ্দীপনাময়ী সুমধুর ধর্মসংগীত; অপর পক্ষে যুবরাজের বাহিনী নিস্তব্ধ

তাদের দৃষ্টিতে কঠিন ভাব। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে পার্লামেণ্টারি সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল যুবরাজের বাহিনীর ওপর। প্রচণ্ড যুদ্ধে ক্রমওয়েল জয়লাভ করলেন। তখন থেকে তাঁর সৈন্যদলের নাম হয় 'Ironsides'—ইতিহাসে এই নামেই এরা অভিহিত হয়ে থাকে।

১৬৪৫ সালে নিউ মডেল আর্মি স্থাপিত হলো। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ক্রমওয়েলের নিজস্ব বাইবেল-বাহিনীর পরিবর্ধিত সংস্করণ। ক্রমওয়েল, ফেয়ারফ্যাক্স ও আয়ারটনের নেতৃত্বে এই বাহিনী নেসবির যুদ্ধে বিরাট জয়লাভ করল। ক্রমওয়েল ও ফেয়ারফ্যাক্স দু'জনে মিলে অশ্বপৃষ্ঠে ইংলণ্ডের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করলেন। তখন দুর্গের পর দুর্গ, অঞ্চলের পর অঞ্চল, বাহিনীর পর বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে থাকে। চার্লস স্কটল্যাণ্ডে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করলেন; সেখানে আশ্রয় চেয়ে তিনি ব্যর্থ হন। স্কচরা তাঁকে পার্লামেণ্টারি কমিশনারদের হাতে সমর্পণ করল ১৬৪৭ সালের গোড়াতেই। ক্রমওয়েলের নির্দেশে তাকে বন্দী করে রাখা হলো। বন্দীদশা থেকে ওয়েলসের রাজভক্ত সৈন্যরা তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ হলো ১৬৪৮ সালের আগস্ট মাসে, স্বল্পকালস্থায়ী এই যুদ্ধ খুবই ভয়াবহ ছিল। পরিশ্রান্ত, কিন্তু নিশ্চিন্ত ক্রমওয়েল এই সময়ে রণাঙ্গনে বসে একদিনের দিনলিপিতে লিখেছিলেন—'It pleased God to enable us to give them a defeat'.

এরপরেই চার্লস স্টুয়ার্টের বিচার। ওয়েস্টমিনিস্টার হলে, রেভোলিউশনারি ট্রাইবুনালের সামনে এই ঐতিহাসিক বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৬৪৯, ২৭ জানুআরি। ক্রমওয়েলের সামনে ইংলণ্ডের রাজা চার্লসের মৃত্যু পরওয়ানার ওপর প্রধান বিচারপতি স্বাক্ষর প্রদান করেন এবং ৩০ জানুআরি তাঁকে ফাঁসির মঞ্চে প্রেরণ করা হয়। হোয়াইট হলের সন্নিকটে ব্যাংকোয়েটিং হলের বহির্ভাগে এই বধ্য মঞ্চটি প্রস্তুত হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনায় ক্রমওয়েল প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি যে তাঁর বিবেকের নির্দেশেই এই কাজ করেছিলেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য তিনি বার বার ঈশ্বরের দোহাই দিতেন।

বাহান্ন বছর বয়সে ক্রমওয়েল তাঁর অসি কোষবদ্ধ করেন। তখন থেকে মুখ্যত তিনিই ইংলণ্ডের অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তখন দ্বিতীয় চার্লস নামে মাত্র ইংলণ্ডের রাজা হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। প্রকৃত শাসক কিন্তু ক্রমওয়েলই ছিলেন। ১৬৫৩ সালে পার্লামেণ্টের অনুমোদন ক্রমে তাঁর নতুন পদবী হয়েছিল লর্ড প্রোটেক্টর অব দি কমনওয়েলথ অব ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড। তাঁকে সম্রাট পদবী দেওয়ার কথাও উঠেছিল, কিন্তু সৈন্যবাহিনীর বিরোধিতার জন্য তা সম্ভব হয়নি। ১৬৫৮, ৩ সেপ্টেম্বর ক্রমওয়েলের মৃত্যুতে ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটি যুগের অবসান ঘটে—যে যুগের স্রষ্টা ছিলেন তিনি।

চতুর্দশ লুই

(১৬৩৮—১৭১৫)

সম্রাট অগস্টাসের যুগের পুনরুক্তি ঘটেছিল চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে; ফরাসী সাহিত্য ও শিল্পের অকল্পিত শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে দেখা গিয়েছিল তাঁর সময়ে। উন্নতির চরমতম শিখরে তিনি যেমন তাঁর দেশকে স্থাপন করেছিলেন, তেমনি একে নিক্ষেপ করেছিলেন ধ্বংসের কাছাকাছি। তিনি তাঁর প্রজাবৃন্দের রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন 'I am the State' —পৃথিবীতে কোনো দেশে কোনো যুগে কোনো রাজার মুখে এমন দম্ভের কথা শোনা যায় নি। নিজেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে, তিনিই ফরাসী বিপ্লবের সূচনা করে গিয়েছিলেন।

১৬৩৮ সালে চতুর্দশ লুই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তিনি যতদিন নাবালক ছিলেন ততদিন তাঁর হয়ে তাঁর মা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা করায়ত্ত ছিল একটি মানুষের—তিনি কার্ডিনাল মাজারিন। রিচেলুর পরে তিনিই তখন ফরাসীর প্রধান মন্ত্রীর পদে সমাসীন ছিলেন। ১৬৬০ সালে স্পেনের সম্রাটের জ্যেষ্ঠা ভগিনী মারিয়া থেরেসার সঙ্গে চতুর্দশ লুই-এর বিবাহ হয়; পরের বছরেই মাজারিনের মৃত্যু হলো। তেইশ বছর বয়স্ক সম্রাট নিজের হাতে সব ক্ষমতা গ্রহণ করলেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুসারে চতুর্দশ লুই ছিলেন তাঁর সমযকার একজন সক্ষমতম ব্যক্তি। প্রখর ছিল তাঁর স্মরণশক্তি, য়ুরোপের অবস্থা সম্পর্কে সবকিছু জ্ঞান ছিল তাঁর নখদর্পণে; এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল প্রচুর কর্মশক্তি, সুগভীর কূটনৈতিক বুদ্ধি এবং নীতির রূপায়ণে তিনি অক্লান্ত ধৈর্যের পরিচয় দিতেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম যুগে তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন কলবার্ট; কূটনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন লায়ন; প্রতিরক্ষা ব্যাপারে তাঁকে পরামর্শ দিতেন টুরেন এবং সৈন্য পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন জেনারেল কঁদে ও জেনারেল ভাউবান—এই শেষোক্ত সেনাপতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি যে দুর্গ অধিকার করতেন তা আর কখনো তাঁর হস্তচ্যুত হতো না, অথবা যে দুর্গ অবরোধ করতেন তা তিনি শেষ পর্যন্ত অধিকার না করে ছাড়তেন না।

তরুণ সম্রাটের সামনে প্রথম সমস্যা ছিল আভ্যন্তরীণ সংস্কার। সংস্কার-গুলির মধ্যে প্রধান ছিল দেশের অর্থনীতিক পদ্ধতি। আভ্যন্তরীণ মতদ্বৈধ ও কুশাসনের ফলে ফ্রান্স তখন ধ্বংসের কাছাকাছি উপনীত হয়েছে। অর্থনৈতিক সংস্কার-সাধনের দায়িত্ব ন্যস্ত হলো কলবার্টের ওপর যাঁর তুল্য অর্থশাস্ত্রী তখনকার

দিনে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না ফরাসী দেশে। উৎসাহের সঙ্গেই তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করা হলো; করনীতির (Taxation) আমূল সংস্কারসাধন করা হলো। সর্বতোভাবে শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া হলো; দেশীয় শিল্পগুলিকে সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হলো, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একাধিক যৌথ সংস্থা গঠিত হলো। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হলো এবং নৌবাহিনীকে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে শক্তিশালী করে তোলা হলো। সৈন্যবাহিনীও নতুন ভাবে পুনর্গঠিত হলো ও এই ক্ষেত্রে নতুন শৃঙ্খলা প্রবর্তিত হয়েছিল; প্রত্যেক সৈন্যকে কঠোর আদেশ দেওয়া হলো এগুলি ঠিকমতো মান্য করতে। বিচার বিভাগটিতেও অনুরূপ সংস্কার সাধিত হলো এবং এটিকে কেন্দ্রীয় করে তোলা হলো। পুলিশ শাসন সম্পর্কে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হলো।

এইসব বিবিধ সংস্কারের ফলে দেশে যখন পুনরুজ্জীবন সূচিত হলো, তখন চতুর্দশ লুই তাঁর রাজসভা অকল্পিত আড়ম্বর দ্বারা মণ্ডিত করলেন। বিলাস-বৈভব মণ্ডিত পরিবেশে তিনি একদল বুদ্ধিমান ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা পরিবৃত থাকতেন। অকৃপণ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা শিল্পকে উৎসাহিত করা হলো। ১৬৬৪ সালে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত হয় আকাদেমি অব সায়েন্সেস বা বিজ্ঞান পরিষদ এবং এর পাঁচ বছর পরে স্থাপিত হয় আকাদেমি অব মিউজিক বা সংগীত পরিষদ। রাজত্বের সূচনায় ফরাসী সাহিত্য ও ধর্মের ক্ষেত্রে সগৌরবে বিরাজমান ছিলেন কর্ণেলি, র‍্যাসাইন, মলিয়ের, বয়লিউ, ফেনেলন ও বুসে প্রমুখ লেখক ও যাজকবৃন্দ।

লুই-এর রাজত্বকালের প্রথম দুই দশক ফরাসী দেশে যেমন শান্তি বিরাজ করেছিল, তেমনি দেখা গিয়েছিল নতুন শ্রীবৃদ্ধি। ১৬৮৩ সালে কলবার্ট মারা গেলেন। এখন থেকে লুই একচ্ছত্র সম্রাট হিসাবে উৎসাহের সঙ্গে দেশশাসনে কৃতসংকল্প হলেন। তার ছিল নভোস্পর্শী দুরাকাঙ্ক্ষা—তিনি নিজেকে গৌরব বিভূষিত দেখতে চেয়েছিলেন। ফ্রান্স বড়ো ছিল, তিনি তাকে আরো বড়ো করবেন, এই ছিল তরুণ সম্রাটের মনের আশা। তখন যুদ্ধ মন্ত্রীর পদে যিনি নিযুক্ত ছিলেন সেই লুভয় ছিলেন যেমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির তেমনি কঠিন চরিত্রের মানুষ। তাঁরই সময়ে শুরু হয় একটির পর একটি যুদ্ধ; কলবার্ট দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যেসব পরিকল্পনা করেছিলেন, এই যুদ্ধগুলির ফলে সেসব বানচাল হয়ে যায়। যুদ্ধবাজ মন্ত্রীর কুপরামর্শে সম্রাটও যেন যুদ্ধের নেশায় মাতলেন।

যুদ্ধ বাধাবার ছল উদ্ভাবন করতে তাঁর বিলম্ব হতো না। তিনি স্পেনের রাজা চতুর্থ ফিলিপের সর্বজ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করেছিলেন। ফিলিপের মৃত্যুর পর, ১৬৬৫ সালে, চতুর্দশ লুই তাঁর পত্নীর জন্য স্পেনীয় নেদারল্যাণ্ডস্ দাবী করলেন। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেল ১৬৬৭ সালে। হল্যাণ্ড ছিল লুই-এর দ্বিতীয় লক্ষ্য, এবং এই দেশটি আক্রমণ করার আগে এটিকে তিনি ইংলণ্ড

ও সুইডেন থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। গোপনে সম্পাদিত ডোভার চুক্তির বলে তিনি ইংলণ্ডকে হাতের মুঠোয় আনলেন এবং উৎকোচ প্রদানে সুইডিস কাউন্সিল অব রিজেন্সীকেও বশীভূত করা হলো। জার্মান যুবরাজদের নিরপেক্ষতা প্রায় সর্ববাদী সম্মতিক্রমে সুনিশ্চিত করা হলো। লুই লোরেনের ডাচি অধিকার করলেন, এবং তারপর তাঁর দুই সেনাপতির অধীনে রাইন নদী বরাবর সৈন্য-বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন হল্যাণ্ডে। ওলন্দাজেরা বাঁধের মুখ খুলে দিয়ে দেশকে জলপ্লাবিত করে দিল এবং শান্তির জন্য দাবী করল। লুই তখন কঠিন শর্তাবলী আরোপ করলেন।

ফ্রান্সের সম্রাটের ক্ষমতার দাপটে গোটা য়ুরোপ আবার শংকিত হয়ে ওঠে। মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলি হল্যাণ্ডের পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু য়্যালসেস থেকে শত্রু-সৈন্য বিদূরিত করার পর সেনাপতি তুরেন যেই মারা গেলেন অমনি বিপর্যয় আর বিপদের আঘাতে ফ্রান্স কাতর হয়ে উঠল। বিপদের ওপর বিপদ, ঐ বছরেই ভগ্ন-স্বাস্থ্যের সেনাপতি কঁদকে কর্মে ইস্তফা দিতে হলো। ক্রমাগত যুদ্ধ চলতে থাকে এবং অবশেষে ১৬৭৮ সালে ঘটল এর পরিসমাপ্তি। এই যুদ্ধের ফলে য়ুরোপের ওপর লুই-এর অধিকার বৃদ্ধি পেলো, কারণ তিনি স্পেনীয় নেদারল্যাণ্ডস ও ফ্রাঙ্ক কোঁৎ-এ বেশ কয়েকটি দুর্গ দখল করেছিলেন এবং কৌশলে সন্ধির শর্তাবলী আরোপ করে তিনি ইলেক্টর পালাটিনের রাজ্যটি ও রাইনল্যাণ্ডের কিছু অংশ অধিকার করে নিয়েছিলেন। সুতরাং যুদ্ধ করে যা তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন কূটনীতির বলে লুই সেগুলি অধিকার করেছিলেন। এর জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল, তথাপি রাজ্যের মধ্যে দুর্বলতার কিছুমাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি। আগের মতোই সমগ্র য়ুরোপে লুই একদিকে যেমন সম্মানিত হতে থাকেন, অন্যদিকে তেমনি ভীতির পাত্র হয়ে উঠলেন। ক্রীতদাসরা তাদের প্রভুকে ঠিক যে দৃষ্টিতে দেখে, ফ্রান্সের লোক ঠিক সেই চক্ষে তাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী সম্রাটকে দেখতে থাকে। কালক্রমে রাজা ও প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ দাঁড়াল ক্রীতদাস ও মনিবের সম্পর্কের তুল্য।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, অর্থাৎ ১৬৮৪ সালে, লুই তাঁর ক্ষমতার শীর্ষ দেশে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সমগ্র য়ুরোপে ফ্রান্স হয়ে উঠেছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তিনি বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, এবং য়ুরোপ তখন তাঁকে নীচে টেনে আনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপের আশীর্বাদ নিয়ে স্থাপিত হলো লীগ অব আগসবার্গ; এর সদস্য ছিল সুইডেন, স্পেন, স্যাক্সনি, ব্যাভেরিয়া, স্যাভয় ও সংযুক্ত প্রদেশগুলি। ফ্রান্সের পুলিশবাহিনী ছিল চতুর্দশ লুই-এর সৃষ্টি। এটিকে তাঁর একটি কীর্তিও বলা চলে। এই পুলিশ বাহিনীর সাহায্যেই তিনি প্যারিসে এনেছিলেন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা; শহরের পথঘাট সব হয়ে উঠেছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘোড়ায় চড়ে রাজধানীর রাজপথ পরিভ্রমণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। কিছুকাল বাদে আলয়েন্স-এর ডাচেসের জন্য লুই প্যালেটিনেট দাবী

করলেন। তখন ১৬৯৮ সাল। ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসলেন নতুন রাজা—উইলিয়াম অব অরিয়েন্স এবং দ্বিতীয় জেমস ফ্রান্সে পলায়ন করলেন। লুই স্বভাবত জেমসকে সমর্থন করলেন। উইলিয়াম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। লুইয়ের সৈন্যবাহিনী রণক্ষেত্রে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করল, কিন্তু সমগ্র দেশ তখন রণশ্রান্ত। লুই শান্তি প্রস্তাব করতে বাধ্য হলেন; তখন রাইসউইকে ১৬৯৭ সালে শান্তির চুক্তি সম্পাদিত হয়। তখন যুদ্ধে লব্ধ কিছু দেশ তাঁকে ছাড়তে হলো।

এই সময়ে স্পেনের রাজা চার্লসের মৃত্যু হলো। তাঁর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। লুই আবার যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে থাকেন। য়ুরোপের দৃষ্টি তখন স্পেনের ওপর নিবদ্ধ। আমেরিকায় তার অসংখ্য উপনিবেশ; য়ুরোপে তার অধিকারভুক্ত ছিল নেদারল্যাণ্ডস, মিলান, নেপলস ও সিসিলি। দ্বিতীয় চার্লসের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী লুইকে বিয়ে করেছিলেন এবং এই বিয়ে করার জন্য তাঁকে স্পেনের সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। তখন লুই তাঁর পুত্র ও প্রপৌত্রের জন্য স্পেনের সিংহাসন দাবী করলেন। কিন্তু য়ুরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি এর বিরোধিতা করতে এগিয়ে এলো। দাবানল জ্বলে উঠল য়ুরোপে। ১৭০২ সালে আরম্ভ হলো স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে সংগ্রাম। এই সংগ্রামে ইংলণ্ড ডিউক অব মার্লবোরোর নেতৃত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। লুইকে এবার তাঁর ক্ষমতাপ্রিয়তার জন্য চরম মূল্য দিতে হলো। অন্ধকারের মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটে তাঁর বাহাত্তর বছরের রাজত্বকাল। ১৭১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিনে লুই এর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বংশধর অর্থাৎ প্রপৌত্রের পুত্রের হাতে রাজত্ব তুলে দিয়ে তিনি এই মর্মে উপদেশ দিয়েছিলেন—'আমার অনুকরণ করো না, যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হয়ে প্রজাসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবে।'

সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক মার্টিন যথার্থ মন্তব্য করেছেন: 'It had been a royal epoch! Louis XIV had the role of a demi-god. Under him all was changed and under him intoxicated France was being dragged to a yawning chasm.' ফ্রান্স তার ক্ষমতাপ্রিয় এই স্বৈরাচারী সম্রাটকে মনে রেখেছে এই জন্য যে, শিল্প ও সাহিত্যে তিনিই ফরাসী দেশকে য়ুরোপের শীর্ষস্থানীয় করে তুলেছিলেন। শুধু তার সৈন্যবাহিনী নয়, তার আদর্শও প্রভাবিত করেছিল সমগ্র য়ুরোপকে। ইতিহাস তাই চতুর্দশ লুইয়ের স্মৃতি আজো তার বক্ষে ধারণ করে আছে। এই বহুনিন্দিত ও বহু আলোচিত সম্রাট আপন প্রতিভাবলেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজ নামের মুদ্রাঙ্কিত করেছেন।

স্যার আইজক নিউটন

(১৬৪২—১৭২৭)

১৬৪২ সালটি কেবলমাত্র ইংলণ্ডের ইতিহাস নয়, বিজ্ঞানের ইতিহাসেও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছরের বড়দিনে উলসথ্রপের হান্না নিউটনের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। বড়দিনের শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন পৃথিবী লাভ করেছিল সেদিন। লাভ করেছিল ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী আইজাক নিউটনকে।

১৬৫৪ সালে নিউটন গ্রামার স্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু ক্ষীণস্বাস্থ্য নিউটনের পড়াশুনার দিকে তাঁর তেমন মন ছিল না। অনতিকাল মধ্যে মায়ের অনুরোধে তাকে ক্ষেত খামারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হোল। এই সময়ে কিশোর নিউটনের মধ্যে জ্ঞান-স্পৃহা জাগতে থাকে। ১৬৬০ সালে নিউটন আবার স্কুলে ভর্তি হলেন। আবার তিনি জ্ঞানের জগতে পরিভ্রমণের সুযোগ পাবেন—এইজন্য নিউটন খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করলেন লেখাপড়া। ১৬৬১ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এর ঠিক তিন বছর পরে তিনি স্নাতক হলেন। প্রবেশিকা ও স্নাতক হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে যাবতীয় গণিতশাস্ত্রে নিউটন পারদর্শী হয়েছিলেন।

১৬৬৫ সালেই তিনি গণিতশাস্ত্রের কতকগুলি কঠিন আবিষ্কার করেন, যেমন—বাইনমিনাল থিওরেম, ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস এবং কঠিন পদার্থের ঘনত্ব। স্নাতক হওয়ার দু'বছরের মধ্যেই তাঁর মানসিক প্রসার বিস্ময়কর ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাত্র চব্বিশ বছর বয়স থেকে তিনি মাধ্যাকর্ষণের কথা চিন্তা করেছিলেন—এ জিনিস ভাবতেও বিস্ময় লাগে। কিন্তু এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ এটাই প্রতিভার লক্ষণ। আইনস্টাইন তো মাত্র বাইশ বছর বয়সে আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কার করে, বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে যে কাহিনীটি প্রচলিত আছে সেটি নিউটনের জীবনের এই সময়কার ঘটনা। এই তত্ত্বের দ্বারা চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের গতি নিরূপণে নিউটন কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য হতে পারেন নি, কারণ প্রচলিত পদ্ধতিতে পৃথিবীর ব্যাসের পরিমাপ নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি মাধ্যাকর্ষণের তাত্ত্বিক ও বাস্তব গতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখতে পেয়েছিলেন। আসলে প্রচলিত পদ্ধতিটাই ভুল ছিল। ১৬৬৭ সালে তিনি প্রথম সম্মান লাভ করলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে—এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁকে ট্রিনিটি কলেজের একজন ফেলো নির্বাচিত করলেন। এই রকম ফেলোসিপ বিশেষ প্রতিভাবান ভিন্ন অন্য কেউ লাভ করতে পারত না। ফেলোসিপ লাভ করার প্রথম কয়েক বছর তিনি দৃষ্টিবিজ্ঞান সম্পর্কে

গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন ; এই সময়ে তিনি প্রধানত আলোকের প্রকৃতি ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে গবেষণা করতেন। ১৬৬৮ সালটি এই বিজ্ঞানীর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে ; এই বছরে নিউটন তাঁর প্রথম প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Reflecting telescope) তৈরি করলেন। যন্ত্রটি ছিল দৈর্ঘ্যে মাত্র ছয় ইঞ্চি আর এর ছিদ্রটির ব্যাস ছিল আধ ইঞ্চি। এরই সাহায্যে তিনি বৃহস্পতি গৃহে অবস্থিত উপগ্রহগুলি দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তিকালে স্যার উইলিয়াম হার্শেল ও লর্ড রসের গবেষণার ফলে উচ্চ মানের যে নিখুঁত দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাসিত হয়েছিল, নিউটন উদ্ভাবিত যন্ত্রটি ছিল তারই পূর্বগামী। অতএব নিউটনই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক, একথা অনায়াসেই বলা চলে।

১৬৬৯ সালে নিউটন ট্রিনিটি কলেজের গণিত-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। এর দু'বছর পরে তিনি ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বা চত হলেন। তাঁর উদ্ভাবিত প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমেই তিনি এই বিদ্বৎসভার সঙ্গে সর্ব প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন। রয়্যাল সোসাইটিতে তিনি প্রথম যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন সেটি ছিল দৃষ্টি-বিজ্ঞান সম্পর্কিত। ১৬৬৬ সালে স্টুরব্রিজ মেলাতে তিনি যে তিন-পলা বা ত্রিশির কাচখণ্ডটি (prism) কিনেছিলেন তাঁরই সাহায্যে তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্যদের সামনে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করার সার্থক প্রয়াস পেয়েছিলেন। সেদিন নিউটনের গবেষণামূলক এই প্রবন্ধটি নিয়ে বিদগ্ধজনের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল—বিশেষ করে বর্ণচ্ছত্রের অর্থাৎ রামধনুর মধ্যে যেসব রঙ পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে সেইগুলির বিপ্রয়োগ ও প্রক্ষেপণ নিয়ে। নিউটন মনে করেছিলেন যে, প্রিজমের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে বর্ণচ্ছত্রের দৈর্ঘ্য যে কোন বস্তুর প্রিজমের সঙ্গে সমান হবে যদি তাদের কোণগুলি এইরূপ হয় যে, বর্ণচ্ছত্রের সবচেয়ে ছোট দৈর্ঘ্যের কিরণটি সর্বক্ষেত্রে সমান হয়। 'নিউটনের এই ধারণাটি—যা তিনি আজীবন পোষণ করতেন—ভুল ছিল ; কিন্তু এই ভুলই তাঁর গবেষণার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। নিউটন সিদ্ধান্ত করলেন যে, দৃষ্টিসহায় কাচের (lense) দ্বারা বর্ণহীন প্রতিমূর্তি উৎপন্ন করা যায় না। সুতরাং তিনি আলোকরশ্মির দিক-পরিবর্তন দেখান যায় এমন ধরনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র (refracting telescops) তৈরি করতে সক্ষম না হয়ে প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়েই তাঁর গবেষণার কাজ চালাতে লাগলেন।

রয়্যাল সোসাইটি আলোক-তত্ত্ব সম্পর্কে নিউটনের পর্যবেক্ষণের প্রশংসা করলেন কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি তাঁরা গ্রহণ করলেন না। যাই হোক, য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর এই প্রবন্ধটি সেদিন তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং এই বিতর্ক আলোচনা প্রায় এক দশককাল যাবৎ চলেছিল। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন আমার আলোক-তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত আলোচনাগুলির দ্বারা আমি সত্যিই আক্রান্ত হয়েছিলাম এবং মনে হয় বিদ্বৎসমাজের সামনে এই রহস্য উদ্‌ঘাটন আমার পক্ষে অবিমৃষ্যকারিতার কাজ

হয়েছিল। তবে এত সব আলোড়ন ও আলোচনা বৃথা হয়নি; কারণ এর ফলে নিউটন বিষয়টির বিস্তারিত গবেষণায় মনোযোগ দিয়েছিলেন। ১৬৭৫ সালে তিনি লিখলেন—'আমার মনে হয়, আলো ঈথর নয়; অথবা ঈথরের স্পন্দিত গতি নয়, উজ্জ্বল বা স্বচ্ছ পদার্থসমূহ থেকে উৎপন্ন স্বতন্ত্র কিছু।' তিনি আরো বলেছিলেন—'আলো ও ঈথর পরস্পর পরস্পরের ওপর প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে থাকে।' বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই দুটি বিষয় নিয়ে যে এত গবেষণা চলেছে, এ কী নিউটনের দূরদৃষ্টির ফল নয়?

নিউটনকে বলা হয় আলোর নির্গমন (emission)-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৩১ সাল পর্যন্ত তাঁর তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা মেনে এসেছেন। তারপর টমাস ইয়ং প্রমুখ নবযুগের বিজ্ঞানীরা এর বিরোধীতা করে বললেন সরলরেখায় নয়, তরঙ্গায়িত ভাবেই আলোকরশ্মির বিকীরণ ঘটে থাকে। এই সময় নিউটনের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। এমন কি রয়্যাল সোসাইটিতে প্রতি সপ্তাহে এক শিলিং করে চাঁদা দেওয়ার সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। ১৬৭৫, ফেব্রুআরি মাসে তিনি সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হলেন। এখন থেকে তিনি আইজাক নিউটন, এফ. আর. এস.—এই নামেই বৈজ্ঞানিক সমাজে পরিচিত হলেন। এটা বড়ো কম সম্মানের বিষয় ছিল না।

ঠিক কোন্ বছর থেকে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে পুনরায় তাঁর গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। এর ফলে যেসব আবিষ্ক্রিয়া সম্ভব হয়েছিল তারই ওপর স্থাপিত হয়েছে তাঁর কালজয়ী খ্যাতির সৌধ। ১৬৮৭ বিজ্ঞান জগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। নিউটন প্রকাশ করলেন তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ **Philosophirie Naturalis Principia Mathematica** ('Mathematical Principles of Natural Philosophy'). মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বিজ্ঞান জগতের একটি মৌলিক তত্ত্ব এবং স্তম্ভ বিশেষ। ১৬৬৬ সালে নিউটনের মস্তিষ্কে এই তত্ত্বের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল। তখন থেকেই তাঁর চিন্তার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছিল মাধ্যাকর্ষণ; তাঁর সকল ধ্যান-ধারণা তখন থেকে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। তখনই তিনি এই তত্ত্বটি সম্পর্কে প্রাথমিক গণনা (calculation) করেছিলেন। কেপলারের তৃতীয় নিয়ম বা বিধি (Law) থেকে একটি সরল অনুমানের (deduction) সাহায্যে তখনই তিনি এই ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন যে, পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে চালিত একটি শক্তির দ্বারা চন্দ্রকে যদি বৃত্তাকার একটি গ্রহ-কক্ষে (orbit) রেখে দেওয়া যায়, তাহলে সেই শক্তির বর্গরাশি চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্বের বিপরীত ভাবে সমানুপাতিক হবে।

তেরো বছর বাদে অর্থাৎ ১৬৭৯ সালে তিনি আবিষ্কার করলেন কিভাবে একটি কেন্দ্রীয় শক্তির দ্বারা পরিচালিত একটি জিনিসের গ্রহ-কক্ষ হিসাবের মধ্যে আনা যায় এবং এই হিসাব বা গণনার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করলেন—'If

the force varied as the inverse square, the orbit would be an ellips, with the centre of the force in one focus'. মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের পক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল। অবশেষে ১৬৮৪ সালে তাঁর তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রধান বাধাটি অপসারিত করতে নিউটন সক্ষম হলেন। কী সেই বাধা? পৃথিবী থেকে অপরিসীম দূরত্ব হেতু সূর্য ও চন্দ্রের আকৃতির সঠিক পরিমাপ এতকাল এক রকম অসম্ভব ছিল। এইবার নিউটনের গবেষণায় ঘটল সেই অসাধ্য সাধন।

মহাজ্ঞানীর এই অসাধ্য সাধন সম্পর্কে এডিংটন লিখেছেন: 'The world of science was as it were waiting for this epoch-making discovery—The law of gravitation'. এইভাবে নিউটন তাঁর যুগান্তকারী তত্ত্বটি দীর্ঘকালের গবেষণার ফলে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশ্ব-জগতের অস্তিত্ব এবং এর গতি কোন্ বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—এটাই ছিল তাঁর আবিষ্কার এবং নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থটির মধ্যে বিধৃত হয়েছে এই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের অনুপুঙ্খিক বিবরণ।

১৬৯২ থেকে ১৬৯৪—নিউটনের কাজে বিঘ্ন ঘটেছিল। ঐ সময়ে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলেন। আর্থিক অবস্থা তাঁর কোনোদিনই স্বচ্ছল ছিল না। তাই ১৬৯৫ সালে বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টায় তিনি টাঁকসালে একটি চাকরি পেলেন এবং চার বছর পরে তিনি টাঁকসালের সর্বোচ্চ পদে (Master of the Mint) নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীকালে ফরাসী দেশ ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমির সম্মানিত সদস্যরূপে নিউটনকে নির্বাচিত করে সম্মানিত করেন। ১৭০১ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহাসভায় দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হলেন। এইসব কাজের জন্য তাঁর নিজস্ব গবেষণার কাজ বিঘ্নিত হয়। নিউটনের জীবনে সর্বোচ্চ সম্মান এলো ১৭০৭ সালে যখন তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তখন থেকে প্রত্যেক বছরেই তিনি ঐ পদে পুনর্নির্বাচিত হতেন। রাজ সম্মান এলো ১৭০৫ সালে। রাণী য়্যানে ঐ বছরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে আসেন এবং তিনি ইংলণ্ডের গৌরব নিউটনকে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭২৭, ২০ মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়।

উলসথ্রপের পৈত্রিক গৃহের যে কক্ষটিতে নিউটন একদিন চোখ মেলে এই পৃথিবীর আলোক দেখেছিলেন, সেই কক্ষের দেয়ালে স্থাপিত একটি স্মৃতি ফলকে পোপের লেখা এই দুই ছত্রের কবিতা উৎকীর্ণ আছে—

'Nature and Nature's laws lay hid in night;
God said: 'Let Newton be' and all was light.'

নিউটন-প্রতিভার সকল বৈশিষ্ট্য এই দুটি ছত্রে অতি সুন্দরভাবেই অভিব্যক্ত হয়েছে।

ভলটেয়ার

(১৬৯৪—১৭৭৮)

'ঈশ্বরে ভক্তি, বন্ধুদিগের প্রতি ভালবাসা, কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং শত্রুদের ঘৃণা না করে আমি মৃত্যু বরণ করছি। তাঁর মৃত্যুর ঠিক তিনমাস আগে একদিন নিজের হাতে এক টুকরো কাগজে এই কয়টি কথা লিখে তাঁর একান্ত সচিবের হাতে দিয়েছিলেন অষ্টাদশ শতকের সিংহপ্রতিক সেই আশ্চর্য দার্শনিক পুরুষ যিনি আজ সারা বিশ্বে 'ভলটেয়ার' নামে পরিচিত। এই নাম নিয়ে তিনি কিন্তু এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নি, এটা ছিল তাঁর নিজের দেওয়া নাম। ফ্রান্সের কুখ্যাত বাস্তিল কারাগারে অবস্থান করার সময় তিনি এই নামটি গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর জীবদ্দশায় পৃথিবীতে আর কোনো লেখক এমন প্রভাবশালী ছিলেন না। আবার এমন নিগ্রহও কারো জীবনকে এমনভাবে বিড়ম্বিত করেনি। নির্বাসন, কারাদণ্ড, চার্চের হাতে লাঞ্ছনা, রাষ্ট্রের হাতে পীড়ন, কি না ভলটেয়ারের ভাগ্যে জুটেছিল ? তাঁর অধিকাংশ রচনার প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এইসব প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়েই তিনি নির্মমভাবে সত্যের পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর বাণী।

চতুর্দশ লুই তখন ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বাহাত্তর বছর রাজত্ব করেছিলেন তিনি নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারিতার সঙ্গে। সেই রাজত্বের যখন অবসান ঘটল, তখন ফ্রান্সে জনসাধারণের স্বাধীনতা বলতে আর কিছু বাকী ছিল না। রাজকর্মচারীদের অপ্রতিহত প্রভাব, অন্যদিকে প্রজাদের দুর্দশার শেষ নেই ; তারা করভারে পীড়িত, স্বৈরাচারে সন্ত্রস্ত। যাজক সম্প্রদায় দুশ্চরিত্র ও কলুষ পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সমাজের অন্তঃস্থল নানাবিধ কদাচারে জর্জরিত। দেশের ও সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারসাধনে যাঁরা সেদিন কলম ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আর নির্ভীক ছিলেন একটি মানুষ। তিনি ভলটেয়ার। অত্যাচার-সহনশীল ফ্রান্সকে তিনি চিন্তা করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই চিন্তার ফলেই ঐ দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। 'ভলটেয়ার' এই নামটি তাই ইতিহাসে স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। এ সম্মান খুব কম লেখকের ভাগ্যেই ঘটেছে।

প্যারিসে এক সম্ভ্রান্ত বংশে ভলটেয়ারের জন্ম হয়। পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ নোটারী ; মা ছিলেন একটি সংগতিসম্পন্ন বংশের কন্যা। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন কোপনস্বভাব ও বৈষয়িক বুদ্ধি, আর

মায়ের কাছ থেকে চরিত্রের তরলতা ও বৈদগ্ধ্য। পিতৃদত্ত নাম—ফ্রানকয়-মারী এরাউয়েট।

ভলটেয়ার দেখতে আদৌ সুশ্রী ছিলেন না। তাঁর চরিত্রে দম্ভ ও চপলতা দুই-ই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অশ্লীলতা ও অসাধুতারও অভাব তাঁর চরিত্রে ছিল না। কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণে সদা প্রবহমান থাকত করুণার ফল্গুধারা। পরের উপকারের জন্য শ্রম ও অর্থদানে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠিত, মুক্তহস্ত। বন্ধুজনকে সাহায্যদানে তিনি ছিলেন উদার; তাদের দুঃখলাঘবের জন্য তাঁর হাত সর্বদাই প্রসারিত থাকত। বদান্যতায় তিনি শাসকালকে অতিক্রম করেছিলেন। কিন্তু এইসব দোষগুণ ভলটেয়ার চরিত্রের বড়ো কথা নয়। এক অতুলনীয় মানসিক সম্পদের তিনি অধিকারী ছিলেন। সত্যের এমন অকপট পূজারী সভ্যতার ইতিহাসে খুব বেশী দেখা যায়নি। তাঁর ছিল আশ্চর্য ধারণা-শক্তি আর সৃজনক্ষমতা। নিরানব্বই খানি গ্রন্থ ও পুস্তিকায় নিবদ্ধ তাঁর বিপুল রচনাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা। বিচিত্র তাঁর জীবন, যেমন বিচিত্র ও বহুমুখী তাঁর প্রতিভা।

রাষ্ট্র পরিচালনার বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক সমালোচনা করার অপরাধে তিনি প্রথমে বাস্তিল কারাগারে এবং পরে ইংলণ্ডে নির্বাসিত হলেন—পাঁচ বছর কাটল নির্বাসনে। এই সময় ইংলণ্ডের প্রতি ভলটেয়ারের মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মায়; ইংরেজ জাতির স্বাধীনতাপ্রীতি তাঁকে মুগ্ধ করল। এরই নিদর্শন ইংরেজ জাতি সম্পর্কে তার প্রসিদ্ধ পত্রাবলী। এই গ্রন্থেই ফ্রান্সে স্বাধীনতার উষার প্রথম আগমনী শোনা গিয়েছিল। ফিরে এলেন স্বদেশে, কিন্তু এই পত্রাবলী প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময়ে (১৭৫০) জার্মানির ফ্রেডরিক দি গ্রেট সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন ভলটেয়ারকে। এলেন তিনি বার্লিনে। দু'বছর পরে এই বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়। তাঁর প্রতি ফ্রেডরিকের দুর্ব্যবহার ছিল এর কারণ। কিন্তু জার্মানির সীমান্ত অতিক্রম করার আগেই তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর প্রতি আবার নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। **An Essay on the Morals and the Spirit of the Nations from Charlamagne to Louis XIII.** গ্রন্থখানিই ছিল এই নূতন নির্বাসনদণ্ডাজ্ঞার হেতু। ভলটেয়ারের যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে এটি বৃহত্তম এবং স্বকীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। এই গ্রন্থের একস্থলে তিনি সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছেন—'ইতিহাসের উপর দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ না করলে এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অন্তরালে মানবমনের অস্তিত্বের সন্ধান করতে না পারলে প্রকৃত ইতিহাস রচনার সম্ভাবনা নেই। ইতিহাস রচনার কাজ দার্শনিকের।

আদিম অসংস্কৃত অবস্থা অতিক্রম করতে মানুষ কোন্ পথে অগ্রসর হয়েছিল, ভলটেয়ার এই গ্রন্থে তাই আবিষ্কার করেছেন। পৃথিবীতে এই

হলো প্রথম দর্শনভিত্তিক ইতিহাস। য়ুরোপে মানবমনের ক্রমবিকাশের কার্য-কারণ শৃঙ্খলার আবিষ্কারের এই হলো প্রথম সুষ্ঠু উদ্যম। পৃথিবীর চিন্তাশীল মনীষিগণ একবাক্যে বলেছেন যে, ভলটেয়ারের এই গ্রন্থেই আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হয়েছে।

তাঁর তীক্ষ্ণ শ্লেষপূর্ণ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কাঁদিদ্' (Candide) রচনার পর কয়েকটি ঘটনায় ভলটেয়ারের জীবনের গতি আবার পরিবর্তিত হয়। যে তরলতা ও হাস্যরসিকতা ছিল তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য, হঠাৎ তা গাম্ভীর্য ও কাঠিন্যে রূপান্তরিত হয়। প্রবলপ্রতাপ রোমান-ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং একাকী অক্লান্তভাবে সেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন; ধর্মধ্বজী পুরোহিতদের অমানুষিক অত্যাচারে ভলটেয়ারের মন যেন জ্বলে উঠল। সেই সদা প্রফুল্ল মুখখানি থেকে সমস্ত হাসি যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। হৃদয় হয়ে উঠল গম্ভীর আর লেখনী পরিণত হলো এক দুর্বার আগ্নেয়-গিরিতে। সেই আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত হতে লাগল শুধু আগুন আর জ্বলন্ত লাভাস্রোত; 'আর পরিহাসের সময় নেই"—এই বিখ্যাত উক্তিটি ভলটেয়ার করেছিলেন দ্য দেদ্যাঁকে লেখা এই সময়কার একখানি পত্রে। দর্শনের আলোচনা ছেড়ে সিংহপ্রতিম মানুষটি এইবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর অনুরাগী বন্ধুজনদের ডাক দিলেন তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্য। তাঁর সুনিপুণ লেখনীমুখে দর্শন যেন হয়ে উঠল বিস্ফোরক ডিনামাইট। অগ্নিগর্ভ সেই ডিনামাইট যেদিন বিদীর্ণ হলো সেইদিনই প্রকৃতপক্ষে রচিত হয়েছিল ফরাসীবিপ্লবের আগমনী। তাঁর অশ্রান্ত লেখনীমুখে ধর্মান্ধ প্রতারকদের অসার বক্তৃতা, ঘৃণিত কূটতর্ক, কল্পিত ইতিহাস, অন্তহীন অসঙ্গতি—সব কিছু একে একে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকে। য়ুরোপে জাগল একটা প্রচণ্ড ভূকম্পন. মহামান্য পোপের সিংহাসন হয় বিপর্যস্ত, খসে পড়ল তাঁর মুকুট দণ্ড। শুধু তাই নয়। রাজসিংহাসনের ভিত্তি পর্যন্ত চুরমার হয়ে গেল।

ভলটেয়ারের লেখনী থেকে অবিরল স্রোতে নির্গত হতে থাকে পুস্তিকার পর পুস্তিকা। এক-একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় আর বিদ্যুতের শিহরণ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠতে থাকে ফরাসীদেশের জনমানসে। কোনো কোনো পুস্তিকা তিনলক্ষ সংখ্যাও বিক্রী হলো। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ঘটনা এর আগে দেখা যায়নি। রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে Questions of Zapeta সমধিক প্রসিদ্ধ। সাধারণভাবে খ্রীষ্টানধর্ম এবং বিশেষভাবে ক্যাথলিক ধর্মের উপর এই অবিশ্রান্ত তীক্ষ্ণ আক্রমণে সেদিন সমগ্র য়ুরোপের যাজক সম্প্রদায় রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। যখন ভলটেয়ার ঘোষণা করলেন—"যাজকসম্প্রদায়ের নির্বুদ্ধিতা আমাদের ঘাড়ের উপর যে কুখ্যাত জোয়ালটি চাপিয়ে দিয়েছেন, আজ তা ভেঙে ফেলার দিন এসেছে। আমাদের বিবেক তাঁর প্রবল শক্তি দিয়ে সেই জোয়ালটিকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।...পুরোহিতের ছদ্মবেশে যে নরখাদকদল

পৃথিবীকে রক্তাপ্লুত করে দিয়েছে আজ সেই বেদনাও ধরণীকে সান্ত্বনা দেবার দিন এসেছে।'—তখন য়ুরোপের খ্রীষ্টানধর্ম জগতে যে বিক্ষোভ, যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, খ্রীষ্টানধর্মের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

চার্চের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামই বলতে গেলে ভলটেয়ারের জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। তাঁর বয়স যখন চৌষট্টি বছর তখন তিনি ফার্নি নামক স্থানে নির্বাসিত হলেন এবং এইখানেই তাঁর জীবনের পরবর্তী ষোলটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সীমান্তে অবস্থিত এবং অপেক্ষাকৃত অপরিচিত এই ফার্নি তখন হয়ে উঠেছিল য়ুরোপের বিদ্বজ্জনদের একটি তীর্থক্ষেত্র।

তিরাশী বছর বয়সে স্বদেশে ফিরে এলেন ভলটেয়ার। এবার প্যারিস তাঁকে জানায় রাজোচিত বিপুল সম্বর্ধনা; দলেদলে লোক আসতে থাকে তাঁকে দর্শন করতে। তিনি তখন সকলের অন্বেষিত মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। কথিত আছে সম্রাট ষোড়শ লুই বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ ভলটেয়ারের এই জনপ্রিয়তা দেখে রীতিমতো ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। একদিন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর পৌত্রকে সঙ্গে করে দেখতে এলেন ভলটেয়ারকে এবং পৌত্রকে আশীর্বাদ করা'র জন্য অনুরোধ করলেন তাঁকে। বৃদ্ধ ভলটেয়ার তাঁর শিথিল কম্পিত হাতখানি যুবকের মাথার উপর ন্যস্ত করে বলেছিলেন—'ঈশ্বর ও স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করো।' ১৭৭৮, ৩০ মে ভলটেয়ারের মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধিক্ষেত্রে ভলটেয়ারের নিজের হাতে লেখা মাত্র তিনটি কথা উৎকীর্ণ আছে: 'ভলটেয়ার এখানে শায়িত।' পৃথিবীর মানুষ তাকে ভোলেনি।

ভলটেয়ারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত লণ্ডনের এক সাহিত্য সভায় জর্জ বার্ণাড্শ একটি সুন্দর মন্তব্য করেছিলে: 'Voltaire is the only man who has freed the human mind from the clutches of the priests and has placed it on the road to freedom—freedom from all sorts of bandage ভলটেয়ার সম্পর্কে এই মূল্যায়ন যথার্থ।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

(১৭০৬-১৭৯০)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার উপনিবেশগুলি যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল—যে সংঘর্ষের পরিণতি ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা—তখন সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম ও সবচেয়ে প্রখ্যাত একটি মানুষের প্রতি। তিনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর জীবন আরম্ভ হয়েছিল একজন সামান্য প্রিণ্টার বা মুদ্রাকর হিসাবে এবং সেই সামান্য অবস্থা থেকে তিনি তখনকার দিনের বিজ্ঞতম রাষ্ট্রনেতার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। জননেতা ভিন্ন তিনি জীবনের বহুবিধ ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা লাভ করেছিলেন। তাঁর রচনাবলী সারা পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করেছিল; দুইটি মহাদেশ তাঁকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল একজন দার্শনিক ও বিজ্ঞানী হিসাবে। তাঁর যা কিছু কাজ, আবিষ্ক্রিয়া, দার্শনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা সবই মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয়েছিল।

১৭০৬, জানুআরি মাস। নিউ ইংল্যাণ্ডের বোষ্টন শহরে বেঞ্জামিনের জন্ম হয়। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে, ধর্মীয় কারণে তাঁর বাবা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন। বেঞ্জামিন ছিলেন তাঁর পঞ্চদশ সন্তান। তাঁর এই কনিষ্ঠ সন্তানটিকে চার্চের কাজে নিয়োজিত করবেন মনস্থ করে বেঞ্জামিনের বাবা তাকে গ্রামার স্কুলে পাঠালেন আট বছর বয়সের সময়। কিন্তু স্কুলের খরচ চালানো তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল। সেইজন্য বছর দুই বাদে ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে তাঁর ব্যবসায়ের কাজে নিযুক্ত করে দেন। তাঁর ছিল সাবান তৈরির একটি কারবার।

সাবান তৈরির কাজে মন বসল না, তখন বেঞ্জামিনের বাবা ছেলেকে ছাপাখানার কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। বেঞ্জামিনের ছিল পাঠে অদম্য আগ্রহ; হাতের কাছে যা পেতেন তা-ই তিনি পাঠ করতেন—ছেলের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করেই বেঞ্জামিনের বাবা তাকে ছাপাখানার কাজের যোগ্য মনে করলেন। তাঁর আর এক ছেলে, জেমস ফ্রাঙ্কলিনের বোষ্টনে একটি ছাপাখানার ব্যবসা ছিল। বারো বছর বয়সে দাদার ছাপাখানার কাজে ঢুকলেন বেঞ্জামিন।

কিছুকাল পরে, দাদার সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে বেঞ্জামিন ফিলাডেলফিয়া চলে এলেন। তখন তাঁর বয়স সতেরো বছর। ফিলাডেলফিয়াতে কিছুকাল একটি মুদ্রণ ব্যবসায় লিপ্ত থাকার পর, অবশেষে ১৭৪২ সালে তিনি ইংলণ্ডে এলেন। এইখানে বছর দুই অতিবাহিত হয় একটি ছাপাখানার কাজে। ১৭২৬ সালে ফ্রাঙ্কলিন ফিলাডেলফিয়াতে ফিরে এলেন এবং অল্পকাল পরেই একজন অংশীদারের সঙ্গে মিলে শুরু করেন মুদ্রণের ব্যবসা। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। শীঘ্রই

তিনি কারবারটির মালিক হলেন এবং ব্যবসায়ে আশাতীত কৃতকার্যতা লাভ করলেন। ১৭২৯ সালটি বেঞ্জামিনের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছরে তিনি 'পেনসিলভানিয়া গেজেট'-এর মালিক হলেন। এর চার বছর পরে তিনি সর্বপ্রথম প্রকাশ করলেন 'পুওর রিচার্ডস্ আলমানাক'। তখনকার দিনে মার্কিন উপনিবেশকারীদের কাছে এই জাতীয় গ্রন্থের খুবই সমাদর ছিল। এই বই লিখে তিনি প্রচুর অর্থলাভ করেছিলেন। এই বইখানি তাঁকে এনে দিয়েছিল অপরিমিত সম্পদ।

এইবার জনকল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন ফ্রাঙ্কলিন। ফিলাডেলফিয়াতে প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে পারস্পরিক কল্যাণসাধনের জন্য তিনি স্থাপন করলেন একটি ক্লাব। নাম দিলেন জুন্টো (Junto); এটিকে আমেরিকার প্রথম জনকল্যাণ সমিতি বলা চলে। এই সমিতিতে তিনি যতগুলি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন এবং যেগুলি তিনি পরে প্রকাশ করেছিলেন তা-ই ছিল তাঁর সংস্কারকর্মের ভিত্তি। ফ্রাঙ্কলিনের দৃষ্টি ছিল প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর এবং যে কোন বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল সমান। তাঁর অনুষ্ঠিত বিবিধ সংস্কারকর্মের তালিকাটি নিতান্ত ছোট নয়। প্রথমে আমরা দেখতে পাই তাঁকে নোটের (paper currency) স্বপক্ষে প্রচার-কার্যচালাতে এবং এই বিষয়ে একাধিক পুস্তিকা রচনা করতে। তারপর ১৭৩০ সালে তিনি সংগঠিত করলেন আমেরিকার প্রথম ভ্রাম্যমান পাঠাগার (Circulating Library); এটি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই কাজটির পরে তিনি গঠন করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম অগ্নিবীমা প্রতিষ্ঠান। শুধু কোম্পানি গঠন করেই তিনি নিরস্ত হলেন না—সেইসঙ্গে অগ্নিকাণ্ড নিবারণের ব্যবস্থাও করলেন। এ হলো ১৭৩৭ সালের ঘটনা। ১৭৪৪ সালে তিনি স্থাপন করলেন একটি দার্শনিক সমিতি। গ্রেট ব্রিটেন তখন স্পেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাই তাঁকে ফিলাডেলফিয়া শহরটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উদ্বিগ্ন হতে হলো।

তাঁর পরবর্তী কাজ ছিল একটি বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান (Academy) স্থাপন করা, যেটি ফ্রাঙ্কলিনের জীবিতকালেই ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। এই আকাদেমি স্থাপিত হয় ১৭৪৯ সালে। এর দু'বছর পরে তিনি তাঁর বন্ধু ডাক্তার বণ্ডকে আমেরিকার প্রথম হাসপাতাল স্থাপনে সহায়তা করেন। এত যে কাজ তিনি সম্পন্ন করতেন, এসবের প্রস্তুতির জন্য তিনি পুস্তিকা রচনা করতেন, খবরের কাগজে চিঠি ছাপাতেন এবং আধুনিক কালে প্রচারের জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে, সংস্কারমূলক কর্মে তিনি সেসব উপায় অবলম্বন করতেন।

এইবার তিনি বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। ইতিপূর্বে, ১৭৪২ সালে ফ্রাঙ্কলিন এক নতুন ধরনের অনাবৃত উনান (open stove) আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর আবিষ্ক্রিয়াটির জন্য তিনি কোন প্রকার পেটেন্ট (patent) নিতে সম্মত হননি। সম্মত না হওয়ার কারণ হিসাবে বেঞ্জামিন সেদিন এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন : 'I decline a patent on the grounds that, as we enjoy great

advantages from the inventions of others, we should be glad of an opportunity to serve others by any inventions of ours; and this we should do freely and generously.' বলা বাহুল্য, পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীদের অধিকাংশকে আমরা এই আদর্শের অনুসরণ করতে দেখেছি। এর বড়ো দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন রেডিয়ামের আবিষ্কারকে ক্যুরী-দম্পতি।

বেঞ্জামিনের আগ্রহ দেখা দিল বৈদ্যুতিক শক্তির প্রতি (Electricity)। তখন পদার্থ বিজ্ঞানে লিডেন জার (Leyden jar) আবিষ্কৃত হয়েছে। চিরকাল বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর অসীম কৌতূহল এবং নতুন যন্ত্রটির সাহায্যে তিনি শুরু করলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং শীঘ্রই তিনি বৈদ্যুতিক শক্তির একটি নতুন তত্ত্ব (Theory) আবিষ্কার করলেন; তিনি প্রমাণ করলেন, যে বৈদ্যুতিক শক্তি দুই রকমের—সত্ত্বমূলক (positive) ও নত্ত্বমূলক (negative)। বিজ্ঞান জগতে এই মতবাদ আজো স্বীকৃত। আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে ইলেকট্রিসিটির একাত্মতা তিনিই প্রথম সপ্রমাণ করেন এবং এর ফলেই তিনি Lightning conductor উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াগুলি, তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহ ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তিনি রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হলেন এবং ১৭৫৩ সালের জন্য তাঁকে কোপলে স্বর্ণপদক দান করা হয়। পরে যখন তিনি ইংলণ্ড পরিদর্শনে আসেন তখন ফ্রাঙ্কলিনকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত ডিগ্রীতে ভূষিত করেন (১৭৬২)। ১৭৩০ সালে যাঁকে আমরা দেখতে পাই সংগ্রামরত একজন প্রিণ্টার হিসাবে, ১৭৪৯ সালে তাঁকেই দেখি একজন জননেতা হিসাবে আর এক দশক কাল পরে সেই মানুষটিকে আমরা দেখতে পাই একজন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরূপে। প্রতিভার এমন সার্থক, বিচিত্র প্রকাশ খুব কম লোকের জীবনেই দেখা যায়।

ফ্রাঙ্কলিনের জীবন ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, জনসাধারণের কাজেই তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ। কিসে লোকের ব্যবহারিক জীবনে উন্নতি হয়, এই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তা এবং চেষ্টা। ১৭৩৬ সালে তিনি পেনসিলভানিয়া ব্যবস্থা পরিষদের করনিক (clerk) হয়েছিলেন। পরের বছরেই তাঁকে ফিলাডেলফিয়ার পোষ্টমাষ্টার পদে নিযুক্ত করা হয় এবং ১৭৫৩ সালে তাঁর ভাগ্যে আরো উচ্চপদ প্রাপ্তি ঘটলো—তিনি কলোনিয়াল পোষ্টাল সার্ভিসের কন্ট্রোলারের পদে নিযুক্ত হলেন। ইংলণ্ডে তাঁর পরিচয় ছিল আমেরিকার একজন বিখ্যাত ও সর্বজনমান্য নাগরিক হিসাবে এবং সেইজন্য তিনি ঐদেশে কিছুকাল আমেরিকার উপনিবেশ সমূহের এজেণ্টরূপে কাজ করেছিলেন।

একজন বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসাবে ফ্রাঙ্কলিনের অবদান বড়ো সামান্য ছিল না। ১৭৬০ সালে তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন তিনি একটি বই প্রকাশ করেন যেটি ইংরেজ জাতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল ও গ্রেট ব্রিটেনের

ঔপনিবেশিক নীতি নির্ধারণে সহায়ক হয়েছিল। বইটির নাম—'The interest of Great Britain considered with regard to Her colonies'; এই বইটি পাঠ করেই ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের সময় গ্রেট ব্রিটেন গুয়াদেলোপের পরিবর্তে কানাডার ওপর কর্তৃত্ব রাখতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুকূলে ফ্রাঙ্কলিন সেই সময়ে অনেক কাজ করেছিলেন। ইংলাণ্ডর রাজার প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ আনুগত্য, কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির ওপর গ্রেট ব্রিটেন যখন করভার চাপিয়ে দিয়েছিল তখন তিনি প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন।

ইংলণ্ডের অধীনতা পাশ ছিন্ন করার জন্য ১৭৭৬ সালে যখন আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হলো তখন ফ্রাঙ্কলিনের সংগঠনী প্রতিভা দেশের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল অকুণ্ঠভাবে। তিনি কংগ্রেসের একজন সদস্য হলেন ও ডাক বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব অর্থাৎ পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭৭৬ সালে তিনি প্রতিনিধি হিসাবে ফ্রান্সে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং দু'বছরের চেষ্টায় তিনি ঐদেশের সঙ্গে আমেরিকার সখ্যতা স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। এই মিত্রতার ফলে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্রান্স আমেরিকাকে ধনবল ও সামরিক সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হয়। য়ুরোপের একাধিক দেশে তিনি আমেরিকার স্বার্থকে তুলে ধরেছিলেন। য়ুরোপ থেকে ফিরে আসার পর তিনি পেনসিলভানিয়ার সর্বোচ্চ শাসন পরিষদের সভাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং ১৭৮৭ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এইসব রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যেও তিনি বৈজ্ঞানিক পুস্তিকা লিখেছেন ও প্রকাশ করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাসত্ব প্রথা অবলুপ্তির আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই বয়সে তাঁর কর্মোন্তম দেখে সবাই বিস্মিত হতো। ১৭৯০ সালে স্বল্পকাল রোগভোগের পর ফ্রাঙ্কলিনের মৃত্যু হয়।

বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি—এই চারটি বিষয়ে অজস্র রচনার মধ্যে বেঞ্জামিন তাঁর কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। 'He was our wise and benevolent father'—এই হলো তাঁর প্রতি তাঁর স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদনের ভাষা। সমগ্র পৃথিবীও ঠিক এইভাবেই তাঁকে জানিয়েছে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। জীবনে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন শুধু একটি ধর্মই আচরণ করে গিয়েছেন; সেটি হলো—জনসাধারণের কল্যাণসাধন। তাইতো মনীষী এমার্সন লোকহিতসাধক এই মানুষটিকে 'The greatest benefactor of the mankind'—এই বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বেঞ্জামিন সত্যিই এই রকমের একজন মানুষ ছিলেন। তিনি সর্বকালের সর্বদেশের মানবসমাজের গৌরবের পাত্র। ইতিহাসে তাঁর অবদান অক্ষয় হয়ে আছে—থাকবেও চিরকাল।

স্যামুয়েল জনসন

(১৭০৯-১৭৮৪)

"Life is like a pill which cannot he swallowed without gilding."—এই কথা বলেছিলেন জীবনধর্মের তপস্বী ডক্টর স্যামুয়েল জনসন। তাঁর এই উক্তিটির মধ্যেই আভাসিত হয়েছে জনসন-চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। এই সুপণ্ডিত, আত্মভোলা মানুষটির মধ্যে ছিল একটি আশ্চর্য মন। নিঃসঙ্গ জীবন তিনি কখনো যাপন করতে পারতেন না। সঙ্গী ভিন্ন তিনি যেন এক মুহূর্তও বাঁচতে পারতেন না—তা সে যে ধরনের সঙ্গীই হোক না কেন। মানুষকে তো বটেই, এমন কি পথের কুকুর বিড়ালকে পর্যন্ত তিনি তাঁর সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে পারতেন। মানুষের জীবনে নিঃসঙ্গতা অতি ভয়াবহ—এই ছিল জনসনের অভিজ্ঞতা আর এই সত্য তিনি উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ এবং এই শতাব্দীর ইংরেজ-চরিত্রের যত কিছু দোষগুণ তারই সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল জনসন-চরিত্র।

কিন্তু নিঃসঙ্গতার অভিশাপ জনসনের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। কারণ এই-ই তাঁকে সর্বদা সচল রেখেছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা তিনি সব সময়ে বাইরেই সমাধা করতেন এবং অধিকাংশ লোকই তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে যারপরনাই মুগ্ধ হতেন। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য আর কথোপকথনের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে অনেকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো। এক শ্রেণীর লোক ছিল যারা তাঁকে একেবারেই অপছন্দ করত।

পোশাক-পরিচ্ছদে চিরকাল উদাসীন ছিলেন জনসন। উদাসীন এবং নোংরা। বাদামী রঙের একটা ময়লা প্যাণ্টালুন, কোটটাও ঐরকম, পায়ে পুরনো একজোড়া জুতো আর মাথার উপর পারিপাট্যবিহীন পরচুলার স্তূপ। জনসনের 'উইগ' কখনো তাঁর মাথার সঙ্গে মানানসই ছিল না—মাথাটির তুলনায় হয় সেটা বড়ো, না হয় ছোট হতো। পায়ে থাকত কালো মোজা। ভাঁজ-পরা সার্টটি কতদিন ধরে যে গায়ে থাকবে সেদিকে ভদ্রলোকের ভ্রূক্ষেপই থাকত না। 'ডক্টর জনসন, আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ এমন অবিন্যস্ত, নোংরা কেন?'—একবার জনসনের এক বন্ধু তাঁকে এই প্রশ্ন করতে তিনি উত্তরে বলেছিলেন—'পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি আমার তেমন আগ্রহ নেই।' নিজের হাতদুটি ধোয়াতেও বুঝি তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না।

শুধু কি পোশাক-পরিচ্ছদের অপরিচ্ছন্নতা? মানুষটির আচরণও ছিল অদ্ভুত রকমের। হাসতেন উচ্চৈঃস্বরে—গণ্ডারের মতো। খুব গর্বিত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। অতিমাত্রায় অবিচক্ষণ। ঘুমতে অত্যন্ত আসক্ত। সহজেই বিরক্ত

হতেন। আবার তেমনি অল্পতেই হতেন উত্তেজিত। মেজাজ ছিল ভীষণ খিটখিটে। কথা যখন বলতেন তখন হাপরের মতো সরবে নিঃশ্বাস ফেলতেন আর সেই সঙ্গে গালদুটো ফোলাতেন এবং জিভ দিয়ে বিশ্রী রকমের টিকটিক আওয়াজ করতেন। যখন তিনি নৈরাশ্য বা বিষণ্ণভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন বা আক্রান্ত হতেন তখন তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, চীৎকার করতেন, কথা বলতেন আপন মনে আর এক ঘর থেকে অন্য ঘরে পায়চারি করতেন। আলাপচারী মানুষ বলে সর্বত্র জনসনের খ্যাতি ছিল সত্য, কিন্তু কারো সঙ্গে বাক্যালাপে তিনি আদৌ মনোযোগী ছিলেন না। আবার নিন্দুকও ছিলেন তিনি। শিষ্টাচারের ধার ধারতেন না।

ভালো জিনিস খেতে ভালোবাসতেন জনসন। ভোজনবিলাসী এবং উদরসর্বস্ব মানুষ ছিলেন তিনি। 'আর কেনই বা নয়'?—বলতেন তিনি। এ হেন যে অদ্ভুত মানুষ, যাঁকে বলা যেতে পারে বিপরীত আচরণের একটি মূর্তিমান বিগ্রহ, সেই স্যামুয়েল জনসনের খ্যাতি ও সামাজিক প্রতিপত্তির রহস্যটা কি ছিল? ধনী তিনি ছিলেন না, অভিজাত ঘরেও তাঁর জন্ম হয়নি, এমন কি তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যেও এমন কিছু নেই যা দৈবী প্রতিভার পরিচায়ক। সাংবাদিক-সুলভ রচনা ভিন্ন তিনি আর কি লিখেছেন? তথাপি এই জনসন, এই অদ্ভুত প্রকৃতির জনসন তাঁর সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন—সেদিনের ইংলণ্ডে 'ডক্টর স্যামুয়েল জনসন'—এই নামটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো। যে-কোন মজলিশে তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত এবং সবাই নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনতে চাইত তিনি কি বলেন! তাঁর ছিল প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর সাধারণ কথাবার্তা এমন জ্ঞানগর্ভ ছিল, এমন প্রাণবন্ত ছিল, এমন বেগবান অথচ হাস্যোদ্দীপক ছিল যে, শ্রোতারা সহজেই মুগ্ধ হতেন। সেই বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়দীপ্ত ও সুগভীর কণ্ঠস্বর সকলকেই অভিভূত করত আর বাইরের কর্কশতার অন্তরালে ছিল সেই সুন্দর হৃদয় যাকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুজন 'সবচেয়ে দয়ালু ও পরোপকারী' বলে উল্লেখ করেছেন। এমন পরোপকারী ব্যক্তি তাঁর সময়কার ইংলণ্ডে আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। কোমলে-কঠোরে এক বিচিত্র মানুষ।

তাঁর বিচিত্র জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেছেন বসওয়েল। বসওয়েল-রচিত 'জনসন-চরিত' ইংরেজী সাহিত্যে তো বটেই, এমন কি বিশ্ব-সাহিত্যেও একখানি শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ বলে আজো গণ্য হয়ে থাকে। তরুণ জনসন যেদিন লণ্ডনে এলেন ভাগ্যের অন্বেষণে, সেদিন থেকে বহুকাল পর্যন্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অনেক সময় তাঁকে কপর্দকহীনভাবে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। একটি আশ্রয়ের অভাবে অনেক রাত তাঁকে লণ্ডনের রাস্তায় হেঁটেই কাটাতে হয়েছে। কতো রকমের লেখা (জনসনের নিজের কথায় 'hack writing') তাঁকে এইসময়ে লিখতে হয়েছে—অনুবাদ, স্যাটায়ার, সমালোচনা, খবরের কাগজে রিপোর্টিং, দোকানের ক্যাটালগ তৈরি করে দেওয়া ইত্যাদি। বিনিময়ে পেতেন অতি সামান্য পারিশ্রমিক। তাই সময় সময় নিজের উপর ধিক্কার দিয়ে জনসন বলতেন,

কেনই বা তিনি লণ্ডনে এসেছিলেন ভাগ্যের অন্বেষণে। আবার এই লণ্ডনেই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর স্থিতিভূমি। এই লণ্ডনকে সত্যিই তিনি ভালোবাসতেন। পুরুষ যেমন ভালোবাসে একজন নারীকে, ঠিক তেমনভাবেই তিনি এই শহরকে ভালোবেসেছিলেন।

তাঁর যৌবন-পূর্ব দিনগুলিও সুখের ছিল না। জীবনে অবমাননার তিক্ত অভিজ্ঞতা তখন থেকেই। অপূর্ব প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিমান ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও অক্সফোর্ড পেমব্রোক কলেজে তিনি যে কয় বছর যাপন করেছিলেন, সেই বছরগুলি ছিল কল্পনাতীত দুঃখকষ্টের বছর। সে সব দিনের স্মৃতি তিনি জীবনে ভুলতে পারেন নি। তাঁর বাবা দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ফলেই এই দুরবস্থা ঘটেছিল তখন। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি স্থূলাঙ্গী কিন্তু অতিমাত্রায় জমকাল এক বিধবা মহিলার পাণিগ্রহণ করলেন। বিধবাটি ছিলেন বার্মিংহামের একজন বস্ত্রব্যবসায়ীর পত্নী। মিসেস পোর্টার হলেন মিসেস জনসন। জনসনের চেয়ে বয়সে তিনি কুড়ি বছরের বড়ো ছিলেন। কিন্তু মহিলাটির ছিল বাৎসরিক প্রায় হাজার পাউণ্ড আয়ের একটি সম্পত্তি। এই সামান্য মূলধন সম্বল করে তাঁরা দু'জনে আরম্ভ করলেন একটা স্কুল। ইংলণ্ডের স্বনামধন্য অভিনেতা ডেভিড গ্যারিক ছিলেন এই স্কুলের ছাত্র। আঠার বছর পরে স্কুলটি উঠে যায়। জনসনের বয়স যখন তেতাল্লিশ বছর তখন তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই জনসনের জীবনে খ্যাতি আসতে থাকে; এই খ্যাতি তিনি উচ্চমূল্যেই লাভ করেছিলেন। ১৭৬২ সনে যখন তাঁর Dictionary of English Literature বইখানি প্রকাশিত হয় তখন থেকেই তিনি খ্যাতির মুখ দেখতে আরম্ভ করেন। বইখানি শুধু উচ্চপ্রশংসিত হয়নি, পরিশ্রমসাধ্য এই সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি বাৎসরিক তিনশো পাউণ্ডের একটি বৃত্তিও লাভ করেন। এর ফলে কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা এলো বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঘরে ও বাইরে তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল অনেকেই। তাছাড়া, রাস্তার ভিখারীদের তিনি দান করতেন মুক্তহস্তে আর দুঃস্থ সাহিত্যিকদের অর্থসাহায্য দানে তিনি সর্বদাই ছিলেন অকাতর। এমন কি বিড়াল কুকুর পর্যন্ত তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত হয়নি।

জনসন দেখতেন জীবনের সকল দিক, আর বসওয়েল পর্যবেক্ষণ করতেন জনসন-চরিত্রের সকল দিক। ছায়ার মতো তিনি জনসনকে অনুসরণ করতেন। তাই আজ আমরা যে জনসনকে দেখি তা প্রকৃতপক্ষে বসওয়েলের চোখ দিয়েই দেখি। বসওয়েল-রচিত জনসনের জীবন-চরিত, বিশ্বের জীবনীসাহিত্যে আজো অতুলনীয় হয়ে আছে।

সর্বদা কাজের মধ্যে, সাহিত্যকর্মের মধ্যে ডুবে থাকতেন জনসন। সাহিত্যই ছিল তাঁর ধর্ম। কাজ ভিন্ন তিনি এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না। বলতেন—
A man must do something, for the mind stagnates for want of employment, grows morbid and is extinguished like a

candle in foul air.' জীবনের পাত্রে কর্মৈষণা আর কর্মের যে আহিতাগ্নি তিনি চয়ন করেছিলেন, কোনো প্রতিকূল বাতাসেই তিনি সেই ইচ্ছা বিঘ্নিত বা অগ্নি নির্বাপিত হতে দেননি। তাই শেষ বয়সে যখন তিনি The Lives of the Poets (দশখণ্ডে বিরচিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৭৭৯ ও ১৭৮১ সনে) গ্রন্থখানি লিখলেন, তখন জনসনের কর্মক্ষমতা দেখে সবাই বিস্মিত হলো। জীবনীকার ও সমালোচক জনসনের পরিচয় আছে এই গ্রন্থে। তিনি কবিতা লিখতে পারতেন না সত্য, কিন্তু একটি কবিতা পাঠ করে বলতে পারতেন সেটি সত্যিকারের কবিতা হয়েছে কিনা। ইংরেজী সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক হিসাবে জনসন তাই আজো হয়ে আছেন অগ্রগণ্য। এ যুগের বিদগ্ধ কবি ও সমালোচক টি.এস. এলিয়ট জনসনের সমালোচনার খুব মূল্য দিয়েছেন।

জনসনের প্রতি পৃথিবীর বিদগ্ধজন এমন অনুরাগ পোষণ করেন কেন? তার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর সাহিত্যপ্রীতিই তাঁকে এমন শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। সাহিত্য ছিল তাঁর প্রাণ, তাঁর অস্তিত্ব। সাহিত্যকর্মকে জনসন তাঁর জীবনের সবচেয়ে দায়িত্বমূলক কর্তব্য বলে মনে করতেন। সে দিনের ইংলণ্ডে অন্যের চেয়ে তাঁরই মতামতের মূল্য ছিল সবচেয়ে বেশি এবং সর্বজনগ্রাহ্য। বহুবিধ ভুলত্রুটি ও তথ্যগত অসঙ্গতি সত্ত্বেও জনসন-কৃত 'কবিজীবনী' তাঁর একমাত্র প্রশংসনীয় সাহিত্য-কীর্তি। বার্নার্ড শ বলেছেন, 'স্যামুয়েল জনসনের তুল্য মানবচরিত্রের এমন দরদী পর্যবেক্ষক ইংলণ্ডে খুব কমই জন্মেছেন।' জনসনের মৃত্যুর পরে তাঁকে ওয়েস্ট-মিনিস্টার এ্যাবেতে সমাধিস্থ করা হয়। এই সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল।

রুসো

(১৭১২-১৭৭৮)

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—প্রতিভা পাগলামির নামান্তর মাত্র। রুসোর জীবন এর একটি বড়ো দৃষ্টান্ত। এক ঘড়ি-প্রস্তুতকারকের দ্বিতীয় পুত্ররূপে জেনিভা শহরে জাঁ জ্যাক্‌স রুসোর জন্ম। পিতা-মাতা দু'জনেই ছিলেন ফরাসীদেশীয় এবং ক্যালভিন সম্প্রদায়ভুক্ত। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ার পরে ষোল বছর বয়সে রুসো গৃহ থেকে পলায়ন করেন ও কপর্দকহীন অবস্থায় ইতালীর স্যাভয় প্রদেশ উপস্থিত হন। শৈশবে পঠিত প্লুটার্কের লেখা জীবনীসমূহ তাঁর উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। পলাতক জীবনেই তিনি পৈতৃক ধর্ম বর্জন করেন ও ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে কিছুদিনের জন্য একটা পোশাকের দোকানে তিনি চাকরি করেন এবং পরে এক মহিলার ভৃত্যের কাজও করেন। অস্থিরচিত্ত, অলস ও স্বপ্নাতুর প্রকৃতির জন্য কোনো কর্মেই রুসো সফলকাম হতে পারেন নি। অথচ ভবিষ্যতের জন্য কোনো চিন্তাই তাঁর ছিল না। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন ও ভলটেয়ারের গ্রন্থাবলী আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন। কিন্তু অধ্যয়নের কোনো সুনিশ্চিত প্রণালী অনুসরণ না করার ফলে ইচ্ছানুরূপ সফলতা তিনি লাভ করতে পারেন নি।

একদা তাঁরই কণ্ঠ আশ্রয় করে য়ুরোপের সাধারণ মানুষ কথা বলেছে। ইতিহাসে রুসোকে তাই 'Voice of the common man' এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। ফরাসীবিপ্লবের মন্ত্রগুরু তিনি। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর চিন্তার অসীম প্রভাব। মাত্র পনর লুই মুদ্রা সম্বল করে উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি প্যারিসে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল একখানা নাটকের পাণ্ডুলিপি ও সংগীতের স্বরলিপির নূতন পদ্ধতি। সাঁইত্রিশ বছর বয়সেও রুসোর জীবনে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি। তখনো এই চির-চঞ্চল প্রকৃতির মানুষটি তাঁর জীবনের লক্ষ্যের সন্ধান পান নি। একদিন রুসো চলেছেন তাঁর কারারুদ্ধ এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। জায়গাটা ছিল প্যারিস থেকে ছয় মাইল দূরে। রুসো চলেছেন পদব্রজে। সঙ্গে ছিল একখানি সাহিত্য পত্রিকা। হঠাৎ তার পাতা ওল্টাতেই একটা বিজ্ঞাপনের প্রতি নিবদ্ধ হয় তাঁর দৃষ্টি। বিজ্ঞাপনটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেন তিনি। একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান থেকে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে। প্রবন্ধের বিষয় বড়ো বিচিত্র—'বিজ্ঞান ও কলার উন্নতি দ্বারা মানুষের নৈতিক উন্নতি বা অবনতি হয়েছে।' সাঁইত্রিশ বছর বয়সের সেই ভবঘুরের মনে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করা মাত্র প্রবল আলোড়ন দেখা দিল। হাজার রকমের ভাব যেন তাঁর মনের মধ্যে কলরব করে উঠল। ভাবের উত্তেজনায় তাঁর

শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়। একটি গাছের তলায় বসে তিনি আধঘণ্টা নিভৃত চিন্তায় অতিবাহিত করলেন। সেই সুগভীর চিন্তা থেকে যখন তিনি বুত্থিত হলেন, তখন তিনি এক নূতন রুসো। সত্যের সন্ধান পেলেন তিনি—পেলেন সেই মুহূর্তে নিজের স্বরূপের পরিচয়। এই যে মানস-উদ্ভাসন, একেই বলা হয় সত্তার নবজন্ম। অথবা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

ফরাসী সমাজ তখন অশান্তির আগুনে অল্প অল্প ধূমায়িত হচ্ছিল। অনিয়ন্ত্রিত রাজশক্তির অধীনে নৈতিক শিথিলতা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছিল। মানব জীবনের মহত্ত্বে সর্বশ্রেণীর মধ্যে প্রসারিত হচ্ছিল সন্দেহ। রুসোর বিদ্রোহী সত্তা সেই নির্জন মুহূর্তে যেন প্রচণ্ড বেগে বিস্ফুরিত হয়ে পড়ল। এইবার তাঁর লেখনী মুখে—সমাজের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও অনাচার উদ্ঘাটিত হওয়ার সময় এল।

রুসো সেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে প্রবন্ধ লিখে পাঠালেন। আরো কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিচারকগণ কিন্তু সেই অজ্ঞাতনামা লেখকের প্রবন্ধই প্রথম পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচনা করলেন। বিদগ্ধ পাঠকসমাজ রুসোর সেই প্রবন্ধের মধ্যে বিপ্লবের ইঙ্গিত দেখতে পেলেন। সমগ্র প্রবন্ধটিতে তিনি এই কথাটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান সুনীতির প্রধান শত্রু। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো, নির্মল নীল আকাশে বিদ্যুৎ উদ্ভাসনের মতো, এই প্রবন্ধটির অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক চিন্তা ফরাসীর মানসলোক উদ্দীপ্ত ও সচকিত করে তুলল। এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসের উদয়াচলে একটি নূতন প্রতিভার অভ্যুদয় ঘোষিত হলো।

হস্তে লেখনী ধারণ করে রুসো থামতে পারলেন না। প্রথম প্রবন্ধের সফলতায় তাঁর চিন্তার স্রোত প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হতে থাকে এবং তখন থেকে একের পর এক যেসব চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে উদিত হতে থাকে, বিস্তারিত ভাবে সেগুলি বর্ণনা করবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সমাজের সর্বাঙ্গে বর্তমান অত্যাচার ও দুর্গতি তাঁকে পীড়া দিতে লাগল। রুসোর স্বভাবেরও সম্পূর্ণ পরিবর্তন লক্ষিত হলো। অসীম সাহসে এইবার তিনি অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর হতে মনস্থ করলেন। তাঁর যেন কেবলই মনে হতে লাগল যে প্রচণ্ড কশাঘাত ভিন্ন এই সমাজের মুক্তি নেই, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই।

১৭৫৩। প্রকাশিত হলো রুসোর Discourse on the Origin of Inequality—সমাজে ও রাষ্ট্রে বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা এই গ্রন্থে তিনি প্রতিপাদন করলেন—'ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সামাজিক বৈষম্যের মূল।' এই গ্রন্থে রুসো রাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান যথেচ্ছাচার প্রতিরোধের জন্য উত্থাপিত বিদ্রোহকে বিধিসম্মত কার্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর সেই অগ্নিগর্ভ ঘোষণা যেন ইতিহাসের নিস্তরঙ্গ বুকে প্রচণ্ড আলোড়ন জাগিয়ে তুলল। গ্রন্থরচনায় যেমন, তেমনি তর্কযুদ্ধে রুসো ছিলেন অপরাজেয়। নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য বহুজনের সঙ্গে তিনি বিতর্কে প্রবৃত্ত হতেন। সেই লাজুক ও স্বল্পবাক্ মানুষটির রসনা এখন হয়ে উঠল ক্ষুরধার।

চুয়াল্লিশ বছর বয়সে রুসো এক নিভৃত কুটীরের অধিবাসী হলেন। এর নাম তিনি দিয়েছিলেন 'হার্মিটেজ'। প্যারিস শহর ত্যাগ করে, সংসার ও সমাজ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি এলেন মণ্ট মরেনসির নির্জন অরণ্যে। সেই বনে এক কুটীর নির্মাণ করে একাকী বাস করতে লাগলেন। তাঁর এই নির্জনবাসের কারণ বর্ণনা করে এক পত্রে রুসো লিখেছিলেন—'লোকালয় ত্যাগের প্রকৃত কারণ আমার অদম্য স্বাধীন প্রকৃতি। এই প্রকৃতির কাছে পার্থিব সম্মান, ধনসম্পদ—কিছুরই কোনো মূল্য নেই। এই প্রকৃতি আমার অহংকার থেকে উদ্ভূত নয়, আমার মজ্জাগত আলস্য থেকে উদ্ভূত। রুসোর সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিল একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা—অখণ্ড অবসর ও পরিপূর্ণ মানসিক শান্তি।

রুসো এইবার গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করলেন। লিখলেন La Nonvetta নামক অমর উপন্যাস। তখন তাঁর বয়স চুয়ান্ন বছর। বিরূপ সমালোচনা, বিশেষ করে ভলটেয়ারের নীচ আক্রমণ সত্ত্বেও এই উপন্যাসখানি ফরাসীর জনসাধারণ কর্তৃক বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়। অতঃপর তিনি তাঁর নির্জন অরণ্যবাস ছেড়ে চলে এলেন লুক্সেমবার্গের ডিউকের আশ্রয়ে। বাস করলেন এখানে চার-পাঁচ বছর। এই সময়েই তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Social Contract' রচিত ও প্রকাশিত হয়; শিক্ষা সম্বন্ধীয় 'Emile' বইখানিও প্রকাশিত হয় এই সময়ে। শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আধুনিক সকল মতই রুসোর এই গ্রন্থখানি দ্বারা প্রভাবিত। জেনিভার প্রসিদ্ধতম নবশিক্ষা প্রতিষ্ঠান রুসোর নামেই স্থাপিত। অথচ এই বইখানি বেরুবার পর তাঁর জীবনে যে উৎপীড়ন শুরু হয় তা অবর্ণনীয়। 'এমিলি' প্রকাশিত হওয়ার কুড়ি দিনের মধ্যেই পার্লামেন্টের আদেশে প্যারিসের বিচারালয়ের সামনে এই গ্রন্থ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। গ্রন্থের সঙ্গে গ্রন্থকারকেও হয়ত পুড়িয়ে মারা হতো যদি রুসো সেখানে উপস্থিত থাকতেন—প্যারিসের একশ্রেণী এমনি ক্ষিপ্ত হয়েছিল তাঁর রচনা সম্পর্কে। তিনি পালিয়ে এলেন সুইজারল্যাণ্ডে। শত্রুরা সেখানেও তাঁর অনুসরণ করল। জেনিভার প্রকাশ্য রাজপথেও 'এমিলি' আগুনে দগ্ধ হলো।

সর্বত্রই তাই হলো। সমস্ত য়ুরোপ রুসোর বিরুদ্ধে অভিসম্পাত-বাণী উচ্চারণ করল। একজন মাত্র ব্যক্তির একটি রচনাকে উপলক্ষ্য করে এমন প্রচণ্ড ক্রোধ পূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। সুইজারল্যাণ্ডে বাস অসম্ভব হয়ে উঠল। সেখান থেকে পালিয়ে তিনি প্রাসিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের রাজ্যে আশ্রয় নিলেন। এলেন সেখানকার এক গ্রামে। এখানে আড়াই বছর বাস করার পর পুরোহিতদের আক্রমণে আর তিষ্ঠোতে পারলেন না। অবশেষে ভাগ্যবিড়ম্বিত রুসো সে স্থান ত্যাগ করে ইংলণ্ডের উদার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি পেলেন। প্যারিসে এসে একটি সামান্য গৃহে স্বরলিপি নকল করে তিনি দরিদ্রভাবে জীবন-যাপন করতে থাকেন। তখন তাঁর আত্মচরিত লেখা শেষ হয়েছে। এর নাম দিয়েছিলেন Confessions। রুশোর আত্মজীবনী এই জাতীয় রচনার মধ্যে আজো অপরাজেয় হয়ে আছে। এই গ্রন্থের একস্থলে তিনি

লিখেছেন—'পৃথিবীতে আমি একা। বন্ধু নেই, প্রতিবেশী নেই, আমি ছাড়া আমার কেউই নেই। মানুষের মধ্যে যে ছিল সবচেয়ে স্নেহশীল ও সদালাপী তাকেই সকলে বর্জন করেছে।…কিন্তু গহ্বরের তলদেশে হতভাগ্য মরণশীল মানুষ আমি শান্তভাবেই আছি—শান্ত কিন্তু ঈশ্বরের মতোই সকল সুখ-দুঃখের অতীত।' অরণ্যের নিস্তব্ধতার মধ্যে বিষাদময় বৃদ্ধ নাইটিংগেলের মধুর সংগীতের মতোই 'কনফেশনস্'-ই রুসোর শেষ গ্রন্থ। য়ুরোপে গ্যেটের আত্মচরিতের মতোই বহু পঠিত হলো তাঁর আত্মচরিত। রুসোর রাজনৈতিক মত তাঁর 'সোশ্যাল কনট্রাস্ট' গ্রন্থে বিবৃত আছে। এই তাঁর একমাত্র গ্রন্থ যার মধ্যে ভাবুকতা বেশি নেই, যুক্তিতর্ক আছে প্রচুর। স্বাধীনতাই দৃশ্যত তাঁর চিন্তার লক্ষ্য হলেও, মুখ্যত তিনি ছিলেন সাম্যের পূজারী। স্বাধীনতার বিনিময়ে তিনি সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। রুসোর ধর্মমত উল্লিখিত হয়েছে তাঁর 'এমিলি' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে—'Confession of a Savoyard Vicar', এই অধ্যায়টি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে জানা যায় যে, ঈশ্বরে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এই বিশ্বাস বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। হৃদয়ের অনুভূতি ছিল এর ভিত্তি।

রুসোর মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির প্রতিভার একত্র সমাবেশ হয়েছিল। তাঁর চিন্তাধারা কেবল যে বৈপ্লবিক ছিল, তা নয়। তাঁর রচনারীতিই ছিল স্বতন্ত্র রকমের। মনের নিভৃতচিন্তার রূপায়ণে তিনি ছিলেন দক্ষ। তাঁর রচনা-কৌশলে তাঁর চিন্তা যেন বাঙ্ময় হয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। রুসো সত্য 'আমি'-র সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর স্বাতন্ত্র্য এইখানেই। রুসোর মৃত্যু সম্বন্ধে দুটি মত আছে। ১৭৭৮ সনের ২রা জুলাই তারিখে যখন সকালে তাঁর শয়নকক্ষে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল তখন তাঁর সমস্ত মুখখানি অস্বাভাবিক রকম ফুলে উঠেছিল। চিকিৎসকগণ সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি সন্ন্যাসরোগ, না আত্মহত্যায় রুসোর জীবনাবসান ঘটেছিল। তবে ঐতিহাসিকগণের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, রুসোই প্রকৃতপক্ষে ফরাসী বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে গিয়েছিলেন।

অ্যাডাম স্মিথ

(১৭২৩—১৭৯০)

স্কটল্যাণ্ডের ফার্থ অব ফোর্থের উত্তরে অবস্থিত কারকালডি শহরে ১৭২৩ সনের ৫ই জুন অ্যাডাম স্মিথ জন্মগ্রহণ করেন। য়ুরোপ তথা সমগ্র পৃথিবীতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক হিসাবে তিনি আজো স্বীকৃত। অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের মানস-উজ্জীবনের ইতিহাসে তাঁর প্রতিভা, পাণ্ডিত্য এবং চরিত্র একটি নূতন অধ্যায় সংযোজন করে দিয়েছিল। স্মিথ পরিবার ঐ অঞ্চলের মধ্যে একটি প্রাচীন খ্যাতনামা পরিবার ছিল। স্কুলের পাঠ শেষ হলে পরে অ্যাডাম গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এখানে তিনি গণিত ও ন্যাচারাল ফিলজফি অধ্যয়ন করতে থাকেন। ছাত্র হিসাবে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে পরীক্ষান্তে একটি বৃত্তি লাভ করেন। বালক অ্যাডামের স্বপ্ন ছিল যে, তিনি বড়ো হয়ে ইংলণ্ডের জ্ঞানানুশীলনের সর্বশ্রেষ্ঠ পীঠস্থান অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার, তাঁহাদের আর্থিক সঙ্গতিও তেমন ছিল না। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, যাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন তাঁদের জীবনের চালক তাঁদের হৃদয়ের উচ্চাভিলাষ। অ্যাডামের মনের মধ্যেও ছিল তেমন উচ্চাভিলাষ। তাই তিনি যখন বৃত্তিলাভ করলেন তখন ঐ বৃত্তির টাকা অবলম্বন করে তিনি প্রবিষ্ট হলেন অক্সফোর্ডের ব্যালিয়ল কলেজে এবং একাদিক্রমে তিনি ছয় বৎসরকাল এই কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

ছাত্র জীবনের প্রারম্ভ থেকেই বালক অ্যাডামের মধ্যে অসামান্য স্মৃতিশক্তির স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তিনি তখন থেকেই গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ব্যালিয়ল কলেজে যখন তাঁর অধ্যয়ন শেষ হলো তখন তিনি ধর্মযাজকের বৃত্তি অবলম্বন করবেন ঠিক করলেন। তাঁর পিতারও সেইরকম ইচ্ছা ছিল। কারণ, যদিও তিনি একজন উচ্চ সরকারী কর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি ধর্মযাজক হওয়ার জন্য তাঁর মনে একটা প্রবল আগ্রহ ছিল। তাই পুত্রকে দিয়ে পিতা তাঁর সেই আগ্রহ চরিতার্থ করবেন ঠিক করেছিলেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইংলণ্ডে যত মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা স্ব স্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন' হয় ধর্মযাজকের পুত্র, অথবা ধর্মযাজকের বংশোদ্ভূত। কিন্তু তাঁর অক্সফোর্ডের অভিজ্ঞতা আর ডেভিড হিউমের বিখ্যাত 'Treatise' গ্রন্থখানির প্রভাব তরুণ স্মিথের মত-পরিবর্তনে সহায়তা করল। তিনি ধর্মযাজক হওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন।

ডেভিড হিউমও (১৭১১-১৭৭৬) স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে একখানি বই রচনা করেন। বইটির নাম—'Treatise on Human Nature'। এই বহু-বিতর্কিত বইখানি প্রকাশিত হওয়া মাত্র সমগ্র খ্রীষ্টান জগতে এক প্রবল আলোড়ন দেখা গিয়েছিল। যদিও এই পুস্তকের অন্তর্গত বিষয়বস্তু প্রচলিত গোঁড়ামিকে আঘাত করেছিল, তথাপি হিউমের ঐ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ইংলণ্ডে সংস্কারমুক্তির আগমনী সুস্পষ্ট ভাবেই ঝঙ্কৃত হয়েছিল।

স্কটল্যাণ্ডে দু'বছর অতিবাহিত করার পর ১৭৪৮ সনে তিনি এলেন এডিনবার্গে! এইখানেই তাঁর সঙ্গে ডেভিড হিউমের প্রথম পরিচয় ও পরবর্তী চার বৎসর কালের মধ্যেই সেই পরিচয় নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড হিউম—এই দুই চিন্তানায়কের বন্ধুত্ব ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে—যেমন মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বন্ধুত্ব। স্মিথ ও হিউম দু'জনে একত্রে বহুকাল বাস করেছেন আর পঁচিশ বছর ধরে উভয়ের মধ্যে চলেছিল অজস্র পত্র-বিনিময়। হিউমের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত এক লোকসভায় স্মিথ বলেছিলেন যে, গ্রেট ব্রিটেনের চিন্তলোকের সংস্কারমুক্তি সাধনে হিউমের কৃতিত্ব অসাধারণ। অলৌকিকের উপর বিশ্বাসকে তাঁর চেয়ে সার্থকভাবে ও প্রবলভাবে আর কেউ আক্রমণ করতে পারেননি। উভয়ের প্রকৃতি ও মননশীলতার সমমর্মিতাই ছিল এই বন্ধুত্বের কারণ। স্মিথের জীবনীকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—স্মিথ ভিন্ন হিউম-হিউম হতেন কিনা বলা যায় না। তবে অনেকের বিবেচনায় একথা নিশ্চিত যে, হিউমের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব ভিন্ন অ্যাডাম স্মিথ কোনো দিনই অ্যাডাম স্মিথ রূপে ফুটে উঠতে পারতেন না।

১৭৫১ সালে অ্যাডাম স্মিথ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং এর ঠিক চার বছর পরেই ঐখানেই তিনি নৈতিক দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে বৃত হন। তখনকার দিনে ময়্যাল ফিলজফির ভালো অধ্যাপক সচরাচর পাওয়া যেত না। কারণ বিষয়টি ছিল কঠিন। এই কঠিন বিষয়ে অধ্যাপনার চিরাচরিত প্রথা বর্জন করে স্মিথ তাঁর ক্লাস লেকচারের মধ্যে এমন সব জিনিস পরিবেশন করতেন যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট বলে তার ছাত্রদের নিকট বিবেচিত হতো। তাঁর পূর্বে এই বিষয়টির পঠন-পাঠনে অধ্যাপকগণ তেমন মনঃসংযোগ করতেন না এবং যতটুকু করতেন তার অধিকাংশই ছাত্রদের নিকট অনধিগম্য থেকে যেত। ফলে ঐ শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু অধ্যাপক স্মিথ যেদিন থেকে ঐ বিষয়ে পড়াতে আরম্ভ করেন, তখন দেখা গেল যে ঐ শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা শুধু যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, পরন্তু ঐ বিষয়টি সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটা গভীর আগ্রহও পরিলক্ষিত হয়েছে যা পূর্বে কখনো দেখা যায় নি।

অধ্যাপক হিসাবে স্মিথ অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর একটি ত্রুটি এই ছিল যে, তিনি কথাবার্তায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন না, তাই তাঁর লেকচার অনেক সময়ই ছাত্রদের নিকট হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠত না। পাণ্ডিত্য ও মৌলিক চিন্তায়

যদিও তিনি তাঁর বন্ধু হিউমের সমকক্ষ ছিলেন, কিন্তু বাগ্মিতায় স্মিথ বন্ধুর তুল্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেন নি।

১৭৬৩। অ্যাডাম স্মিথের জীবনে এই বৎসরটি সবচেয়ে স্মরণীয় বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই বছরে একদিন তাঁর হাতে এসে পৌঁছল একখানি অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণলিপি; আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তৎকালীন ইংলণ্ডের অন্যতম বিদগ্ধ ব্যক্তি চার্লস টাউনসেণ্ড। জনৈক ডিউক য়ুরোপ ভ্রমণে বহির্গত হবেন; ভ্রমণের সঙ্গী হিসাবে তার একজন সুপণ্ডিত লোকের দরকার এবং তাঁকে এজন্য উপযুক্ত বেতন ও অন্যান্য সুবিধাও দেওয়া হবে। টাউনসেণ্ডের পত্রে এই সংবাদই ছিল এবং পত্রের শেষে তিনি তাঁকে জানালেন যে, যদি স্মিথ ঐ ডিউকের ভ্রমণসঙ্গী হতে রাজী থাকেন তাহলে তিনি তাঁকে সুপারিশ করতে পারেন। বলা বাহুল্য, স্মিথ ঐ পদ গ্রহণের জন্য আগ্রহান্বিত হলেন। যথা সময়ে ডিউকের কাছ থেকে তিনি পেলেন একখানি নিয়োগপত্র। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে ইস্তফা দিলেন। শুরু হলো স্মিথের জীবনে একটি নূতন অধ্যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর এই ভ্রমণ বৃথা হয়নি। প্যারিসে এসে তিনি দু'জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের সঙ্গে পরিচিত হন। এই পরিচয় তাঁর 'দি ওয়েলথ অব দি নেশনস' গ্রন্থ রচনার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। তিন বছর পরে ভ্রমণ শেষে তাঁরা লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করলেন। লণ্ডন থেকে স্মিথ এলেন স্বদেশে এবং সেইখানে একাদিক্রমে দশটি বছর অবস্থান করলেন। কথিত আছে, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না—কারো সঙ্গে তিনি দেখাসাক্ষাৎ বা পত্রালাপ পর্যন্ত করতেন না। দশ বছর এই ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করে, অ্যাডাম স্মিথ তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থটির রচনাকার্য শেষ করেন এবং ১৭৭৬ সালের গোড়াতেই উহা দুইটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তখন বইটির নাম ছিল—'Inquiry into the Nature and Courses of the Wealth of Nations'; পরবর্তীকালে এই নামটি সংক্ষিপ্ত হয়ে পরিচিত হয়। অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে তথা সমগ্র য়ুরোপে স্মিথের এই যুগান্তকারী বইখানির প্রকাশ একটি স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে গণ্য হয়েছিল।

বন্ধু হিউম তখন মৃত্যু শয্যায় যখন স্মিথের এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। স্মিথ তাই সর্বাগ্রে বন্ধুর মতামত জানবার জন্য তাঁকে গ্রন্থ পাঠিয়ে দিলেন। রোগ-শয্যায় শায়িত অবস্থায় বইটি আদ্যন্ত পাঠ করে হিউম তাঁর বন্ধুকে অভিনন্দিত করেছিলেন। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মিথ হয়ে উঠলেন জগদ্বিখ্যাত। এর আগে তাঁর খ্যাতি ছিল একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি হিসাবে, ময়্যাল ফিলজফির একজন লেখক হিসাবে এবং তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় ছিল তিনি হিউমের একজন বন্ধু। দেখতে দেখতে বিদগ্ধসমাজে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হলো বইখানিকে কেন্দ্র করে—তেমন আলোড়ন ইতিপূর্বে খুব কমই দেখা গিয়েছিল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা নবদিগন্ত উন্মোচিত করে দিলেন তিনি। খ্যাতি যেমন

পেলেন, তেমনি বিরোধিতার সম্মুখীনও তাঁকে হতে হলো। অনুকূল সমালোচনা যেমন হলো, গ্রন্থটির প্রতিকূল সমালোচনাও বড়ো কম হলো না।

কিন্তু প্রতিকূল সমালোচনার ঝটিকা সত্ত্বেও দেখা গেল যে, রাষ্ট্রনেতা ও বিদগ্ধজন সকলেই এই বইখানির প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই তাঁদের সকলের চিন্তাকে প্রভাবিত করলেন স্মিথ। প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি বিস্ময়।

অতঃপর স্মিথ কিছুকাল লণ্ডন শহরে অবস্থান করতে থাকেন এবং সেখানকার বিদগ্ধসমাজে তিনি বিশেষ সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হলেন। এইভাবে লণ্ডনে দু'বছর অতিবাহিত করে, ১৭৭৮ সনের শেষভাগে স্মিথ এলেন স্কটল্যাণ্ডে সেখানকার শুল্ক-বিভাগের অন্যতম কমিশনাররূপে। তখন থেকে তিনি এডিনবার্গে অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু সরকারী চাকরিতে তাঁর সময়ের অপব্যবহার হতে থাকে। সরকারী কাজের নথিপত্রের আড়ালে তিনি যেন একরকম হারিয়ে গেলেন। তাঁর জীবনীকারের মতে, এই চাকরি গ্রহণের পর থেকেই অ্যাডাম স্মিথের জীবনের অবশিষ্টকাল ছিল একেবারেই ঘটনাবিহীন ও বর্ণবিরল। ১৭৮৪ সনে তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে এবং সেই অবস্থায় ১৭৯০ সনের জুলাই মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর তিন বছর আগে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টরের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এইটাই ছিল স্মিথের জীবনে সবচেয়ে বড়ো সম্মানলাভ। এডিনবার্গের ক্লেটন পর্বতের সানুদেশে কাছাকাছি দুটি সমাধিক্ষেত্র আজো বিদ্যমান ; তার একটিতে ডেভিড হিউম আর অপরটিতে তাঁরই প্রিয়তম বন্ধু অ্যাডাম স্মিথ সমাহিত হয়ে আছেন।

সেই পিট ও ফক্সের কাল থেকে প্রায় দুইটি শতাব্দী অতিক্রম হতে চলেছে। তথাপি অ্যাডম স্মিথের 'দি ওয়েলথ অব দি নেশনস' গ্রন্থের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। য়ুরোপ তথা পৃথিবীতে পলিটিক্যাল ইকনমির বেদী রচনা করে দিয়ে বিশ্ব-সাহিত্যে আজ এই গ্রন্থখানি ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে। স্টুয়ার্টের গ্রন্থের পরেই স্মিথের এই গ্রন্থ উল্লেখ্য। স্টুয়ার্ট ছিলেন তাঁর পূর্বসূরী। মানুষের চিন্তার ইতিহাসে স্মিথের এই গ্রন্থখানি আজো একটি দিকচিহ্নরূপে পরিগণিত। মানবসভ্যতার ইতিহাসের অগ্রগামী স্রোতধারাকে একটি মানুষের চিন্তা-ভাবনা কিভাবে প্রবল ও সার্থক করে তুলতে পারে অ্যাডাম স্মিথ তারই একটি ভাস্বর দৃষ্টান্ত।

রবার্ট ক্লাইভ

(১৭২৫-১৭৭৪)

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিলান্যাস করেছিলেন যিনি ইতিহাসে তিনিই রবার্ট ক্লাইভ নামে খ্যাত। ১৭২৫ সালে জন্ম; মৃত্যু ১৭৭৪ সালে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে সামান্য করনিকের একটা চাকরি পেলেন রবার্ট ক্লাইভ। এটা শুভ সংবাদ ছিল তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে। ইংলণ্ড থেকে বহু দূরে নতুন কর্মক্ষেত্রে এবার দেখা যাবে তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ। স্বদেশ পরিত্যাগের পর এই চির দুঃসাহসী যুবকের জীবনের কাহিনী বড়ই বিচিত্র।

এইখানে একটু ইতিহাসের কথা বলি। মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম বছরে (১৬৯০) ইংরেজরা মাদ্রাজ থেকে বাংলায় এসে সুতানুটিতে উপনিবেশ স্থাপন করার অনুমতি লাভ করে। চারটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, যথা,—ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ—তখন এই দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করেছিল। সুতানুটি অর্থাৎ কলকাতায় ইংরেজদের যে উপনিবেশ স্থাপিত হয় তাই পরবর্তিকালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ফরাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করে চন্দননগরে, ওলন্দাজদের উপনিবেশ স্থাপিত হয় চুঁচুড়ায় আর পর্তুগীজরা গোয়াতে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। কিছুকাল পরে এই চারটি বৈদেশিক কোম্পানির মধ্যে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল তাতে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিই জয়লাভ করেছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বলতে এদেরই বোঝাত।

ক্লাইভ ভারতে উপনীত হওয়া মাত্র ভারতে অবস্থিত ইংরেজ ও ফরাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং ফরাসীরা মাদ্রাজ অধিকার করে। ইংরেজ যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ক্লাইভ ছিলেন একজন। তিনি কৌশলে পলায়ন করেন এবং পরিভ্রমণ করতে করতে ইংরেজদের একটি দুর্গে এসে উপনীত হন। এই দুর্গটির নাম ফোর্ট সেন্ট ডেভিড। এইখানে তিনি যেন নিজের বুদ্ধি ও শক্তির সন্ধান পেলেন। তখন য়ুরোপে ফরাসী ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছিল তা ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়। দুই দেশই উপলব্ধি করল যে, কি অপরিমিত সম্পদ তাঁদের হস্তগত হতে পারে যদি তাঁরা ভারতে স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপন করতে পারেন। ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের ব্যবসা শুরু হয়েছিল রাণী এলিজাবেথের সময়ে; কিন্তু কয়েক শতাব্দীকাল যাবৎ এই ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্ম এদেশে খুবই সীমিত ছিল। তাঁদের ঘাঁটি ছিল মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতায়। এই তিনটি স্থলে তাদের তিনটি দুর্গ ছিল।

ক্লাইভ ভারতে এসেছিলেন কোম্পানির একজন সামান্য করণিক বা কেরানী হয়ে, কিন্তু এইবার কলম ত্যাগ করে হাতে তরবারি নেবার সময় এলো তাঁর

জীবনে। বন্দীদশা থেকে কৌশলে মুক্তিলাভ করে তিনি এইবার অসিজীবী হতে মনস্থ করলেন। ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডের কর্তৃপক্ষকে যখন তিনি তাঁর মনের ইচ্ছা জানালেন তখন তাঁরা আনন্দের সঙ্গে ভাগ্যান্বেষী সেই যুবককে সৈন্যদলে স্থান দিলেন। মাদ্রাজে ইংরেজদের দুর্গটির পতন হওয়ার ফলে অবস্থা সঙীন হয়ে উঠল এবং ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করল। ফরাসী গভর্নর ডুপ্লে দেখলেন ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের এই সুযোগ এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও শক্তি এই দিকে নিয়োজিত করলেন। তিনি ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিতে কৃতসংকল্প হলেন।

এর বছর কয়েক আগে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু ঘটেছিল এবং তখন থেকে ভারতের শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল দেখা দিতে থাকে। এত বড়ো একটি সাম্রাজ্য পরিচালনা করবার মতো উপযুক্ত কেউ ছিল না, যদিও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মুঘল মসনদে তাঁরই উত্তরাধিকারীরা একের পর এক অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজ্য শাসনে তাঁরা সকলেই ছিলেন অপটু। এখানে-ওখানে ছোট-ছোট রাজ্য গজিয়ে উঠতে থাকে এবং রীতিমত গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় মুঘল রাজকুমারদের মধ্যে। মারাঠা শক্তি তখন পশ্চিম ভারতে কায়েম হয়েছে। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে ডুপ্লে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি মুঘলের সঙ্গে হাত মেলালেন এবং ঔরঙ্গজেবের যে উত্তরাধিকারী তখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করলেন। কিন্তু এই মুঘল সম্রাটের কোন ক্ষমতা ছিল না। যাই হোক, মুঘল সম্রাটের নামে ডুপ্লে মধ্য ভারত ও হায়দ্রাবাদের বহু অংশ অধিকার করে বসলেন।

এই ছিল ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যখন ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ক্লাইভ অস্ত্রধারণ করেছিলেন। সেণ্ট ডেভিড দুর্গের যিনি ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সেই মেজর লরেন্স এই তরুণ করনিকের মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন প্রাথমিক সংঘর্ষের পর পণ্ডিচেরিতে ফরাসীর সঙ্গে ইংরেজের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তার ফলে সাময়িকভাবে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে বিবাদের অবসান হয়। কিন্তু ক্লাইভ তাঁর দূরদৃষ্টি বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতে উপনিবেশ স্থাপনকারী এই দুই শক্তির মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য। সাধারণ সৈন্য হিসেবে ক্লাইভ কোম্পানির ফৌজে যোগদান করেছিলেন এবং পণ্ডিচেরিতে প্রথম যে যুদ্ধ হয় তাতে তাঁর সাহস ও রণনৈপুণ্য দেখে মেজর লরেন্স খুব প্রশংসা করেন ও ক্লাইভ লেফটেনান্টের পদে উন্নীত হন। এইবার পুরোপুরি ভাবে শুরু হয় ক্লাইভের সামরিক জীবন।

পণ্ডিচেরিতে উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তির যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তা স্থায়ী হলো না। তখন ডুপ্লেই ছিলেন ভারতে ফরাসী স্বার্থের তত্ত্বাবধায়ক। তিনি যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষী তেমনি রণনৈপুণ্য ছিলেন। এদিকে ক্রমশই ভারতে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। দুই পক্ষই সময় ও সুযোগের জন্ত অপেক্ষা

করেছিলেন। ঠিক এই সময়ে দাক্ষিণাত্য ও কর্ণাটকের শাসনক্ষমতা নিয়ে এক সংকট উপস্থিত হলো। এই দুটি রাজ্যের দাবীদার ছিলেন দু'জন; তাদের সমর্থন করতে এগিয়ে এলো ইংরেজ ও ফরাসী। বোঝা গেল এইবার একটি চূড়ান্ত শক্তির পরীক্ষা হবে এই দুই শক্তির মধ্যে। পরলোকগত নবাবের পুত্র, মহম্মদ আলি, ছিলেন কর্ণাটকের সিংহাসনের দাবীদার; তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন একজন ভূতপূর্ব নবাবের জামাতা, চন্দ্র সাহেব। প্রথম জনের পেছনে ছিলেন ইংরেজরা আর দ্বিতীয় জনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন ফরাসীরা।

ক্লাইভ তখন ক্যাপ্টেন; সামরিক পরিষদে তাঁকে আলোচনার জন্য ডাকা হয়। মেজর লরেন্স তরুণ ক্যাপ্টেন ক্লাইভকে এই ব্যাপারে সামরিক দায়িত্ব অর্পণ করলেন। ত্রিচিনোপলিতে ফরাসীরা যে অবরোধ গড়ে তুলেছিল সেই অবরোধের অবসান ঘটাবার দায়িত্ব পেলেন ক্লাইভ। তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে কর্ণাটকের রাজধানী আর্কটের অভিমুখে যাত্রা করলেন। ১৭৫১ সালে শুরু হয় আর্কটের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সৈনাপত্য লাভ করলেন তিনি। মুষ্টিমেয় অর্থাৎ মাত্র পাঁচশত সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন। যাওয়ার সময় মেজর লরেন্সকে অনুরোধ করে গেলেন মাদ্রাজ থেকে যেন আরো সৈন্য পাঠানো হয়। তখন বর্ষাকাল। প্রতিকূল আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে যাত্রা করে, ক্লাইভ যখন আর্কেটে পৌছলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, সেখানকার দুর্গটি পরিত্যক্ত হয়েছে। তরুণ সেনাপতির নির্ভীকতা ও রণদক্ষতার কথা শুনে আর্কট দুর্গের দেশীয় সেন্যবাহিনী ক্লাইভকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে দুর্গ পরিত্যাগ করে পলায়ন করে। যে কোন কারণে তারা পালিয়ে যাক না কেন, ক্লাইভ বিনা রক্তপাতে জয়লাভ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাচীন দুর্গটি অধিকার করেন। এই দুর্গকে কেন্দ্র করেই পরবর্তিকালে গড়ে উঠেছিল আর্কট শহর।

এরপর দুটি বছর ক্লাইভ অবিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটি রণক্ষেত্রে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। প্রত্যেকটি যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি কৌশল, সাহস আর রণনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এই দু'বছরের মধ্যে এই তরুণ সৈনিকের নাম যেন সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে, সৈন্যদের প্রত্যেকের অন্তরে সাহস সঞ্চারিত করে এবং অধীনস্থ বাহিনীকে ঠিকভাবে রণক্ষেত্রে পরিচালিত করে, ক্লাইভ ব্রিটিশের গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু এইভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে, ক্লাইভের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। বিশ্রাম লাভের জন্য তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত করলেন।

আর্কট যুদ্ধে জয়লাভ ক্লাইভের জীবনে সৌভাগ্যের সূচনা করে দিয়েছিল। সেই বিজয়ের বার্তা লণ্ডনে কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের কাছে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই জয়লাভের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হয়েছিল—ভারতবর্ষ, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড—সর্বত্র তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়িল; প্রত্যেকের মুখেই ক্লাইভের সুখ্যাতি শোনা গেল। ১৭৫৩ সালে তিনি যখন ইংলণ্ডে ফিরে এলেন তখন তিনি

বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন। তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী উৎসাহ ভরে আর্কট-বিজয়ী ক্লাইভকে জানাল তাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

তিনি মাদ্রাজের সেণ্ট ফোর্ট ডেভিডের লেফটেনাণ্ট গভর্নরের পদ গ্রহণ করে আবার ভারতবর্ষে চলে এলেন; শর্ত রইল যে, মাদ্রাজের গভর্নর অবসর গ্রহণ করলেই ক্লাইভ ঐ পদের উত্তরাধিকার লাভ করবেন। এইবার তিনি লেফটেনাণ্ট-কর্নেল হিসাবে ফিরলেন ভারতে। ক্লাইভ যখন এই দেশে ফিরলেন তখন সিরাজদ্দৌলা ছিলেন বাংলার নবাব। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তখন নবাবের প্রবল বিরোধ চলছে। ইংরেজদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তরুণ নবাব কলকাতা আক্রমণ করলেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করলেন। গভর্নর ড্রেক পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। বাংলায় ইংরেজদের এই বিপর্যয়ের সংবাদ যখন মাদ্রাজে পৌঁছল তখন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য ক্লাইভকেই উপযুক্ত মনে করলেন। এর পরবর্তী ইতিহাস সুপরিচিত। পলাশির যুদ্ধে বাংলা তথা ভারতের ভাগ্যরবি চিরকালের মতো অস্তমিত হয়। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন।

১৭৬০ সালে ক্লাইভ ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। তাঁর শিরে বর্ষিত হয় অজস্র সম্মান। ১৭৬২ সালে তিনি 'ব্যারণ অব পলাশি' হলেন। দু'বছর বাদে তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হলেন। তিনি এখন লর্ড রবার্ট ক্লাইভ। ১৭৬৫ সালে তিনি বাংলার গভর্নর হয়ে ফিরে এলেন ও দু'বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাস্থ্যের কারণে তিনি আবার ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। এবার সম্মান নয়, সম্বর্ধনা নয়—নিন্দা ও অভিযোগের ভেতর দিয়ে তাঁকে স্বদেশে ফিরতে হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ নিয়ে আসা হয় ও তাঁকে পার্লামেণ্টারি কমিশনের সম্মুখে জবাবদিহি করতে হয়। বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করলেও অপযশ আর অবমাননা তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। মানসিক অশান্তি থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য শেষজীবনে ক্লাইভ আফিম ধরেন। ১৭৭৪, ২২শে নভেম্বর অতিরিক্ত আফিম খাওয়ার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। লর্ড ক্লাইভের প্রসঙ্গে মেকলে বলেছেন: **'His name stands high on the roll of conquerors.'** ইতিহাসের নিরিখে এই উক্তি যথার্থ। পৃথিবীর ইতিহাসে বিজেতাদের তালিকায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দোষত্রুটি সত্ত্বেও রবার্ট ক্লাইভের একটি অনন্যলভ্য স্থান আছে।

ক্যাথেরিন দি গ্রেট

(১৭২৯—১৭৯৬)

১৭৪৪। শীতকাল। জার্মানির রাস্তাঘাট সব বরফে আচ্ছন্ন। সেই রাস্তার ওপর দিয়ে বিকট শব্দ করতে করতে একখানি রাজকীয় শকট ছুটে চলেছে। গাড়ীর ভেতর আরোহী মাত্র দু'জন—মা ও মেয়ে। মেয়েটির নাম সোফিয়া, বয়স চৌদ্দ বছর। জার্মানির বার্গবুর্গ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আনহল্ট; রাজধানী—জারবস্ট। সেই রাজধানী থেকে রওনা হয়ে দ্রুতগতিতে চার-ঘোড়ার গাড়িটি ছুটে চলেছে পূর্বদিকে। প্রথমে তাঁরা এলেন বার্লিনে। এখানে তাদের পরম সমাদরের সঙ্গে স্বাগত জানালেন জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক। মা ও মেয়ের যাত্রা শুভ হোক—এই কামনা তিনি করলেন। তারপর তুষারাচ্ছন্ন পথের ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটে চলল : একটি নতুন দেশের অভিমুখে। সেই দেশটির নাম রাশিয়া। চৌদ্দ বছরের সেই মেয়েটি অবশেষে উপনীত হয় এই দেশে।

এখানে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ তার প্রাপ্য অভ্যর্থনা জানালেন মেয়েটিকে। এরই সঙ্গে তার ভাবী স্বামীর পরিচয় করিয়ে দিলেন এলিজাবেথ। তাঁর ভাগিনেয়, গ্রাণ্ড ডিউক পিটারের সঙ্গে এই জার্মান রাজকুমারীর তিনি বিয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন। গ্রাণ্ড ডিউকের বয়স সবে ষোল। দেখতে কুৎসিত। রুগ্ন, দুর্বল : বুদ্ধি-শুদ্ধি বিশেষ কিছু ছিল না। দৈহিক অক্ষমতার সঙ্গে মিলেছিল মানসিক পঙ্গুতা। সকল দিক দিয়ে কদাচারী—মদ্যপ ও উচ্ছৃঙ্খল।

রাশিয়াতে উপনীত হওয়ার কিছুকাল পরে সোফিয়া অসুস্থ হন এবং দীর্ঘকালের চিকিৎসার ফলে আরোগ্যলাভ করেন। ইতিমধ্যে সোফিয়ার বাবাও জার্মানি থেকে এখানে এসেছেন। সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের জার্মান রাজকুমারীকে পছন্দ হলো এবং পিটারের সে উপযুক্ত স্ত্রী হবে মনে করলেন। এইবার শিক্ষার পালা শুরু হয়। রুশ ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন এবং গ্রীক চার্চ-এর রীতি অনুসারে তাঁর ধর্মশিক্ষাও শুরু হয়। যে ধর্মীয় সংস্কারে তিনি মানুষ হয়েছিলেন এখানে তার আমূল পরিবর্তন ঘটল ও গ্রীক চার্চের বিধিবিধানের মধ্যে ঘটল তাঁর ধর্মান্তর। নামান্তরও ঘটল—তাঁর পিতার বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজকুমারীর নাম পালটিয়ে নতুন নাম রাখা হলো ক্যাথেরিন এ্যালেক্সেনা। এই নামেই তিনি বাগদত্তা হলেন এবং ১৭৪৫ সালের আগস্ট মাসের এক শুভদিনে গ্র্যাণ্ড ডিউক পিটারের সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন। নতুন পরিবেশে শুরু হয় তাঁর নতুন জীবন। তাঁর পিতামাতা জার্মানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন; তাঁদের সঙ্গে ক্যাথারিনের আর কখনো সাক্ষাৎ হয় নি।

গ্র্যাণ্ড ডাচেস হিসাবে তাঁর জীবন খুব সুখের ছিল না। সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ

ছিলেন খুব নৃশংস প্রকৃতির রমণী—আর তাঁর ভাগিনেয় পিটার ছিলেন যেমন নিরক্ষর, তেমনি অসভ্য; তাঁর কিছুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না। অন্যদিকে জার্মান রাজকন্যারী ছিলেন অতি সুশিক্ষিত ও ফরাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট ছিল তাঁর মন। তাঁর রুচিও ছিল খুব পরিচ্ছন্ন। নিয়তি বিপরীত প্রকৃতির এই দুটি নর-নারীকে পরিণয়-সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল।

১৭৬২, জানুআরি মাস। সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হলো। ক্যাথেরিনের স্বামী, তৃতীয় পিটার রাশিয়ার 'জার' (Czer) হলেন। ক্যাথেরিনের জীবনে এইটা ছিল সংকটের সময়; কিন্তু তিনি ছিলেন সুচতুরা নারী; তাঁর মস্তিষ্কটা ছিল খুবই উর্বর: আর বুদ্ধি ছিল তেমনি তীক্ষ্ণ। তিনি এই সংকটের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। চারমাস পরে পিটার তাঁর প্রণয়পাত্রী, ভূতপূর্ব সম্রাজ্ঞীর প্রিয়তমা পরিচারিকা এলিজাবেথ ভোরোনটজোভকে সঙ্গে নিয়ে সেণ্ট পিটার্সবার্গ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর সাম্রাজ্য থেকেই চিরকালের মতো চলে গিয়েছিলেন। ক্যাথেরিন দেখলেন এই সুযোগ; রাজধানী থেকে তাঁর স্বামীর চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাথেরিন সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষিত হন। সৈন্যবাহিনীর সম্পূর্ণ আনুগত্য পেলেন তিনি। তাদের কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে—'সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন দীর্ঘজীবী হোন। এর অল্প কিছু দিন পরেই সম্রাজ্ঞীর একটি ঘোষণাপত্রে রাশিয়ার প্রজাপুঞ্জ অবগত হলো যে, কলিকবেদনা জনিত অসুখে তৃতীয় পিটার মারা গেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল এবং এই হত্যার বিশদ বিবরণ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না।

দ্বিতীয় ক্যাথেরিন এখন রাশিয়ার সর্বময়ী অধিশ্বরী হলেন। এবং জার্মান বংশোদ্ভূত এক নারী এমন দক্ষতার সঙ্গে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন যে সিংহাসনে আরোহণের অল্পদিন পরেই তিনি 'দি গ্রেট' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর নামের সঙ্গে এই অভিধাটি সার্থক হয়েছিল; কারণ ক্যাথেরিন সত্যিকারের শাসন করতেন। সকল ঐতিহাসিকই একবাক্যে বলেছেন ক্যাথেরিন দক্ষ হাতেই রাজদণ্ড পরিচালনা করতেন। তাঁর শাসন প্রকৃত শাসনই ছিল। তাঁর রাজত্বকালে রাশিয়ার যে সাফল্য ও ঐশ্বর্যলাভ ঘটেছিল তা একমাত্র তাঁরই জন্য। রাজনীতি তিনি ভালই বুঝতেন—এই বিষয়ে তাঁর বিচক্ষণতা ছিল সন্দেহাতীত।

রাশিয়ার ইতিহাসে ক্যাথেরিন চার প্রকারে নিজ নামের মুদ্রাঙ্কিত করে গিয়েছেন—প্রেমিকা হিসাবে, গার্হস্থ্য জীবন ও শাসন কার্যের সংস্কারক হিসাবে, বিজয়িনী ও বৈদেশিক নীতির রচয়িত্রী হিসাবে এবং সংস্কৃতিসম্পন্না একজন নারী হিসাবে। রাশিয়ার জনসাধারণের জীবনে এইগুলির প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। রাজদরবারে তিনি উচ্ছৃঙ্খল নীতি ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ আমদানী করেছিলেন। এমন অভিযোগ কেউ কেউ করেছেন; কিন্তু সত্যসন্ধানী ঐতিহাসিকদের বিবেচনায় তাঁর বিরুদ্ধে এই প্রকার অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই।

উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁরা নিন্দা করেছেন। কিন্তু তারা

একথাও স্বীকার করেছেন যে সম্রাজ্ঞীর ব্যক্তিগত জীবনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কোন-দিনই রাশিয়ার রাজকার্যে বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। স্বরাষ্ট্র ব্যাপারে ক্যাথেরিনের শাসন শুরু হয় সংস্কারের মাধ্যমে। বহুবিধ সংস্কারের জন্য তাঁর শাসনকাল রাশিয়ার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি ফরাসী সংস্কৃতি ও ফরাসী ভাবধারা আয়ত্ত করেছিলেন। নীচের তলার মানুষের জন্য কিছু করতে তিনি কৃতসংকল্প ছিলেন। ১৭৬৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত 'শাসনবিধি' (Instructions)। ক্যাথেরিনপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে এই পুস্তিকাটির প্রতিটি পৃষ্ঠায়। ফরাসীর দুই রাজনৈতিক মনীষী, মনতেস্কু ও বেকারিয়ার ভাবধারাকে ভিত্তি করে এটি রচিত হয় এবং এই শাসনবিধিকে অবলম্বন করেই রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সংস্কারের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনাটি মস্কোর কমিশনে প্রেরিত হয় তাঁদের বিবেচনার জন্য। সম্রাজ্ঞীর এই শাসনবিধি এমন বৈপ্লবিক ছিল যে, ফরাসী দেশে এটি নিষিদ্ধ হয়। রাশিয়ার সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ও জমিদারগণ এক বাক্যে শাসনবিধির বিরোধিতা করেন, কারণ তাঁরা আশংকা করলেন যে, এর মধ্যে উল্লিখিত শাসনতন্ত্র গৃহীত হলে ক্রীতদাসদের ওপর তাঁদের ক্ষমতা খুবই সীমিত হয়ে পড়বে। অবশেষে ক্যাথেরিন তাদের কাছে নতি স্বীকার করলেন; তাদের কিছুটা সুখসুবিধা দিলেন এবং এর ফলে ক্রীতদাসদের অবস্থা আগের চেয়ে শোচনীয় হয়। তাঁর রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ভোলগায় কৃষকদের বিদ্রোহ। রানী অবশ্য এই বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তারপর ১৭৭৫ সালে ক্যাথেরিন বিধি বা আইন প্রদাত্রী হিসাবে তাঁর প্রকৃত সফলতা লাভ করলেন। জার্মান আইনজ্ঞদের পরামর্শক্রমে তিনি অবশেষে প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়া সম্পর্কে একটি ঘোষণা করলেন—ইতিহাসে ইহাই ক্যাথারিনের 'Statute of the Provinces' নামে বিখ্যাত। রাশিয়াতে সেই প্রথম এই ঘোষণার ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত হয় এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে নিয়মিত বিচার ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। সম্রাজ্ঞীর রাজত্বকালে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল এবং ইহা দীর্ঘকাল যাবৎ বলবৎ ছিল। পরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় আলেকজান্দারের সময়ে এই সংস্কারকে বাতিল করে অধিকতর সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল। ক্যাথেরিনের স্বরাষ্ট্র নীতি উদার হতে পারত, কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ার ফলে সেটা সম্ভব হতে পারেনি।

তাঁর বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার সম্প্রসারণ। কত দূর যেতে হবে এটা তিনি যেমন জানতেন, ঠিক তেমনি জানতেন তাঁর মিত্রশক্তিগুলির ওপর কতখানি নির্ভর করতে হবে। ১৭৬৮ সালে তিনি প্রশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সঙ্গে জোট বেঁধে তুর্কী ও অস্ট্রিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহাই প্রথম তুরস্ক যুদ্ধ। এই সংঘর্ষ চলেছিল ছয় বছর। এই যুদ্ধে রাশিয়া জয়লাভ করে এবং দক্ষিণে কিছু অঞ্চল তাঁর শাসনাধীনে আসে। তারপর ১৭৮৭ সালের দ্বিতীয় তুরস্ক

যুদ্ধের সময় ক্যাথেরিন অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জোট বাঁধলেন ও প্রাশিয়া এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে আরো কিছু অঞ্চল অধিকার করলেন। রাশিয়ার সীমান্ত কৃষ্ণ সাগর, ক্রিমিয়া ও ককেশাস পর্যন্ত প্রসারিত হলো। ১৭৯৫ সালে ক্যাথেরিন পোল্যাণ্ড কুক্ষিগত করলেন। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে তাই বলেছেন—বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ক্যাথেরিনের শাসনকাল একটির পর একটি বিজয় দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল।

এত সব রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে ক্যাথেরিন তাঁর সাংস্কৃতিক চেতনা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থেকে এতটুকু বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। রাজ্যশাসনের বোঝা মাথায় বহন করেও তিনি সংস্কৃতির জগতে বাস করতেন। ভলতেয়ার প্রমুখ ফরাসী মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ছিল নিয়মিত পত্রালাপ এবং সর্বদাই তাঁকে অধ্যয়নে মগ্ন দেখা যেত। শিল্পসম্পদ সংগ্রহেও সম্রাজ্ঞীর ছিল বিশেষ আগ্রহ; তাঁর দরবারে তিনি একটি সম্পূর্ণ নতুন সংস্কৃতি ও নতুন আচার-আচরণ প্রবর্তন করেছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ক্যাথেরিন নিজে ছিলেন একজন সুলেখিকা—ইতিহাস, গল্প প্রভৃতি অনেক কিছুই তিনি লিখেছিলেন। অনেকের হয়ত জানতে কৌতূহল হয়—এত যাঁর গুণ, সেই ক্যাথেরিন নারী হিসাবে কেমন ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর সম্রাজ্ঞী নিজেই দিয়েছেন ছোট্ট একটি কথায়; আমি সহজেই ক্ষমা করতে পারি, আমি কাউকে ঘৃণা করি না।' তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল মধুর; মুখের কথায় তিনি মানুষের মন হরণ করতে পারতেন। তাঁর বুদ্ধির পরিমণ্ডলে তিনি বিদ্বৎজনদের একত্রিত করেছিলেন। পরিশ্রম করতে পারতেন প্রচুর; শয্যাত্যাগ করতেন সকাল পাঁচটায় এবং তখনি রাজকার্যে মনোনিবেশ করতেন। ১৭৯৬, ১০ নভেম্বর পরিণত বয়সে ক্যাথেরিনের মৃত্যু হয়। সমগ্র রাশিয়া তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্লাবিত হয়েছিল। একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য পিছনে রেখেই তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

জর্জ ওয়াশিংটন

(১৭৩২-১৭৯৯)

স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার স্রষ্টা হিসাবে তাঁর স্বজাতির ইতিহাসে যেমন, তেমনি বিশ্ব ইতিহাসেও জর্জ ওয়াশিংটন চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আমেরিকা যে স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল তার মূলে ছিলেন এই অসাধারণ মানুষটি। তিনি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট। ১৭৩২ সালে ভার্জিনিয়াতে ওয়াশিংটনের জন্ম হয়।

তাঁর বয়স যখন সবে এগারো তখন ওয়াশিংটনের পিতার মৃত্যু হয়। তখন তিনি তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই লরেন্সের কাছে চলে গেলেন। ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্স পরিবারটি ছিল সবচেয়ে বিত্তশালী ভূম্যধিকারী। লরেন্স এই পরিবারে বিয়ে করেছিলেন। লর্ড ফেয়ারফ্যাক্স যখন ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় বসবাস করতে এলেন জর্জ তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলেন। এমন একজন সংস্কৃতিবান মানুষের সংস্পর্শে এসে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

ওয়াশিংটনের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ফেয়ারফ্যাক্সকে আকৃষ্ট করেছিল এবং পিতৃহীন এই তরুণের প্রতি তিনি মমতা বোধ করলেন। ১৭৪৮ সালে যখন তিনি শেনান-ডোয়া উপত্যকায় তাঁর বাট লক্ষ একর জমি জরিপ করার জন্য একটি দল পাঠিয়ে-ছিলেন তখন তিনি সেই দলের একজন সহকারী সার্ভেয়ার হিসাবে ওয়াশিংটনকে নিযুক্ত করেন। তাঁর বয়স ষোল বছর। অভিযান শেষ হলে পরে, ফেয়ারফ্যাক্স তখন ওয়াশিংটনকে ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির প্রধান সার্ভেয়ারের পদে নিযুক্ত করলেন। ১৭৪৯ সাল থেকে দু'বছর তিনি এই কাজ করেন। তারপর লরেন্সের সঙ্গে তিনি বারবাডোজ যাত্রা করেন; এই স্থানটি ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত। এইখানে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন—এই রোগের চিহ্ন তাঁর শরীরে আজীবন ছিল। প্রত্যাবর্তনের পর লরেন্স মারা গেলেন। তাঁর জমিদারী তাঁর কন্যা লাভ করলেন —কিন্তু জর্জকে তিনি এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। লরেন্সের উইলে আরো বলা হয়েছিল যে, তাঁর কন্যার মৃত্যুর পরে জর্জ তার জমিদারির উত্তরাধিকার লাভ করবেন। কয়েক বছর পরেই লরেন্স-দুহিতার মৃত্যু হলো আর জর্জ ওয়াশিংটন হয়ে পড়লেন একজন বিত্তবান ভূম্যধিকারী। তাঁর জমিদারি প্রকৃতপক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এবং মিতব্যয়িতার পথেই এর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। তাঁর উদ্যম শুধু চাষবাসের মধ্যে সীমিত ছিল না—ভেড়ার লোমের তৈরি পশমও উৎপন্ন হতো। সেই পশম থেকে তাঁর নিজস্ব তাঁতে বস্ত্রাদি তৈরী হতো; সেইগুলি দূর ও নিকটবর্তী অঞ্চলে লাভের সঙ্গেই বিক্রী হতো। দুশো ক্রীতদাস, কুশলী কারিগর, সুদক্ষ চাষী তিনি নিযুক্ত করেছিলেন। কর্মচারীদের তিনি বলতেন

'হিসেবের একটি খাতা রাখবে; সেই খাতায় প্রত্যেকটি জমা-খরচের হিসাব থাকবে মনে রেখো প্রবাদ বাক্যের তালিকায় সবচেয়ে মূল্যবান প্রবাদটি হলো—একপেনি বাঁচালে এক পেনি লাভ হয়।' কাকে যেন ওয়াশিংটন তাঁর মন সঁপে দিয়েছিলেন। তাঁর চিত্ত-বিনোদনের মধ্যে ছিল ভার্জিনিয়ার সুবিস্তৃত অঞ্চল, শিকার করা, মাছ ধরা আর শিকারী কুকুরের দল নিয়ে ঘোড়ায় চড়া। ওয়াশিংটনের বাড়িতে প্রায়ই পার্টি দেওয়া হতো। নাচ ও তাস খেলে তিনি খুব আনন্দ পেতেন—ভালবাসতেন থিয়েটার দেখতে ও বৈকালিক চায়ের আসর ও বনভোজনে অংশ গ্রহণ করতে।

১৭৫২ সালে ওয়াশিংটন ভার্জিনিয়ার একটি সামরিক জেলার অ্যাডজুটান্ট নিযুক্ত হন। এক বছর পরে সক্রিয় সামরিক কর্মে লিপ্ত হওয়ার তাঁর সুযোগ এলো। ওহিও নদীর তীরবর্তী অঞ্চল নিয়ে তখন ফরাসীদের সঙ্গে বিতর্ক চলছিল। ভার্জিনিয়ার গভর্নর ওয়াশিংটনের মারফৎ ফরাসীদের ঐ অঞ্চল পরিত্যাগ করতে আদেশে পাঠালেন। আদেশ প্রতিপালিত হলো না। তাদের এই অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হয়ে গভর্নর তখন ওয়াশিংটনকে আবার পাঠালেন আদেশ বলবৎ করার জন্য। শেষ পর্যন্ত ফরাসীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমেরিকা বিজয়ী হলো। যুদ্ধের প্রথম স্বাদে পুলকিত হলেন ওয়াশিংটন—তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে এক রকম রোমাঞ্চ অনুভব করলেন তিনি। এই যুদ্ধে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল সাহস—অতুলনীয় সাহস। বন্দুকের গুলির শব্দের মধ্যে তিনি যেন বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেতেন। একথা ওয়াশিংটন নিজেই বলেছেন তাঁর সহোদরকে লেখা একটি চিঠিতে। তাঁর সাহসের আরো প্রমাণ দেওয়ার জন্যে তাঁকে আবার একটি অভিযানে নিযুক্ত করা হলো। এবারকার যুদ্ধ ইংরেজ শক্তির সঙ্গে। এই উপনিবেশে আদেরও স্বার্থ ছিল এবং কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্য এখানে মোতায়েন ছিল। রণক্ষেত্রেই ব্রিটিশ সেনাপতির মৃত্যু হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভের পুরস্কার হিসাবে ১৭৫৫ সালে ওয়াশিংটন কর্নেল পদে উন্নীত হন এবং সমগ্র ভার্জিনিয়া বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হন। তিন বছর পরে স্বাস্থ্যের অজুহাতে তিনি পদত্যাগ করেন এবং পরবর্তী সতেরো বছর তিনি মাউণ্ট ভার্ণনে তাঁর জমিদারি দেখাশুনা করার কাজকর্মে অতিবাহিত করেন। জনসাধারণের কাজে তিনি কচিৎ অংশগ্রহণ করতেন। এই সময়েই তিনি বিত্তশালিনী বিধবা মার্থা ড্যানড্রিজ কাসটিসের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছিল।

১৭৭৪। আমেরিকার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। ফিলাডেলফিয়া শহরে তেরটি মার্কিন উপনিবেশের প্রতিনিধিদের প্রথম কংগ্রেস বসল। এই কংগ্রেসে ভার্জিনিয়া থেকে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করলেন ওয়াশিংটন। এখানে উল্লেখ্য যে ইংলণ্ডের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল ওয়াশিংটনের কণ্ঠেই। উপনিবেশকারীদের পরিশ্রমে উৎপন্ন তামাক পাতা, চা প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য ইংলণ্ডে চালান যেত ও সেখানকার অধিবাসীদের সুখ-

সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করত এবং ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে গৃহীত আইনের বলেই উপনিবেশকারীদের এইভাবে শোষণ করা হতো। তাদের মধ্যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। ১৭৭৪ সালে ওহিও ও পোটোম্যাকের মধ্যে ওয়াশিংটন একটি খাল তৈরি করার পরিকল্পনা করছিলেন তখন কুইবেক আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনের বলে ওহিও ও মিসিসিপির মধ্যবর্তী অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই অঞ্চলের যাঁরা জমির মালিক ছিলেন তাঁদের খুব অসুবিধা হলো—কোন উপনিবেশ স্থাপনকারীকে তাঁরা নতুন আইন অনুসারে জমি বিক্রী করতে পারবেন না। ওয়াশিংটন এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণ এই এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। এর পরেই এলো আরো দুটি নতুন আইন—স্ট্যাম্প অ্যাক্ট ও টি অ্যাক্ট। এই দুটি নতুন আইন উত্তর আমেরিকার অধিবাসীদের বিক্ষুব্ধ মনোভাবকে আরো উত্তেজিত করে তুললো। সেই উত্তেজনা থেকেই সংঘটিত হয়েছিল আমেরিকার বিপ্লব বা স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ফিলাডেলফিয়াতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশন এক সপ্তাহকাল যাবৎ চলেছিল. এই কংগ্রেসে উপনিবেশকারীদের পক্ষ থেকে অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইতিহাসে ইহাই 'Bill of Grievance' এই নামে পরিচিত। পরের বছর, প্রধানত ম্যাসাচুটসের জন অ্যাডামস-এর উদ্যোগে ও প্রভাবে দ্বিতীয় কংগ্রেস বসল। এই কংগ্রেস ওয়াশিংটনকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করে। তাঁর বয়স তখন চল্লিশের ঊর্ধ্বে। ওয়াশিংটন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিবাদের ফলে হয়ত বা ব্রিটেনের মনোভাব পরিবর্তিত হতে পারে এবং সেটা যদি সম্ভব হয় তাহলে এই তেরোটি উপনিবেশকে আর তাদের মাতৃভূমি ইংলণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন হবে না। মোট কথা, উচ্চশ্রেণীর মার্কিনদের মতো তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পক্ষপাতী আদৌ ছিলেন না। কিন্তু যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার সংযুক্ত সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল, ওয়াশিংটন—জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটন—পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য, বিভিন্ন স্টেটগুলির মধ্যে ঐক্য নিয়ে আসার জন্য এবং একটি ঐক্যবদ্ধ মার্কিন জাতির উদ্ভবের জন্য সংগ্রাম করতে কৃতসংকল্প হলেন।

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে জেনারেল ওয়াশিংটনকে এই যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছিল। তাঁর সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতা ও কংগ্রেসের অযোগ্যতা তাঁর সাফল্যলাভের পক্ষে প্রবল অন্তরায়স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের জন্য একটি বিপুল বাহিনী গঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সৈন্যদের বেতন অতি সামান্য ছিল, অনেক সময় বিনা বেতনেই তাদের যুদ্ধ করতে হতো। এই বাহিনী অস্ত্র-শস্ত্রেও তেমন সুসজ্জিত ছিল না, পরিচ্ছদ সামান্য আর খাদ্য ছিল অপর্যাপ্ত। জেনারেল ওয়াশিংটন তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন—'আমরা একমাত্র ঘাস ছাড়া সব রকম ঘোড়ার মাংসই খেতাম। এইসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, পরাজয় ও প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও, ওয়াশিংটন রণক্ষেত্রে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধরত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা

সম্ভব হয়েছিল কঠিন শৃঙ্খলার জন্য। সকল ঐতিহাসিকই একবাক্যে বলেছেন যে, একমাত্র ওয়াশিংটন ও তাঁর নেতৃত্বের অনুপ্রেরণাই আমেরিকার এই স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়লাভের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

আমেরিকার এই স্বাধীনতার যুদ্ধ চলেছিল পাঁচ বছর। এই আমেরিকার জয়লাভ ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। যুদ্ধশেষে, সৈনাপত্য পরিত্যাগ করে ওয়াশিংটন মাউণ্ট ভার্ণনে তাঁর শান্ত পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই সময় একটি চিঠিতে তাঁর এক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন : "The first wish of my soul is to spend the evening of my days as a private citizen of my farm.'—'আমার জীবনসন্ধ্যার দিনগুলি আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে শান্তভাবে আমার খামারে অতিবাহিত করতে চাই।' তখন ওয়াশিংটনের বয়স পঞ্চাশ বছর হতে চলেছে। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সামনে একটির পর একটি নানা গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে লাগল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, এখনও একটি সুগঠিত কেন্দ্রীয়সরকারও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার, নতুবা সব বিফল হবে। শাসনতন্ত্র রচনার জন্য তেরটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন বা কনভেনসন বসল। সেই কনভেনসন সর্ববাদী-সম্মতিক্রমে ওয়াশিংটনকে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করল।

তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভায় দুই বিরোধীগোষ্ঠিকে সমবেত করার জন্য ওয়াশিংটন ধনতন্ত্রীদলের জন্য আলেকজান্দার হ্যামিলটনকে সেক্রেটারি অব ট্রেজারি আর গণতন্ত্রী-গোষ্ঠির মুখপাত্র টমাস জেফারসনকে সেক্রেটারি অব স্টেট নিযুক্ত করলেন। ওয়াশিংটন পরপর দু'বার প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তৃতীয় বারের জন্যও তাঁর নাম কংগ্রেস সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হন নি। ১৭৯৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরপর ওয়াশিংটন মাত্র দু'বছর জীবিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে (১৭৯৯, ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু হয়।

'First in war, first in peace, first in the hearts of his countrymen.'—ওয়াশিংটন সম্পর্কে তাঁর স্বদেশবাসীপ্রদত্ত এই শ্রদ্ধাঞ্জলি আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসে এমন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ খুব বেশি পাওয়া যাবে না। সংকল্পে অজেয়, আচরণে কঠিন চরিত্রে নির্মল, কর্তব্য-পালনে কঠোর এবং সারল্যের প্রতিমূর্তি—এই হলো নবগঠিত যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার প্রথম জনপ্রিয় প্রেসিডেণ্টের প্রকৃত ছবি। কালের পটে এই চিত্র আজো ভাস্বর হয়ে আছে—থাকবেও চিরকাল। তিনি স্বাধীনতার একজন প্রকৃত উপাসক ছিলেন, কিন্তু স্বৈরতন্ত্র বা উচ্ছৃঙ্খলতার নয়।

গ্যেটে

(১৭৪৯-১৮৩২)

১৭৪৯ সনের ২৮শে আগস্ট দিবা দ্বিপ্রহরে ফ্রাংকফুর্ট শহরে গ্যেটের জন্ম। জন্ম-লগ্নে বিভিন্ন গ্রহের অনুকূল সমাবেশ তাঁর জীবনে মঙ্গলপ্রদ হয়েছিল, একথা স্বয়ং বলেছেন গ্যেটে তাঁর আত্মচরিতে। বহুমুখী প্রতিভা নিয়েই তাঁর জন্ম। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক দক্ষ শাসক, জার্মান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক ও প্রধানতম ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার।

গ্যেটের মা ছিলেন আনন্দের প্রতিমা। মায়ের সরল প্রকৃতি, সহৃদয় অন্তঃকরণ ও স্বাভাবিক বৈদগ্ধ্য তাঁর পুত্রের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। গ্যেটের পিতা ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ও কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ। মা উদ্দীপ্ত করতেন পুত্রের কল্পনাশক্তিকে আর পিতা তার বুদ্ধিকে।

যোহান ক্যাসপারের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর পুত্র আইন শিক্ষালাভ করে একজন অধ্যাপক হয়। গ্যেটে কিন্তু দু'টোর কোনোটার প্রতিই আকৃষ্ট হলেন না। পিতার সন্তুষ্টিসাধনের জন্য ষোল বছর বয়সে তিনি লাইপজিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন আর নিজের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি পাঠ নিতেন পুঁথি থেকে নয়, জীবনগ্রন্থ থেকে।

গ্যেটের জীবন ও প্রতিভা দুই-ই অদ্ভুত রকমের। তাঁর বয়স যখন মাত্র ছয় বছর, তখন তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; সাত বছর বয়স থেকেই তিনি মানুষের ন্যায়বিচারে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। ঐ বয়সেই তিনি ছয়টি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন—ইংরেজি, জার্মান, লাতিন, গ্রীক, ইতালীয় ও ফরাসী ভাষা।

জীবনধর্মের বাণীবাহক গ্যেটের জীবনের অন্তঃপুরে যে কেউ প্রবেশ করবে সে দেখতে পাবে সেই জীবনের কি বিচিত্র বর্ণসমারোহ আর সেই প্রতিভার কি অনন্য-সাধারণ উদ্ভাসন। ষোল বছর বয়সে তিনি একবার সংকটাপন্ন স্নায়বিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এরই পরিণতি চরম নৈরাশ্য। আর সেই নৈরাশ্যের তাড়নায় অস্থির হয়ে তিনি লেখনী চালনা শুরু করেন, তাঁর জীবন-যন্ত্রণাকে ভাষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এই সাহিত্যকর্ম দ্বারা তাঁর জীবনরক্ষা পেয়েছিল বলেই না গ্যেটে তাঁর জীবন প্রারম্ভে এই সংকল্প গ্রহণ করেন—'To convert my entire life into a work of art'. অর্থাৎ—একটি মহৎ শিল্পকর্মে আমার জীবনকে রূপান্তরিত করব আমি।" এমন সংকল্প পৃথিবীতে খুব কম লোকেই গ্রহণ করেছেন।

গ্যেটে দেখতে ছিলেন অতিপ্রিয়দর্শন। গ্যেটের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা একটি নাটক। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল বিবাহিত জীবনের ব্যাভিচার। এই নাটক

রচনাকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর। ঐ বয়সের একটি ছেলের পক্ষে প্রবল যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা রচিত এই নাটকখানি অনেক পাঠকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করেছিল সেদিন। ক্রমে যৌবনে উপনীত হলেন গোটে এবং সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে দেখা দিল যৌবনের ফেনিল মাদকতা। তখন যে কেউ তাঁর সান্নিধ্যে আসত সেই-ই গোটের ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়ে পারত না। অসিচালনা এবং অশ্বারোহণে তিনি তো রীতিমতো দক্ষ ছিলেন, তার উপর তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য সুকণ্ঠের অধিকারী। এমন সুকণ্ঠ ব্যক্তি তাঁর আগে বা পরে জার্মানিতে আর কেউ জন্মগ্রহণ করেনি।

আইনে ডক্টরেট উপাধি লাভ করলেন গোটে এবং পিতার ইচ্ছানুক্রমে সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিসও আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু আদালতের হালচাল দেখে অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি আইন ব্যবসায়ের উপর হয়ে উঠলেন বীতশ্রদ্ধ। অতঃপর সাহিত্যকেই তিনি জীবনের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করলেন। তিনি বাইশ বছর বয়সে প্রচণ্ড মানসিক বিক্ষোভের বশে গোটে রচনা করলেন একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক। এই নাটকখানি পাঠ করলে মনে হবে এটি যেন শেক্সপীয়রের নাটকের দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুকৃতি। হোমার ও শেক্সপীয়র, এই দু'জনই ছিলেন গোটের প্রিয় কাব্য ও নাট্যকার এবং এঁদের রচনা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল বললেই হয়।

দু'বছর পরে গোটে রচনা করলেন 'The Sorrows of Worther' নামে একটি উপন্যাস। সমগ্র য়ুরোপ সেদিন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল এই উপন্যাসখানি দ্বারা। জার্মানির জন সাধারণের উপরও অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল এই উপন্যাস।

পঁচিশ বছর বয়সেই গোটে একজন পৃথিবী বিখ্যাত লেখক বলে গণ্য হলেন। ভাইমের আঠার বছর বয়স্ক ডিউক প্রিন্স কার্ল আগস্ট গোটেকে সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন ভাইমের রাজসভা অলংকৃত করার জন্য। তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ বছর। তৎপরতার সঙ্গে তিনি সেই রাজ-আমন্ত্রণ স্বীকার করলেন; তিনি ডিউকের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত হলেন। অতঃপর আরম্ভ হয় তাঁর জীবনে একটি নূতন অধ্যায়। সেই থেকে তাঁর মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত এই শহরটি ছিল গোটের আবাসস্থল। শুধু আবাসস্থল নয়—তাঁর জীবনের যা কিছু দুঃখকষ্ট, আশাবেদনা, সৌভাগ্য এবং মানসিক রূপান্তর তা সবই এইখানে অবস্থান-কালেই সংঘটিত হয়েছিল।

প্রাসাদের সন্নিকটে একটি মনোরম উদ্যানবাটিকায় ডিউকের এই তরুণ মন্ত্রীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। এই প্রাসাদেই দুই রকম কাজের মধ্যে অতিবাহিত হতো তাঁর সময়—রাজনীতি ও কাব্যচর্চা। কেমন করে রাজ্য শাসন করতে হয়, মহাজ্ঞানী কনফুসিয়াসের মতে-ই গোটে সেই বিষয়ে ডিউককে সযত্নে শিক্ষা দিতেন। তাঁর জীবনের অর্ধশতাব্দীকাল এই ভাইম হয়ে উঠেছিল বিশ্বের সাহিত্য কেন্দ্র। একাদিক্রমে দশ বছর চাকরি করার পর গোটের মনে এল বিতৃষ্ণা। ডিউকের

ব্যবহারের মধ্যে অনুরাগের অভাব অনুভব করলেন তিনি। এইবার ইতালী তাঁকে আকর্ষণ করল। তিনি ইতালী ভ্রমণে বেরুলেন। এই ভ্রমণ ছিল গ্যেটের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ফ্লোরেন্স দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি—এত ভালো, এত রঙ তিনি জীবনে আর কোথাও দেখেন নি। প্রস্ফুটিত নেবুফুলের সুবাসে তাঁর মন হলো প্রসন্ন, দেহ হলো সুস্থ। ইতালীর আকাশ বাতাস তাঁর চিত্তকে করে তুলল উদ্দীপ্ত ও সরস।

ইতালীতে দু'বছর কাটল। গ্যেটের মানসলোকে দেখা দিল আর একবার গভীর পরিবর্তন। তাঁর যেন নবজন্ম হলো। তাঁর নিজের কথায়—'It was God it was Nature.' এই প্রকৃতিকে তিনি বলেছেন চরম বাস্তবতা। মানব প্রকৃতিরই অংশ এবং তার শিল্পসৃষ্টিও তাই। এই সময়েই তিনি এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন—'Great works of art are supreme works of Nature carried out in accordance with Nature's laws.' এইবার এই চরম সৃষ্টির কাজে তাঁর নিমগ্ন হওয়ার দিন এলো।

মানুষের জীবনে যা কিছু পরম কাম্য, তার সবই গ্যেটে লাভ করেছিলেন তাঁর জীবনের মধ্যাহ্নে। স্নেহময়ী পত্নী, একটি পুত্র ও একজন বিশ্বস্ত বন্ধু। উনচল্লিশ বছর বয়সে তেইশ বছর বয়সের একটি সুন্দরী তরুণীকে তিনি বিবাহ করেন এবং এরই গর্ভে তাঁর পুত্রের জন্ম হয়। ছ'বছর পরে তিনি কবি শিলারের সঙ্গে পরিচিত হন। গ্যেটের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ আর শিলারের পঁয়ত্রিশ। গ্যেটে-শিলারের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব যেন একটি উজ্জ্বল কবিতা—এমন কবিতা বুঝি তাঁদের দু'জনের একজনও রচনা করতে পারেন নি। কিন্তু গ্যেটে-শিলারের বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়েছিল মাত্র এগার বছরকাল। তারপর যখন শিলারের মৃত্যু হলো, তখন বন্ধুবিয়োগে ব্যথিতচিত্ত গ্যেটেকে তাঁর রুদ্ধদ্বার পাঠকক্ষের মধ্যে শিশুর মতো কাঁদতে দেখা গিয়েছিল। "My half of the existence is gone with Schiller's death· ·The pages ofmy journal are blank during this tragic period and they express the blankness of my life.'—তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তিকে এক চিঠিতে এই কথাগুলি লিখেছিলেন গ্যেটে।

গ্যেটের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি গ্যেটে স্বয়ং। তাঁর চরিত্র যেন একটি নিখুঁত শিল্পরচনা। প্রচণ্ডভাবে অসুখী হলেও তাঁর জীবন যেন সাফল্যের জয়স্তম্ভ। দীর্ঘ পরমায়ু তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু এর জন্য তাঁকে অনেক কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল। তাঁকে একরকম নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিল। যারা তাঁর প্রিয় ছিল, একে একে তাঁদের সকলের মৃত্যু হয়—তাঁর বন্ধুজন, তাঁর ভগ্নী, স্ত্রী এবং অবশেষে তাঁর একমাত্র পুত্র—সকলেই তাঁর চোখের সামনে একে একে জীবনের পরপারে চলে যায়। কিন্তু গ্যেটের জীবনস্রোত আগের মতোই প্রবাহিত হতে থাকে—জীবনের দুঃখ ও বেদনাকে তিনি অমর সংগীতে রূপায়িত করলেন।

'ফাউস্ত' গ্যেটের অবিস্মরণীয় সাহিত্যসৃষ্টি। দশখণ্ডে সমাপ্ত তাঁর আত্ম-

চরিত্রের পরেই এই হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। 'ফাউস্ত' নাট্যকাব্যখানি তিনি সারাজীবন ধরেই রচনা করেছিলেন; এর প্রথম খণ্ড লিখতে সময় লেগেছিল ত্রিশ বছর আর দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে পঁচিশ বছর। বিরাশী বছর বয়সে, মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে, গ্যেটে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে 'ফাউস্ত' রচনা সমাপ্ত করেন। তাঁর মাথার চুলগুলি তখন সব সাদা হয়ে গিয়েছে। এই সময়ে একদিন তিনি বলেছিলেন "এই সাদা চুলগুলির তলায় আছে এটনা।" অবশেষে একদিন সেই এটনার অগ্ন্যুদগার দেখা গেল—গ্যেটে 'ফাউস্ত' রচনা শেষ করলেন কম্পিত হস্তে বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করে। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' কাব্যের পরেই পাশ্চাত্ত্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'ফাউস্ত'।

'ফাউস্ত আসলে একটি রূপকাশ্রিত মহাকাব্য। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, দর্শনে যার চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ উন্মেষ হয়েছে, অথচ জীবনের পুরুষার্থ অথবা লক্ষ্য কি, তা সে খুঁজে পাচ্ছে না এমন পণ্ডিতমন্য অথচ অতৃপ্ত দিব্য আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অভিভূত অস্বাভাবিক প্রকৃতির একজন আধুনিক মানুষের জীবনের সত্য উপলব্ধির সংগ্রামের কথা এই কাব্যময় নাটকে রূপায়িত হয়েছে। পণ্ডিত ফাউস্তস এই রকম একজন মানুষের প্রতীক। গ্যেটে এই চরিত্রের আধারে একটি জ্ঞানী অথচ অস্বস্তিপূর্ণ, সত্যানুসন্ধানী অথচ সংশয়াচ্ছন্ন আধুনিক মানব-নায়কের কল্পনা করেছেন। ফাউস্ত-চরিত্র গ্যেটের নিজ চরিত্রেরই প্রতিফলন, কিন্তু প্রতিচ্ছবি নয়। জার্মান জাতির অন্তরের কথা প্রকাশ পেয়েছে এই অতুলনীয় নাট্য-কাব্যে।

২২ মার্চ, ১৮৩২। তাঁর পাঠকক্ষের একখানি ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে আছেন অসুস্থ বৃদ্ধ কবি। চিরবিশ্রাম লাভের প্রতীক্ষায় রয়েছেন গ্যেটে। সারা বাড়িখানি ঘিরে তখন বিরাজ করছিল একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। সামনের খোলা জানালা দিয়ে বাইরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কবি আপন মনে উচ্চারণ করলেন—'আলো, আরো আলো'। এই কথাটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাপিত হলো গ্যেটের জীবনের আলো—অসীম অনন্ত নিস্তব্ধতার পথে উধাও হয়ে গেল তাঁর জীবনের সংগীত। পিছনে রয়ে গেল সেই সংগীতের অনুরণন যার মধ্যে আজো ঝংকৃত হয়ে চলেছে গ্যেটের সীমাহীন মানবপ্রীতি আর তাঁর হৃদয়ের বিশাল মানবতা।

হোরেসিও নেলসন

(১৭৫৮-১৮০৫)

হোরেসিও নেলসন। ব্রিটিশ জাতির নৌশক্তির ইতিহাসে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। চিরস্মরণীয় নাম। এমন রণকুশল নৌ-সেনাপতি ইংলণ্ডের ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। ১৭৫৮, সেপ্টেম্বর। নরফোকের বার্ণহামে এক সামান্য পরিবারে নেলসনের জন্ম হয়। এগারোটি ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ষষ্ঠ। জন্মাবধি তিনি ছিলেন রুগ্ন—যেমন ছিল তাঁর অন্যান্য ভাই-বোনগুলি। বাবা ছিলেন একটি পল্লী-গীর্জার ভারপ্রাপ্ত যাজক, আর মা ছিলেন খুব সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। নেলসনের বাবা দরিদ্র ছিলেন। তাঁর যখন নয় বছর বয়স তখন নেলসন মাতৃহীন হন। ক্যাপ্টেন মরিস সাকলিং ছিলেন নেলসনের কাকা—তিনি নৌবিভাগে একজন উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। নেলসনের বয়স যখন বারো বছর তখন তাঁর বাবা তাঁকে তাঁর ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন জাহাজে একটা কাজ দেবার অনুরোধ করে। ক্যাপ্টেন মরিসের অধীনে তখন চৌষট্টি জন নাবিক কাজ করত, তাদের বলা হতো মিডসিপম্যান (Midshipman)। দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক কিশোর নেলসন নৌ-বিভাগে তাঁর কাকার অধীনেই মিডসিপম্যান হিসাবে ভর্তি হলেন।

এই পরিবেশেই শুরু হয়েছিল ট্রাফালগার-বিজয়ী নেলসনের জীবন। ক্যাপ্টেন সাকলিং তখন 'ট্রায়াম্ফ' নামক একটি জাহাজের ভারপ্রাপ্ত নাবিক ছিলেন। সত্যিকারের জাহাজ চালানোর বিদ্যা হাতে-কলমে শেখাবার জন্য তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে একটা মালবাহী জাহাজে করে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে পাঠালেন। ফিরে আসার অল্প কাল পরেই তাকে তিনি 'কারকাস' নামক একটি জাহাজে বদলি করে দিলেন। জাহাজটির মেরুপ্রদেশে অভিযানে যাওয়ার কথা। এই অভিযানে তরুণ নাবিক তাঁর ব্যক্তিগত সাহসের অনেক পরিচয় দিয়েছিলেন; কারণ যখন তাঁদের জাহাজটি বরফের মধ্যে আটকে গিয়েছিল, তখন তিনি এক রাত্রিতে সকলের অজ্ঞাতসারে জাহাজ থেকে বেরিয়ে, বরফের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে ভল্লুক শিকার করেছিলেন।

মেরু অভিযান থেকে ফিরে আসার পর তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে আবার নতুন একটি অভিযানে যাওয়ার জন্য। তখন 'সী হর্স' নামে বিশ কামান-সমন্বিত একটি রণতরী ইষ্ট ইণ্ডিজের দিকে যাত্রা করবে; নেলসন চেষ্টা করে সেই রণতরীতে কাজ নিলেন। কিন্তু দু'বছর পরে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল; অকর্মণ্য বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দুর্বল স্বাস্থ্য নৈরাশ্যের সূতিকাগার। নেলসন যেন নৈরাশ্যে মুষড়ে পড়লেন। অকৃতকার্যতার আশংকায় তাঁর মন ও মেজাজ ভরে গেল। জীবনের সেই সংকট মুহূর্তে, নেলসন লিখেছেন—হঠাৎ আমি বোধ করলাম আমার মধ্যে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে দেশ-

প্রেমের আগুন। তখন মনে হলো আমার পৃষ্ঠপোষক দু'জন—রাজা এবং দেশ। চীৎকার করে উঠলাম—'আমি বীর হব এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে আমি প্রত্যেকটি বিপদ অতিক্রম করব।'

১৭৮৭ সালে যখন তিনি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে কর্মরত ছিলেন, তখন তিনি ফ্রান্সের নিসবেট নাম্নী এক বিধবা রমণীকে বিবাহ করেন। মনে হয় তিনি এই নারীটির প্রতি গভীর ভাবেই অনুরক্ত ছিলেন, তাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু সত্যিই তাকে তিনি ভালবাসতেন কিনা, সেটা সন্দেহের বিষয়। এইবার নেলসনের প্রকৃত জীবনের আরম্ভ। ১৭৯৩। ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধল। চৌষট্টি কামানের রণতরী 'আগামেমনন' পরিচালনা করবার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো তাঁর ওপর। এডমিরাল হুডের অধীনে রণতরী নিয়ে তিনি ভূমধ্যসাগরে যাত্রা করলেন। টুলোঁ শহরের আত্মসমর্পণের পর জাহাজটিকে নেপলস-এ পাঠিয়ে দেওয়া হলো সেখান থেকে নিয়াপোলিটান সৈন্যদের নিয়ে আসার জন্য। এই নেপলস্ শহরে ব্রিটিশ রাজদূতের স্ত্রী লেডি হ্যামিলটনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। পরের বছরে কর্সিকাতে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল এবং এই রকম একটি সংঘর্ষে নেলসন আহত হন ও তাঁর ডান চোখটি নষ্ট হয়।

১৭৯৭ সালে কেপ সেণ্ট ভিনসেণ্টের যুদ্ধে তিনি নৌসেনাপতি জার্ভিসের সহযোগী ছিলেন এবং তাঁরই তৎপরতা ও সাহসের ফলে স্প্যানিয়ার্ডদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। এই জয়লাভের পুরস্কার তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাভ করলেন—নেলসন রিয়ার-এডমিরালের পদে উন্নীত হলেন। তাঁকে ক্যানারিজ দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো হলো; এখানে সাণ্টাক্রুজের ওপর তাঁর আক্রমণ বিফল হয়। তাঁর জীবনে এই একটিমাত্র অকৃতকার্যতার দৃষ্টান্ত; এইখানে তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্তটি হারান। আবার তাঁকে ভূমধ্যসাগরে পাঠানো হলো কয়েকখানি ফরাসী রণতরীর পশ্চাদ্ধাবন করতে ও সেগুলি আটক করতে। অবশেষে ১৭৯৮, অগস্ট মাসের প্রথম দিনটিতে আবুকির উপসাগরে নাইলের যুদ্ধে তিনি যে রণকৌশল প্রদর্শন করে জয়লাভ করেন তা তাঁর মাথায় গৌরবের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল। এখানে উপস্থিত হয়ে নেলসন দেখলেন যে, ফরাসীরা সমুদ্রপথে আক্রমণ আশংকা করেছিল; তাই তিনি সুকৌশলে তাদের ও সমুদ্রতীরের মধ্যে তাঁর জাহাজগুলি স্থাপন করলেন। এই ভাবে আটক হওয়ার ফলে ফরাসীরা মাত্র দুটি রণতরী নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। নাইলের যুদ্ধে এই জয়লাভ বড় সামান্য ছিল না—এর ফলে নেপোলিয়ানের শক্তি একেবারে খর্ব হয়ে যায়। এই সংবাদে সমস্ত ইংলণ্ড সেদিন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। নেলসন 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত হলেন এবং য়ুরোপের প্রত্যেকটি রাজদরবার থেকে তাঁর ওপর কত সম্মান, সম্মানসূচক কত চিহ্ন যে বর্ষিত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই।

নাইলের পর নেলসন নেপলস্ যাত্রা করলেন। সমগ্র শহর তাঁকে সেদিন অভ্যর্থনা জানবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। যুদ্ধ চিহ্ন-সম্বলিত তাঁর জাহাজটিকে

অভ্যর্থনা করতে নৌকার একটি শোভাযাত্রা এসেছিল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন নেপল্‌সের রাজা। তাঁর পিছনে ব্রিটিশ রাজদূত স্যার উইলিয়াম ও লেডি হ্যামিলটন। শোভাযাত্রার সঙ্গে ব্যাণ্ড তালে তালে বাজছিল—'Rule Britannia, Britannia rules the waves'. সমারোহপূর্ণ সেই অভ্যর্থনায় অভিভূত হলেন নেলসন। কয়েকদিন অবসর যাপনের পর নেলসন নেপল্‌স পরিত্যাগ করে লেগহর্ণে চলে গেলেন। সেই সুযোগে ফরাসীরা বিদ্রোহী নিয়াপোলিটান জ্যাকোবিনদের সহায়তায় নেপল্‌স অধিকার করে। রাজকীয় সৈন্যবাহিনী সেই রাজদ্রোহীদের আত্মসমর্পণে সম্মত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে নেলসন নেপল্‌সে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সমস্ত জ্যাকোবিনদের আত্মসমর্পণ নাকচ করলেন, নিয়াপোলিটান নৌ বিভাগ থেকে পলাতক ক্যারাচিওলোকে বিচার করলেন ও তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। তারপর তিনি বলিষ্ঠ হস্তে নেপল্‌স রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর এই কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে সিসিলিতে ব্রোন্টির ডিউক পদে অভিষিক্ত করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হয়ে আরম্ভ হলো ঊনবিংশ শতাব্দী। এই শতাব্দীর সূচনায় নেলসন নেপল্‌স থেকে ইংলণ্ডে তাঁর বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন করলেন। সারা ইংলণ্ড তখন এই বিজয়ী নৌ-সেনাপতির জয়গানে মুখর। পথে ঘাটে নর-নারীর কণ্ঠে লর্ড নেলসনের জয়ধ্বনি। ১৮০১। নেলসনের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর। এইবার বালটিক অভিযান। ডেনমার্ক, সুইডেন, রাশিয়া একযোগে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণের উদ্দেশ্যে সজ্জিত হচ্ছিল। এই ত্রি-শক্তির আঁতাত লীগ অব নিউট্রালিটি নামে তখন পরিচিত হয়েছিল। আক্রমণের কারণ হিসাবে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ইংলণ্ড লীগের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। লীগের বিনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে স্যার হাইড পার্কারকে পাঠান হলো এবং তাঁর সঙ্গে রইলেন নেলসন। এর থেকেই শুরু হয় কোপেনহেগেনের বিখ্যাত যুদ্ধ।

ডেনমার্কের রণতরীর সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ হলো। এমন নৌ-যুদ্ধ খুব কম সংঘটিত হতে দেখা গেছে। দুর্ধর্ষ ড্যানিস্ সৈন্যদের আক্রমণে ব্রিটিশ রণতরীগুলি খুবই জখম হয়েছিল। একটি রণতরীর নিম্ন ডেকের ওপর শান্তভাবে দাঁড়িয়ে, নৌ-সেনাপতি নেলসন তাঁর দুর্জয় সাহস দিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দণ্ডায়মান তাঁর সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করছিলেন শুধু এই কথা বলে—'Engage the enemy more closely'—'শত্রুদের আরো কাছে গিয়ে যুদ্ধরত হও।' তারপর ক্যাপ্টেন ফলিকে বলেন, 'ক্যাপ্টেন, তুমি জানো যে আমার শুধু একটা চোখ আছে। ভবিষ্যতে কোনদিন আমার একেবারে অন্ধ হয়ে যাবার দাবীও আছে।' তারপর তাঁর হাতের দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি বাঁ চোখের কাছে তুলে ধরে যুদ্ধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন এক মনে। তাঁর মুখে তখন শুধু একটি কথাই শোনা গিয়েছিল—'We must win !—'আমরা অবশ্যই জয়লাভ করব।'

জয়লাভ তিনি করেছিলেন। তাঁর বীরত্ব ও দৃঢ় সংকল্পের জন্ত ডেনমার্কের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল এবং তাঁর বিজয়লাভের তালিকায় আর একটি গৌরবময় বিজয় সংযুক্ত হলো। এইবার তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, কিছুদিনের জন্ত বিশ্রাম নিলেন—সেই সঙ্গে একটু শান্তি। ১৮০৩। আবার দেশের কাজে তার ডাক এলো। নেলসনকে ভূমধ্যসাগরের দায়িত্ব দেওয়া হলো। ১৮ই মে 'ভিক্টোরি' জাহাজে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা উড্ডীন করে, তাঁর শেষ ও সবচেয়ে গৌরবজনক অভিযানে যাত্রা করালন লর্ড নেলসন। ১৮০৩ থেকে ১৮০৫—এই দুটি বছর তিনি টুঁলো অবরোধ করে রেখেছিলেনন, এবং তখন ফরাসী এডমিরাল তাঁকে পথ করে দিলেন। নেলসন ওয়েস্ট ইণ্ডিজদের তাড়া করলেন ও ফিরে এলেন। অবশেষে ইংলণ্ড ও ফরাসী দুই পক্ষের রণতরী দুইটি ট্রাফালগার অন্তরীপের অদূরে মিলিত হলো। ১৮০৫, ২১ অক্টোবর শুরু হয় ট্রাফালগারের যুদ্ধ। যুদ্ধের আগে তিনি আক্রমণ সম্পর্কে একটি সুন্দর পরিকল্পনা রচনা করলেন। যুদ্ধে তিনি শত্রুকে দুই দিক থেকে নিযুক্ত রাখতে চাইলেন। এই যুদ্ধের সময়েই নেলসন তাঁর অধীনস্থ নৌবাহিনীর উদ্দেশ্যে এই বিখ্যাত উদ্দীপনাময়ী বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন—'England expects that every man will do his duty,'

যুদ্ধে জয়লাভ যখন নিকটবর্তী হয়ে এসেছে—ঠিক সেই মুহূর্তে শত্রু পক্ষের একটি গুলি এসে নেলসনকে বিদ্ধ করলে। তিনি রণতরীর ডেকে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সেখান থেকে ককপিটে স্থানান্তরিত করা হলো। শল্যচিকিৎসক এলেন তখনি। কিন্তু নেলসন জানতেন এই তাঁর অন্তিম সময়। 'আমি যাচ্ছি। লেডি হ্যামিলটন ও আমার মেয়ে হোরেসিয়াকে দেশের উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে গেলাম।' তখনো প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে; প্রতি মুহূর্তে তাঁকে যুদ্ধের সংবাদ দেওয়া হচ্ছিল। যখন তাঁকে বলা হলো শত্রুপক্ষের বারোটি জাহাজ তাদের পতাকা নামিয়ে দিয়েছে, তখন বার বার নেলসনের কণ্ঠে এই কয়টি কথা শোনা যাচ্ছিল 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি আমার কর্তব্য সম্পন্ন করেছি।' অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসে। শেষবারের মতো অস্ফুট স্বরে তিনি উচ্চারণ করলেন মাত্র দুটি কথা—'God and my country'—'ঈশ্বর ও স্বদেশ।' নেলসনের গৌরবময় জীবনে এই দুটিই সত্য হয়েছিল। তাঁর কাছে ঈশ্বর ও স্বদেশ ভিন্ন আর কিছু বড়ো ছিল না। ঈশ্বর এবং স্বদেশের বাইরে তাঁর চিন্তায় অন্য কিছু স্থান পায়নি কখনো। ইংলণ্ডের মানুষ নেলসনকে নিয়ে তাই চিরকাল গর্ববোধ করে এসেছে। আজো করে।

উইলিয়াম উইলবারফোর্স

(১৭৫৯-১৮৩৩)

আজ পৃথিবী দাসত্বপ্রথার অভিশাপ থেকে অনেকখানি মুক্ত হয়েছে এবং পৃথিবীর অগণিত মানুষের মুক্তিলাভের জন্য আমরা নিশ্চয়ই গর্ববোধ করতে পারি। তথাপি মাত্র একশত বৎসর কালের কিছুপূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাসত্বমুক্তি বিল (Slavery Emancipation Bill) পাশ হয়েছিল এবং এই বিলটিই পরবর্তী কালে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে দাসত্বপ্রথার অবসানের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। এই স্মরণীয় আন্দোলনের নেতা ছিলেন উইলিয়াম উইলবারফোর্স। দাসত্বপ্রথার বিলোপ-সাধনের জন্য তিনি যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তার উপর চিরকালের মতো মুদ্রিত হয়ে আছে তাঁর ব্যক্তিত্ব আর তাঁর প্রয়াসের আন্তরিকতা। মনুষ্যত্বের হানিকর যতগুলি প্রথা আছে সেগুলির মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে ঘৃণ্য, সবচেয়ে জঘন্য হল slavery বা দাসত্বপ্রথা। এই দাসত্বকে প্লেটো পরিপূর্ণ অন্যায়ের নীতি বলে মনে করতেন। সভ্যসমাজ থেকে এই অন্যায় নীতি, এই ঘৃণিত ক্রীতদাস-প্রথা উঠিয়ে দেওয়ার জন্যই একটি মানুষের চেষ্টা অমর হয়ে আছে। তিনি উইলিয়াম উইলবারফোর্স। দীর্ঘ বিশ বৎসরকাল ধরে তিনি একক সংগ্রাম চালিয়েছেন দাসত্বপ্রথার অবলুপ্তি-সাধনের জন্য।

ইংলণ্ডে দাসত্বপ্রথা অবলুপ্তির আন্দোলনের পুরোভাগে অনেকেই ছিলেন। কিন্তু একে সার্থক নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন একজনই। তিনি উইলিয়াম উইলবারফোর্স। ইংলণ্ডে দাসত্বপ্রথার অবলুপ্তিসাধনে পিট, ফক্স ও উইলবারফোর্স—এই তিনজন যেমন স্মরণীয় হয়ে আছেন, ঠিক তেমনি স্মরণীয় হয়ে আছে মেথডিস্ট ক্রিশ্চান ও কোয়েকারদের সম্মিলিত প্রয়াস। একটি মানুষের চরিত্র ও হৃদয় কিভাবে একটি ঘৃণিত প্রথার অবসান ঘটিয়ে দিয়েছিল, তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি গৌরবজনক অধ্যায় বলেই গণ্য হয়েছে। ইংলণ্ডকে চিরদিনের জন্য কলঙ্ক-মুক্ত করেছেন এই একটি মানুষ এবং সেইসঙ্গে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে তিনি উন্মোচন করেছেন এক নবদিগন্ত। মানবহিতৈষণাকে এক নূতন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছেন উইলবারফোর্স।

১৭৫৯ সনের অগাস্ট মাসে তাঁর জন্ম। পিতামাতার তিনি একমাত্র পুত্র। পিতা রবার্ট উইলবারফোর্স বালটিক উপকূলভাগের একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। ইয়র্কসায়ারের একটি অতি সম্ভ্রান্ত প্রাচীন পরিবার এঁরা। সাত বছর বয়স পর্যন্ত উইলিয়াম হালের (Hull) গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা করেন। ন'বছর বয়সের সময় উইলিয়ামের পিতার মৃত্যু হয়; তখন তিনি উইমবলডনে তাঁর খুল্লতাতের বাড়িতে এসে পড়াশুনা করতে থাকেন। সতর বছর বয়সে তিনি কেমব্রিজের সেণ্ট জনস

কলেজে প্রবিষ্ট হন। যথাসময়ে কেমব্রিজ থেকে স্নাতক হয়ে তিনি তাঁর জন্মভূমি হালে ফিরে আসেন। পৈতৃক ব্যবসার প্রতি তিনি আদৌ আকৃষ্ট হলেন না। নিয়তি তাঁর জন্য কর্মের এক স্বতন্ত্র ক্ষেত্র তৈরী করে রেখেছিল। তাই তরুণ উইলিয়াম দেশসেবার কাজেই আত্মনিয়োগ করবেন ঠিক করলেন। ১৭৮০ সনের সাধারণ নির্বাচনে তিনি তাঁর জন্মস্থান থেকে সদস্য নির্বাচিত হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর। অতঃপর তিনি লণ্ডনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। বিত্তবান এই তরুণকে লণ্ডন জানাল সাদর অভ্যর্থনা। তাঁর পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচি, শালীনতামণ্ডিত আচরণ তাঁকে সকলের কাছেই জনপ্রিয় করে তুলল। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা আর স্বাভাবিক হাস্যপরিহাসে উজ্জ্বল উইলিয়ামকে সেদিন লণ্ডনের একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিরূপেই চিহ্নিত করে দিয়েছিল।

পিট তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। ইংলণ্ডের ইতিহাসে পিটের মন্ত্রীত্ব স্মরণীয় হয়ে আছে বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার জন্য। পিট ও উইলবারফোর্সের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল এবং এই বন্ধুত্বও স্মরণীয় হয়ে আছে একটি স্মরণীয় আন্দোলনের জন্য। দাসত্বপ্রথার অবসানের মূলে পিটের সঙ্গে উইলবারফোর্সের বন্ধুত্ব কতদূর সক্রিয় ছিল সেটা এঁদের দু'জনের জীবনচরিত লেখকগণই উল্লেখ করেছেন।

উইলবারফোর্স সত্যিই তার জীবিতকালে এই মহৎ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছরকাল তিনি সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন। এই অর্ধশতাব্দী কালব্যাপী আন্দোলনের ফলেই আফ্রিকা থেকে দাস হিসাবে—শিশু-যুবা-বৃদ্ধ নারী নির্বিশেষে মানুষ চালান দেওয়া বন্ধ হয় এবং অবশেষে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দাসব্যবসা সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়। পরবর্তিকালে তাঁর এই জীবনব্যাপী সংগ্রামের দৃষ্টান্তই আমেরিকাকে দাসত্বপ্রথালোপের সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছিল। প্রথম জীবনে তিনি নাস্তিক। তারপর পাঁচিশ বছর বয়সে এক খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের সঙ্গে য়ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে গ্রীক ভাষায় 'নিউ টেস্টামেণ্ট' পড়ে তিনি খ্রীষ্টধর্মে অনুরাগী হন। তখন থেকেই তাঁর জীবনের দিক্ পরিবর্তন সূচিত হয়। 'মানুষের মঙ্গল কর্মে আমি নিজেকে উৎসর্গ করব'—এই সিদ্ধান্ত তিনি এই সময়েই গ্রহণ করেন।

পার্লামেণ্টে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন সুবক্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। শৈশবে ব্রিস্টলে একবার তিনি দাস কেনাবেচার বাজার দেখেছিলেন এবং চৌদ্দবছর বয়সেই এক পত্রিকায় ক্রীতদাসপ্রথা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'This heinous traffic in human flesh should end.' সেই শৈশবস্মৃতি তাঁর স্মৃতিপট থেকে মিলিয়ে যায়নি। তিনি ইচ্ছা করলে নিশ্চিন্ত পার্লামেণ্টারি রাজনীতি করে তাঁর জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু যখন থেকে তাঁর মনে এই মহৎ চিন্তার উদয় হয়, তখন থেকে রাজনীতি তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল।

১৭৮৬। ইংলণ্ডের রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন এক নতুন উইলবারফোর্স।

ফৌজদারি আইন সংশোধনের জন্য একটি বিল তিনি পার্লামেন্টে উত্থাপন করলেন, তখনি তাঁর ওপর সকলের দৃষ্টি পড়ল। তখন সবে কোয়েকাররা এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছে। কোয়েকারদের পক্ষ থেকে উইলবারফোর্সের নিকট আবেদন গেল দাসত্বপ্রথার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য। তখন তাঁর বন্ধু পিটও তাঁকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করলেন ও হাউস অব কমনস-এ এই বিষয়টি নিয়ে একটি বিল উত্থাপন করতে বললেন। উইলবারফোর্স তখনি সংকল্প গ্রহণ করেন মনে মনে—হয় দাসত্বপ্রথার অবসান, না হয় জীবন ত্যাগ।

১৭৮৭। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে উইলবারফোর্স ঘোষণা করলেন 'Never, never will we give up, until we have extinguished every trace of this bloody traffic—a disgrace and dishonour to our country.' এই বলে একটি ১২ দফা প্রস্তাব পেশ করে সরকারকে তিনি আহ্বান জানালেন এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য। তারপর থেকে বিশ বছর ধরে চলে এই সংগ্রাম। বিরোধিতা করল দাস-ব্যবসায়ীরা। তখন উইলবারফোর্স তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে অমানুষিক পরিশ্রমে স্বপক্ষীয় তথ্যাদি সংগ্রহে মন দিলেন। ক্রমে উইলবারফোর্সের প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল। নানাজনে তাঁর নামে নানা অপবাদও রটাতে থাকে। তিনি কিন্তু অবিচল রইলেন। সমস্ত অপবাদ ও ভীতি-প্রদর্শন অগ্রাহ্য করে, তিনি আফ্রিকাবাসীর সঠিক চেহারাটি তুলে ধরতে প্রয়াসী হলেন।

পার্লামেন্ট থেকে যে তদন্ত শুরু হয়, ১৭৯১তে তা শেষ হল। অতঃপর হাউস অব কমনস-এ দাসব্যবসা প্রতিরোধী বিলটি উত্থাপিত হল। পাশ হল না, বিপক্ষের ১৬৩ ভোটে বিলটি পরিত্যক্ত হয়। দাসপ্রথা অবলুপ্তির জন্য যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই দমে গেলেন, কিন্তু দমলেন না উইলবারফোর্স। এইবার তিনি জনমত গঠনে মনোযোগী হলেন। নিজের খরচেই তিনি এই আন্দোলন চালাতে লাগলেন। ইস্তাহারের পর ইস্তাহার বিলি হল হাজারে হাজারে, আর সমস্ত দেশ তিনি ঘুরে বেড়ালেন তাঁর বক্তব্য সোজাসুজি জনসাধারণের কাছে পেশ করবার উদ্দেশ্যে। উনিশ বছর ধরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে উইলবারফোর্স বারবার পার্লামেন্টে এই বিল তোলেন এবং প্রত্যেকবারই হাউস অব লর্ডস কর্তৃক সেটা প্রত্যাখ্যাত হয়। অবশেষে ১৮৭০ সনে বিশ বছর বাদে পাশ হয় Slavery Emancipation Bill, এবার বিলের স্বপক্ষে ভোটের সংখ্যা ছিল ২৮৩, বিপক্ষে ১৬। পার্লামেন্টে যেদিন এই বিখ্যাত বিল পাশ হয়, সেদিন উইলবারফোর্স যে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে আছে। হাউস অব কমনস-এর আগে বা পরে অন্য কারো সম্বর্ধনায় এমনভাবে গম গম করেনি। ১৮০৭, ২৫ মার্চ পার্লামেন্টে গৃহীত এই বিলটি সম্রাটের সম্মতি লাভ করল এবং এই বিলকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এই বছরেই স্থাপিত হয় আফ্রিকান ইনস্টিটুট।

অতঃপর দলমত নির্বিশেষে উইলবারফোর্স সকলের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলেন।

১৮০৭ সনে তিনি যখন নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন তখন জনসাধারণ চাঁদা তুলে এই নির্বাচনের তহবিল গঠন করে দিয়েছিল—ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। বিল পাশ হলো, আইন তৈরী হলো, কিন্তু আইনের উদ্দেশ্য সফল হলো না। দাসব্যবসা আগের চেয়ে যেন প্রচণ্ডতর হয়ে উঠল। আরো পঁচিশ বছর উইলবারফোর্সকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বিপক্ষের দু'জন প্রতিভাশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে, ইয়র্কসায়ার থেকে নির্বাচিত হয়ে তিনি আবার পার্লামেন্টে এলেন। শুরু হয় তাঁর সংগ্রামের শেষ পর্ব। পৃথিবীর সকল দেশের ক্রীতদাসদের মুক্তি ছিল তাঁর কাম্য। ১৮২৩ সনে যখন য়্যান্টি-স্লেভারি সোসাইটি স্থাপিত হয়, তখন উইলবারফোর্স এই সমিতির সভ্যদের উদ্দেশে বলেন—'Nothing less than the total abolition of slavery should be your goal.' ১৮৩৩, জুলাই মাসে পার্লামেন্টে যখন দ্বিতীয়বার Slavery Emancipation Bill উত্থিত হয় তখন অসুস্থ শরীরে উইলবারফোর্স বিলের আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন। ঐ বছরের জুলাই মাসে তাঁর মৃত্যু হয় আর আগস্ট মাসে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

এই মহাপ্রাণ মানবহিতৈষীর মৃত্যু শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী প্রেরণ করেছিলেন তার কয়েক লাইন এখানে উদ্ধৃত হলো। 'The evil has not died with his own death. In the dark corners of civilization slavery still lurks, hiding its name and nourshing its spirit.' ক্ষেতে খামারে ও কারখানায়, চটকল আর পাটকলে অভিশপ্ত শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের সঙ্গে ক্রীতদাসদের জীবনের অনেকখানি মিল আছে এবং বর্তমান সভ্যতায় এদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা হয় তা অতীতকালের ক্রীতদাসদের প্রতি তাদের হৃদয়হীন মনিবদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আজকের দিনের পৃথিবীতে তাই মহামতি উইলবারফোর্সের মতো আরেকজন মানুষের আবির্ভাব কি অনিবার্য হয়ে ওঠেনি?

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

(১৭৬৯-১৮২১)

কর্সিকার এক আইনজীবীর ছেলে উত্তরকালে ফরাসী দেশের সম্রাট হয়েছিলেন এবং য়ুরোপের সম্মিলিত শক্তিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। সামান্য সৈনিক ছিলেন, কিন্তু এক অসামান্য সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। তার সঙ্গে ছিল অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, পরিষ্কার চিন্তা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই দিয়ে অসাধ্য সাধন করে ইতিহাসে তিনি এক অতি আশ্চর্য কীর্তি রেখে গেছেন। এই কীর্তিমান হচ্ছেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ অতিক্রান্ত হয়ে আরো বিশটি বছর যখন শেষ হয়, সেই সময়ে (১৭৬৯) তাঁর পিতা মাতার চতুর্থ সন্তান হিসাবে নেপোলিয়ান জন্ম গ্রহণ করেন ইতালির অন্তর্গত কর্সিকার রাজধানী আজাসিও শহরে। তিনি ফরাসী নাগরিক হিসাবেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কারণ তাঁর জন্মের অল্প কিছুদিন আগে কর্সিকা ফরাসীদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। তাঁর পিতা চার্লস বোনাপার্ট ছিলেন সুশ্রী, প্রিয়দর্শন ও প্রতিভাবান তরুণ। বাগ্মী হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। ফরাসী ভাষা তিনি সুন্দর আয়ত্ত করেছিলেন।

নেপোলিয়ানের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল প্রথমে বাড়িতে, পরে স্কুলে। দশ বছর বয়সে নেপোলিয়ান একটি ফরাসী স্কুলে ভর্তি হলেন; ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা স্কলারশিপও পেয়ে গেলেন। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে তিনি সামরিক শিক্ষা লাভ করেন একটি ফরাসী সামরিক কলেজে। ১৭৯১ সালে নেপোলিয়ানকে আমরা একটি গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেনরূপে দেখতে পাই। ১৭৯৩ সালে ইংরেজরা যখন টুলোঁ অবরোধ করেছিল তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম যুদ্ধে নেপোলিয়ান যে প্রতিভার পরিচয় রেখেছিলেন তা-ই তাঁর জীবনের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। সেনাবাহিনীতে তাঁর পদোন্নতি দ্রুত হতে লাগল। তিন বছরের মধ্যে জেনারেল পদে উন্নীত হলেন। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তিনি জেনারেল বোনাপার্ট হয়েছিলেন।

এখন তিনি সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হলেন। প্যারিস থেকে চলে যাবার আগে তিনি সুন্দরী বিধবা যোসেফাইনকে বিবাহ করলেন। যে সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার সৈন্যসংখ্যা সামান্যই ছিল; তাই দিয়েই তিনি লোদি, রিভোলি ও আরকোলা প্রভৃতি রণাঙ্গনে বিস্ময়কর জয়লাভ করেছিলেন। লোদিতে তিনি যে রকম সামরিক সাফল্যলাভ করেছিলেন, তাই নেপোলিয়ানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করে দিয়েছিল। অতঃপর ইতালির রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তিনি পরবর্তী অভিযানের পরিকল্পনা রচনা

করলেন। তিনি মিশর জয় করবেন, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করবেন এবং ফিরবার পথে তুরস্কের শক্তি চূর্ণ করবেন। ১৭৯৭-৯৮ সালে তাঁর মিশর অভিযান দুঃসাহসিক ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর এই বেপরোয়া উদ্যোগ সফলতা লাভ করেনি। ব্রিটিশ রণতরীর কাছে তাঁর পরাজয় ঘটে এইখানে। নেপোলিয়ানের একটা মারাত্মক দুর্বলতা এই ছিল যে তিনি ইংলণ্ডের শক্তি সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না এবং নৌশক্তির গুরুত্ব বুঝতেন না। মিশরে তিনি যেটুকু জয়লাভ করেছিলেন তা ব্রিটিশ এডমিরাল নেলসন নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন—আবুকির উপসাগরে তিনি সমস্ত ফরাসী রণতরী বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন। নাইলের যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে, মাত্র দু'খানি রণতরী নিয়ে তিনি রণাঙ্গন থেকে ফ্রান্সে চলে আসতে বাধ্য হন।

ঠিক সময়েই তিনি ফ্রান্সে উপস্থিত হয়েছিলেন। সমস্ত দেশ জুড়ে তখন বিপ্লব শুরু হয়েছে, কিন্তু তাকে নেতৃত্ব দেবার মতো উপযুক্ত লোকের অভাব ছিল। সন্ত্রাসবাদ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্সের শত্রুদের একটি 'কোয়ালিশন' মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। সৈন্যবাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিল অনেক, কিন্তু সত্যিকার প্রতিভাবান কেউ ছিল না। বোনাপার্ট তাঁর সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় অসামরিক শাসনের ক্ষমতা দখল করলেন, প্রথম কনসাল হলেন এবং টুলারিজদের বিরাট প্রাসাদকে তাঁর বাসভবন করলেন। ১৮০০ সালের জুন মাসটি তাঁর জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসররূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই বছরে তিনি চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আল্পস পর্বতমালা' অতিক্রম করে, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্যুৎগতিতে একটি প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। অস্ট্রিয়ার সৈন্য তখন ইতালির অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। ম্যারেনগোতে নেপোলিয়ানের বাহিনী ও অস্ট্রিয়ার বাহিনী মুখোমুখি হলো। আক্রমণের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে না পেরে অস্ট্রিয়ার সৈন্যরা পরাজিত হয়। বিজয়ীর গৌরব নিয়ে বোনাপার্ট প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এইবার তিনি প্রজাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর প্রতি মনোনিবেশ করলেন। বিপক্ষ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কয়েকটি চুক্তি সম্পাদন করে য়ুরোপে তিনি পুনরায় শান্তি স্থাপন করতে উদ্যত হলেন। তারপর সামাজিক জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনে মনোযোগী হলেন; শাসনব্যবস্থার প্রত্যেকটি বিষয় নিজে তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। তারপর ফরাসী আইনের সংস্কার সাধন করলেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্তনের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করলেন। আইনের ক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের সংস্কার ফ্রান্সে যুগান্তর নিয়ে এসেছিল। তিনি নতুন বিধিও দিয়েছিলেন; ইতিহাসে সেইবিধি "The Code of Napolean' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। নেপোলিয়ান সব সময়ে বলতেন—'আমি প্যারিসের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অনেক কিছু করতে চাই।' তিনি যখন কনসালরূপে ও পরে সম্রাটরূপে দেশ শাসন করেছিলেন তখন ফ্রান্সের রাজধানী নানা দিক দিয়ে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। সিন নদীর ওপর তিনি চারটি নতুন সেতু তৈরি করিয়ে-

ছিলেন; শহরের অনেকগুলি সড়কের ওপর ফুটপাথের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্যারিসের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল জল সরবরাহ। নেপোলিয়ান জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে তৎপর হলেন। শহরে যান-বাহনের উপযোগী যথেষ্ট ভালো রাস্তার অভাব ছিল; তিনি এই অভাব দূর করবার জন্য অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর প্রশস্ত সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এইবার নেপোলিয়ান ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে রত হলেন। এই যুদ্ধই তাঁর পতনের কারণ হয়েছিল। ১৮০৫ থেকে ১৮১৪—এই নয় বছরকালের মধ্যে তিনি একাধিক অভিযান পরিচালনা করে, তাঁর সামরিক প্রতিভার বিস্ময়কর পরিচয় প্রদান করে সমস্ত য়ুরোপকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস ছিল যে, এই অভিযানগুলির শেষে রক্তাক্ত রণক্ষেত্র থেকে তাঁকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে চিরজীবনের মতো নির্বাসনে যেতে হয়েছিল ইংরেজের বন্দীরূপে। ক্ষণস্থায়ী শান্তি বিনষ্ট হওয়ার পর ১৮০৪ সালে তিনি ফ্রান্সের সম্রাট হলেন। নেপোলিয়ানের আগ্রাসী নীতি য়ুরোপের শাসকদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল, কারণ তিনি উত্তর ইতালি তাঁর অধিকারভুক্ত করেছিলেন। তখন তাকে পুনরায় য়ুরোপের সম্মিলিত শক্তির সম্মুখীন হতে হলো—এই শক্তির পিছনে ছিল ব্রিটেনের ধনবল, জনবল ও রণতরী। ১৮০৫ সালে ট্রাফালগারের যুদ্ধে নেলসনের হাতে নেপোলিয়ানের পরাজয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। তখন নেপোলিয়নের ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা নির্মূল হয়ে যায়।

এরপর তিনি ক্ষিপ্রবেগে ইংলণ্ডের মিত্রশক্তি অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তাঁর সামরিক প্রতিভার চরম বিকাশ এই যুদ্ধে দেখা গিয়েছিল এবং এইবার তিনি যেরকম কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিপক্ষদের রীতিমত হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। আক্রমণের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে না পেরে, অস্ট্রিয়ার সেনাপতি ম্যাক সত্তর হাজার সৈন্যসহ উলমের রণক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন; নেপোলিয়ানের সৈন্য খুব সামান্যই নিহত হয়েছিল; অস্টারলিজে সম্রাট বোনাপার্টকে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বাকী সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং এই যুদ্ধে তিনি যেরকম জয়লাভ করেন তার বিবরণ শুনে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিটকে এই বিখ্যাত মন্তব্যটি করতে হয়েছিল; 'য়ুরোপের মানচিত্র গুটিয়ে ফেলা হোক। আগামী দশবছর আর এর প্রয়োজন হবে না।'

কিন্তু য়ুরোপ বিজেতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বিলম্ব করেনি। প্রাশিয়া যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছিল; কিন্তু নেপোলিয়ানের হাতে প্রাশিয়ার পরাজয় ঘটল। তিনি সগৌরবে বার্লিনে প্রবেশ করলেন, যেমন তিনি প্রবেশ করেছিলেন ভিয়েনাতে। তারপর তিনি দুর্জয় রাশিয়ানদের ফ্রেডল্যাণ্ডের রণক্ষেত্রে পরাজিত করলেন। এই সময়েই সম্পাদিত হয় টিলসিটের চুক্তি; এই চুক্তির ফলে প্রাশিয়া একটি বিজিত রাষ্ট্রের পর্যায়ে নেমে এলো। এই চুক্তির পর তিনি ইংলণ্ডকে আঘাত হানবার জন্য সমস্ত য়ুরোপকে একটি তরবারি হিসাবে

ব্যবহার করতে মনস্থ করলেন। স্পেন আক্রমণ, অনেকের মতে, নেপোলিয়ানের পক্ষে একটি মারাত্মক ভুল হয়েছিল। তিনি মাদ্রিদ অধিকার করে, তাঁর সহোদর যোশেফকে সেখানকার রাজা করলেন এবং ইংরেজ সৈন্যদের বিতাড়িত করবার দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন মার্শাল সোল্টের ওপর। কিন্তু এই স্প্যানিশ যুদ্ধ দক্ষিণে ও উত্তরে তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনীর ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮০৯ সালে অস্ট্রিয়া আবার তার শক্তিমান জেনারেল আর্চ ডিউক চার্লসের নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য তৈরি হলো। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ানই বিজয়ী হন।

১৮১১ সালে নেপোলিয়ান তাঁর ক্ষমতার শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিলেন। রাশিয়া এতকাল তাঁর মিত্রশক্তি ছিল। সেইজন্য তাঁর পক্ষে সমগ্র য়ুরোপের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর শত্রু ব্রিটেন যাতে কোথাও তার পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করতে না পারে, সেজন্য নেপোলিয়ান য়ুরোপের বন্দরগুলি বন্ধ করে দিলেন। জার আলেকজান্দার এই অর্থনৈতিক দাসত্ব মেনে নিতে পারলেন না; ফলে দুই শক্তির মধ্যে হলো প্রচণ্ড বিচ্ছেদ। ১৮১২ সালে নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করলেন। তাঁর মন্ত্রীরা এই আক্রমণের বিপক্ষে ছিলেন। এই ভুলই নেপোলিয়ানের সামরিক জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। এই অভিযানে তাঁর সৈন্যবাহিনীর প্রায় অর্ধেক রাশিয়াতে তুষার-সমাধিলাভ করেছিল। মস্কোতে তিনি যে বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ানের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষাকে চিরকালের মতো ভস্মসাৎ করে দিয়েছিল।

রাশিয়ার কাছে বোনাপার্টের পরাজয়ে আবার য়ুরোপের শক্তিগুলি সম্মিলিত হয়। ১৮১৪ সালে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে এলবা দ্বীপে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তারপর সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে, তিনি পুনরায় প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করেন সিংহাসন লাভের চেষ্টায়। তাঁর এই প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। য়ুরোপের সম্মিলিত শক্তির আঘাতে প্যারিসেই তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমাধি হয়। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের হাতে নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত পরাজয় তাঁর জীবন-নাট্যের ওপর যবনিকা টেনে দেয়। সুদূর আফ্রিকার সেন্ট হেলেনা দ্বীপে জেনারেল বোনাপার্টকে বন্দীজীবন কাটাতে হয়েছিল। সেখান থেকে তিনি আর ফিরে আসেন নি। পিঞ্জরাবদ্ধ ঈগলপাখীর মতো এই দ্বীপে ছয়টি বছর তাঁকে বন্দীজীবনের অগৌরব নিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। অবশেষে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে বাহান্ন বছর বয়সে নেপোলিয়ানের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। কর্সিকার এই উচ্চাভিলাষী যুবকের জীবন কি সত্যিই বিফল হয়েছিল? ইতিহাসের রায়—না। কার কবির কথায়—

> 'Death makes no conquest of this conqueror,
> For now he lives in fame.'

লুডউইগ ভ্যান বীটোফেন

(১৭৭০-১৮২৭)

য়ুরোপের সংগীত জগতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, সুরলোকের যাদুকর লুডউইগ ভ্যান বীটোফেন জন্মকাল থেকেই বধির ছিলেন। যাঁর সমগ্র অস্তিত্ব শব্দের কবিতায় অভিসিক্ত ছিল, যিনি ছিলেন অসামান্য সংগীত প্রতিভার অধিকারী, সুরলোক প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল যাঁর ঐন্দ্রজালিক সুরসৃষ্টিতে, সেই মানুষটি কিনা এই শব্দময়ী পৃথিবী থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন—একথা ভাবতেও হৃদয় যেন সহানুভূতিতে ও বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৭৭০, ডিসেম্বর ২৭। জার্মানির অন্তর্গত রাইন নদীর তীরে অবস্থিত বন্ শহর। এইখানে একজন গায়কের গৃহে তাঁর সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বীটোফেন। তিনি খুব যত্নের সঙ্গে তাঁর পুত্রকে বেহালা বাজানো শিখিয়েছিলেন। কারণ তাঁর পুত্রটি যে সংগীত প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, এটা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয়নি।

সংগীত দিয়েই তাঁর লেখা-পড়া শুরু হয়েছিল—অন্য পাঠ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়নি। বাড়ির ওপর তলায় অপেক্ষাকৃত একটি স্বল্প পরিসর নির্জন ঘরের মধ্যে বসে বালক একমনে সুরের সাধনা করতেন। বাবা তাঁকে সুরের যে গৎটি (Scale) শিখিয়েছিলেন, একঘেয়ে সেই গৎটি নিবিষ্টচিত্তে বাজাতেন।

ধীরে ধীরে বালকের প্রতিভা উন্নতি লাভ করতে থাকে। বাবার আনন্দ ধরে না। গর্বের সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেন যে, বাজনায় ছেলের হাত খুব হয়েছে। এইবার স্কুলে যাওয়ার সময় হলো। লুডউইগকে একটা সাধারণ স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। বালক লুডউইগ পড়া-শুনায় তেমন মনঃসংযোগ করতে পারতেন না। লেখা, পড়া ও গণিতের প্রাথমিক পাঠ খুব ভাসা-ভাসা ভাবে তিনি গ্রহণ করতেন—মনে কিছুই রাখতেন না। তথাপি এই স্কুলজীবন লুডউইগের সংগীত-জীবনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। এইবার ছেলেকে তিনি রাজদরবারে পিয়ানো বাদক ভ্যান ডেন এডেনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুকাল পরে বৃদ্ধ এডেন অবসর গ্রহণ করলেন; তখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যিনি এলেন সেই ক্রিশ্চিয়ান গট্‌টলোব নীফির কাছে লুডউইগ শিখতে লাগলেন। ১৭৮২ সালে যখন তাঁর বয়স বারো বছরও হয়নি তখনই ডেপুটি হয়েছিলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ইলেক্টর থিয়েটারে অপেরা ব্যাণ্ড পরিচালনা করার দায়িত্ব লাভ করলেন।

এই সময়ের মধ্যে তিনি ক্রমাগত সুরের পর সুর রচনা করে চলেছিলেন; কিন্তু তাঁর কৃতির সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তবে সুর-রচনায় তিনি অসীম যত্ন আর নিখুঁত জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন যা চিরজীবন তার আয়ত্তে ছিল। ঈশ্বর

তাঁকে শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে বঞ্চিত করেছিলেন বটে কিন্তু তা পূরণ করে দিয়েছিলেন তাঁকে তীক্ষ্ণ মানসিক ক্ষমতা প্রদান করে। দৈবী প্রতিভার অধিকারী এই সুর-শিল্পীর জীবনের একটি চিত্র আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। একটি টেবিলের সামনে লুডউইগ বসে আছেন নিবিষ্ট মনে, হাতে পেনসিল, তাঁর সামনে কাগজের স্তূপ। কিছুক্ষণ বাদে চেয়ার থেকে উঠে, চিন্তামগ্নভাবে পিয়ানোটির কাছে এলেন, তারপরেই বাজাতে লাগলেন, কতকটা এলোমেলো ভাবে, তারপর তাঁর সমস্ত মুখখানা যেন আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এক ঘণ্টা ধরে [illegible] মধ্যে তিনি বাজালেন—একই সুর বার বার বাজালেন। তারপর তিনি ফিরে এলেন টেবিলের কাছে। যে সুরটি এইমাত্র বাজালেন, সেটি কাগজের বুকে স্বরলিপির আকারে ফুটিয়ে তুললেন। এইভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এমন কি বছরের পর বছর কেটে গেল। এমনই নির্ভুল ও সুন্দর হতো সেই স্বরলিপি। এইজন্যই তো তাঁর সুরের সংখ্যা এত কম।

পিয়ানো বাদক হিসাবে বীটোফেনের খ্যাতি তাঁকে লোকের দৃষ্টিপথে নিয়ে এলো। ১৭৮৪ সালে ম্যাক্স ফ্রানজ ইলেক্টর হলেন। এই তরুণ সুরকারের ভেতরে যে প্রতিভা নিহিত ছিল তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এইবার লুডউইগ মাসিক দেড়শত ফ্লোরিনে দ্বিতীয় অর্গানিস্টের পদে নিযুক্ত হলেন। তারপর ১৭৮৭ সালে শিল্পীর জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। তাঁকে ভিয়েনায় পাঠিয়ে দিলেন ইলেক্টর, সেখানে তিনি মোজার্টের কাছে কয়েকটি পাঠ গ্রহণ করলেন। মোজার্টের কাছে শিখতে পারা একটা সৌভাগ্যের বিষয় বলে গণ্য হতো, কারণ তিনিই তখন য়ুরোপের সুরলোকের সম্রাট ছিলেন। আচার্য মোজার্ট প্রথমে বীটোফেনের দু'তিনটি বাজনা শুনলেন—তরুণ শিল্পী যে কটি সুর বাজিয়ে শোনালেন তা ছিল মোজার্টেরই রচনা। শুনবার পর ভাবান্তর দেখা দিল তাঁর মনে; তিনি চেয়ারের পিঠে চিন্তামগ্ন ভাবে হেলান দিয়ে তাঁর হাতের আঙুলগুলি সঞ্চালিত করতে থাকেন। তারপর খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কয়েকজন সতীর্থদের বলেন—এই শিল্পীর প্রতি তোমরা দৃষ্টি রেখো; একদিন সে পৃথিবীতে ঝড় তুলবে। বীটোফেন সম্পর্কে মোজার্টের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল।

বীটোফেনের জীবনে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি এলো যখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। প্রসিদ্ধ এবং সহৃদয় সুরকার হেডন বন্ পরিদর্শনে এলেন। তিনি বীটোফেনের কথা শুনলেন এবং এই প্রতিভাবান সুরশিল্পী যখন তাঁরই নিজস্ব কয়েকটি সুর বাজিয়ে তাঁকে শোনালেন হেডন তখন যারপরনাই বিস্মিত হলেন। এইভাবে দু'ঘণ্টা ধরে স্নেহে বয়োজ্যেষ্ঠ সুরকার তরুণ শিল্পীর পিয়ানো বাজানো শুনলেন। পরে তিনি ম্যাক্স ফ্রেনজের কাছে গিয়ে বীটোফেন সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা বললেন। ঠিক হলো বীটোফেন আর কিছুকাল ভিয়েনাতে থেকে তাঁর পাঠ শেষ করবেন। কারণ তখন সমস্ত য়ুরোপে সংগীতের পীঠস্থান ছিল ভিয়েনা। এইবার বীটোফেন চিরকালের মতো বন্ পরিত্যাগ করে ভিয়েনাতে চলে

এলেন। শুরু হয় তাঁর ছাত্রজীবনে একটা নতুন অধ্যায়। অত্যন্ত যত্ন এবং আগ্রহের সঙ্গেই এই অধ্যায় আরম্ভ হয়েছিল। তারপর তাঁর অদৃষ্টে যা ছিল তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে থাকে—সফলতা ও বিফলতা, সমালোচনা ও প্রশংসা, নৈরাশ্য ও বিজয়লাভ সব যেন একত্রে তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে। হেডনের কাছ থেকে তিনি প্রায় এক বছর পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাঁর মধ্যে কিছু মানসিক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি যেন কতকটা খামখেয়ালি হয়ে উঠলেন— খেয়াল ও কল্পনা তাঁকে পেয়ে বসল।

তাঁর স্বভাব ভয়ংকর ভাবে উগ্র হয়ে উঠেছিল। সময় সময় তিনি নিজেকে সংযত করতে পারতেন না—রাগে তাঁর সর্বশরীর কাঁপতো। সেই রাগ এমন প্রচণ্ড ছিল যে তাঁর কপালের শিরা উপশিরাগুলি স্ফীত হয়ে ফুলে উঠত। যদি কারো বাজনা শুনে বেসুরো মনে হতো অমনি তিনি উন্মাদের মতো বদ্ধমুষ্টি দিয়ে বাদ্যযন্ত্রটিকে আঘাত করতেন। রেস্তোরাঁতে গিয়ে হয়তো স্যুপের (Soup) ডিসটা তুলে নিয়ে পরিচারকের মাথায় ঢেলে দিতেন। তথাপি তাঁর জীবনীকারগণ লিখেছেন, মানুষটি জনপ্রিয় ছিলেন আর সেই জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেন ও সেই বন্ধুত্ব বজায় রাখতেন। কারণ লুডউইগের অত্যাশ্চর্য ব্যক্তিত্বকে তাঁর চেয়ে বন্ধুরাই বেশি বুঝতেন। এইসব যুক্তিহীন আচরণ, খামখেয়ালিপনা ও অশিষ্ট ব্যবহারের পর শিল্পী যখন শান্তভাবে তাঁর পিয়ানোর সামনে বসে, তাঁর সৃষ্ট সুমিষ্ট স্বরলহরীর মধ্যে তাঁর আত্মাকে ঢেলে দিতেন, তখন হয় তিনি স্বর্গে, নতুবা নরকে বাস করতেন। বীটোফেন ত্রিশের কোঠায় পদার্পণ করলেন। তাঁর স্বভাব তখনো দুঃসহ ছিল। তাঁর ক্রোধ, সন্দেহ ও কর্কশ আচরণ তাঁর বন্ধুদের কাছে সর্বদাই বিরক্তির বিষয় হয়ে উঠেছিল। এক নির্দয়, নিষ্ঠুর নিয়তি ধীরে ধীরে তাঁকে যেন গ্রাস করছিল। ক্রমে ক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর শ্রবণশক্তি একেবারেই কমে আসছে। যখন পিয়ানোর সামনে বসে বাজাতেন তখন সুরের লয় ও তালের সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরতে পারতেন না। ব্যাধি ক্রমেই খারাপের দিকে যায়। তিনি বিশেষজ্ঞদের দেখালেন। তাঁরা খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে, তাঁকে বললেন—'আপনার এই বধিরতার সূচনা আপনার প্রথম যৌবনকাল থেকেই, এবং সম্ভবত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।'

ভগ্নহৃদয়ে শিল্পী ফিরে আসেন তাঁর সাধনার নির্জন ঘরটিতে এবং পিয়ানোটির সামনে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তাঁর জীবনের আকাশ ধূসরতায় আচ্ছন্ন হয়; হৃদয় ভেঙে পড়ে নৈরাশ্যে। তাঁর পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে—সামনে শুধু প্রসারিত রয়েছে এক অসীম শূন্যতা—সুরহীন, সংগীতহীন শূন্যতা। পিয়ানোর ওপর হাত রাখলেন, জোরে রীডগুলি টিপলেন, কিন্তু কৈ, কোন ধ্বনি তো তাঁর কানে এসে আঘাত করল না। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় বীটোফেনের হৃদয়। তবে কি অবশিষ্ট জীবন তাঁকে সুরের জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে কাটাতে হবে? থাকতে হবে তাঁকে এই শব্দহীন পৃথিবীতে? চিকিৎসকগণ ভুল করেননি তো?

তাঁদের তো কখনো কখনো এরকম ভুল হয়ে থাকে। কিন্তু না; ক্বচিৎ তাঁরা ভুল করেন। অতএব তাঁর চিন্তার দোলকটি আশা-নৈরাশ্যের মধ্যে ক্রমাগত দুলতে থাকে। অবশেষে তাঁর প্রিয়তম যন্ত্র ও তাঁর মধ্যে যেন একটা দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়—তিনি পিয়ানোর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। যা ছিল তাঁর কাছে সুরের যন্ত্র তা এখন হয়ে উঠল যন্ত্রণার সামগ্রী। হাত দুটির মধ্যে মাথা ঢেকে, বীটোফেন নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকেন তাঁর টেবিলের কাছে।

কয়েক সপ্তাহ তিনি ঘরের বাইরে এলেন না। কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত করলেন না। কিন্তু যদি কেউ দরজা অতিক্রম করে ভেতরে আসতে সক্ষম হতো তাদের তিনি নম্র শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানাতেন। নিয়তির নির্মম কঠিন আঘাতে তাঁর চরিত্র যেন সহসা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল—তাঁর সেই উগ্র প্রকৃতি কোমলতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। তাঁর সত্তার মধ্যে একটা সম্ভ্রান্ত ভাব, সাহসের ভাব ফুটে উঠতে থাকে। ১৮০২ সালে তিনি একটি পত্র রচনা করলেন যেটিকে বলা হয় তাঁর দানপত্র বা 'উইল'। হৃদয়-বিদারক সৌজন্য ও গভীর অনুভূতির সঙ্গে পরিষ্কার অনুত্তেজিত ভাষায় তিনি জানালেন তাঁর এই কঠিন ও দুরারোগ্য ব্যাধির তাৎপর্য কি।

কিন্তু ক্রুর নিয়তি শিল্পীর প্রতিভাকে বিনষ্ট করতে সক্ষম হলো না। শ্রবণশক্তি হারানো সত্ত্বেও তিনি তাঁর সৃষ্টির কাজে মনোনিবেশ করলেন। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, বধিরতা সত্ত্বেও তিনি সুরসৃষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকেন নি।

১৮২৬। শরৎ কাল।

বীটোফেন গিয়েছিলেন তাঁর ভাই যোহানকে দেখতে। সেখান থেকে এসে আক্রান্ত হলেন 'ড্রপসি' বা শোথ রোগে। প্রায় সাত মাস তিনি এইভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। এই সময় তাঁর নতুন কাজের পরিকল্পনা রচনা করে, রোগযন্ত্রণা লাঘবের জন্য তিনি প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছিলেন। সেই নিঃশব্দ মানসিক সংগ্রামের ভাব তাঁর বিবর্ণ মুখমণ্ডলের রেখায় ফুটে উঠত। রোগ-শয্যায় শায়িত বীটোফেনকে দেখে সবাই বিস্মিত হতো তাঁর আশ্চর্য মানসিক শক্তি দেখে।

১৮২৭। মার্চ মাস। সেদিন ছিল ঘোর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বীটোফেন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তাঁর বাসভবন থেকে কফিনটি যখন নিক্রান্ত হলো, তখন বিশ হাজার শোকার্ত নরনারী সেই কফিনের পুরোভাগে নিঃশব্দে চলেছিল।

স্যার ওয়াল্টার স্কট

(১৭৭১—১৮৩১)

ইংরেজি সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা এবং ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, স্যর ওয়াল্টার স্কট সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নিজ নামের মুদ্রাঙ্কিত করেছেন। তাঁর প্রথম জীবনে কবি-খ্যাতিও ছিল। কিন্তু পরবর্তিকালে জনপ্রিয় ঐতিহাসিক রোমান্স-লেখক হিসাবেই তাঁর প্রভাব শুধু তাঁর স্বদেশের লেখকগণের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র য়ুরোপেই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ পাঠক স্কটের নভেল পাঠ করে আনন্দলাভ করেছেন। তাঁর জীবন তাঁর লেখা যে-কোন একটি কাহিনীর মতোই চিত্তস্পন্দী—সে জীবনে ছিল কঠিন সংগ্রাম, প্রাণপাত পরিশ্রম, আর অসামান্য সাহস। সফলতা যেমন ছিল, তেমনি তাঁকে একসময়ে ঋণভারে জর্জরিত হতে হয়েছিল, সম্মান যেমন পেয়েছিলেন, ভালোবাসায় তেমনি সার্থক হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবন।

স্যর ওয়াল্টার স্কটের জীবন একটি শ্রেষ্ঠ রোমান্সের সঙ্গেই তুলনীয় এবং তাঁর যে কোন লেখার মতোই সেই জীবন ছিল একটি প্রাণস্পর্শী ট্রাজিডি। সুশ্রী ও সুগঠিত দেহ, তাঁর সময়কার 'বেস্ট-সেলার' লেখক, গৌরবময় সৃষ্টির দ্বারা ইংরেজী সাহিত্যকে যিনি সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁকেই কিনা শেষ জীবনে ঋণের দায়ে জর্জরিত হতে হয়েছিল, ভগ্নস্বাস্থ্য নিঃস্ব হয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। যে ঋণের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না, তাই পরিশোধ করবার জন্য জীবনের শেষ দিনগুলি তাঁকে ক্রীতদাসের মতো পরিশ্রম করতে হয়েছিল—এমন ট্র্যাজিডি কারো জীবনে দেখা যায়?

১৭৭১, আগস্ট ১৫, স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত এডিনবরাতে এক আইনজীবীর পুত্ররূপে ওয়াল্টার স্কট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা একটি স্কটিশ এ্যাটর্ণী অফিসে কাজ করতেন। স্কট যখন আঠারো মাসের শিশু তখন তাঁর ডান পা-টি অকেজো হয়ে যায় এবং সারা জীবন তাঁকে পঙ্গু হয়ে কাটাতে হয়েছিল। এই পঙ্গুতা সত্বেও তিনি সুঠাম আকৃতির ছিলেন এবং এই পঙ্গুতা কখনো তাঁর সুখের অন্তরায় হয়ে উঠতে পারেনি। স্কুল অপেক্ষা খেলার মাঠ তাঁর প্রিয় ছিল। বয়োপ্রাপ্ত হয়ে খোঁড়া পা নিয়েই তিনি বিশ ত্রিশ মাইল তাঁর গ্রামের পথে হেঁটে বেড়াতেন। সেখানে যেসব লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, উত্তরকালে তারাই নানা চরিত্ররূপে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে দেখা দিয়েছিল। পিতার পদাঙ্ক অনুকরণ করে স্কট আইনের পেশা অবলম্বন করলেন ও একজন আইনজীবী হলেন। পরিশ্রম ও প্রতিভার বলে তিনি এই ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরের অনুরাগ ছিল সাহিত্যের প্রতি। আইন ব্যবসায় ও সাহিত্যকর্ম—দুটিই তিনি

একসঙ্গে শুরু করেছিলেন এবং লেখক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমে তাঁর মনে এই ধারণা দৃঢ় হলো যে, আইনের পেশা অপেক্ষা সাহিত্য-কর্মের মধ্যেই রয়েছে তার জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

যখন তিনি আইন ব্যবসায়ে নিবিড়ভাবে লিপ্ত ছিলেন, দেশের অতীত সম্পর্কে স্বপ্ন দেখার সময় পেতেন—দেশের ইতিহাস ও লোক কাহিনীতে তাঁর মন তখনই অভিসিঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। মনশ্চক্ষে স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসের বিখ্যাত চরিত্র ও ঘটনাবলী নতুন করে সৃষ্টি করতেন। ১৭৪৫ সালের যুদ্ধে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেইসব প্রাচীন লোকদের খুঁজে বের করতে তিনি কখনো ক্লান্তি বোধ করতেন না। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্কটল্যাণ্ডের সংগ্রামে তিনি গৌরব বোধ করতেন; সেই সংগ্রামের কাহিনী নতুন করে বর্ণনা করতে তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন এবং এই বর্ণনা দ্বারা তিনি তাঁর শ্রোতাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন গাথা নিয়ে ১৮০২ সালে স্কট প্রকাশ করলেন 'বর্ডার মিনিস-ট্রেলস' নামে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ। আবার এই ছিল তাঁর জীবনে ধ্বংসের প্রথম সোপান; কারণ তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশক জেমস ব্যালানটাইন ছিলেন তাঁর স্কুল জীবনের বন্ধু; চব্বিশ বছর পরে যখন তাঁর কারবার বন্ধ হয়ে যায়, তখন সেই ঋণের বোঝা স্কটকে বহন করতে হয়েছিল। এই ঋণ পরিশোধ করতে করতে তাঁর মৃত্যু হয়।

এডিনবরাতে বসবাস স্থাপন করে, স্কট কঠিন পরিশ্রম করতে লাগলেন, মিতব্যয়ী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলেন। চাকরির অবসরে যেটুকু সময় পেতেন সেইটা তিনি সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত করতেন। ১৮০৫ সালে তাঁর নতুন কাব্যগ্রন্থ Lay of the Last Ministrel প্রকাশিত হলো। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে বইটি পাঠক মহলে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়। বিক্রীর দিক দিয়ে, আশাতীত সাফল্য লাভ করল। তখন থেকেই বিচারবোধ সম্পন্ন সমালোচকগণ বুঝলেন যে আইনজীবী হিসাবে নয়, লেখক হিসাবেই স্কট অমরত্ব লাভ করবেন। পরের বছরে বেরুলো Marmion। আর একটি কবিতার বই এবং এটিও 'Lay' অপেক্ষা অধিক সাফল্যমণ্ডিত হলো, সমাদৃত হলো পাঠক সমাজে। এখন স্কট যেন সুখ ও সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করলেন। ১৮১২ সালে টুইডসাইড অঞ্চলে তিনি ছোটখাটো একটা জমিদারি কিনলেন; নাম দিলেন 'য়্যাবোটসফোর্ড'। তারপর থেকে জমিদারি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ব্যারোনিয়াল হলে পরিণত হয়। এই অঞ্চলটির বিশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য ছিল এবং এইখানেই ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (১৫২৬) স্কট ও কেরবের সঙ্গে প্রসিদ্ধ সীমান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। জমিদারী করতে গিয়ে স্কট ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। অর্জিত সম্পদ সব তিনি ব্যয় করে ফেললেন। শেষে ঋণ করে জমিদারির প্রসার ও পুরাতন বাড়ির উন্নতি সাধন করেন। প্রথমে তাঁর খরচ হয়েছিল চার হাজার পাউণ্ড। এখন খরচ হলো ৭২ হাজার পাউণ্ড। যাই হোক, এই ব্যয়বহুল পরিবেশেই সৃষ্ট হয়েছিল তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি—

‘রকবি’, ‘লর্ড অব দি আইলস্’, ‘গাই ম্যানারিং’, ‘কেনিলওয়ার্থ’, ‘আইভানহো’, ‘রব রয়’, ‘হার্ট অব মিডলোথিয়ান’ ইত্যাদি।

১৮১৫ সালে স্কট উপলব্ধি করলেন যে তাঁর কবিত্ব শক্তি হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এজন্য তিনি বিচলিত বোধ করলেন না। কারণ তিনি জানতেন যে তাঁর মগজে এখনো অন্তত এক ডজন উপন্যাসের উপকরণ সঞ্চিত রয়েছে। এই বছরগুলিই ছিল লেখক হিসাবে তাঁর সাফল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। প্রকাশকগণ যথেষ্ট মূল্য দিয়ে তার বই নিতেন। হাজার হাজার পাঠক সেগুলি পড়ত। স্কটল্যাণ্ডে যেসব সম্ভ্রান্ত লোক বাস করতেন বা যাঁরা স্কটল্যাণ্ড পরিদর্শনে আসতেন তাঁরা সকলেই অ্যাবোট-সফোর্ডে এসে স্কটের আতিথ্য গ্রহণ করে যেমন পরিতৃপ্ত হতেন তেমনি আনন্দ পেতেন তাঁরা ‘আইভানহো’র লেখকের সঙ্গে আলাপ করে। স্কট যেমন সামাজিক তেমনি আলাপচারি মানুষ ছিলেন।

ঔপন্যাসিক হিসেবে স্কটের খ্যাতি যখন মধ্য গগনে তখন আরো কিছু সম্মান-লাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটল। ১৮২০ সালে তিনি ব্যারণ হলেন। তাঁকে ব্যারোনেসি প্রদানের প্রস্তাব যখন করা হয়, তখন তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। সেই বছরেই তিনি স্কটল্যাণ্ডের বিদ্বজ্জন সভা রয়্যাল সোসাইটি অব স্কটল্যাণ্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। তারপর তাঁকে রাজকবির সম্মান দান করার প্রস্তাব হয়; তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হন। অসম্মত হবার একটা প্রধান কারণ এই ছিল যে, তখন জনসাধারণের দৃষ্টিতে রাজকবি হওয়া খুব গৌরবের বিষয় ছিল না।

তখনো তাঁর সাহিত্য কর্মের অনেক বাকি। এমন সময় জীবনের অন্ধকার দিনগুলি ঘনিয়ে আসতে থাকে। স্কটের স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করেছে; আর সেই সঙ্গে আর্থিক কষ্ট। মিতাচারী জীবন তিনি কোন দিন যাপন করেন নি আর পরিশ্রম করতেন অপরিমিত। কাজ ও আনন্দ-উপভোগ এই দুটি বিষয় একসঙ্গে চালিয়ে তাঁর দেহ ও মন দুই-ই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তিনি যেভাবে তাঁর শরীর ও মনের ওপর জবরদস্তি করেছেন এমনটি করতে খুব কম লোকেই সাহস পায়। অবশেষে দেহ-যন্ত্র বিদ্রোহ করল—১৮১৭ সালে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। পেটের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করতেন—সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় যেন কুঁচকে উঠত। এই অবস্থায়, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, তিনি তাঁর দুটি উপন্যাসের শেষাংশ মুখে মুখে বলে যেতেন। তারপর ছাপার অক্ষরে যখন দেখলেন, একটি বর্ণও তাঁর বোধগম্য হলো না। সমস্ত শরীরে ফোস্কা, তেমনি চলছে রক্তস্রাব। একখানি শুকনো রুটি আর দৈনিক বড়জোর তিন গ্লাস মদ—এইভাবে কিছুকাল তাঁর স্বাস্থ্য টিকিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু এর চেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি মুদ্রাকর ও প্রকাশক ব্যালানটাইন অ্যাণ্ড কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ব্যালেনটাইন ভ্রাতৃযুগল (জেমস্ ও জন) ছাপার কাজ ভাল বুঝতেন। কিন্তু প্রকাশনার ব্যবসা মোটেই বুঝতেন না; প্রকাশক হিসাবে তাঁদের অযোগ্যতা যথেষ্ট ছিল। তাঁরা যে অসাধু

ছিলেন তা নয়, আসলে তাঁরা ছিলেন অমনোযোগী এবং ঠিকভাবে ব্যবসা চালাতে তাঁরা ছিলেন নিতান্ত অক্ষম। ১৮২৬ সালে কনস্টেবল ও ব্যালেনটাইন দুটি প্রতিষ্ঠানই দেউলিয়া হয়ে যায় এবং এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের ঋণের বোঝা এসে পড়ল স্কটের মাথায়।

সেই দারুণ বিপর্যয়ের দিনে সকলে দেখে বিস্মিত হয়েছিল স্কটের আত্মসম্মান বোধ কত প্রখর। তিনি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে অসম্মত হলেন। এমন কি যদিও নৈতিকতার দিক থেকে ঋণের জন্য তিনি অংশত দায়ী ছিলেন, তথাপি সমস্ত ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং তাঁর উত্তমর্ণদের স্বার্থে তিনি ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগলেন। একমাত্র তাঁর লেখনীর ওপর নির্ভর করে তিনি এই বিপুল পরিমাণ দেনা পরিশোধ করতে মনস্থ করলেন।

সত্তর হাজার পাউণ্ড দেনা তিনি লিখে পরিশোধ করেন এবং বাকীটা তাঁর বইয়ের স্বত্ব বাবদ মূল্য দিয়ে পরিশোধ করেছিলেন। এই দায়িত্ব বহন করতে গিয়ে স্কটের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে যায়। ১৮৩১, ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন যা সকলেই আশংকা করেছিল। সরকারী সাহায্যে স্কট সমুদ্র-ভ্রমণে গেলেন হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য। ইতালীতে এসে ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করলেন। কিন্তু স্কট জানতেন তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় তিনি গ্যেটের মৃত্যু সংবাদ পেলেন। বললেন 'মহাকবি' অন্তত তাঁর স্বগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

১৮৩২, জুলাই ১১। স্কট য়্যাবোটফোর্ডে ফিরে এলেন। দশদিন বাদে' এক উজ্জ্বল গ্রীষ্মের দিনে পুত্র-কন্যা পরিবৃত হয়ে এক শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক এবং সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। সাহিত্যে তাঁর অমরত্ব সুনিশ্চিত। বিগত এক শতাব্দী যাবৎ বৃদ্ধ ও তরুণ তাঁর কবিতা ও উপন্যাস পাঠ করে আনন্দ উপভোগ করে এসেছে। তাঁর জীবিত কালেই য়ুরোপের সাহিত্যজগতে স্কটের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলেকজান্দার ডুমা বলেছিলেন 'ইংরেজি সাহিত্যের জন্য স্কট যা করেছেন, ফরাসী সাহিত্যের জন্য আমি তা-ই করতে ইচ্ছা করি।' তাঁর জীবিতকালেই অনেক লেখক তাঁর অনুকরণ করেছিলেন আর সমকালীন লেখকদের ওপর স্কটের প্রভাবই ইংরেজি কথাসাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের সূচনা করে দিয়েছিল। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। সকলের প্রতি প্রসারিত ছিল তাঁর সহৃদয়তা। গৃহভৃত্যদের কাছে তিনি ছিলেন একজন উদারচেতা মনিব। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর অদম্য জীবনীশক্তি যারা যেন অভিসিঞ্চিত হয়ে আছে স্কটের সমগ্র কৃতির মধ্যে। একজন লেখকের পক্ষে এ বড়ো কম গৌরবের কথা নয়। স্কটের সাহিত্যে তাঁর মাতৃভূমি স্কটল্যাণ্ড যেন তার সকল প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। এ সত্যিই অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন।

রামমোহন রায়

(১৭৭২—১৮৮৪)

পলাশির যুদ্ধের পনর বছর পরে, হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা তখনকার নবাব-সরকারে দায়িত্বজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেই সূত্রে তাঁরা জমিদারী লাভ করেন। রায়-পদবীটি নবাবদের কাছ থেকেই পাওয়া। রামমোহনের পিতার নাম রামকান্ত রায়, মায়ের নাম তারিণীদেবী। তিনি ছিলেন যেমন বুদ্ধিমতী তেমন তেজস্বিনী। উত্তরাধিকার সূত্রে রামমোহন শৈশব বয়সেই তাঁর মায়ের অনেকগুলি গুণ লাভ করেছিলেন।

রামমোহন মেধাবী ছিলেন। প্রথম জীবনে পাটনায় অবস্থানকালে তিনি ফার্সী ও আরবী ভাষা ভালোভাবেই আয়ত্ত করেন। কিশোর বয়সেই মূল আরবীতে তিনি এরিস্টটল ও ইউক্লিডের গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন এবং এরই ফলে তাঁর স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর ও মার্জিত হয়েছিল। ন্যায়শাস্ত্রেও তাঁর অসাধারণ অধিকার জন্মেছিল এবং এই গুণেই পরবর্তিকালে তিনি একজন বীর তর্কযোদ্ধা হতে পেরেছিলেন। পাটনায় অধ্যয়নকালে রামমোহন ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরান ও সুফী দিগের কিছু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এই অধ্যয়ন তাঁর মানসবিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। এরপর হিন্দুশাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হওয়ার জন্য রামমোহন কাশীতে এসে কিছুকাল সংস্কৃত পড়তে থাকেন। কথিত আছে, মেধাবী রামমোহন অল্পকালের মধ্যেই প্রধান প্রধান আর্যশাস্ত্রে আশ্চর্যরূপ জ্ঞান অর্জন করেন। এইভাবে যৌবনে উপনীত হওয়ার পূর্বেই তিনি হিন্দুসাধনার সঙ্গে যেমন পরিচিত হয়েছিলেন তেমনি পরিচিত হয়েছিলেন মুসলিম সাধনার সঙ্গে এবং এর প্রত্যক্ষফল এই দাঁড়াল যে, ইসলামের একেশ্বরবাদ ও বেদান্তের ব্রহ্ম—এই দুটির মধ্যে রামমোহন কোনো পার্থক্য দেখতে পেলেন না। এর পরেই আমরা যে রামমোহনকে পাই তিনি একজন পুরাদস্তুর মূর্তিপূজা বিরোধী একেশ্বরবাদী রামমোহন।

রামমোহনের বয়স যখন ষোল বছর তখন তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানা বই লিখলেন এবং এর ফলেই তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল। সেই বয়সেই রামমোহন এই সংকল্প গ্রহণ করেন যে তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধন করবেন ও মূর্তিপূজার গ্লানি থেকে আর্যধর্মের চিরন্তন মহিমাকে রক্ষা করবেন এবং পুরোহিতের বিধান থেকে মানুষের ধর্মচিন্তাকে অধিকৃত রাখবেন। গৃহত্যাগ করার পর পরিব্রাজক রামমোহন ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে গিয়ে স্বচক্ষে দেশের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করেন। কেবল যে ধর্মের দিকটার পরিচয় গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, এই অজ্ঞাতবাসের সময় তিনি ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থা—সকল স্তরেই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কিছুকাল বাদে রামমোহন গৃহে

ফিরলেন এবং আবার গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। পিতা যখন দেখলেন যে, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা সম্পর্কে পুত্রের ধারণার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি, তখন হিন্দুধর্মের প্রতি পুত্রের তীব্র বিরূপ মনোভাব দেখে, পিতা-পুত্রে আবার সংঘর্ষ বাধল, পরিজনদের সঙ্গে আবার মতান্তর হলো। এই দ্বিতীয়বার গৃহত্যাগের সময় রামমোহন সপরিবারে কাশী চলে আসেন। এইখানেই তখন তাঁর ইংরেজী শিক্ষা শুরু হয়েছিল। রামমোহনের বয়স তখন বাইশ বছর। তখন থেকেই এই বিদ্রোহী তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির করে পথ চলতে শুরু করেন।

অতঃপর রামমোহন কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হন। তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। কালেক্টর জন ডিগবির অধীনে তিনি চাকরি গ্রহণ করেন। তাঁর কর্মজীবনের দীর্ঘকাল রংপুরে অতিবাহিত হয়েছিল। স্বীয় প্রতিভা ও কার্যদক্ষতা-গুণে সামান্য কেরাণী থেকে রামমোহন শেষ পর্যন্ত কালেক্টরের দেওয়ান হয়েছিলেন। ডিগবির অধীনে কাজ করতে করতেই তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেন। এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখ্য যে কালেক্টর ও দেওয়ান উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যার ফলে উত্তরকালে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ মুছে গিয়ে তাঁদের দু'জনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। রামমোহন কর্মজীবনে এই ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে রামমোহন সরকারি কর্ম পরিত্যাগ করে কলকাতায় এসে স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৮১৬ সনে তাঁর কলকাতা আসার পর থেকে ১৮৩১ সনের এপ্রিল মাসে বিলাত যাত্রার সময় পর্যন্ত, এই দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কালের মধ্যে স্বোপার্জিত অর্থের সাহায্যে ও প্রাণপণ পরিশ্রম সহকারে রামমোহন স্বদেশের উন্নতির জন্য নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তার স্বদেশবাসীকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা থেকে আধুনিককালের যুক্তি-সিদ্ধ জীবনের পথে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার জন্য একাকী তিনি যে সব সংস্কারমূলক প্রয়াসে অগ্রণী হয়েছিলেন—তা সহজে ধারণা করা যায় না।

সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন রামমোহন। একদিকে গোঁড়া পাদরি, অন্য দিকে গোঁড়া ভট্টাচার্যের দল—তাঁর প্রথম পর্যায়ের সংগ্রাম ছিল এই দুই পক্ষের সঙ্গে। শাস্ত্র ও যুক্তি—এরই সাহায্যে তিনি স্বজাতির মতি পরিবর্তন ও তাদের মননের সংস্কারসাধন করতে চাইলেন। শাস্ত্র বলতে একেশ্বরবাদী রামমোহন বুঝতেন উপনিষদ ও বেদ। প্রথম উদ্যোগেই তিনি সংস্কৃত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বাংলায় অনুবাদ করে 'বেদান্ত গ্রন্থ' এই নামে প্রকাশ করলেন। এর কিছু কাল পরে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে প্রকাশ করলেন 'বেদান্ত সার' গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থের একটি ইংরেজী অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। পাঁচখানি প্রধান উপনিষদের বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ করলেন একে একে। তাঁর এইসব গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ ও বিচার-বিতর্কমূলক পুস্তিকাগুলির ইংরেজী অনুবাদ

তিনি বিলাতে পাঠাতেন এবং তখন থেকেই পাশ্চাত্য দেশ রামমোহনকে একজন মহাজ্ঞানী ধর্মসংস্কারক বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। বাংলায় ধর্মশাস্ত্র প্রকাশ করে তিনি সেদিন বাংলা ভাষার গোড়াপত্তন করে স্বজাতির মানস-বিকাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।

রামমোহনের দ্বিতীয় কীর্তি আত্মীয়সভা স্থাপন। তিনটি ধর্মই তাঁর ভালো করে জানা ছিল বলে তাঁর মত ছিল অত্যন্ত উদার। তাঁর প্রবর্তিত নূতন রীতি ছিল সকল ধর্মের লোকের পক্ষেই উপযোগী। এই আত্মীয়সভাই তাঁর ভবিষ্যৎ ধর্মসংস্কারের প্রথম সোপান ছিল এবং পরবর্তিকালে ইহাই ঐতিহাসিক পরিণতি লাভ করে ব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত হয়। হিন্দুধর্মের এই নূতন রূপরেখা রচনা রামমোহন মনীষীর অন্যতম নিদর্শন বলে গণ্য হয়ে থাকে। এখান থেকেই ভারতের ধর্মজগতে নবযুগের সূচনা। সেদিন তিনি যে সার্বভৌমিক ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করেছিলেন তা কোনো শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না—সাধারণ জ্ঞান ও নির্বিরোধ যুক্তিই তার ভিত্তিভূমি। এই বিশ্বজনীন অশাস্ত্রচালিত ধর্মের পরিকল্পনা পৃথিবীতে সেই প্রথম। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এত বড়ো বিপ্লব আর কখনো দেখা যায় নি।

ধর্ম ও সমাজ—এই দুটিই ছিল রামমোহনের শ্রেষ্ঠ সাধ্য। রামমোহন ভারতের শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। হিন্দুসমাজে প্রচলিত পাঁচটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি একাকী সংগ্রাম করেছিলেন, যথা—জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ। এর মধ্যে শেষোক্তটিকে কেন্দ্র করে তিনি যে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন তাই তাঁর অক্ষয় কীর্তি এবং বাংলা তথা ভারতের পরবর্তিকালের সমাজবিপ্লবের ইতিহাসে এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। সহমরণে পুণ্য হয়—প্রচলিত এই ধারণা প্রকৃতপক্ষে যে একটি বড়ো রকমের কুসংস্কার এবং বর্বর প্রথা এটা তাঁর আগে আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেন নি। একে তিনি পুরুষপ্রধান সমাজের অত্যাচার বলে মনে করতেন। ১৮১৮ সনে তিনি সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং এগার বছর কাল যাবৎ তিনি একাকী এই আন্দোলন পরিচালনা করে কৃতকার্য হয়েছিলেন।

রামমোহনের অপর প্রধান কর্মকীর্তি—এই দেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার। এই ক্ষেত্রে তিনি যে আন্দোলন করেছিলেন, তার গুরুত্ব তাঁর সমাজ-সংস্কার আন্দোলনেরই তুল্য; বরং অধিক বলা যেতে পারে। এই আন্দোলনে রামমোহনের প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও দূরদৃষ্টি দেখে বিস্মিত হতে হয়। ১৮২৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর রামমোহন তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট'কে যে সুদীর্ঘ পত্রখান লিখেছিলেন, ভারতে ইংরেজী শিক্ষা, বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষার পথ তাতেই সুগম হয়েছিল, একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর এই পত্র দ্বারাই সেদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষানীতি নির্ধারিত হয়ে ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তরের সূচনা করে দিয়েছিল।

রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু স্বাধীনতার প্রতি এক অদম্য তৃষ্ণা তাঁর সমস্ত জীবনকে যদি একটি গানের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে তাঁর এই স্বাধীনতা-প্রীতি যেন গানের একটি কলি যা বার বার তাঁর জীবনে ফিরে ফিরে এসেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন রামমোহন। ১৮২৩ সনের প্রেস অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে তাঁর স্মরণীয় পত্রটি তাঁর স্বাধীনতা-প্রীতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। রামমোহনের জাতীয়তার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার কোনো বিরোধ ছিল না। তিনি যথার্থ অর্থে দেশকাল পাত্রের বাধা অতিক্রম করেছিলেন।

রামমোহনের বয়স যখন প্রায় ছাপান্ন বছর তখন তিনি ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের কথা বলবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। দিল্লীর বাদশাহ এই সময়ে তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তিনি য়ুরোপ যান নি। দেশের জন্য, জাতির স্বার্থের জন্য তাঁর ইংলণ্ড যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। য়ুরোপ যেতে পারলে দেশের জন্য আরো বহুবিধ রাষ্ট্রীয় অধিকার তিনি অর্জন করতে পারবেন—এই বিশ্বাসই তাঁকে য়ুরোপ ভ্রমণে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইংলণ্ডে গিয়েও রামমোহন সেখানকার সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে রীতিমতো স্পন্দনের সৃষ্টি করেছিলেন। তবে রিফর্ম বিলই ছিল তার এই সময়কার চিন্তার সর্বপ্রধান বিষয়।

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩। ইংলণ্ডের ব্রিস্টল নগরে মস্তিষ্ক প্রদাহের রোগে রামমোহন মৃত্যুমুখে পতিত হন। মানবসমাজের গুরু এইভাবে মানবকল্যাণব্রতে স্বীয় জীবন সার্থক করে, পৃথিবীতে পরিপূর্ণ মানবতাবোধের যে আদর্শ-স্থাপন করে গিয়েছেন তাই-ই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের কীর্তিস্তম্ভরূপে কালের প্রান্তরে সমুন্নত মহিমায় আজো বিরাজমান।

এলিজাবেথ ফ্রাই

(১৭৮০—১৮৪৫)

'বিশ্বের নারীসমাজে তিনি ছিলেন একটি উজ্জ্বল রত্ন। তাঁকে বিস্মৃত হওয়া কঠিন আমাদের মানসপটে এই করুণাময়ী নারীর স্মৃতি আজো দেদীপ্যমান।' এলিজাবেথ ফ্রাই সম্পর্কে কবি রুপার্ট ব্রুকের এই উক্তিকে কবি-জনোচিত আবেগ বা উচ্ছ্বাস মনে করলে ভুল হবে, এর প্রতিটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাঁকে বলা হয়েছে মূর্তিমতী করুণা। কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত এই নারী ইংলণ্ডের কারা-সংস্কারে ছিলেন অগ্রণী এবং এই একটি মাত্র মহৎ কার্যের জন্য শুধু ইংলণ্ডের ইতিহাসে নয় সমগ্র য়ুরোপ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে নারীদের মধ্যে এলিজাবেথ ফ্রাই একটি অনন্যলব্ধ গৌরব অর্জন করেছেন।

আর্লহ্যামের গার্নি পরিবারটি ছিল কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জর্জ ফক্স। যে উন্নত আদর্শের ভিত্তিতে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ইংলণ্ডে এই কোয়েকার (Quaker) সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল, এলিজাবেথের জীবনে ও কর্মে আমরা সেই আদর্শেরই পরাকাষ্ঠা দেখতে পাই। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে যে তিনটি নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়ে থাকে তা হলো বার্কলে, লয়েড ও গার্নি। এরা তিনজনেই কোয়েকার সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। এই শেষোক্ত গার্নি পরিবারেই ১৭৮০, ২১শে মে, এলিজাবেথ গার্নি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম জন গার্নি। তিনি লেখাপড়া বেশি শিখতে পারেন নি, তবে দেখতে খুবই প্রিয়দর্শন ছিলেন। নরউইচে সেইসময়ে তাঁর চেয়ে প্রিয়দর্শন ও উন্নত হৃদয়ের মানুষ খুব বেশি ছিল না বললেই হয়। যথা সময়ে জন ক্যাথেরিন নাম্নী কোয়েকার সম্প্রদায়ের একটি তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর এগার বৎসর কালের মধ্যে জন সাতটি কন্যা ও চারিটি পুত্রের পিতা হয়েছিলেন। তাঁদের সর্বশেষ সন্তানটির বয়স যখন দুবছর পূর্ণ হয়নি তখন জনের স্ত্রী মারা যান। তখন পুত্র-কন্যাদের লালন-পালন করবার সমস্ত দায়িত্ব বিপত্নীক পিতাকেই গ্রহণ করতে হয়। পিতা হিসাবে জন ছিলেন যেমন স্নেহশীল তেমনি কর্তব্যপরায়ণ। এলিজাবেথ ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান।

এলিজাবেথের বয়স যখন সতেরো তখন থেকেই তাঁর প্রকৃতিতে একটা পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। আগের মতো ভাইবোনদের সঙ্গে বাড়ির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে খেলাধুলা করতে তাঁর মন চাইতো না। তখন থেকেই কিশোরী এলিজাবেথ তাঁর অন্তরে একটা প্রবল প্রেরণা বোধ করতে থাকেন। কে যেন তাঁকে বলে যে জীবনের একটা গভীরতম উদ্দেশ্য আছে। অতীতের সেই হাস্যচঞ্চল দিনগুলি তিনি যেন আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন না। তাঁর এই মানসপরিবর্তনের মূলে

ছিল আমেরিকান ধর্মোপদেশ প্রচারক উইলিয়াম সেভারির বক্তৃতা। তাঁর উপদেশ শুনেই এলিজাবেথের মনে সর্বপ্রথম এই অনুভূতি জাগল যে, ঈশ্বর আছেন। তখন থেকেই তিনি একটু গম্ভীর প্রকৃতির হয়ে উঠলেন। অন্যান্য ভাইবোনদের কলহাস্য মন্দ্রিত সেই আর্লহ্যাম ভবনে এলিজাবেথ যেন নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকেন। তাঁকে নিয়ে বাড়িতে হয় কত সমালোচনা, কত ঠাট্টা তামাসা, কিন্তু তিনি তার কোনো প্রতিবাদ করতেন না, বা বিন্দুমাত্র বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতেন না।

যতই দিন যায় ততই যেন কিশোরী এলিজাবেথ বোধ করতে থাকেন যে একটি মহৎ কর্ম সম্পাদন করতেই তিনি এই সংসারে এসেছেন, আর পাঁচজন মেয়ে যে রকম গতানুগতিক ভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত করে, তাঁর জন্য সে জীবন নয় কি সেই মহৎ কর্ম? মনের মধ্যে জাগে এই প্রশ্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুস্পষ্ট উত্তর শুনতে পান—মানুষের সেবা করে জীবনকে ধন্য করতে হবে, সার্থক করতে হবে। এলিজাবেথ নিজেই লিখেছেন—"I felt that I must didicate my life to the service of humanity." তাঁর পিতা জন গার্নি ছিলেন একজন ধনী ব্যাঙ্কার এবং পুত্রকন্যাদের তিনি প্রচলিত রীতি অনুসারেই মানুষ করেছিলেন। কন্যা এলিজাবেথের এইরকম মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে তিনি তাকে কিছুদিনের জন্য লণ্ডনে রেখে দিলেন। এখানে কিছুকাল ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের পর এলিজাবেথ একজন পুরোদস্তুর কোয়েকার হয়ে উঠতে চাইলেন। পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর বিসর্জন দিলেন, নৃত্য ও সংগীতচর্চা ত্যাগ করেন এবং সর্বপ্রকার প্রসাধন ও আমোদ-প্রমোদের প্রতি বীতস্পৃহ হলেন।

সেই মানসিক পরিবর্তনের গুণে এলিজাবেথ জনহিতকর কাজে মনোনিবেশ করতে চাইলেন। কি ধরনের জনহিতকর কাজ করা যায়? চিন্তা করলেন তিনি এবং অবশেষে ঠিক করলেন যে তিনি গ্রাম্য ছেলেদের জন্য একাকী বিদ্যালয় খুলবেন। সত্তরটি ছেলে নিয়ে তিনি আরম্ভ করেন এই কাজ; সপ্তাহে দু' দিন তাদের পড়াতেন ও প্রতি রবিবার তাদের নিয়ে একসঙ্গে প্রার্থনা করতেন। সেই বয়সেই এলিজাবেথের চরিত্রে অপূর্ব দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল—যে চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তিনি পরবর্তিকালে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এইসময় থেকেই বাইবেল হয়েছিল তাঁর সর্বক্ষণের পাঠ্যগ্রন্থ আর দরিদ্র ও পীড়িতদের পরিচর্যা করা হয়ে দাঁড়াল তাঁর জীবনব্রত। কন্যার এই ধরনের জীবনযাত্রা, এই কৃচ্ছ্রসাধন পিতার আদৌ মনঃপুত হলো না। সংসারে তাঁকে নিয়ে দেখা দিল অশান্তি। কোনো সুন্দরী মেয়ে এইভাবে তার যৌবন নষ্ট করবে—এটা যেন গার্নি পরিবারের কেউ বরদাস্তই করতে চাইল না। এই সময় যোসেফ ফ্রাই নামক কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত এক তরুণের সঙ্গে এলিজাবেথের বিয়ে হয়। বিয়ের শর্ত ছিল এই যে, তাঁর স্বামী তাঁকে কখনই মানবসেবার লক্ষ্য থেকে নিরস্ত বা নিবৃত্ত করবেন না। তখন এলিজাবেথের বয়স কুড়ি বছর যখন তিনি যোসেফকে স্বামিত্বে বরণ করেন।

যোসেফ ধনি ছিলেন। বিয়ের পর লণ্ডনে সেণ্ট মিলড্রেড কোর্টে স্বামীগৃহে এলেন এলিজাবেথ। বিবাহিত জীবনে কয়েকটি পুত্রকন্যার জননী হয়েও তিনি ঠিক সুখী হতে পারলেন না। এই সময় তিনি লণ্ডনের দরিদ্রদের বস্তিগুলি মাঝে মাঝে পরিদর্শন করতেন ও ইসলিংটন ওয়ার্ক হাউসের একজন পরিদর্শিকা নিযুক্ত হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি দুঃস্থদের জন্য স্কুল পরিচালনা, দরিদ্রদের ঔষধ ও পরিচ্ছদ বিতরণ প্রভৃতি জনহিতকর কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন ও জনসভায় বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম বক্তৃতা করতে তিনি সংকোচ বোধ করতেন, যদিও তিনি জানতেন না যে তাঁর প্রকৃত প্রতিভা ছিল বাগ্মীতা এবং এই বাগ্মীতার সাহায্যেই তিনি সমকালীন ইংলণ্ডে একটি বৃহত্তম সংস্কার প্রয়াসে সফলতা লাভ করেছিলেন। ইংলণ্ডের তৎকালীন বন্দীশালাগুলির অবস্থাকে কেন্দ্র করে অভিব্যক্ত হয়েছিল তাঁর এই সংস্কার প্রয়াস।

এই কারা-সংস্কার কার্যে প্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন জন হাওয়ার্ড। অষ্টাদশ শতকে যখন তিনি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন তখন তিনি তথ্যসংগ্রহের কাজে বেশি অগ্রসর হতে পারেন নি। তাঁরই সংগৃহীত তথ্যকে ভিত্তি করে এলিজাবেথ ফ্রাই এই কাজে অসামান্য সফলতা লাভ করেন। তাঁর জীবনের প্রকৃত ইতিহাস এই কারা-সংস্কার উদ্যমের সঙ্গে বিশেষভাবেই সংযুক্ত। তিনিই সর্বপ্রথম এই কারা-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইংলণ্ডের জনসাধারণকে সচেতন করে তুলেছিলেন।

১৮১৩ সালে তিনি যখন সর্বপ্রথম নিউগেট কারাগারটি পরিদর্শন করলেন তখন তিনি সেখানে তিনশত মহিলা বন্দীকে তাদের শিশু পুত্রকন্যাদের নিয়ে আবর্জনাপূর্ণ মেঝের উপর পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। তারা নিজেদের মধ্যে কদর্য ভাষা ব্যবহার করে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে বলে তাদের কোনো কাজে নিয়োগ করা হয় নি। যে সব বন্দিনীর অর্থসঙ্গতি আছে তারা জেলারকে ঘুষ দিয়ে মদ্য সংগ্রহ করত ও অবাধে তা পান করত। এলিজাবেথ কিন্তু এই সব নারী বন্দিনীর দুর্দশা অপেক্ষা তাদের পুত্রকন্যাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অস্থির হয়েছিলেন। তার এই কাজে তাঁকে সহায়তা করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর এক সহোদরা—র‍্যাসেল। ছেলেমেয়েদের কনভেণ্টে রাখার ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে সংসারের দায় ও দায়িত্ব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে নিয়ে এলিজাবেথ তাঁর ইপ্সিত কাজে মনোনিবেশ করলেন। নিউগেট কারাগারে মেয়ে কয়েদীদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবার উদ্দেশে তিনি কারাগারের সন্নিকটেই একটি স্কুল খুললেন। প্রথম প্রথম যখন তিনি জেলখানায় এসে মেয়ে কয়েদীদের সঙ্গে কথা বলেন, তখন তাঁকে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো।

তাঁরই চেষ্টায় জেলখানায় মেয়ে কয়েদীদের অবস্থা তদন্ত করার জন্য পার্লামেণ্ট থেকে একটি কমিটি গঠিত হয়—বারোজন মহিলাকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই জাতীয় তদন্ত কমিটি পার্লামেণ্টের ইতিহাসে সেই প্রথম। অতঃপর ১৮১৭ সনে যখন তিনি The Association for the improvement of

female prisoners in Newgate নামক সমিতিটি স্থাপন করেন তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে কারা-সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৮১৮ সনে তিনি স্কটল্যাণ্ডের কারাগারগুলি পরিদর্শন করে সেখানেও অনুরূপ সংস্কার আন্দোলন সৃষ্টি করেন। এই সময়ে তাঁর এক সহোদর, যোসেফ জন গার্নি, তাঁর অগ্রজার কাজে সহায়তা করেছিলেন। দেখতে দেখতে য়ুরোপের সকল দেশে এলিজাবেথ প্রবর্তিত কারা-সংস্কারের আন্দোলনের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৮২০ থেকে ১৮৩৮ এই আঠার বৎসরকালের মধ্যে রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম, এই কয়টি দেশের বন্দীশালা পরিদর্শন করে সর্বত্রই এলিজাবেথ কারা-সংস্কার প্রবর্তন করেন এবং তখন থেকেই সমগ্র য়ুরোপে এই মহিয়সী নারী মূর্তিমতী করুণা বলে পরিচিতা হন। সর্বত্রই তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন শুধু কারা-সংস্কার নয়, য়ুরোপের বহু রাষ্ট্রের উন্মাদাগারেও তিনি বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করে সেখানকার পরিবেশকে মানবিক সুষমামণ্ডিত করে তুলেছিলেন। এইভাবে মানুষের সেবায় জীবন সার্থক করে, পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে, ১৮৪৫ সনের ১২ অক্টোবর এলিজাবেথ ফ্রাই লোকান্তর গমন করেন।

সাইমন বোলিভার

(১৭৮৩—১৮৩০)

পৃথিবীর বিপ্লবীদের তালিকায় 'সাইমন বোলিভার' একটি অবিস্মরণীয় নাম। দক্ষিণ আমেরিকার মুক্তিপ্রদাতা হিসাবে ইতিহাসে তিনি শাশ্বত খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৭৮৩, ২৪শে জুলাই বোলিভারের জন্ম হয়।

ভেনেজুয়েলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। যতই তিনি বয়োঃপ্রাপ্ত হতে থাকেন, বোলিভার যেন ততই চঞ্চল, বেপরোয়া প্রকৃতির হয়ে উঠতে থাকেন। তিনবছর বয়সের সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তখন ক্যারাকাসের জনৈক বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, মিগুয়েল হোসে সাঁজের রক্ষণাবেক্ষণে বালককে রেখে দেওয়া হয়। নয় বছর বয়সে যখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় তখন সাইমন ও তার তিনটি ভাইবোন এক বিরাট ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হন। খনিজদ্রব্যসমন্বিত খনি, অপর্যাপ্ত আখের ক্ষেত, কল, মদের কারখানা, ফলের বাগান আর অসংখ্য গবাদি পশু ও ক্রীতদাস—এই ছিল তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ।

কিন্তু ঐশ্বর্যের প্রতি সাইমনের বিন্দুমাত্র লালসা ছিল না—তিনি তাঁর দুঃসাহসিক অভিযান নিয়েই ব্যস্ত থাকতে ভালবাসতেন। তিনি একটি ছোট খাটো দল গঠন করেছিলেন এবং তাঁর উৎপাতে রাজকর্মচারী ও ব্যবসায়ী সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। তাঁর উদাস জীবনের শিক্ষক ও পরিচালক হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন রোড্রিগুয়ে নামে একজন অর্ধ উন্মাদ ও স্বাপ্নিক ঘরছাড়া দার্শনিককে। সাইমনের মানসগঠনে তাঁর অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর তরুণ ছাত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে রোড্রিগুয়ে ভেনিজুয়েলার অরণ্য ও পর্বতে ভ্রমণ করতেন বুনোঘোড়া কেমন করে পোষ মানাতে হয় তা তিনি তাঁকে শিখিয়েছিলেন।

বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সাইমনের শরীর সুগঠিত হয়ে উঠল, দেহের পেশী হলো লোহার মতো শক্ত। আকৃতিতে ফুটে উঠল যৌবনের দৃপ্ত মহিমা। 'তোমার এইরকম লোহার শরীর দরকার—দরকার হবে ভবিষ্যতের বড়ো বড়ো যুদ্ধের জন্ম। সেইসব যুদ্ধ পরিচালনা করবার জন্ম তুমিই বিধাতৃ-প্রেরিত মানুষ'—এই কথা একদিন যখন রোড্রিগুয়ে তাঁর ছাত্রটিকে বললেন তখন সাইমনের অন্তঃকরণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তিনি যুদ্ধে সৈনাপত্য করবেন্ এ যেন তাঁর অনেকদিনের সাধ। তিনি গ্রহণ করলেন সৈনিকের বৃত্তি। সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার দুবছর পরেই তিনি সাব-লেফটেনাণ্টের কমিশন লাভ করেন।

১৭৯৯, জানুআরি। সাইমনের দৃষ্টি পড়ল পুরাতন পৃথিবীর দিকে এবং ঐ দিকেই এইবার তিনি অভিযান করবেন মনস্থ করলেন। তিনি যাত্রা করলেন স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ অভিমুখে। সেখানে রাজপ্রসাদে উচ্চ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন

তাঁর খুল্লতাত, ইস্টবান পালাসী।' কেউ বলতো তিনি রাজার, আবার কেউ বলতো তিনি রাণীর বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন। রাজা ক্যারোল ও রাণী মারিয়া লুইসার রাজভক্ত প্রজা হিসাবে সাইমন এলেন মাদ্রিদে। কিন্তু এখানে উপনীত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য রাজকীয় আদেশ দেওয়া হলো। সন্দেহ করা হয়েছিল যে, তিনি ও তাঁর খুল্লতাত উভয়েই সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। ধৃত হওয়ার পূর্বেই সাইমন প্যারিসে পালিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি নেপোলিয়নকে নিবেদন করলেন তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য। নেপোলিয়নকে তিনি ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পরিত্রাতা বলে মনে করতেন। কিছুকাল পরে তিনি জানতে পারলেন যে রাজা ক্যারোল তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তখন কাল বিলম্ব না করে বোলিভার মাদ্রিদে চলে এলেন। এইখানে তিনি একটি স্প্যানিস মেয়েকে বিবাহ করেন। তখন বোলিভারের বয়স মাত্র উনিশ বছর। বিয়ের পর নব পরিণীতা পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে সাইমন যাত্রা করলেন ক্যারাকাসের অভিমুখে। তাঁর বন্ধুরা জানাল তাঁকে স্বাগত ও তাঁর সম্মানার্থে তারা আয়োজন করল আনন্দ উৎসবের। কিন্তু বিধাতা তাঁর অদৃষ্টে গৃহসুখ লেখেন নি। তাই ভাগ্যের নির্মম আঘাতে মাত্র আটমাস কাল পরে সাইমনের স্ত্রী হঠাৎ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। স্ত্রী বিয়োগের দুঃখ বিস্মৃত হবার জন্য তিনি চলে এলেন মাদ্রিদে এবং এইবার এইখানে তিনি পরিচিত হলেন দক্ষিণ আমেরিকার বুদ্ধিজীবী একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে। সাইমনের মতো এঁরাও তখন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁরা গঠন করলেন একটি গুপ্তসমিতি এবং সেই সমিতির অন্যতম নেতা হিসাবে তাঁরা গ্রহণ করলেন বোলিভারকে। অগ্নিবর্ষী তাঁর কণ্ঠস্বর, আভিজাত্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল আর প্রশস্ত ললাট এবং সকলের উপর চক্ষু দুইটির গভীর চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টি সহজেই তাঁর প্রতি অনুগামীদের সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলল। অল্পদিনের মধ্যেই স্পেনের রাজসভার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাঁর উপর এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি একটি রাজকীয় বহিষ্করণের আদেশ প্রদত্ত হলো।

পূর্বের ন্যায় তিনি পুনরায় চলে এলেন প্যারিসে। এইবার তিনি এখানকার সম্ভ্রান্ত সমাজে সাদরে গৃহীত হলেন এবং বিশেষভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন একজনের সঙ্গে—জার্মানীর বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী আলেকজান্দার ভন হমবোল্ড। তিনি তখন সদ্য দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বৈজ্ঞানিক অভিযান শেষ করে প্যারিসে উপনীত হয়েছিলেন। একদিন বোলিভার তাঁকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো ঘুরে এলেন, আপনার কি মনে হয় দক্ষিণ আমেরিকা এখন স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত?' উত্তরে হমবোল্ড তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ। আমার মনে হয় দক্ষিণ আমেরিকা প্রস্তুত তবে আপনার স্বদেশের পক্ষে এখন একজন যোগ্য নেতার প্রয়োজন।' তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের গুরু রোড্রিগুয়েে তখন প্যারিসে অবস্থান করছিলেন। বোলিভার দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে।

অবশেষে গুরু ও শিষ্য এলেন রোমে। পরিদর্শন করলে ভ্যাটিকান শহর।

একদিন অপরাহ্নে দুজনে আরোহণ করলেন মন্তিসাক্রো পর্বতে। অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত ভ্যাটিকান শহরটিকে স্বর্ণমণ্ডিত প্রতীয়মান হলো ; তখনই আশ্চর্য মুহূর্তে রোড্রিগুয়ে জলন্ত ভাষায় রোমের প্রাচীন গৌরব বর্ণনা করলেন। বোলিভার নীরবে দাঁড়িয়ে তা শুনলেন। শুনতে শুনতে তাঁর চক্ষু দুটি সিক্ত হয়ে উঠল, নিঃশ্বাস দ্রুত পড়তে লাগল এবং একটা অধীর আবেগে তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়ে উঠল। তিনি বললেন—'আমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের নামে আমি শপথ গ্রহণ করছি যে, যতদিন না আমার স্বদেশ পরশাসন শৃঙ্খলমুক্ত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমি সংগ্রাম করব'।

বোলিভার যুক্তরাষ্ট্রের পথে স্বদেশে ফিরলেন। দেশের সর্বত্র তিনি এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করলেন। স্বাধীনতা যেন এইবার বাস্তবমূর্তি নিতে চলেছে। তাঁর জন্মভূমি ক্যারাকাসে এসে জনসাধারণের জোয়ার দেখে তিনি উৎফুল্ল হলেন। তাহলে হামবোল্ড মিথ্যা বলেননি। ভেনিজুয়েলাতে আবির্ভূত হয়েছেন এক নূতন মুক্তি প্রণেতা। তাঁর নাম মিরান্দা। ইনিও ছিলেন ভেনিজুয়েলার অধিবাসী। আমেরিকা এবং ফরাসী বিপ্লবে ইনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীতে ইনি ছিলেন একজন জেনারেল। এখন তিনি ফিরে এসেছেন দক্ষিণ আমেরিকায় এবং স্পেনের রাজার বিরুদ্ধে একটি বিপ্লব সংগঠনে সচেষ্ট ছিলেন। মিরান্দা ঘোষণা করলেন দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা। তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল অস্ত্রের সাহায্যে এই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সৈন্য কোথায়। কৃষকদের দিয়ে এই সৈন্যবাহিনী তৈরী করার দায়িত্ব দেওয়া হয় সাইমন বোলিভারকে। তিনি কর্নেল পদে উন্নীত হলেন। কাজটা বড়ো সহজ ছিল না কিন্তু অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বোলিভার সেই কৃষকদেরই সংগ্রামদক্ষ একটি উপযুক্ত বাহিনীতে রূপান্তরিত করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সৈন্যদলের সাহায্যেই মিরান্দা পর পর দুবার স্পেনের রাজকীয় বাহিনীকে পরাস্ত করে দিয়েছিলেন। তারপরেই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মিরান্দা ধৃত ও কারারুদ্ধ হলেন। বন্দী অবস্থায় তিনি ভগ্নমনোরথ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ভেনিজুয়েলার বিদ্রোহ এখানেই শেষ হয়। রাত্রির অন্ধকারে বোলিভার একটি জাহাজে চড়ে নিরাপদ স্থলে চলে যান। কিছুকাল পরে ক্যারাকাসে ফিরে এসে তিনি আত্মগোপন করেন এবং ভবিষ্যতের আর একটি বিপ্লবের জন্য পরিকল্পনা করতে থাকেন।

তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো, সৈন্যদলে ভাঙন ধরল এবং ভূমিকম্প গ্রাস করল বিশ হাজার সৈন্যকে। 'প্রকৃতি পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে। বেশ আমরা প্রকৃতিকে বাধ্য করব আমাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে।' এই কথা সেদিন বলেছিলেন বোলিভার। তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তির কাছে প্রকৃতিকে তিনি নতিস্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন। ধৃত হয়ে বোলিভার যখন একটি দ্বীপে নির্বাসিত হন, তিনি সেখান থেকে পালিয়ে জাহাজে চড়ে নিউগ্রানাডার দিকে যাত্রা করলেন। ভেনিজুয়েলা থেকে আণ্ডিস (Andes) পর্বতমালা অতিক্রম করে এই দেশটি অবস্থিত

ছিল। নিউ গ্রানাডা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ ছিল, এখানে তাঁর নামও কেউ শোনেনি অথচ এইখানে উপনীত হয়ে বোলিভার মুক্তির জন্য একটি ইস্তাহার প্রচার করলেন এবং অস্ত্রের জন্য জানালেন একটি আবেদন। তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে নিউ গ্রানাডার অধিবাসী বোলিভারের আবেদনে সাড়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন যাদুমন্ত্রে গড়ে উঠল একটি সৈন্যবাহিনী। এই সৈন্যদলের সাহায্যে গ্রানাডার উদ্ধার সাধন করে অতঃপর তিনি ভেনিজুয়েলার দিকে তাঁর অভিযান চালালেন। রাত্রির অন্ধকারে তিনি অতর্কিতে শত্রুসৈন্যের উপর আক্রমণ চালাতেন। সংখ্যায় তাঁর সৈন্য খুব বেশি ছিল না। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় সৈন্যদের সাহায্যে তিনি আক্রমণের প্রাক্কালে কৌশলে এমন তুমুল শব্দের সৃষ্টি করতেন যা শুনে স্পেনের সৈন্যরা মনে করতো এ বুঝি এক বিরাট বাহিনী। অস্ত্রবলও তাঁর বিশেষ ছিল না তখন, কামান তো ছিলই না। ছিল শুধু অজেয় সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি।

এইভাবে বোলিভারের একটির পর একটি অভিযান সফল হতে লাগল, সর্বত্রই তিনি রাজকীয় বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনদিনের মধ্যে তিনি ছয়টি যুদ্ধ করেন এবং ছয়টি যুদ্ধেই জয়লাভ করেন। অবশেষে আন্দিস পর্বতমালা অতিক্রম করে তিনি এলেন তাঁর জন্মভূমি ভেনিজুয়েলাতে। তখন তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচশত। বোলিভারের প্রবল উৎসাহের মুখে ভেনিজুয়েলার প্রতিরোধ ভেঙে পড়তে দেরী হলো না—স্পেনের সৈন্যদল বোলিভারের সৈন্যদলের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো। ভেনিজুয়েলা অধিকার করবার পর বোলিভার তাঁর জন্মভূমি ক্যারাকাসের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর এই বিজয় অভিযানের সময় প্রত্যেক শহর ও গ্রাম থেকে বহু তরুণ স্বেচ্ছায় এসে বোলিভারের সৈন্যদলে যোগদান করে তাঁর বাহিনীকে শেষপর্যন্ত বেশ পুষ্ট করে তুলেছিল। শুধু দক্ষিণ আমেরিকাবাসীগণ নয়, বহু স্প্যানিয়ার্ডও যোগদান করেছিল। স্পেনের কুশাসনের বিরুদ্ধে তখন সর্বত্রই অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। ১৮১৩, ৬ই আগষ্ট তাঁর বিজয় অভিযান শেষ হয়—ঐ দিন তিনি ক্যারাকাসে প্রবেশ করেন। পূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে বোলিভার নগরে যখন প্রবেশ করলেন তখন অধিবাসীদের মধ্যে সে কী তুমুল উল্লাস। তারা সম্বর্ধনা জানাল বিজয়ীবাহিনী ও তার অধিনেতাকে। একটি প্রকাণ্ড স্থানে একটি মঞ্চ তৈরি হলো। সেই মঞ্চের উপর স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হয়েছিলেন এবং বোলিভারও সেই মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন।* হর্ষোৎফুল্লিত জনতার সামনে তাঁরা বোলিভারকে দেশের মুক্তিপ্রদাতা বলে ঘোষণা করলেন। সেইদিন থেকেই দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাসে 'Boliver the Liberator' কথাটি স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়।

১৮৩০ সালে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন বোলিভার শুধু বলেছিলেন —'আমার স্বদেশবাসীরা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়—এই আমার অন্তিম ইচ্ছা।'

জর্জ গর্ডন, লর্ড বায়রণ

(১৭৮৮—১৮২৪)

ইংরেজি কবিতায় এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন বায়রণ, তাঁর স্বল্পস্থায়ী কবি-জীবনের এই ছিল গৌরবের বিষয়। প্রদীপ্ত যৌবনের জয়টীকা ললাটে নিয়ে ইংলণ্ডের কাব্যগগনে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই প্রিয়দর্শন কবি—ইংলণ্ডের তরুণদের তিনিই করেছিলেন এক নতুন আদর্শে উজ্জীবিত।

১৭৮৮ সালের ২২শে জানুআরি ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত লর্ড পরিবারে তাঁর পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন বায়রণ। তাঁর জন্মের তিন বছর পরে তাঁর পিতার অকাল মৃত্যু ঘটল, তাঁর মা, ক্যাথেরিন গর্ডন (ইনি স্কটল্যাণ্ডের এক প্রাচীন পরিবারের মেয়ে ছিলেন) স্নেহশীলা নারী হলেও তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত উগ্র, অপ্রকৃতিস্থ হলে তিনি নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে পারতেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর শিশু সন্তানকে নিয়ে তিনি এ্যাবারডিনে চলে আসেন। বায়রণের একটি পায়ের কিছু দোষ ছিল, সেজন্য তাঁকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হতো।

বায়রণের শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল এ্যাবারডিনের একটি স্কুলে। বায়রণের যখন দশ বছর বয়স তখন তাঁর ঠাকুরদাদা লর্ড উইলিয়াম বায়রণ মারা গেলেন, বালক বায়রণ উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যারণ হলেন ও তখন থেকেই তিনি জর্জ গর্ডন লর্ড বায়রণ নামে পরিচিত হন। পদবীটাই লাভ করলেন, সম্পত্তি বলতে কিছুই পেলেন না, কারণ তাঁর ঠাকুরদাদা এক রকম নিঃস্ব হয়েছিলেন। সরকার থেকে মিসেস বায়রণ বার্ষিক তিনশ পাউণ্ডের একটা পেনসন লাভ করেছিলেন। আর তখন থেকেই তাঁর পুত্র দূর সম্পর্কের আত্মীয় লর্ড কার্লিসলের তত্ত্বাবধানে মানুষ হতে থাকেন।

১৮০১। বায়রণকে হ্যারোতে পাঠানো হলো। এখানে তিনি লেখাপড়ায় আশ্চর্য রকমের অলসতার পরিচয় দিয়ে তাঁর সহপাঠীদের কাছে একটা নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। অথচ স্কুলের খেলাধুলায় খুবই দক্ষতা প্রদর্শন করে সবাইকে রীতিমত বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। মুষ্টিযুদ্ধ ও সাঁতারে তাঁর জুড়ি কেউ ছিল না বললেই হয় এবং পায়ের ঐ পঙ্গুতা সত্ত্বেও ১৮০৫ সালে ইটনের ছেলেদের সঙ্গে তিনি ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিলেন।

স্কুলের পাঠ শেষ হলে, ১৮০৫ সালে বায়রণ কেমব্রিজের ট্রিনটি কলেজে ভর্তি হলেন। এই সময়ে তিনি অতিমাত্রায় অমিতব্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন। এইখানে তিনি জ্যাকসন নামে একজন ব্যায়াম-বীরের বন্ধুত্ব লাভ করেন। তাঁর শিক্ষার গুণে বায়রণের শরীরের মেদ হ্রাস পায় এবং তখন থেকে তিনি দেখতে অতি প্রিয়দর্শন হন। ছিপছিপে, সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান। ইতিমধ্যে তিনি কবিতা-লেখা

শুরু করে দিয়েছিলেন এবং ১৮০৭ সালে 'Hours of Idleness' এই নামে বায়রণের প্রথম কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুলির মধ্যে মাঝামাঝি ধরনের এক কবি-প্রতিভার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়রণ পার্লামেন্টের লর্ডসদের সভায় তাঁর আসন গ্রহণ করলেন এবং নিউষ্টিডের পৈত্রিক ভবনে মধ্যযুগীয় কায়দায় বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে উৎসব করতে থাকেন। মায়ের উগ্র প্রকৃতি, মা ও ছেলের মধ্যে ব্যবধানকে অনিবার্য করে তুলেছিল, নিউষ্টিডের বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছা বায়রণের আদৌ ছিল না। ইতিমধ্যে অতিরিক্ত অমিতব্যয়িতার জন্য তিনি বেশ ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আবো ঋণ গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮০৯ সালের জুন মাসে তাঁর কেমব্রিজের পুরাতন বন্ধু হবহাউসের সমভিব্যাহারে বায়রণ লণ্ডন ত্যাগ করে প্রাচ্য দেশ গমনে বাহির্গত হলেন।

ভ্রমণের প্রথম পর্যায়ে তাঁরা এলেন লিসবনে; সেখান থেকে অশ্বপৃষ্ঠে কাডিজ এবং তারপর সমুদ্রপথে আবার জিব্রালটার। মাল্টাতে তিন সপ্তাহ যাপন করে, তাঁরা পুনরায় মহাদেশ অতিক্রম করেন ও প্রিভেজা নামক স্থলে উপনীত হন। এখান থেকে তাঁরা অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ও বন্য প্রদেশ আলবানিয়া ভ্রমণ করেন। আরণ্য সৌন্দর্য ও আধা বর্বর জাতির সংস্পর্শ কবি চিত্তকে সব সময় আনন্দিত করত। আলবানিতে ধর্মান্ধ আলি পাশার অভ্যর্থনার আন্তরিকতা বায়রণের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। অরণ্যবাসীদের হৃদয় নগরবাসীদের হৃদয় অপেক্ষা যে কত উন্নত তা প্রত্যক্ষ করে কবি মুগ্ধ হলেন। তাঁর এই ভ্রমণকেই কবি অক্ষয় করে রেখেছেন তাঁর চাইলড্ হ্যারলড কাব্যে। আলবানিয়া ত্যাগ করে যখন তিনি গ্রীসের অভিমুখে যাত্রা করেন তখন তিনি এই কাব্যটির রচনা শুরু করেছিলেন। এথেনস্ শহরে উপনীত হয়ে গ্রীসের সমারোহপূর্ণ ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনি খুবই অনুপ্রাণিত হলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে গ্রীসের গৌরবময় ইতিহাস। এথেনস্-এ তিনি মাস অতিবাহিত করে স্মার্ণার অভিমুখে যাত্রা করলেন। এইখানেই 'চাইলড্ হ্যারলড কাব্যের দ্বিতীয় সর্গটির রচনা সমাপ্ত হয়। এখান থেকে তিনি এলেন কনস্তান্তিনোপল; এখানে কিছুকাল অতিবাহিত করে আবার গ্রীসে ফিরে এলেন তিনি। এখানে তিনি 'হিনটস্ ফ্রম হোরেস' ও 'কার্স অব মিনার্ভা' রচনা করেন। অবশেষে তাঁর উত্তমর্ণ ও উকিলরা দাবী করলেন যে, বায়রণ যেন অবিলম্বে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরে আসার কয়েকদিন বাদেই নিউষ্টিডে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে বায়রণ উপস্থিত ছিলেন না। এই সময় একদিন তাঁর কেমব্রিজের এক বিদগ্ধ বন্ধু, ডালাস তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন—'কই' দেখি তোমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতার নিদর্শন'। অমনি বায়রণ বন্ধুর হাতে তুলে দিলেন Child Harold-এর প্রথম দুটি সর্গ। ডলাস তৎক্ষণাৎ সেগুলি পাঠ করে বিস্মিত হলেন, আর যথার্থ ভালো কবিতা, নতুন ধরনের কবিতা পাঠের আনন্দ পেলেন তিনি।

নিঃসন্দেহে এগুলি মূল্যবান। মনে মনে বললেন তিনি। তারপর সেই পাণ্ডুলিপি নিয়ে, লণ্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক জন মুরে য্যাণ্ড কোম্পানির পরিচালক মিস্টার মুরের কাছে নিয়ে গেলেন। প্রকাশককে বলে এলেন—'দেখবেন, এই বই বেরুলে সাহিত্য জগতে ঝড় উঠবে'। ১৮১২, ২৭ ফেব্রুআরি। বায়রণ হাউস অব লর্ডস-এ প্রথম বক্তৃতা করবেন। নটিংহ্যামে একটি ঘটনায় ধৃত ও অভিযুক্তদের ওপর যে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল, সেইটা ছিল তার বক্তৃতার বিষয়। তাঁর এই বক্তৃতাটি কিছু মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এর ঠিক দুদিন পরে 'চাইল্ড হ্যারল্ড'-এর প্রথম সর্গ দুটি প্রকাশিত হলো। লণ্ডনের পাঠক মহলে যেন ঝড় উঠল। এক মাসের মধ্যে বইটির সাতটি সংস্করণ ছাপাতে হয়েছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই কাব্যটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের কাব্যজগতে যেন একটি নতুন প্রতিভার অভ্যুদয়ের বার্তা ঘোষিত হয়েছিল—সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল কবি বায়রণ আর তাঁর কাব্যটির নাম।

লণ্ডনের অভিজাত সমাজের দরজা এই রোমান্টিক কবির জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল —সকলেই তাঁর কবিতার সৌন্দর্যের মতো তাঁর বিবর্ণ সৌন্দর্যেরও প্রশংসা করতে লাগল। সেই নিঃসঙ্গ তরুণ সমগ্র লণ্ডন সমাজের একজন গন্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে বায়রণের লেখনী থেকে অজস্র কবিতা বেরুতে থাকে আর সেগুলি প্রকাশিত হওয়া মাত্র জনসাধারণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। ইতিপূর্বে আর কোন কবির ভাগ্যে এমন সমাদর লাভ ঘটেনি। ১৮১৩ সালের এপ্রিলে বেরুলো 'The Waltz'; এর ঠিক একমাস পরে The Giaour এবং ডিসেম্বরে 'The Bride of Abydos' প্রকাশিত হলো। প্রত্যেকটি কাব্য ঠিক আগের মতোই পাঠক মহলে সমাদর লাভ করতে লাগল। পরের বছরে বায়রণ উপহার দিলেন 'The Corsair', 'Lara' ও 'Hebrew' 'Melodies'—এই তিনটি কাব্য গ্রন্থ। ইংলণ্ডের কাব্যজগৎ তখন যেন বায়রণের বন্দনায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

১৮১৫ সালটি বায়রণের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর। লেডি ক্যারোলিন ল্যামবের খুড়তুতো বোন য্যানাবেলা মিলব্যাঙ্ক নাম্নী এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে কবি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এই বিয়ের আকর্ষণ ছিল পাত্রীর রূপ নয়, সম্পদ। য্যানাবেলা প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধীকারিণী ছিলেন। বায়রণ যখন প্রথমবার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন তখন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, কিন্তু ১৮১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিয়ে হলো। এই বিয়ের ফলে যে সম্পত্তি পাবেন বলে তিনি আশা করেছিলেন তা কিন্তু যথেষ্ট ছিল না। বিচ্ছেদ অনিবার্য ছিল। ১৮১৫, ডিসেম্বরে য্যানাবেলার গর্ভে বায়রণের একটি কন্যার জন্ম হয়—অগষ্টা য্যাডা। কন্যার জন্মের পাঁচ সপ্তাহ পরে লেডি বায়রণ তাঁর স্বামীকে পরিত্যাগ করে চলে যান। তিনি আর ফিরে আসেন নি। এই বিচ্ছেদের ফলে বায়রণ জনসাধারণের চক্ষে নিন্দার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সংবাদপত্র এবং একাধিক বেনামী পুস্তিকায় তাঁর উপর

কটুকথা বর্ষিত হতে থাকে। লণ্ডন সমাজে তাঁর দু'একজন সর্বকালের বন্ধু ভিন্ন বায়রণকে এই সময়ে নিঃসঙ্গজীবন যাপন করতে হয়েছিল। অবশেষে তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৮১৬, এপ্রিল মাস, বায়রণ আবার ভ্রমণে বেরুলেন। জেনিভাতে এসে তাঁর সঙ্গে ক্লেয়ার ক্লেয়ারমেণ্টের সাক্ষাৎ হয়। ইনি ছিলেন ইংলণ্ডে তাঁর শেষ প্রণয়পাত্রী। ক্লেয়ারের সঙ্গিনী ছিলেন তাঁর দূর সম্পর্কের বোন মেরি গডউইন ও তাঁর প্রণয়ী শেলি। চরিত্রে ও আদর্শে মিল না থাকলেও, দুই কবি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং কবি হিসাবে উভয়ে উভয়ের প্রাধান্য উপলব্ধি করেন।

শেলির সঙ্গে বায়রণ লেক জেনিভা ভ্রমণ করেন। তাঁর এই সময়কার কাব্য প্রয়াসের মধ্যে উল্লেখ্য ছিল 'প্রিজনার অব চিলিয়ন', 'চাইল্ড হ্যারল্ড'-এর তৃতীয় সর্গ আর কয়েকটি ছোট কবিতা। শেলিরা ইংলণ্ডে ফিরে এলেন আগস্ট মাসে, বায়রণ তাঁর বন্ধু হব হাউজের সঙ্গে আলপ্স ভ্রমণে চলে যান। এই সময়ে তিনি সমগ্র উত্তর ইতালি পরিভ্রমণ করেছিলেন। অবশেষে তিনি ভেনিসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর ভেনিস জীবনের ফসল হলো 'ডন জুয়ান'-এর প্রথম দুটি সর্গ। এই সময়ে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রচিত তাঁর 'Caine' কাব্যটি ইংলণ্ডে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল—প্রশংসার নয়, নিন্দার আলোড়ন। ১৮২১ সালে শেলির সঙ্গে তাঁর আবার সাক্ষাৎ হয়; এবং অল্পকাল পরে শেলির শোচনীয় মৃত্যুতে বায়রণ যারপর নাই ব্যথিত হন; কারণ তিনি ছিলেন শেলির প্রতিভার গুণমুগ্ধ। এইবার তিনি 'ডন জুয়ান' কাব্যটি সমাপ্ত করেন। এইসময় তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছিল। এই যুদ্ধে তিনি গ্রীকদের পক্ষ সমর্থন করেন। অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন এবং ১৮২৩ সালের জুলাই মাসে নিজে গ্রীসে এসে সংগ্রামীদের পাশে দাঁড়ান; গ্রীক বিদ্রোহীদের কাছে বায়রণ ছিলেন প্রেরণার প্রতীক। অগ্নি অক্ষরে লেখা তাঁরই 'Isles of Greece, Isles of Greece' কবিতাটি কণ্ঠে নিয়ে বিদ্রোহীরা তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। প্রায় নয় মাস কাল তিনি গ্রীসের যুবরাজের সম্মানিত অতিথি হিসাবে এখানে বাস করেছিলেন এবং যুদ্ধরত সৈন্যদের হৃদয়ে সাহস ও প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন।

১৮২৪,১৯ এপ্রিল। জ্বররোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেলেন। শোকার্ত গ্রীসে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়—বায়রণের মৃত্যু হয়েছে। একদা যিনি ধূমকেতুর মতো য়ুরোপের কাব্যগগনে উদিত হয়েছিলেন ও স্বীয় প্রতিভার আলোকে য়ুরোপের মনোজগৎ উদ্ভাসিত করেছিলেন, সেই সহৃদয়, স্বাধীনতাপ্রিয় ও রোমান্টিক কবির প্রবাসে এই মৃত্যু তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে সেদিন দারুণ শোকের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বায়রণের মহত্ত্ব ঝটের মতোই তাঁর প্র ভাবের মধ্যেই প্রতিফলিত, এবং উনিশ শতকের য়ুরোপীয় কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে দীপ্যমান হয়ে আছে একটি নাম জর্জ গর্ডন, লর্ড বায়রণ। অবিনশ্বর এই নাম।

মাইকেল ফ্যারাডে

(১৭৯১-১৮৬৭)

আমাদের বর্তমান সভ্যতাকে যে বৈদ্যুতিক শক্তি এত গতিময় করে তুলেছে তার মূলে রয়েছে ফ্যারাডের বিস্ময়কর আবিষ্কার। তাঁর বয়স যখন একত্রিশ বছর সেই সময় একদিন এই তরুণ বৈজ্ঞানিক তাঁর নোটবুকে লিখেছিলেন—'Convert magnetism into electricity' অদ্ভুত কথা। অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য—অন্ততঃ বিজ্ঞানজগতের কাছে। নিজের প্রতি এই যে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ, এরই মধ্যে সেদিন আভাসিত হয়েছিল একটি বৈজ্ঞানিক সমস্যা যার সমাধান প্রয়োজন ছিল। সমস্ত পৃথিবীতে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তখন এই সমস্যাটির সমাধান খুঁজছিলেন। সমস্যাটি কিন্তু ছিল একান্তভাবেই তত্ত্বগত, এর বাস্তব রূপায়ণ তখনো পর্যন্ত তাঁদের চিন্তার বাইরে ছিল। ফ্যারাডে স্বয়ং তখন কতকগুলি বাস্তব বিষয় নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি তাঁর নোটবুকে ঐটুকু লিখে রাখার অধিক আর কিছু করবার সময় পাননি। তারপর একদিন তিনি পৃথিবীর সামনে হাতে-কলমে দেখালেন চৌম্বক শক্তি কেমন করে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ১৮৩১ সনে যখন তিনি সমস্যাটি প্রায় তাঁর আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এসেছেন তখনি তিনি মাত্র দশদিন পরীক্ষা করার পর তাঁর ঈপ্সিত সমাধানটি আবিষ্কার করে বিজ্ঞানজগতে এক যুগান্তরের সূচনা করে দিয়েছিলেন।

১৭৯১ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনের এক শহরতলীতে ফ্যারাডের জন্ম হয়। তাঁর পিতা জেমস ফ্যারাডে ছিলেন একজন দরিদ্র কর্মকার। পরে তিনি এই পেশা ত্যাগ করে বই-বাঁধানোর কর্মে লিপ্ত ছিলেন। ফ্যারাডের বয়স যখন উনিশ বছর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। দরিদ্র কর্মকারের পুত্র ফ্যারাডে তাঁর ছেলেবেলায় লেখাপড়া বিশেষ কিছু শিখতে পারেন নি; যা শিখেছিলেন তা অতি সামান্য। সংসারের অভাব-অনটনের জন্য তের বছর বয়সেই তাঁর লেখাপড়ার পাট চুকে যায় এবং একটি পুস্তক বিক্রেতার দোকানে কাজ গ্রহণ করেন। এক বছর পরে ফ্যারাডের কাজে খুশি হয়ে তাঁর মনিব তাঁকে বই বাঁধানোর কাজে একজন শিক্ষানবিশ হিসাবে গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তাঁর জীবনে প্রকৃত দিক্‌-পরিবর্তন সূচিত হয়। তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষানবীশির প্রথা অনুসারে মাইকেলকে তাঁর মনিবের সঙ্গে বাস করতে হতো। বই বাঁধানোর দোকানে কতো রকমের বই আসত; কাজের অবসরে ফ্যারাডে বেছে বেছে সেইসব বই পড়তেন। এই ব্যাপারে তাঁর সহৃদয় মনিব তাঁকে খুবই উৎসাহিত করতেন। অধ্যয়নে অল্পবয়স্ক এই কর্মচারিটির আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে তাঁর মনিব মুগ্ধ হন এবং তিনি তাঁকে অধ্যাপকদের লেকচার শুনবার জন্য আরো সময়ের ব্যবস্থা করে দেন বিজ্ঞানের

বই পড়ার দিকেই তাঁর প্রবণতা ছিল বেশি। সেই বয়স থেকেই তিনি ছিলেন তথ্যসন্ধানী। তাঁর মনিবের বই বাঁধানোর দোকানে বিশেষ আগ্রহসহকারে তিনি যে বই দুখানি পড়েছিলেন, সেই বই দুটি হলো 'Encyclopedia Britannica আর জেন মার্সেডের 'Conversations on Chemistry' এবং এই বই দুটি পাঠ করেই তাঁর মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রথম সুস্পষ্ট ধারণা জন্মেছিল। তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার বনিয়াদ সেদিন এইভাবেই রচিত হয়েছিল। এই বনিয়াদ সুদৃঢ়ভাবে গঠিত হয়েছিল, কারণ ফ্যারাডে তাঁর সমগ্র জীবন রসায়ন ও বিদ্যুতের গবেষণাতেই অতিবাহিত করেছিলেন।

বই বাঁধানোর কর্মে লিপ্ত থাকার সময়েই তিনি তাঁর মনিবের অনুমতি নিয়ে ন্যাচুরাল ফিলজফি সম্পর্কে অধ্যাপকদের বক্তৃতা কিছুদিন শুনেছিলেন। এই বক্তৃতামালা তাঁর মধ্যে এক নূতন শিহরণের সঞ্চার করে দিয়েছিল এবং অধ্যাপকদের প্রত্যেকটি কথা তিনি যত্নের সঙ্গে লিখে রাখতেন। এই সময় এক ফরাসী উদ্বাস্তু চিত্রকরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ফ্যারাডে ঐ চিত্রকরকে অনুনয় করলেন তাঁকে ছবি আঁকানো শেখাবার জন্য। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে ছবি আঁকা শিখে তিনি বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে সচিত্র করে তাঁর নোটবুকে সুন্দর করে, প্রাঞ্জল করে লিখে করে রাখবেন। এই ছবি আঁকা শিখবার বিনিময়ে তিনি চিত্রকরের গৃহ সম্মার্জনা করতেন, তার জুতা পর্যন্ত পালিশ করে দিতেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন একজন সুদক্ষ বুক বাইণ্ডার, তাই তাঁর নোটের খাতাগুলি অতি সুন্দর ভাবে খণ্ডে খণ্ডে বাঁধিয়ে রাখতেন।

১৮১২। রয়্যাল ইনস্টিট্যুটে বিখ্যাত রাসায়নিক স্যার হামফ্রি ডেভির বক্তৃতা হবে চারদিন ধরে। ঐ বক্তৃতা শুনবার জন্য ফ্যারাডের খুব আগ্রহ হলো। কিন্তু বিনা টিকিটে তো আর বক্তৃতা শোনা যায় না। টিকিট কিনবার সঙ্গতিও তাঁর ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের দোকানের একজন খরিদ্দার ফ্যারাডেকে চার দিনের জন্য চারখানি টিকিট দিয়ে গেলেন। ঐ বক্তৃতা শুনবার পর তাঁর জীবনে গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। বই বাঁধানোর কাজে সেইখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের একটি অধ্যায় সমাপ্ত হলো। তিনি স্যার হামফ্রিকে একখানি পত্র লিখলেন এবং তিনি তার উত্তরে ফ্যারাডেকে লিখলেন যে, তিনি যদি তাঁর কোনো উপকার করতে পারেন তাহলে তিনি বিশেষ আনন্দিত বোধ করবেন, তবে সেটি তাঁর ক্ষমতার মধ্যে থাকা চাই।

স্যার হামফ্রি ডেভি ছিলেন রয়্যাল ইনস্টিট্যুটের পরিচালক। তিনি ফ্যারাডেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য লিখে পাঠালেন। প্রথম দর্শনেই যুবক ফ্যারাডের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন এবং তিনি সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং বেতনে ফ্যারাডেকে তাঁর সহকারীর পদে নিযুক্ত করলেন এবং সেইখানেই তাঁর থাকারও ব্যবস্থা করে দিলেন জীবনের গতি কোথা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কোথায় এসে উত্তীর্ণ হয়, মানুষ তা ধারণা করতে পারে না। নইলে বুক-বাইণ্ডার মাইকেল ফ্যারাডে যে একটি প্রখ্যাত

গবেষণাগারে স্যার হামফ্রি ডেভির মতো একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের সহকারী নিযুক্ত হবেন, এ কি ফ্যারাডে কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন? অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পরিচালকের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন এবং স্যার হামফ্রি তাঁর এই তরুণ সহকারীকে 'My Philosophical Assistant' বলে সম্বোধন করতেন পরবর্তীকালে স্যার হামফ্রি বলেছিলেন—"The greatest of my discoveries is Faraday.' তাঁর এই উক্তি আদৌ অত্যুক্তি ছিল না। বিজ্ঞান-জগতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে হামফ্রি-ফ্যারাডের সংযোগ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

অক্টোবর, ১৮১৩। স্যার হামফ্রি ফরাসী দেশ পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। ফ্যারাডেকে তিনি তাঁর অন্যতম সঙ্গীরূপে গ্রহণ করেন। কর্মকারের পুত্রের জীবন থেকে এখন তাঁর সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট অতীত একেবারে মুছে গেল। তিনি এখন স্যার হামফ্রির সেক্রেটারি ও তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজের প্রধান সহকারী। অল্প কিছুকাল পূর্বেও যিনি ছিলেন একজন অখ্যাত বুক-বাইণ্ডার, সেই মাইকেল ফ্যারাডে এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসতে লাগলেন ডেভির সহকারীরূপে। ১৮১৫ সনের এপ্রিল মাসে তাঁরা ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করলেন। ফ্যারাডে আরো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন ও আগের মতোই রয়্যাল ইনস্টিট্যুটের গবেষণাগারের কাজ করতে থাকেন। পরবর্তিকালে ডেভিড যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন ফ্যারাডে এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বহুকাল যাবৎ ডেভি যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করতেন (ডেভি ও ফ্যারাডের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল তেরো বছর), ফ্যারাডেও ঠিক সেই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন ; উভয়ের গবেষণার ধারা ও বিষয়বস্তু প্রায় একই ছিল। স্যার হামফ্রির আবিষ্কারের মধ্যে যেটি আজ পৃথিবী-বিখ্যাত সেই 'Devy's safty lamp উদ্ভাবনের ব্যাপারে ফ্যারাডে তাঁকে অনেক পরিমাণে সহায়তা করেছিলেন। যখন তাঁর আর্থিক অবস্থা কিছু সচ্ছল হলো, তখন মাতৃভক্ত ফ্যারাডে সর্বাগ্রে মায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে সচেষ্ট হলেন ও তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরাকে একটি বোর্ডিং স্কুলে রাখার ব্যবস্থা করেন। তখন থেকে তিনি কঠিন পরিশ্রম করতে কৃতসংকল্প হন। বিজ্ঞানের অনুশীলনে তাঁর প্রথম ও প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল রসায়ন। এই ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যলাভও ছিল অসাধারণ। ক্লোরিন ও কার্বন—এই দুটি পদার্থের যৌগিক বস্তুকে তিনিই সর্বপ্রথম বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন এবং তাঁর এই রাসায়নিক গবেষণাই পরবর্তিকালে বেদাগ (stainless) ইস্পাত তৈরি করার পথ সুগম করে দিয়েছিল। ১৮২১ সনে ফ্যারাডে বিবাহ করেন এবং সেই বছরেই তিনি রয়্যাল সোসাইটির একজন 'ফেলো' নির্বাচিত হন। বিয়ের পর তিনি সপরিবারেই রয়্যাল ইনস্টিট্যুটে সংলগ্ন একটি আবাসে বাস করতে থাকেন। তখন তাঁর বাৎসরিক উপার্জন ছিল এক হাজার পাউণ্ড।

১৮৩১ সনটি ফ্যারাডের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। ন'বছর আগে একদিন তাঁর খাতায় তিনি যা লিখে রেখেছিলেন—Convert Magnetism into

Electricity'. ন'বছর বাদে তাঁর গবেষণাগারে তিনি সেই জিনিস আবিষ্কার করে দেখালেন। চুম্বকের দ্বারা যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদিত হতে পারে—এই তথ্য সেদিন হাতে-কলমে প্রমাণিত হলো তাঁর গবেষণার ফলে, তখনই বিজ্ঞানজগতের একটি নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। ১৮৩১ সনের শেষভাগেই তিনি ডাইনামো ও ইলেকট্রিক মোটর আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনেকে বলে থাকেন যে বিজ্ঞানী ফ্যারাডে ও গবেষক ফ্যারাডে বাইরের জগতের সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্বন্ধ রাখতেন না এবং এই জগৎ থেকে তিনি নিজেকে একরকম বিচ্ছিন্ন করে রেখে-ছিলেন। এইজন্য ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর পদ্ধতি বা জ্ঞান (technique) উদ্ভাবিত হতে আরো পঞ্চাশ বছর বিলম্বিত হয়েছিল। নইলে ১৮৩১ সনে উদ্ভাবিত ডাইনামো ও ইলেকট্রিক মোটর যা ফ্যারাডে আবিষ্কার করেছিলেন, তার বাস্তব প্রয়াস অনেক পরে আমরা প্রত্যক্ষ করি। যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা তাঁর ছিল তা যদি তিনি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন ও শিল্প উৎপাদনের স্বার্থে নিয়োজিত করতেন তা হলে তিনি ধনী হতে পারতেন। তা করেননি বলেই ফ্যারাডে পরিবারকে দারিদ্র্যের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী সারা-ই ছিলেন গৃহের পরিচারিকা। শেষ জীবনে তিনি বাৎসরিক তিনশো টাকার পেনসন লাভ করেছিলেন। তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেওয়ার প্রস্তাবও হয়েছিল, কিন্তু ফ্যারাডে তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—"I must remain plain Michael Faraday to the last.' বিজ্ঞানীর মধ্যে যে একজন দার্শনিক ছিলেন সেটা ফ্যারাডের এই উক্তি থেকেই আমরা বুঝতে পারি।

যত তাঁর বয়স বৃদ্ধি পেতে থাকে ফ্যারাডে ততই গবেষণার ক্ষেত্র থেকে বক্তৃতার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন। তরুণ গবেষকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য তিনি সর্বদাই তাদের কাছে বিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। তখনকার সেই শুভ্রকেশ ফ্যারাডেকে দেখলে একজন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বলে মনে হতো। বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে অবধি তিনি আর্থিক প্রলোভনকে যেমন দূরে রেখেছিলেন, তেমনি পার্থিব খ্যাতি সম্পর্কে তাঁর কোনো উৎসাহ ছিল না। তাঁর আগ্রহ ছিল শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। এই অনাড়ম্বর মাইকেল ফ্যারাডে শান্তভাবে তাঁর পাঠ কক্ষে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সতীর্থ ও অনুগামীদের চক্ষে তিনি বিজ্ঞানের বেদীমূলে একটি আত্মনিবেদিত ও স্বার্থলেশশূন্য প্রতিভাবান পুরুষ বলে স্বীকৃত ও সম্পূজিত হয়েছেন।

উত্তরকালে ফ্যারাডের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানিবেদন করতে গিয়ে এডিংটন করেছিলেন: 'Michael Farady was a dedicated, an unselfish genius. "কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

পারসি বাইসি শেলি

(১৭৯২—১৮২২)

হাতে বিদ্রোহের পতাকা আর কণ্ঠে স্বাধীনতার গান নিয়ে ইংরেজি কাব্য সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন শেলি। সহজাত কবিপ্রতিভা নিয়েই তাঁর জন্ম হয়েছিল। মানুষ শেলির চরিত্র ও আচরণ হয়ত সমালোচনার যোগ্য, এমন কি নিন্দার বিষয়, কিন্তু কবি শেলিকে বিস্মৃত হবে কে? তাঁর অতুলনীয় কাব্যসংগীতের মধ্যেই তিনি তাঁর শাশ্বত কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করে গিয়েছেন। ১৭৯২, ৪ আগস্ট। সাসেক্সের অন্তর্গত ওয়ার্নহ্যামে টিমোথি শেলির জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পারসি বাইসি শেলি। পিতামহ বাইসি শেলি ছিলেন ধনী এবং অস্থির প্রকৃতির মানুষ। ১৮০৬ সালে তিনি ব্যারনেট হয়েছিলেন। শৈশবে শেলি তাঁর নিজের তৈরি জগতে বাস করতেন—সে পৃথিবী ছিল রোমান্টিক। দশ বছর তিনি আয়সিলওর্থে সায়ন হাউস অ্যাকাডেমি নামে একটি স্কুলে পড়তে এলেন। কিন্তু এখানকার পরিবেশ তাঁর ভাল লাগল না। তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির ছেলে কিন্তু সহপাঠীদের বেশির ভাগই ছিল উদ্দাম প্রকৃতির। শেলির চেহারা ছিল অনেকটা মেয়েদের মতো; তাঁকে দেখতে ছেলেদের পোশাকে ঠিক একটি সুন্দরী মেয়ের মত মনে হত। পড়াশুনায় শৈথিল্য দেখালে এই স্কুলে ছাত্রদের বেত্রাঘাত করা হতো। তাঁর এক সহপাঠী লিখেছেন যে 'বেত্রাঘাতে জর্জরিত শেলি যখন মেঝেতে গড়াগড়ি দিতেন তখন মনে হতো যন্ত্রণার জন্য যতটা না হোক, অসম্মানের জন্য তিনি ঐ রকম কাতরতা প্রদর্শন করতেন।' এই স্কুলে পড়বার সময় শেলি বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাঁর এই আগ্রহ সমানভাবে বজায় ছিল।

স্কুলে পড়া শেষ হলে শেলি ইটনে ভর্তি হলেন। এইখানে লিণ্ড নামে একজন চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, সেই পরিচয় পরিণত হয় বন্ধুত্বে। ইনি যেমন শেলির একজন উপকারী বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি এঁর প্রতি শেলিও বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করতেন। ১৮১০। শেলি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি হলেন। এই সময় থেকে যেমন তাঁর প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি তাঁর জীবনে প্রেমঘটিত ব্যাপারের সূচনা। এই সময় থেকেই অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন কালে রসায়ন, দর্শন ও কাব্য—এই তিনটি বিষয়ে শেলির বিশেষ অনুরাগ দেখা গিয়েছিল। তাঁর এই সময়কার জীবনের একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন টমাস জেফারসন হগ নামে তাঁরই অক্সফোর্ডের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি লিখেছেন—এই সময়ে শেলির আকৃতি ছিল রোগা, পাতলা ধরনের, কিন্তু তাঁর দেহটি খুবই সুগঠিত ছিল। বেশ লম্বা দেখতে, কিন্তু তিনি সামনের দিকে এমন ঝুঁকতেন যে তাঁকে খর্বাকৃতি মনে হতো। খুব দামী পরিচ্ছদ তিনি ব্যবহার করতেন; সেগুলি একেবারে

হাল ফ্যাসানের তৈরী ছিল। তবে সব সময়েই তাঁর বেশভূষা অবিন্যস্ত দেখতাম। তাঁর আচরণ ছিল অদ্ভুত ধরনের—যেমন কোমল ও মধুর তেমনি কখনো কখনো খুবই প্রচণ্ড। সমস্ত মুখখানি সব সময় প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত থাকত। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের মধ্যে ভগবান যেন একটা ত্রুটি রেখে দিয়েছিলেন। সেটি তাঁর কণ্ঠস্বর। শেলির কণ্ঠস্বর কর্কশ ছিল।

অক্সফোর্ডে অধ্যয়নকালেই শেলির মধ্যে ধর্মের প্রতি একটা বিরাগ বা বিতৃষ্ণার ভাব দেখা যায় এবং তাঁর জীবন দর্শনের মধ্যে ঈশ্বরে অবিশ্বাস ছিল প্রকট। এ জন্য তাঁকে বিপদে পড়তে হয়েছিল। ১৮১১ সালে 'The Necessity of Athism' নামে একটি পুস্তিকা তিনি প্রকাশ করেন, এর ফলে তিনি কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। পুত্রের এই আচরণে টিমোথি শেলি খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং ছেলেকে তিনি অনেক করে বুঝিয়েছিলেন। পিতার উপদেশ পুত্র কর্ণপাত করলেন না; পিতা ও পুত্রের মধ্যে একরকম বিচ্ছেদই হয়ে গিয়েছিল। অর্থকষ্টে পড়লেন শেলি, কিন্তু তাঁর ছোট বোন দুটি (এরা তখন স্কুলে পড়ছিল) তাদের স্কুলের আর একটি মেয়ের হাত দিয়ে দাদাকে অর্থ সাহায্য করত।

১৮১১ শেষ হওয়ার আগেই শেলির সঙ্গে হ্যারিয়েটের বিয়ে হয়। বিয়ের পর ভ্রাম্যমানের জীবন যাপন করতেন শেলি-দম্পতি—ইয়র্ক, কেনউইক (এখানে কবি সাদের সঙ্গে শেলির আলাপ হয়েছিল), ডাবলিন, ওয়েলস ও লেনসাউথ প্রভৃতি স্থানে তাঁরা এই সময় বাস করেছিলেন। ১৮১২। শেলির জীবনে এই বৎসর স্মরণীয় হয়ে আছে। লেনসাউথে অবস্থান কালে তিনি রচনা করেন 'কুইন ম্যাব'— তাঁর প্রথম কবি কর্ম যার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছিল তাঁর প্রতিভার প্রতিশ্রুতি। শেলির নিজের কথায়—'অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই অবিচ্ছিন্ন ত্রিকালই হলো এই কবিতার বক্তব্য'। ১৮১৩ সালের গ্রীষ্মকালে হ্যারিয়েটের কোলে এলো একটি মেয়ে; 'কুইন ম্যাব' এর নায়িকার নামানুসারে শেলি তাঁর মেয়ের নাম রাখলেন Ianthe (আয়ানথি)। শেলির প্রথম বিয়ে কিন্তু স্থায়ী হয়নি; হ্যারিয়েট সুন্দরী ছিলেন কিন্তু বুদ্ধিমতী ছিলেন না। শেলিরা চলে এলেন লণ্ডনে। স্ত্রীর প্রতি শেলির আকর্ষণ হ্রাস পেতে থাকে। এই সময়েই শেলি দার্শনিক উইলিয়াম গডউইনের কন্যা মেরি গডউইনের প্রেমে পড়েন। ইটনে অধ্যয়ন কালে শেলি গডউইনের 'Political Justice' বইটি পাঠ করে খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। দার্শনিকের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তাই লণ্ডন আসার পর শেলি তাঁর সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষেই গডউইনের গৃহে তিনি প্রায়ই আসতেন এইভাবে যাওয়া আসার ফলেই মেরির সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়। সেই পরিচয় পরিণত হয় প্রেমে। হ্যারিয়েটের তুলনায় দেখতে সুন্দরী না হলেও, মেরি বিদুষী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন।

শেলি হ্যারিয়েটের কাছে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব তুললেন। তিনি সম্মত তো হলেনই না, বরং স্বামীর মুখে এই কথা শুনে তিনি মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন

এবং সেই আঘাতের ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হ্যারিয়েট তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কিন্তু তাঁকে সেই অবস্থায় রেখে, ১৮১৪ সালের জুলাই মাসে একদিন মেরিকে সঙ্গে নিয়ে শেলি ফ্রান্স চলে গেলেন। দেড়মাস বাদে কনটিনেণ্ট ভ্রমণ করে শেলি ইংলণ্ডে ফিরলেন। এসে দেখলেন যে ব্যাঙ্ক থেকে হ্যারিয়েট তাঁর সমস্ত টাকা তুলে নিয়েছেন; কয়েকবার দু'জনের মধ্যে সাক্ষাৎকার হলো। নভেম্বরে হ্যারিয়েটের পুত্র সন্তানের জন্ম হলো। শেলি তখন ঋণভারে জর্জরিত। পাওনা-দারের তাগাদায় অস্থির হয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তিনি তাদের ঠেকাতেন। এই সময়ে ('৮১৫) শেলির পিতামহ স্যার বাইসি শেলির মৃত্যু হয়। পৌত্র শেলিকে তিনি তাঁর জমিদারির যে অংশ দিয়ে গিয়েছিলেন তার বার্ষিক আয় ছিল এক হাজার পাউণ্ড। এর থেকে শেলি হ্যারিয়েটের জন্য বছরে দুশো পাউণ্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

১৮১৬। মার্চ মাস। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত শেলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য 'Alastor' প্রকাশিত হলো। দু'মাস বাদে মেরিকে নিয়ে শেলি এলেন জেনিভাতে। কয়েকদিন বাদে বায়রণও এখানে এসে পৌঁছলেন। শেলি ও বায়রণ—দুই কবির মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটল সুইজারল্যাণ্ডে। শেলি ইতিমধ্যে বায়রণের গুণমুগ্ধ ও তাঁর কবিতার অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কাছে মানুষ বায়রণই বিশেষ আকর্ষণের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে বায়রণও শেলিকে এক মহৎ কবি-প্রতিভার অধিকারী বলে মনে করতেন। ইংরেজি সাহিত্যে এই দুই কবির বন্ধুত্ব একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে। জেনিভাতে ভ্রমণকালে বায়রণ রচনা করেছিলেন তাঁর অন্যতম বিখ্যাত কবিতা 'Prisoner of Chillion; আর শেলি রচনা করেন মণ্টব্লাঙ্কের উপর একটি কবিতা। আর 'Hymn to Intellectual Beauty' নামে অপর একটি ছোট কবিতা।

আগস্ট মাসে শেলিরা ইংলণ্ডে ফিরে এলেন ফিরে এসে তিনি লে হাণ্টের সঙ্গে আলাপ করলেন; ইনি তাঁর কবিতার ভালো সমালোচনা করেছিলেন; ডিসেম্বর মাসে কিছুদিনের জন্য তিনি হাণ্টের অতিথি হিসাবে তাঁরই গৃহে অবস্থান করেন। এর খুব অল্পদিন বাদেই তিনি খবর পেলেন যে হ্যারিয়েট জলে ডুবে মারা গেছেন। কিন্তু যখন আদালতে একটি নোটিশে তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁকে হ্যারিয়েটের সন্তানদের অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তখন শেলি অত্যন্ত দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ হলেন। যিনি রায় দিয়েছিলেন সেই লর্ড চ্যান্সেলারের উদ্দেশ্যে রচিত একটি সুতীক্ষ্ণ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল এই রাগ ও দুঃখ।

১৮১৭ সালে টেমস নদীর ধারে মার্লোতে তিনি একটি বাড়ি নিলেন। এই খানে তিনি রচনা করেন 'Rosalind and Helen' আর সম্পূর্ণ করেন 'The Revolt of the Islam' নামক তাঁর সুবিখ্যাত কবিতাটি। এছাড়া 'Prince Athanase' নামে একটি টুকরো কবিতা। কঠিন পরিশ্রম আর জলবায়ু তাঁর সহ্য হলো না—শেলি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসক বিধান দিলেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম,

হাওয়া পরিবর্তন। অনেক দিন ধরেই শেলির ইতালি দেখার ইচ্ছা ছিল। ১৮১৮ সালের মার্চ মাসে মেরি ও তাঁদের পুত্র কন্যাদের নিয়ে তিনি ইতালি যাত্রা করেন। ইতালিতে যাযাবরের মতো ভ্রমণের সময় শেলির প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১৮১৮ সালে তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা 'Prometheus the Unbound' রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং পরের বছর এটির রচনা সমাপ্ত হয়। তারপর লিখলেন 'The Cenci'—ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম সুন্দর নাট্যকাব্য। এর পরেই তাঁর লেখনী থেকে একের পর এক সেই সব লিরিক কবিতা বেরতে থাকে যেগুলির জন্য তিনি ইংরাজি সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লিরিক কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। এইগুলির মধ্যে 'Ode to the West Wind', 'The Cloud' 'The Skylark' ও 'Song of Proserpine'—এই চারিটি খুব বিখ্যাত। শেলির 'ওড টু দি ওয়েষ্ট উইণ্ড' বিশ্ব-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে গণ্য হয়ে থাকে। ১৮২১ সালে বিরূপ সমালোচনার আঘাতে কীটস্ এর অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে শেলি 'Adonais' নামে যে মর্মস্পর্শী কবিতাটি রচনা করেছিলেন সেটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম।

এই সময়ে পিসাতে বায়রণের প্রতিবেশি হিসাবে শেলি কিছুদিন বাস করেন। তারপর ১৮২২ সালের বসন্তকালে স্পেৎজিয়া উপসাগরের তীরবর্তী একটি বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করতে থাকেন। একটি নৌকা নির্মাণ করালেন সাগর বিহারের জন্য। তরণীর নাম দিলেন 'এরিয়েল'। সাঁতার জানতেন না, তাই তাঁর বন্ধুরা তাঁকে এইভাবে জলবিহার করতে নিষেধ করেছিলেন। শেলি যেন বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন। তার জীবনের শেষ কদিন কবি যেন মেঘ ও রৌদ্রের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত করেছিলেন। ১৮২২, জুলাই ৮। কবি লেগহর্ন থেকে ফিরছিলেন তাঁর নৌকায় চড়ে। নৌকাতে আর কেউ ছিল না। সেদিন আবহাওয়া ছিল দুর্যোগপূর্ণ। স্থানীয় নাবিকরা তাঁকে নিষেধ করেছিল। সন্ধ্যায় তুমুল বজ্রপাতের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। দশদিন বাদে ভিয়া রেগ্গিয়োর তীরের কাছে ভেসে উঠল একটি পাংশু দীর্ঘ দেহ; মৃতের জামার এক পকেটে ছিল সফোক্লিসের একটি বই, অন্য পকেটে কীট্সের কবিতাবলী। এইভাবে পূর্ণ যৌবনে যৌবনের কবি জলে ডুবে মারা গেলেন—যে জল ছিল তাঁর প্রিয়। সাগরতীরেই শেলির চিতাশয্যা রচিত হলো; সেই প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নি পার্শ্বে সাশ্রুনেত্রে দাঁড়িয়েছিলেন বন্ধু বায়রণ। কবির ভস্মাবশেষ রোমের একটি সমাধি মন্দিরে রক্ষিত হয়। মন্দির গাত্রে এই তিনটি লাইন উৎকীর্ণ আছে:

Nothing of him that doth fade
But doth suffer a sea-change.
Into something rich and strange.

টমাস কার্লাইল

(১৭৯৫—১৮৮১)

ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক বলে যাঁর খ্যাতি সেই কার্লাইল ছিলেন একজন গ্রাম্য রাজমিস্ত্রির ছেলে। স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত একলিফেকান গ্রামের একটি পর্ণকুটীরে তাঁর জন্ম। পিতামাতার নয়টি সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। এক জীবনীকারের মতে, শৈশব থেকেই তাঁর স্বভাবের মধ্যে দুটি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল—উগ্রতা আর অস্থিরচিত্ততা। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ভিক্টোরীয় যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলে যিনি উত্তরকালে গণ্য হবেন, সেই কার্লাইলের ছাত্রজীবন খুব সুখের ছিল না, প্রতিদিন পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হতো। শৈশবে কার্লাইল দেখতে খুব সুশ্রী ছিলেন। সুশ্রী কিন্তু গর্বিত এবং লাজুক প্রকৃতি। কিছুটা স্পর্শকাতরও ছিলেন। আরেকটি গুণ তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল—উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। পড়তেন তিনি অবিশ্রান্তভাবে আর তাঁর সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল জার্মান সাহিত্যের প্রতি। ইংলণ্ডের পাঠকসমাজকে জার্মানসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ও আগ্রহশীল করে তুলেছিলেন একমাত্র কার্লাইল। এজন্য ইংলণ্ড তাঁর কাছে বিশেষভাবেই কৃতজ্ঞ। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে কার্লাইল অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। প্রতিভার লক্ষণই এটা কিন্তু কার্লাইল জানতেন না কি ভাবে বা কোন্ পথে তিনি তাঁর সেই ক্ষমতা প্রকাশ করবেন। তাঁর এই সময়কার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে পরবর্তিকালে কার্লাইল নিজেই লিখেছিলেন—'ভবিষ্যৎ আমার সামনে ধূসর এবং অস্পষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হলে কার্লাইল কিছুকাল একটি বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষকের কাজ করেন। সেইসঙ্গে মিস্টার বাটলারের পুত্রদের গৃহশিক্ষকের কাজেও তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর সাহিত্যকর্ম। প্রথমে তিনি জার্মান ভাষা থেকে শীলারের জীবনচরিত ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন আর এডিনবরা রিভিয়্যু পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতেন। কিন্তু লেখা খুব সহজে আসত না; প্রায়ই তিনি গভীর নৈরাশ্যে নিমগ্ন হতেন। সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভে এই যে গভীর নৈরাশ্যবোধ, এর প্রধান কারণটা ছিল শারীরিক। এই সময় তাঁকে কঠিন অজীর্ণরোগে ভুগতে দেখা যায়। এই অজীর্ণব্যাধি তাঁর সারাজীবনের সঙ্গী ছিল; এরই ফলে যৌবনকালেই তাঁর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট হানি হয়। কার্লাইল আজীবন স্বাস্থ্যের কাঙাল ছিলেন।

যৌবনকাল থেকেই বেদনাদায়ক নৈরাশ্য ও মানসবিক্ষোভ কার্লাইলের জীবনকে করে তুলেছিল ভারাক্রান্ত। তথাপি কাজ, কর্তব্য ও শৃঙ্খলা—এই তিনটিকে তিনি

জীবনের প্রকৃত অর্থ বলে বিশ্বাস করতেন। এই শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন স্কুল বা কলেজে নয়, শৈশবে তাঁর ধর্মপরায়ণা মা ও জীবনপূজারী পিতার কাছ থেকেই। কার্লাইল পরিবারের ধারা-ই ছিল, সরল জীবন, উন্নত চিন্তা ও প্রত্যহ শ্রমসাধ্য কর্ম।

যথাসময়ে তার জীবনপথে এলেন তাঁর ভাবী জীবনসঙ্গিনী। নাম তার জেন বেলি ওয়েলস। জেন ছিলেন এক চিকিৎসকের পরমাসুন্দরী কন্যা, নক্ষত্রের মতো ফুটফুটে চেহারা। রূপে ও গুণে সমান। বুদ্ধিমতী, সংগীতনিপুণা ও কথাবার্তায় চৌকস। বিয়ের পর সাত বছর ক্রেগেনবুটে কাটিয়ে কার্লাইল-দম্পতী এলেন চেলসিয়াতে। চারদিকে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ দিয়ে ঘেরা এই স্থানটি কার্লাইলের বড়ো রমণীয় মনে হলো। রমণীয় এবং নির্জন। প্রকৃতির কোলে এই মনোরম স্থানটি কার্লাইলকে মুগ্ধ করল। এইখানে চেইনী রো নামক একটি রাস্তার ধারে একটি গৃহ নির্মাণ করিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন তিনি। এই গৃহেই তাঁর জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাসও মিশে আছে এখানকার বাতাসে। বাড়ির সামনে একটা বাগান ছিল, সেখানে ওয়ালনাট ও চেরীগাছের তলায় একটি সুন্দর উন্মুক্ত বিশ্রামস্থল ছিল। কতদিন এইখানে রাত্রিবেলায় নক্ষত্রের হীরকখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে রজনীর নিঃশব্দ প্রহরগুলি যাপন করতেন কার্লাইল। পাশে বসে থাকতেন জেন। শয়নের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শেষ পাইপটি তিনি এইখানে বসেই উপভোগ করতেন।

চেলসিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাসের পর থেকেই প্রকৃতভাবে আরম্ভ হয় কার্লাইলের সাহিত্যজীবন। জার্মান সাহিত্যের প্রতি ইংরেজ পাঠকদের তেমন অনুরাগ ছিল না, তাই প্রকাশক বা পত্রিকার সম্পাদকগণ তাঁর জার্মান অনুবাদমূলক রচনা সহজে ছাপতে চাইতেন না। তার ওপর তাঁর প্রবন্ধের বিষয়গুলিও ছিল অতিমাত্রায় বিতর্কমূলক; কোনো পত্রিকা সম্পাদকই সেগুলি প্রকাশ করতে আগ্রহ দেখাতেন না। অতঃপর কার্লাইল ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করবেন ঠিক করলেন। এই বিষয়টি তাঁকে বহুকাল যাবৎ আকর্ষণ করে আসছিল এবং এজন্য তিনি প্রস্তুতও হচ্ছিলেন। এই বিষয়টি নিয়ে তাঁর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধিৎসার অন্ত ছিল না। একজন উৎসাহী প্রকাশক পাওয়া গেল, তিনি অগ্রিম বেশ মোটা টাকাও দিলেন কার্লাইলকে যাতে তিনি নিরুদ্বেগে এই সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারেন।

এই মহৎ কাজে তিনি যখন লিপ্ত হন তখন কার্লাইলের বয়স উনচল্লিশ বছর। একনিষ্ঠ মনে ও প্রচুর পরিশ্রমের সঙ্গে তিনি ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হতে থাকেন। অধ্যয়ন আর পরিশ্রম দুই-ই চলতে থাকে একসঙ্গে। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের রচনা যখন শেষ হয়, তখন তাঁর প্রকাশকের নির্দেশে কার্লাইল সেটা পড়তে দিলেন জন স্টুয়ার্ট মিলকে তাঁর মতামত জানবার জন্য। কিন্তু কার্লাইলের দুর্ভাগ্যক্রমে মিলের এক পরিচারিকার অসাবধানতার ফলে প্রথম খণ্ডের সমগ্র

পাণ্ডুলিপি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। আবার স্মৃতিশক্তি মন্থন করে নূতন করে লিখলেন তিনি এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লিখলেন ঠিক সেইভাবে যেমনভাবে প্রথম বার লিখেছিলেন।

'দি ফ্রেঞ্চ বিভলিউসন্' বইখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের বিদগ্ধ-সমাজে ছড়িয়ে পড়ল কার্লাইলের খ্যাতি। তিনি ভিক্টোরীয় যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলে স্বীকৃত হলেন। এই গ্রন্থ তাঁর প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ দান। এই গ্রন্থই কার্লাইলের জীবনে নিয়ে এল খ্যাতি, সম্পদ আর প্রতিষ্ঠা। তখন থেকেই তাঁর সমকালীন সাহিত্যলেখকগণের মধ্যে তাঁর বিষয়ে কৌতূহল জাগ্রত হতে থাকে। কৌতূহল এবং প্রত্যাশা। বহু লেখকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় স্থাপিত হয়, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ সম্পর্কে তিনি খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। এই আচরণের মূলে আছে তাঁর প্রবল নীতিপ্রবণতা। কার্লাইলের পরবর্তী গ্রন্থ 'ক্রমওয়েল'। ক্রমওয়েলের জীবনী রচনা করে তিনি জীবনী সাহিত্যে একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচন করার প্রয়াস পান। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এই সময়ে ছিল অত্যন্ত নিরানন্দ ও অশান্তিপূর্ণ। এই সময়ে দেখা যায় যে সেই তাঁর সেবাপরায়ণা ও প্রীতিময়ী জীবনসঙ্গিনী জেন তাঁর স্বামীর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছেন। স্বামীর সাহিত্যিক খ্যাতিই ছিল এই বিরূপতার প্রধান কারণ। স্ত্রীর এই মানসিক বিপর্যয় কিন্তু তাঁকে তাঁর নিরলস সাহিত্যকর্ম থেকে সরিয়ে নিতে পারল না। 'ক্রমওয়েল' আর 'ফ্রেডরিক দি গ্রেট'—এই দুটি জীবনের কাহিনী তখন কার্লাইলের কল্পনাকে বিশেষভাবেই অধিকার করেছিল।

কার্লাইলের সর্বপ্রথম রচনা, অনেকের মতে, তাঁর কঠিনতম রচনা 'Sartor Resartas' তাঁরই প্রচ্ছন্ন আত্মচরিত। এই আবেগহীন শ্লেষাত্মক রচনা সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। কার্লাইল তাঁর জীবনে লিখেছেন প্রচুর—প্রবন্ধ আর পুস্তিকার তো সীমাসংখ্যা ছিল না। আর লিখবার বিষয়বস্তুই বা কত—গণতন্ত্র, জেলখানা, মানুষের অধিকার, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, ইংলণ্ডের ধনীসম্প্রদায়ের অলসতা, ইংলণ্ডের আর্থনীতিক অবস্থা—কত বিষয় নিয়ে যে তিনি তাঁর লেখনী চালনা করতেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই সবই তিনি লিখেছিলেন তখন যখন তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কার্লাইল তথাকথিত বৈপ্লবিক চিন্তাসম্পন্ন লেখক ছিলেন না সত্য, কিম্বা কোনো একটি রাজনৈতিক দল বা সম্প্রদায়ভুক্ত তিনি ছিলেন না, কিন্তু নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে তাঁর যে বক্তব্য ছিল, তা তিনি নির্ভীকভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এ না করা পর্যন্ত তাঁর বিশ্রাম ছিল না।

কার্লাইলের পরিণত বয়সের চিন্তা যেমন প্রগাঢ় তেমনি গম্ভীর। তখন থেকে জলন্ত লাভাপ্রবাহের মতো কার্লাইলের লেখনীমুখে বেরুতে থাকে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ। সেসব প্রবন্ধের অনেকগুলিই ইংরেজি সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে আছে। তাঁর প্রত্যেকটি প্রবন্ধই চিন্তাশীল পাঠকবর্গকে জাগিয়ে তোলে এক অনাস্বাদিত

অভিজ্ঞতা আর জনসাধারণের মনে অপরিসীম শ্রদ্ধা। প্রবন্ধসাহিত্যে কার্লাইলের দান ইংরেজিসাহিত্যকে চিরকালের মতো সমৃদ্ধিশালী করে গেছে এবং প্রাবন্ধিক হিসাবে, বার্নার্ড শ'র আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত তিনিই ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তখনকার ইংলণ্ড বলতে গেলে কার্লাইলের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল, কারণ তিনি ছিলেন যুগপৎ একজন খাঁটি মানুষ একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক।

এই সুতীব্র আন্তরিকতার গুণেই স্কটল্যাণ্ডের এক গ্রাম্য রাজমিস্ত্রীর পুত্র আভিজাত্যগর্বী ইংলণ্ডে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার দুর্লভ সম্মান পেয়েছিলেন। এই আন্তরিকতার সঙ্গে মিশেছিল দূরদর্শিতা আর এই দুইয়ের সংমিশ্রণে তাঁর মধ্যে যে প্রতিভা বিকাশ লাভ করেছিল, সেই প্রতিভা সাধারণ প্রতিভা ছিল না, তা ছিল রীতিমতো 'savage genius' এবং এই জাতীয় প্রতিভার অধিকারী যাঁরা হন তাঁদের বক্তব্য থাকে অনেক। কিন্তু কিভাবে তা বলতে হয়, সেই বিষয়ে তাঁরা বড় একটা মনোযোগী হতে পারেন না। প্যালিশ করা গদ্য তিনি রচনা করেন নি বলেই না, কার্লাইল ইংরেজি সাহিত্যিক এমন সমৃদ্ধশালী করে যেতে পেরেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে পৌরুষ সমন্বিত গদ্যের প্রবর্তক কার্লাইল। সত্যের পূজারী ছিলেন কার্লাইল। তাঁর প্রধান জীবনীকার ফ্রাউদে লিখেছেন: "Carlyle made an eternal monument for himself in the hearts of all to whom truth is the dearest of all possessions.' যে নৈতিকবোধের উপর তিনি তাঁর জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন, তা ছিল সত্যের আলোকে উদ্দীপ্ত, তাঁর সকল সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে আছে এক গভীর সত্যানুসন্ধিৎসা। ছিয়াশী বছর বয়সে যখন তাঁর জীবনের সূর্য পাটে বসল, তখন চেলসির ঋষির প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ চেতনায় ইংলণ্ডের মানসলোক উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল চিরকালের মতো। পৃথিবীর মানুষের মনেও কার্লাইলের আসন শাশ্বত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

লর্ড শ্যাফটসবারি

(১৮০১—১৮৮৫)

পৃথিবীর মানব হিতৈষীদের তালিকায় আমরা যে কয়জনকে পাই তাঁদের মধ্যে লর্ড শ্যাফটসবারি একটি অবিস্মরণীয় নাম। মানুষের হিতসাধনকে তিনি তাঁর জীবনের ধর্ম বলে জানতেন এবং এই ধর্মাচরণেই তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল। 'পৃথিবীতে যারা দরিদ্র, যারা দুর্ভাগ্য-পীড়িত আমি তাদের হিতসাধনে আমার জীবন উৎসর্গ করব'—দশ বছর বয়সে লর্ড শ্যাফটসবারি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন কোনো একটা মর্মন্তুদ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। কৈশোরের প্রতিজ্ঞা শূন্যে বিলীন হয়ে যায়নি, বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তিনি সত্যই এই মহৎ কাজের মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে বিলীন করে দিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডের শ্যাফটসবারির ষষ্ঠ আর্ল-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন অ্যানথনি অ্যাসলে কুপার ১৮০১ সনের ২৮শে এপ্রিল। ১৮০১ সনে যখন তাঁর পিতা বংশের উত্তরাধিকার লাভ করেন তখন থেকেই সৌজন্যবশত তাঁকে লর্ড অ্যাসলে বলা হোত এবং এই উপাধির দ্বারাই তিনি পরিচিত ছিলেন। তারপর ১৮৫১ সনে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর অ্যানথনি শ্যাফটসবারির সপ্তম আর্লরূপে গণ্য ও স্বীকৃত হন। একটি সম্ভ্রান্ত বিত্তবান পরিবারেই তাঁর জন্ম হয়েছিল, কিন্তু তাঁর শৈশবের দিনগুলি খুব সুখের ছিল না। তিনি যেন তাঁর পিতামাতার পরিত্যক্ত সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁর সন্তানদের প্রতি আদৌ স্নেহশীল ছিলেন না। তাঁর মা ছিলেন আরাম ও বিলাসপ্রিয়; পুত্র-কন্যাদের লালন-পালনে তিনিও যথেষ্ট অমনোযোগী ছিলেন। এইভাবে পিতামাতার স্নেহ ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে, উপেক্ষিত ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিল বালক অ্যানথনিকে। যা কিছু স্নেহ মমতা তিনি তাঁর শৈশব জীবনে লাভ করেছিলেন তা, তাঁদের এক গৃহপরিচারিকার কাছ থেকে।

হ্যারো ও অক্সফোর্ডে ছাত্রজীবন পরিসমাপ্ত হওয়ার পর অ্যানথনি তাঁদের বংশের প্রথানুসারে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। সংরক্ষণশীল দলের পক্ষ থেকেই তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি এমনই আত্মকেন্দ্রিক ও প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন যে, দলীয় আনুগত্য তিনি কোনোদিনই পছন্দ করেননি। দলীয় অথবা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি অপেক্ষা তিনি ধর্মকেই প্রধান স্থান দিতেন। পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে প্রথম প্রথম তিনি উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিশ্রুতিই দেখাতে পারেননি। তাঁর কণ্ঠস্বর এমনই ক্ষীণ ছিল যে সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের পক্ষে তাঁর বক্তৃতার অনুলিপি নিতে খুব অসুবিধা হতো। কিন্তু সুযোগ যখন এলো তখন মৃদুভাষী এই সদস্যের কণ্ঠস্বরের উচ্চতা শুনে সবাই বিস্মিত হলেন। সে বছর

তিনি উন্মাদদের সম্পর্কিত আইনের সংশোধনের জন্য একটি বিল সমর্থন করছিলেন। তখন ইংলণ্ডের উন্মাদাগারগুলিতে রোগীদের সম্পর্কে যে রকম নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো এবং তাদের চিকিৎসা ব্যাপারে যে রকম ঔদাসীন্য দেখান হতো তা নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে সমালোচনা হতে থাকে। এই হতভাগ্যদের পক্ষ সমর্থন করতে উঠে লর্ড স্তাফটসবারি পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতাটি করেন তার ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত হয়েছিল একটি মানবহিতৈষী ব্যক্তির অন্তরের করুণা। নিরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি যখন সদস্যদের সামনে উন্মাদাগারের শোচনীয় চিত্র তুলে ধরেছিলেন, পাগলকে সুস্থ করে তোলার চেয়ে কিভাবে তাকে অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে তার জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হরণ করে নেওয়া হয়—এইসব কাহিনী, তথ্য ও প্রমাণ সহকারে যখন তিনি পরিবেশন করছিলেন তখন মহাসভার সদস্যবৃন্দ নিস্তব্ধভাবে তা শুনছিলেন। শৈশবে তাঁর সেই মমতাময়ী পরিচারিকার মুখে বাইবেলের মাধ্যমে যে ধর্মভাব তিনি শিক্ষা করেছিলেন, তাঁর পরিণত বয়সে সেই ধর্মভাবই তাঁকে মানব-দরদী করে তুলেছিল।

লর্ড স্তাফটসবারির চেষ্টায় সেই বিল আইনে পরিণত হয় এবং তখন থেকেই ইংলণ্ডের দীর্ঘকালের 'Lunacy Law' সুসংস্কৃত হয়। বিভিন্ন উন্মাদাগার স্বয়ং পরিদর্শন করে তিনি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন। মাঝে মাঝে পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে সেইগুলি যখন তিনি সভ্যদের সামনে পরিবেশন করতেন তখন উন্মাদাগারের নারকীয় অবস্থা জ্ঞাত হয়ে তাঁরা আতঙ্কে শিউরে উঠতেন।

অতঃপর মহাপ্রাণ মানুষটির দৃষ্টি পড়ল ইংলণ্ডের সমাজজীবনে আর একটি অভিশপ্ত প্রথার উপর। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ঐদেশের খনি-গুলিতে অল্পবয়স্ক ছেলেদের নিযুক্ত করা হতো। সেখানে তাদের দিনের মধ্যে বারঘণ্টা খাটানো হতো ও তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হতো। শুধু অল্পবয়স্ক ছেলে নয়, খনির নীচে মেয়েদেরও নিযুক্ত করা হতো—প্রায় নিরাবরণ হয়ে এইসব হতভাগ্য মেয়েদের পুরুষ শ্রমিকদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করতে হতো। অবশেষে ১৮৪২ সনে, যখন স্তাফটসবারির চেষ্টায় খনি আইন বিধিবদ্ধ হলো, তখন তিনি কাপড়ের কারখানায় শিশু ও নারী শ্রমিকদের দিকে তাঁর দৃষ্টি দিলেন। তখনকার দিনে কলে-কারখানায় শ্রমিকদের কাজ করার কোনো নির্ধারিত সময় ছিল না; কোনো কোনো কারখানায় দিনে পনর ঘণ্টা পর্যন্ত খাটানো হতো। হতভাগ্য শ্রমিকদের প্রতিবাদের উপায় ছিল না এবং তাদের দুর্দশার কথা চিন্তা করবার মতো তখন ইংলণ্ডে কেউই ছিল না। শিল্প বিপ্লবের পথ দিয়ে ইংলণ্ডের রাজকোষে তখন প্রচুর ধনাগম হচ্ছিল; শিল্পপতিরা তাই শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করবার অবকাশ পেতেন না; কোনো আন্দোলনের সম্ভবনা দেখলে তাঁরা পার্লামেণ্টের সদস্যদের উৎকোচ দিয়ে এমন ভাবে প্রভাবিত করতেন যে, সরকারী ভাবে সেখানে তাদের বিষয় কচিৎ আলোচিত হতো। এই ধারাই চলে আসছিল দীর্ঘকাল ধরে।

লর্ড স্তাফটসবারিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইংলণ্ডের কল-কারখানা ও খনির শ্রমিকদের বিষয়টি যত্নের সঙ্গে অনুধাবন করেন এবং তাঁর অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে এর প্রতিকারের কথা চিন্তা করেন। এই প্রসঙ্গে বার্নার্ড শ' একবার বলেছিলেন, ইংলণ্ডে শ্রমিক দরদী অনেক মানুষ আমরা দেখেছি কিন্তু দ্বিতীয় লর্ড স্তাফটসবারি আর জন্মগ্রহণ করেননি।

এরপর তাঁকে আমরা দেখতেপাই ইংলণ্ডের জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের পুরোভাগে। যখন দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে ১৮৪৮সনে জনস্বাস্থ্য আইন (Public Health Act) প্রথমবার পাশ হয়, তখন পার্লামেন্টের তত্বাবধানে সেণ্ট্রাল বোর্ড অব হেলথ্ নামে যে সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল তার সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন লর্ড স্তাফটসবারি। ইংলণ্ডে তখন শিল্প-বিপ্লবের ফলে একাধিক নগর গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে; ঐসব নগরের ময়লা নিষ্কাশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা যাতে পর্যাপ্ত হয় এবং ঐসব শিল্প-নগরের অধিবাসীরা সভ্য জগতের উপযোগী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারে সেজন্য তাঁর চিন্তা ও প্রয়াসের অন্ত ছিল না।

কিন্তু লর্ড স্তাফটসবারির কর্মজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো হতভাগ্য চিমনী-পরিষ্কারক বালকদের দুর্দশা মোচন। ইংলণ্ডের যাঁরা সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তি, তাঁদের গৃহের চিমনীর পুঞ্জীভূত ধোঁয়াকালি পরিষ্কার করার কাজে ছোট ছোট ছেলেদের নিযুক্ত করার প্রথা ছিল। সেই সুদীর্ঘ চিমনীর অভ্যন্তরে নেমে গিয়ে, এই দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করতে হতো এবং এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসাবে তারা যা লাভ করত তা সামান্যই। বহু ক্ষেত্রেই চিমনী-পরিষ্কারক বালকদের বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে জীবন সংশয়াপন্ন হতো এবং প্রায়ই তাদের মৃত্যু ঘটত। ডিকেন্স যখন তাঁর 'ওলিভার টুইষ্ট' উপন্যাস রচনা করেন তখনো পর্যন্ত (১৮৩৮) ছোট ছোট ছেলেদের এই নৃশংস কাজে নিযুক্ত করার প্রথা বিদ্যমান ছিল। এমন কি, ভিক্টোরিয়ান যুগের অন্যতম ঔপন্যাসিক চার্লস কিংসলে ১৮৬৩ সনে যখন তাঁর 'ওয়াটার বেবীজ' উপন্যাসখানি রচনা করেন তখন তিনি একটি চিমনী-বালককে তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র করেছিলেন।

এই জঘন্য প্রথাটির বিলোপ সাধনের জন্য পার্লামেণ্টে যে কতবার বিলের পর বিল উত্থাপিত হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। এই প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য মহা-সভায় কত তর্ক-বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। হতভাগ্য চিমনী-বালকদের জীবনের অপরিসীম দুর্দশা, সভ্যতাগর্বী ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনের একটি কলঙ্কিত অধ্যায়রূপেই বিরাজ করছিল। দাসত্ব-প্রথার তুল্য জঘন্য ও অমানুষিক এই প্রথার যূপকাষ্ঠে কত দরিদ্রবালককে যে জীবন দিতে হয়েছে তা স্মরণ করলে রোমাঞ্চ জাগে। বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্ত চিমনীর ধূমকালি নিষ্কাশনের জন্য যান্ত্রিক কল-কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন এবং নূতন গৃহস্থদের বলা হতো যে তাঁরা যেন এমনভাবে চিমনীর পরিকল্পনা করেন যা সহজেই পরিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁদের কাছে যন্ত্র অপেক্ষা বালকদের শ্রম ছিল সুলভ। এইভাবে বছরের পর

বছর কেটে যেতে লাগল এবং প্রতিবছরেই ধুমকালিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে চিমনীর মধ্যে কতো বালকেরযে মৃত্যু হতো তার সঠিক বিবরণ সংবাদপত্রে কচিৎ প্রকাশিত হতো। জনসাধারণও এই নৃশংস প্রথাটি সম্পর্কে কেমন যেন উদাসীন ছিল। ১৮৪০সনে লর্ড শ্যাফটসবারি সর্বপ্রথম এই দিকে তাঁর দৃষ্টি প্রদান করেন। জনসাধারণের ঔদাসীন্যকে তিনি টলিয়ে দেবেনই—এই পণ করে এই আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর কাল তিনি এই নৃশংস প্রথার বিলোপ সাধনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উইলবারফোর্সের সগোত্র। অবশেষে এই প্রথার অবলুপ্তি সাধনে তিনি সফলকাম হতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এর চেয়েও তাঁর জীবনের বড় কাজ হলো দুস্থ ও দরিদ্র বালকদের জন্য একাধিক আবাসিক গৃহস্থাপন করা। বর্তমানে ইংলণ্ডে একাধিক দুঃস্থনিবাস দেখা যায় যার নাম Destitute Home বা Ragged School. প্রাচুর্যের পাশাপাশা সর্বরিক্ত মানুষ জীবনের গ্লানি নিয়ে কিভাবে বাস করে তার বেদনা খ্রীষ্টান জগতের কোনো ধর্মযাজক অনুভব করেননি—অনুভব করেছিলেন এক ধনীর সন্তান। তিনি লর্ড শ্যাফটসবারি। সেইদিন থেকে (১৮৪৩) তাঁর জীবনের মিশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর নিজের কথায়—'To rescue and to restore the lowest of the low—the poorest and the most down trodden and hopeless.' লণ্ডনে সেদিন এদের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। এদের জীবন বলতে কিছুই ছিলনা—এরা অস্তিত্বের ভারবহন করত মাত্র। এদের জীবনে সত্য ছিল দুটি জিনিস—অভাব আর দারিদ্র্য, আর এই পথ দিয়ে সমাজ জীবনে যে পাপ প্রবেশ করত তা বুঝবার মতো মানুষ সেদিন ইংলণ্ডেএকমাত্র লর্ড শ্যাফটসবারিই ছিলেন। এদের জন্য তিনি বহু উপনিবেশ স্থাপন করে এদের মানুষ হওয়ার ও মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছিলেন।

ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংলণ্ডে এমন কোনো সদনুষ্ঠান ছিল না, এমন কোনো সমাজ কল্যাণ প্রয়াস ছিল না যার সঙ্গে লর্ড শ্যাফটসবারি যুক্ত ছিলেন না। এক প্রবল ধর্মবিশ্বাস তাঁকে বরাবর এইসব মানব হিতকর কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে আর তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর ধর্মপ্রাণা পত্নী লেডি এমিলি কুপারের কাছ থেকে। রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের গোড়ারদিকের স্বনামধন্য প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ন ছিলেন এমিলির মাতুল। শৈশবে যিনি প্রতিজ্ঞা গ্রহণকরেছিলেন—I shall serve poorest of the poor—জীবনের সত্তর বৎসরকাল তিনি নিজেকে সেই মহৎ কর্মে নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়োজিত রেখে মানবহিতৈষণার এক নূতন আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। ১লা অক্টোবর, ১৮৮৫ সনে মৃত্যুর পর লর্ড শ্যাফটসবারির মৃতদেহ যখন লণ্ডনের পথ দিয়ে ওয়েস্টমিনিস্টার য্যাবেতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন পথের দুইধারে ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় অবনত চিত্ত তারাই দাঁড়িয়েছিল যাদের সেবায় তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

র‍্যালফ ওয়ালডো এমার্সন

(১৮০৩-১৮৮২)

কনকর্ডের ঋষি এমার্সনকে বলা হয়ে থাকে তিনি নবযুগের প্লেটো। য়ুরোপের গর্ব যেমন তার প্লেটোকে নিয়ে, আমেরিকার গর্ব তেমনি এমার্সনকে নিয়ে। স্বচ্ছ বুদ্ধির প্রতিমূর্তি তিনি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও আমেরিকার মানসিক পরিণতি বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না, তথাপি ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, সেই অবস্থাতেই আমেরিকা এমন কয়টি মনীষীর জন্ম দিয়েছে যাঁরা মানবিক কর্মপ্রয়াসের সকল দিকেই আপন আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন এমার্সন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক; তবে তাঁর প্রতিভার সর্বাধিক অভিব্যক্তি প্রাবন্ধিক হিসাবেই। তাঁর সমকালীন চিন্তানায়কদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ।

এমার্সনের পিতা উইলিয়াম এমার্সন ছিলেন একজন ধর্মযাজক, তিনি ছিলেন ম্যাসাচুসেট্সের অন্তর্গত বোস্টনের ফার্স্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চের পুরোহিত। ১৮০৩ সনের ২৫শে মে যখন তিনি গীর্জার প্রাত্যহিক কাজকর্ম সম্পাদনের অপরাহ্ন-কালে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনি জানতে পারলেন যে, অল্প কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁর চতুর্থ সন্তান, একটি পুত্র, ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সে চার্চের পরে ঐ শহরের জন্ম যে জস্টার নবজাতকের নাম রাখলেন—র‍্যালফ ওয়ালডো। র‍্যালফের বয়স যখন আট বছর হতে আর দু'সপ্তাহ বাকি ছিল তখন পাকস্থলীর স্ফোটক-জনিত অসুখে উইলিয়ামের মৃত্যু হয়। সৌভাগ্যক্রমে ধর্মযাজক হিসাবে তিনি এমন সুনাম কিনেছিলেন যে, গীর্জার কর্তৃপক্ষ উইলিয়ামের বিধবা পত্নীকে সাত বছরের জন্য বার্ষিক পাঁচশত ডলারের একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। তাঁরা শুধু বৃত্তির ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হননি; যাজক হিসাবে উইলিয়াম যে বাড়িতে বাস করতেন, আরো দু'বছর সেই বাড়িতেই উইলিয়ামের বিধবা স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের বাস করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়।

এমার্সনের বয়স যখন নয় বছর তখন তিনি বোস্টন ল্যাটিন স্কুলে ভর্তি হলেন। ছেলেবেলায়, যাকে বলে স্কুল-পালানো ছেলে, তিনি অনেকটা তাই ছিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর স্বভাবের এই দোষ আর ছিলনা। বোস্টন স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি এলেন কনকর্ডের ল্যাটিন স্কুলে এবং পাঠ শেষ হলে এমার্সন হারভার্ড কলেজে প্রবিষ্ট হন। যে চার বছর তিনি কলেজের ছাত্র ছিলেন, তিনি স্কলারশিপ নিয়ে পড়েছিলেন। তবে ছাত্র জীবনে তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। ১৮২১ সন পর্যন্ত তিনি কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর কবিতা লেখার অভ্যাসটা তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। এরপর তিনি ফিরে গেলেন

হারভার্ডে ধর্মতত্ত্ব (Theology) অধ্যয়নের জন্য। ১৮৭২ সনে হারভার্ড ডিভিনিটি স্কুল থেকে সসম্মানে 'ডক্টর অব ডিভিনিটি' (D.D.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এমার্সন কিছুকাল অস্থায়ীভাবে এখানে-ওখানে বিভিন্ন গীর্জায় ধর্মযাজকের কাজ করেন। তারপর ১৮২৯ সনে বোস্টনে যখন একটি নূতন গীর্জা—'সেকেণ্ড ইউনিটেরিয়ান চার্চ'—স্থাপিত হয়, এমার্সন ঐ গীর্জার স্থায়ী ধর্মযাজকের পদে নিযুক্ত হন। তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন ও সেই সঙ্গে বিবাহিত জীবনও। বিবাহিত জীবনে এমার্সন সুখী হয়েছিলেন, কিন্তু এই সুখ তাঁর ভাগ্যে স্থায়ী হয়নি, কারণ বিয়ের মাত্র দু'বছর পরে স্ত্রী এলেন যক্ষারোগে মারা যান। পত্নীর অকাল মৃত্যুতে এমার্সন অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন এবং এই বিয়োগ-বেদনা তিনি আজীবন তাঁর অন্তরে পোষণ করেছিলেন। এমন কি দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করার পরেও এলেনের পবিত্র স্মৃতি তাঁর অন্তর থেকে মুছে যায়নি। তাঁর চরিত্রের এই দিকটি হৃদয় দিয়ে অনুভব করার মতো বিষয়।

অতঃপর এমার্সনের জীবনে দিক্-পরিবর্তন সূচিত হয়। যিনি ছিলেন ধর্মযাজক তিনি এখন হলেন বক্তা ও লেখক। ১৮৩৩ সনে এমার্সন তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল-'On the relation of Man to the Globe.' এই বক্তৃতাটির মধ্যে তাঁর য়ুরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিবর্তনবাদ তত্ত্বের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও ছিল। তাঁর গোড়ার দিককার প্রবন্ধগুলি এই সময়েই রচিত হয় এবং তাঁর প্রথম পুস্তক 'Nature'-এর রচনা তখন প্রায় পরিসমাপ্ত হয়েছে। বক্তা হিসাবে এমার্সন আরও খ্যাতি লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু লেখক হিসাবে যশস্বী হতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল। বক্তৃতা দিয়ে তিনি উপার্জনও করতে লাগলেন প্রচুর। ১৮৩৪ সনে তিনি কনকর্ডে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

তখন থেকেই এমার্সনকে ঘিরে একটি বুদ্ধিজীবির দল গড়ে উঠতে থাকে; সমধর্মিতাই এঁদের পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং তখন থেকেই এমার্সন ও তাঁর অনুগামীরা জার্মান দার্শনিক কান্ট, ফিক্টে ও শেলিং এর রচনা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করতে থাকেন। এই জার্মান চিন্তানায়কদের প্রভাবেই এঁরা আমেরিকায় একটি নূতন গোষ্ঠি গঠন করেন। এই নূতন গোষ্ঠি 'Transcendentalist' নামে পরিচিত হয়েছিল এবং এঁদের অনুসৃত মতবাদ অলৌকিক দর্শন বা 'Transcedenatalism' নামে পরিচিত হয়। এই মতবাদের মূল কথা ছিল—যুক্তির উপর প্রজ্ঞা বা ইনটুইসনের প্রাধান্য। আরো বিশেষভাবে বলা যেতে পারে যে, এমার্সন প্রবর্তিত এই নূতন মতবাদ ছিল আমেরিকান পিউরিট্যানিজমের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ। কিন্তু এই মতবাদের প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আমেরিকার চিন্তাজগতে এই বিদ্রোহের সেদিন প্রয়োজন ছিল এবং আমেরিকার সামাজিক ইতিহাসে এইটাই ছিল এমার্সনের মুখ্য ভূমিকা।

ক্রমে এমার্সন হয়ে উঠলেন একজন চিন্তা-নায়ক ও নূতন গোষ্ঠির নেতা। ভাব

ও আদর্শের দিক্ দিয়ে যেসব তরুণ ছিলেন প্রাগ্রসর তাঁরা দলে দলে এই গোষ্ঠীতে যোগদান করতে থাকেন এবং কনকর্ড হয়ে উঠল বহুজন অন্বেষিত একটি তীর্থস্থান। তীর্থযাত্রীর বিরাম ছিল না সেখানে। কনকর্ডে সমাগত সকল ব্যক্তিই নূতন অলৌকিক দর্শনের প্রবক্তা এমার্সনের সঙ্গে কথা বলতে, বিচার করতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁর নাম হেনরী ডেভিড থোরো (১৮১৭-১৮৬২)। পরবর্তিকালে ইনি একজন প্রসিদ্ধ ন্যাচারালিষ্ট হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন। থোরোই ছিলেন এমার্সনের ভাবধারার শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক এবং তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এমার্সন পরিবারেই বাস করতেন। থোরোর সঙ্গে এমার্সনের বন্ধুত্ব কনকর্ডের ঋষির জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়। থোরোর অকালমৃত্যু তাঁর জীবনে গভীর শোকের কারণ হয়ে উঠেছিল।

কনকর্ডে এমার্সনের বাসগৃহের নামছিল 'Old Manse' এবং এই বাসভবনেই ট্রান্সেনডেন্টাল ক্লাবের নিয়মিত বৈঠক বসত ১৮৩৬ সন থেকে। এই ক্লাবের মুখপত্র ছিল 'The Dial' এবং এর প্রথম সম্পাদিকা ছিলেন মার্গারেট ফুলার। কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও পত্রিকাখানি অল্পদিনের মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এমার্সন স্বয়ং ১৮৪২ থেকে ১৮৪৪—এই দু'বছর পত্রিকাটির সম্পাদনা কার্যে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। 'দি ডায়াল' পত্রিকায় এমার্সনের অজস্র রচনা প্রকাশিত হয়েছিল এবং ঐ রচনাগুলি যখন (১৮৪১) একত্র সংগৃহীত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন থেকেই তাঁর ভাবধারা ও দার্শনিক চিন্তা জাতীয়তার ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে।

১৮৪৭ সনে তাঁর কবিতার প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হলে পরে এমার্সনের খ্যাতি সমধিক বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী বৎসরের শরৎকালে তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড পরিদর্শনে গমন করেন এবং ঐ সময়ে তিনি সেখানে 'Representative Men' শীর্ষক যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইংলণ্ডের বিদগ্ধ সমাজে একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্‌রূপে বিপুল খ্যাতি লাভ করেন। শুধু তাই নয়। আমেরিকা ও য়ুরোপের মানসলোকের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিল তাঁর এই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থখানি। য়ুরোপের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রতিষ্ঠাভূমি রচনা করেছিলেন এমার্সন এবং একমাত্র এই কারণেই তাঁর স্বদেশ এই মনীষীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। তখন থেকেই এমার্সনীয় ভাবধারা পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

তিনটি পুত্রের অকালমৃত্যু ও তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর হেনরী থোরোর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ বয়সে এমার্সন আর একটি প্রকাণ্ড আঘাত পেলেন। ১৮৭২ সনে তাঁর বাসভবনটি অগ্নিদগ্ধ হয়ে একেবারে ভস্মীভূত হয়ে যায়। যদিও বন্ধু-বান্ধব ও অনুরাগীদের প্রদত্ত চাঁদায় বাড়িটি আবার নূতন করে তৈরি হয়েছিল এবং তিনি আরো দশ বছরকাল বেঁচেছিলেন, তথাপি এই ক্ষতির তীব্রতা তিনি কোনোদিনই বিস্মৃত হতে পারেননি। না পারার কারণ, তাঁর মূল্যবান পুস্তক-সংগ্রহটি একেবারে

বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এমার্সন তখনো আগের মতোই বক্তৃতা করে থাকেন, কারণ তাঁর ছিল অর্থের প্রয়োজন। জীবনের দীর্ঘ পথে ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে এমার্সন জীবনের প্রান্তসীমায় এসে উপনীত হলেন। স্তিমিত হয়ে এলো সেই তাঁর বিস্ময়কর মানসদীপ্তি, ম্লান হয়ে আসে সেই বিরাট প্রতিভা। স্মরণশক্তিও হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৮১ সনে কবি লংফেলোর মৃত্যু হলো—সেই লংফেলো যিনি তাঁর 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় লিখেছিলেন 'Tell me not, in mournful numbers! Life is but an empty dream!' এমার্সন তাঁর সমকালীন আমেরিকার এই প্রিয়তম কবির শবযাত্রায় যোগদান করেছিলেন বটে কিন্তু কবির বাসভবনে এসে তিনি কিছুতেই মনে করতে পারলেন না তাঁর নামটি। তাঁর নিজের অন্তিমকালও তখন আসন্ন হয়ে এসেছে। পরের বছরেই বসন্তকালে এমার্সন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন এবং তাঁর ৭৯তম জন্মদিনের ঠিক একমাস আগে তাঁর মৃত্যু হয়। ৩০শে এপ্রিল, ১৮৮২, কনকর্ডের 'Sleepy Hollow' নামক নির্জন ও মনোরম সমাধিস্থলে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

এমার্সনের মানসগঠনে প্রাচ্য দর্শনের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। ভারতীয় কবিতা ও দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় তাঁর ছাত্রজীবনেই ঘটেছিল বলে জানা যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাঁর দিনপঞ্জী পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, এমার্সনের সঙ্গে যখন খ্রীষ্টান চার্চের বিচ্ছেদ ঘটে তখন তিনি মহাভারতের আদর্শবাদ সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। তাঁর 'দি ডায়াল' পত্রিকায় তিনি দু'বছর ধরে মনুসংহিতার অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। 'The Laws of Manu' এই শিরোনামায় এই ধারাবাহিক অনুবাদ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কনকর্ডের বাসভবনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিয়মিত পঠন-পাঠন কনকর্ডের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। অনেকেই হয়ত এমার্সনের দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে গীতার দার্শনিক চিন্তার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করে থাকবেন। বিশ্বাত্মার সঙ্গে সকল জিনিসের একাত্মতা—গীতার এই ভাব এমার্সনের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল। বস্তুতঃ তাঁর পরিণত দার্শনিক চিন্তা গীতার ভাব দ্বারা নিষিক্ত ছিল। 'In my mental development the Hindu philosophy was no less influential than Plato.'—এমার্সনের নিজের এই উক্তিটিই তাঁর মানসগঠনে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার প্রভাবের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।

জিসুপ্পে গ্যারিবল্ডি

(১৮০৭–১৮৮২)

'The glorious liberator of Italy'—ইতিহাসে এই হলো গ্যারিবল্ডির যথার্থ পরিচয়। য়ুরোপে শিল্পকলার অন্যতম পীঠস্থান ইতালি বহু বীর সন্তানের জননী। এই বীর সন্তানদের তালিকায় ম্যাটসিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডি—এই তিনটি অবিস্মরণীয় নাম। এঁদের মধ্যে নব্য ইতালির মুক্তিদায়ক রূপে গ্যারিবল্ডি পরিচিত হলেও ইতিহাসে তাঁর একটি অনন্যলব্ধ বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি শুধু ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেননি, বিশ্বমানবের মুক্তির সন্ধানেও তিনি ব্রতী ছিলেন। অত্যাচারিত ও অনুন্নত জাতির জন্য তিনি সর্বদাই অস্ত্রধারণ করেছেন। প্রাচীন অথবা নবীন পৃথিবীতে যেখানেই কোন একটি জাতি মুক্তির জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, সেখানেই গ্যারিবল্ডি এসে দাঁড়িয়েছেন আর তাদের হয়ে সংগ্রাম করেছেন। এর বিনিময়ে তিনি কিন্তু কোন গৌরব বা পুরস্কারের দাবী করতেন না।

দীর্ঘ, কমনীয়, পেশীবহুল দেহ, মাথার উপর সোনালী-বাদামী রঙের একরাশ চুল আর মুখে ঠিক একই রঙের পরিপাটি দাড়ি ও গুম্ফরাজি—দেখলেই মনে হবে এ যেন মিখায়েল এ্যাঞ্জেলোর আঁকা একখানি তৈলচিত্র। পরনে লাল রঙের একটি কোট আর জোড়া তালি-দেওয়া ট্রাউজার। এই লাল কোটটিই গ্যারিবল্ডির মুক্তি-সংগ্রামের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নূতন ও পুরাতন পৃথিবীতে মুক্তিসংগ্রামের একনিষ্ঠ এই যোদ্ধা মানুষের স্মৃতিপটে এই মূর্তিতেই স্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৮০৭ সনের ৪ঠা জুলাই নীস্ শহরে এক নাবিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গ্যারিবল্ডি। জন্মের কালেই তাঁর শোণিতের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল দুটি ধারা—অরণ্যের সুবিস্তৃত মুক্ত অঙ্গনের প্রতি আগ্রহ আর স্বাধীনতার জন্য অদম্য আকাঙ্খা। এই দুটি সংস্কারই শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। এর ফলে বাল্যকাল থেকেই গ্যারিবল্ডির আচরণে ও কথাবার্তায় তাঁর নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল।

নাবিকের ঘরে এক দুর্দমনীয় স্বাধীনতার আকাঙ্খা বুকে নিয়ে কেমন করে যে গ্যারিবল্ডির আবির্ভাব ঘটেছিল তা ইতিহাসের বিস্ময় হয়ে আছে। শৈশবকালে তিনি যেমন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন তেমনি ভালবাসতেন সাগরবক্ষে অবিরাম সন্তরণ ক্রীড়ায় মগ্ন হতে। আলেকজান্দার ডুমাকে তাই গ্যারিবল্ডি একবার বলেছিলেন, 'আমি বোধ হয় উভচর হয়ে জন্মেছি।' নির্ভীকও ছিলেন তিনি। একদিন নদীর তীর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে দৈবক্রমে তিনি দেখতে পেলেন কতকগুলি স্ত্রীলোক জলে শণের আঁশ ধোওয়ার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে।

তাদের মধ্যে একজন পা পিছলিয়ে জলের মধ্যে পড়ে গেল। নদীটি ছিল খরস্রোতা আর তার তরঙ্গ ছিল ঘূর্ণিসমাকুল। তীরস্থ নারীগণ আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠলেন। গ্যারিবল্ডির কানে এলো সেই আর্তস্বর; তিনি তখনি জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন এবং নিমজ্জমানা স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করে তীরের উপর নিয়ে এলেন। একজন বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এইরকম দুঃসাহস প্রদর্শন স্বাভাবিক হতো, কিন্তু গ্যারিবল্ডির বয়স তখন মাত্র আট বছর।

পনর বছর বয়সেই তিনি বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 'The freedom of the open appealed to me more than the confinement of the classroom.'—এ গ্যারিবল্ডিরই নিজের কথা। সাগর তাঁকে ডাক দিল; অভিযানের সন্ধানে নাবিকের বৃত্তি গ্রহণ করে তিনি চলে গেলেন জেনোয়াতে। পুত্রের এই আচরণে পিতা মর্মাহত হলেন, কারণ ছেলে একজন ধর্মযাজক হবে, এমনি আশাই তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। কিন্তু এখন তিনি বুঝলেন যে তাঁর সে আশা চরিতার্থ হবার নয়। ভাগ্যকে তিনি মেনে নিলেন এবং পেপিনোকে তিনি তখন তাঁর নিজের জাহাজে 'কেবিন বয়' করে নিলেন। পেপিনো ছিল গ্যারিবল্ডির ডাকনাম। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নাবিকদের প্রিয় হয়ে উঠলেন। পেপিনোর নীল আয়ত চোখ দুটার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত সৌহার্দ্যের উত্তাপ আর কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হতো সমবেদনার স্নিগ্ধ রাগিনী।

ঠিক এই সময়ে একজন দেশপ্রেমিক ইতালিয়ানের কথা তিনি শুনলেন যিনি স্বাধীনতার জন্য জীবন দান করেছিলেন। তাঁর নাম সিরো মোনাত্তি। তিনি খণ্ডবিচ্ছিন্ন ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং একে অস্ট্রিয়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। অস্ট্রিয়ানরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করেছিল। কিন্তু মোনাত্তিকে হত্যা করলে কি হবে, নবজাগ্রত বিপ্লবের প্রেরণাকে তো হত্যা করা সাধ্য ছিল না। যে স্ফুলিঙ্গ তিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তা কালক্রমে একাধিক স্বদেশপ্রেমিক ইতালিয়ানের অন্তরে প্রবল শিখায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। মোনাত্তির অসংখ্য অনুগামীদের মধ্যে একজন ছিলেন জেনোয়াবাসী কুনিও। 'আমাদের হাজার হাজার লোককে ওরা ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি এখনো জীবিত। তাঁর নাম ম্যাটসিনী। তোমার উচিত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। ইনি একটি মূর্তিমান অগ্নিশিখা যাঁদের ঈশ্বর প্রেরণ করেন অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।' একদিন কুনিওর মুখে এই কথা শুনলেন গ্যারিবল্ডি।

—ম্যাটসিনি! বিপ্লবী ম্যাটসিনি! ইয়ং ইতালির সভাপতি ম্যাটসিনি—এই নাম গ্যারিবল্ডি আগে আর একজনের মুখেও শুনেছিলেন। শুনেছিলেন যে গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতির নেতা ম্যাটসিনী তখন নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন। তারপর মার্শাই নগরে এক গভীর রাত্রে তাঁর দেখা পেলেন গ্যারিবল্ডি। দেখলেন শীর্ণাকৃতি দীপ্ত অগ্নিশিখার মতো এক তীক্ষ্ণধী পুরুষ যিনি স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ

ইতালিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপ্নে বিভোর। ম্যাটসিনীও তরুণ গ্যারিবল্ডিকে দেখে তাঁর মধ্যে জ্বলন্ত দেশপ্রেম অনুভব করে তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ম্যাটসিনী তাঁকে মুক্তিসংগ্রামের যাবতীয় কার্যকলাপ একে একে বর্ণনা করে আহ্বান জানালেন এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য। সার্ডিনিয়ার রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য যে গুপ্ত প্রচেষ্টা চলছিল তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য ম্যাটসিনী তরুণ গ্যারিবল্ডিকে নির্বাচিত করলেন। এইভাবে নাবিক গ্যারিবল্ডির জীবনের দিক্-পরিবর্তন ঘটে গেল। ইতালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ম্যাটসিনী-গ্যারিবল্ডির এই সংযোগ এক নবযুগের সূচনা করে দিয়েছিল। একজন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন আর অপর জন সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। একটি মৃতপ্রায় জাতিকে একটি জীবন্ত জাতিতে পরিণত করার দুশ্চর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন সেদিন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এই দুই তরুণ।

জেনোয়ার রাজকীয় রণতরীর নাবিকদের মধ্যে বিদ্রোহ সংগঠন করতে গিয়ে গ্যারিবল্ডি ব্যর্থকাম হলেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা জারি হলো, তাঁর মাথার ওপর বহু টাকা ধার্য হলো। তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে মার্শাই পালিয়ে এলেন। সেখানে বসে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে সার্ডিনিয়ার আদালতের বিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে স্বদেশচ্যুত গ্যারিবল্ডি এবার এক নূতন পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। ইতালিতে অবস্থান আর নিরাপদ নয় ভেবে তিনি আতলান্তিকে পাড়ি দিলেন, দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশে।

১৮৩৬। ব্রেজিলে তখন বিপ্লবের আগুন জ্বলছে। রিও গ্র্যাণ্ড আর উরুগুয়ে দুটি দেশই তখন পর্তুগীজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। বিদেশের এই বৈপ্লবিক প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হলেন স্বদেশচ্যুত এক বিপ্লবী। নাবিক এখন অশ্বারোহী—এক দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীবাহিনী গড়ে তুললেন তিনি এবং অল্পকালের মধ্যেই তাদের সুশিক্ষিত করে তুললেন। আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর চেয়েও বিস্ময়কর ছিল গ্যারিবল্ডির এই দক্ষিণ আমেরিকা অভিযান। বারো বছর ধরে তিনি চালিয়েছেন এই অভিযান এক লালকোর্তা বাহিনীর নেতা হিসাবে।

দক্ষিণ আমেরিকায় বিদ্রোহের গৌরবপতাকা উড়িয়ে, রিও গ্র্যাণ্ড ও উরুগুয়ে এই দেশ দুটি পর্তুগীজ শাসন মুক্ত করে, ১৮৪৮ সনে ইতালিতে প্রত্যাবর্তন করলেন গ্যারিবল্ডি। সঙ্গে এল প্রায় একশত লালকোর্তাধারী অনুচর। মৃত্যুদণ্ডাদেশ তখনো বলবৎ ছিল। আনন্দিত জনতা সোচ্চার হলো গ্যারিবল্ডির জয়ধ্বনিতে, সার্ডিনিয়ার রাজা স্বাগত জানালেন বিপ্লবী বীরকে. কারণ অস্ট্রিয়ার সম্রাটের হুমকিতে সার্ডিনিয়া তখন ভীত, সন্ত্রস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজকীয় বাহিনীতে গ্যারিবল্ডি ও তাঁর অনুগামী লালকোর্তাধারী সৈনিকদের গ্রহণ করতে রাজা দ্বিধা বোধ করলেন। গ্যারিবল্ডি নিজের দল নিয়ে স্বাধীনভাবেই বাধা দিলেন শত্রুকে। পাশা ঘুরে গেল—অস্ট্রিয়ার রাজকীয় বাহিনী পরাজিত হলো। তারপর ওপাক

থেকে এলো শান্তির প্রস্তাব। সেই শান্তির বৈঠকে গ্যারিবল্ডির একমাত্র প্রশ্ন ছিল, পরবর্তী যুদ্ধ কোথায় হবে?

ইতালির প্রাণকেন্দ্র রোম থেকে এই প্রশ্নের উত্তর এলো। সেখানে তখন বিপ্লবের আগুন জ্বলছে। মহামান্য পোপ পালিয়ে গেছেন নেপলসের নরপতি বম্বার আশ্রয়ে। জনসাধারণের দাবিতে প্রায় দু'হাজার বছর পরে রোমান রিপাবলিকের পত্তন হলো। এই নবজাগ্রত জনচেতনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন অস্ট্রিয়ার রাজশক্তি নেপলসের রাজা, মহামান্য পোপ, স্পেন ও ফ্রান্স সংযুক্তভাবে। ফ্রান্সের লুই নেপোলিয়ান দশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। সে বাহিনীকে সাফল্যের সঙ্গে বাধা দিলেন গ্যারিবল্ডি। এই যুদ্ধে বিজয়লাভের পর সমগ্র ইতালির জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে বন্দিত হলেন বিজয়ীবীর গ্যারিবল্ডি। তৃতীয় যুদ্ধ হয় জ্যানিকুলামে। এইযুদ্ধে ফরাসী সৈন্যদের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে নিহত হয় বহু তরুণ ইতালিয়ান সৈন্য। জলন্ত স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সেই তরুণ সৈনিকদের আত্মদান সার্থক হয়েছিল। এরপরেই রোমের ইতিহাসে ঘটল গ্যারিবল্ডি ও তাঁর লালকোর্তাবাহিনীর পদসঞ্চার। য়ুরোপের ইতিহাসে সেদিন এটা ছিল একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। সমস্ত ইতালি জুড়ে তখন নূতন এক প্রত্যাশার দুন্দুভি ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ইতালির প্রধানমন্ত্রীর পদে তখন সমাসীন হয়েছেন কাভুর। ইনি ছিলেন রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষক, গণতান্ত্রিক সরকারের আদর্শের তিনি ছিলেন পরিপন্থী। কাভুরের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধল গ্যারিবল্ডির। সংঘর্ষ থেকে আবার সংগ্রাম।

সেই ঐতিহাসিক সংঘর্ষ ও সংগ্রামের শেষে বিজয়ীবীর গ্যারিবল্ডি জুলিয়াস সীজারের পর ইতালির মুক্তিসংগ্রামের শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা, যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় রচনা করে দিয়েছিল। তিনি ইচ্ছা করলে ইতালির ডিক্টেটর বা অধিনায়ক হতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি হননি। 'I want to serve Italy, I desire no other reward.'—এইকথা সেদিন তিনি বলেছিলেন দ্বিতীয় ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে। ক্যাপরেয়ার এক নির্জন পার্বত্য আবাসে কেবলমাত্র সামান্য খাদ্যশস্য নিয়ে ফিরে গেলেন এই মহান দেশপ্রেমিক। স্বাধীন ও অখণ্ড ইতালির স্বপ্ন তখন আর স্বপ্ন মাত্র নয়, তা তখন হয়ে উঠেছে এক বাস্তব সত্য। গ্যারিবল্ডির জীবনসাধনার এই ফলশ্রুতি।

অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন

১৮০৯-১৮৬৫।

আমেরিকার বিশাল ভূভাগ অনাদি-কালের অরণ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেই অরণ্য পরিষ্কার করে, আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকেরা প্রায় সকলেই কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। জঙ্গল কেটে, মাঝে মাঝে বসেছে গ্রাম। অরণ্যের ক্রোড়ে এইরকম একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বা পল্লীর মধ্যে একটি সাধারণ পরিবারে লিঙ্কনের জন্ম হয়। পিতা ছিলেন একেবারেই নিরক্ষর, নিজের নামটি পর্যন্ত বানান করে পড়তে পারতেন না। সেই গ্রামের সমস্ত বাড়ীই ছিল কাঠের তৈরী। জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে যে সব বিশাল গাছ কাটা হতো তারই গুঁড়ি দিয়ে তৈরী করা হতো এইসব বাড়ির দেওয়াল। সেসব কাঠের ঘরে কোন জানালা থাকতো না। এই রকম একটি সামান্য কাঠের ঘরে যিনি তাঁর বাল্য ও শৈশব অতিক্রম করে স্বীয় প্রতিভাবলে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ও রাষ্ট্রপতির জন্য নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক 'হোয়াইট হাউস' নামক ভবনে বাস করেছিলেন তিনিই যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে আব্রাহাম লিঙ্কন নামে খ্যাত। এই জন্য তাঁর সম্পর্কে "From Log Cabin to White house"—এই বহুখ্যাত উক্তিটি প্রচলিত আছে এবং এই একটিমাত্র কথার মধ্যে তাঁর সমগ্র জীবনেতিহাস যেন অতি সুন্দরভাবে আভাসিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রকৃত মহত্ত্ব তাঁর এই উন্নতির শিখরে আরোহণের কাহিনীর মধ্যে নয়, তাঁর স্বদেশের জন্য ও পৃথিবীর মানুষের জন্য তিনি যা করে গিয়েছেন, লিঙ্কনের শ্রেষ্ঠত্ব তারই মধ্যে খুঁজতে হবে।

১৮৩০ সন থেকেই দাসত্বপ্রথাকে উপলক্ষ্য করে আঞ্চলিক সংঘাত তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। আবার ঐসময়েই দেখা যায় দাসত্ব-নিরোধ আন্দোলন। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ যখন শেষ হয় তখনো পর্যন্ত আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা মনে করত যে, এই দাসত্বপ্রথা তারা লাভ করেছে উত্তরাধিকার সূত্রে, সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অন্যান্য চিরাচরিত ঐতিহ্যের মতো এর জন্যেও তাদের দায়ী করা যায় না। ১৮৪০ সন থেকেই আমেরিকার রাজনীতিতে দাসত্ব-প্রথাই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতিতে এই প্রথার ছিল গভীর প্রভাব। সম্ভবতঃ এই কারণেই অনেকেই ছিলেন এই প্রথার উগ্র সমর্থক। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলে ছিল মজুরি প্রথা। দক্ষিণীদের অভিমত এই ছিল যে, মজুরীপ্রথার চেয়ে দাসত্বপ্রথা অনেক বেশী মানবিক। কিন্তু ১৮৩০ সনের পরে দুশো বছরের এই প্রথায় একটা স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। সে সময় আমেরিকায় গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ দেখা দিতে শুরু করেছে এবং ক্রমেই তা গতিবেগ অর্জন করেছিল। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি সুবিচার করার জন্য যে প্রবল

আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তারই ফল ঘটেছিল এই দাসত্ব প্রথা বিরোধী আন্দোলন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে; হ্যারিয়েট বিচার স্টৌ প্রণীত 'টম কাকার কুটির উপন্যাসখানি দাসত্ব প্রথার অবিচার ও নিষ্ঠুরতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে এই আন্দোলনকে প্রবলতর করে তুলেছিল।

এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের পটভূমিকায় দেখতে হবে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনকে। তখন হুইডা পার্টির পরিবর্তে দেখা দিয়েছে রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি শক্তিশালী সংগঠন। ১৮৫০ সনের নির্বাচনে এই দলের পরাজয় ঘটলেও উত্তরাঞ্চলে ঐ নূতন দলের প্রতিষ্ঠা খুবই সুদৃঢ় হলো। চেজ্ ও উইলিয়াম সীওয়ার্ডের মতো দাসত্ব প্রথাহীন অঞ্চলের নেতৃবর্গ অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন। এদেরই সঙ্গে দেখা দিলেন একজন দীর্ঘাকৃতি কৃশকায় ইলিনয়বাসী আইন ব্যবসায়ী। এঁরই নাম অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন। এই মহাপুরুষের শৈশব ও বাল্য জীবনের কাহিনী বড়ো বেদনা দায়ক। নয় বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহীন হন। তাঁর পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করলেন। নূতন মা এসে বালক অ্যাব্রাহামের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। অনুকূল পরিবেশে তিনি যত্নের সঙ্গে বিদ্যা অর্জন করতে থাকেন। তিনি রাত জেগে অঙ্ক করতেন। কোদালের ফাল ছিল তাঁর স্লেট, তার উপর চক খড়ি দিয়ে লিখতেন। ষোল বছর বয়সে লিঙ্কন জীবিকা অর্জনে বের হলেন। প্রথমে তিনি খেয়া নৌকায় কাজ নিলেন। তাঁর মনিবের কতকগুলি পুস্তক ছিল, এই পুস্তকগুলি যখন তাঁর পড়া হয়ে গেল, তখন লিঙ্কন সে কাজ ছেড়ে দিলেন। আস্তাবলে, কসাইখানায়, প্রতিবেশির খামারে, গ্রামে মুদীর দোকানে—কতো জায়গায়ই যে তিনি কত রকমের কাজ করেছিলেন তার হিসেব নেই।

একুশ বছর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। দুই বছর তিনি জরিপের কাজে নিযুক্ত হন এবং তখনি তিনি একজনের পরামর্শে আইন পড়তে থাকেন। আটাশ বছর বয়সেই তিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজ চেষ্টা, চরিত্র ও বুদ্ধির বলে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হলেন। তিনি এতদূর সৎ ছিলেন যে, কোন মিথ্যা মোকদ্দমার জন্য তিনি নিযুক্ত হচ্ছেন বুঝতে পারলে, তখনি ওকালতনামা ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। এরপর তাঁকে আমরা স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে নির্বাচিত হতে দেখতে পাই। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হিসাবে তাঁর যুক্তি-শক্তি ও নীতি-নিষ্ঠা দেখে সবাই বিস্মিত হতো। এইভাবে দেশের ও দশের প্রতিনিধি হতে হতে কাল-ক্রমে তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের অন্য শতশত আইনজীবি রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তাঁর কোনো পার্থক্য ছিল না। দাসত্বপ্রথাকে তিনি বহু পূর্ব থেকেই অন্যায় বলে মনে করতেন। ইলিনয়ের পিওরিয়াতে ১৮৫৪ সনে তিনি একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, জাতীয় আইনগুলি এমনভাবে রচিত হওয়া উচিত যাতে

সেগুলির যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান-রচয়িতাগণ কর্তৃক গৃহীত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সে নীতি হচ্ছে সামাজিক প্রথা হিসাবে দাসত্বকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বর্জন করা হবে।

এই বক্তৃতার ফলে লিঙ্কন ক্রমবর্ধিষ্ণু পশ্চিমাঞ্চলের সর্বত্র সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। চার বছর পরে সেনেটর নির্বাচনে তিনি ইলিনয় থেকে ষ্টিফেন ডগলাসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ালেন। তাঁর নির্বাচনী প্রচারের প্রথম বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তিনি ১৮৫৮ সনের ১৭ই জুন। এই উদ্বোধনী ভাষণের গোড়াতেই তিনি আমেরিকার ইতিহাসের পরবর্তী সাত বছরের মূল নীতিটিকেই তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'আত্ম-দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন পরিবার দাঁড়াতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি এই জাতি অর্ধ-দাস ও অর্ধ-মুক্ত অবস্থায় চিরকাল টিকে থাকতে পারে না। আমি চাই না যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে পড়ুক, আমি চাই না এই পরিবার ধ্বংস হোক তবে আমি চাই যে, এই পরিবার থেকে চিরকালের জন্য বিভেদ বিচ্ছেদ লুপ্ত হয়ে যাক।'

এই নির্বাচনের ফলে লিঙ্কন সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন একজন জাতীয় নেতা হিসাবে। অচিরকালের মধ্যে দাসত্বপ্রথা বিরোধী ও তার সমর্থকদের সংঘাত আবার তীব্র হয়ে উঠল। ১৮৬০ সনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় উত্তর ও দক্ষিণের বিভেদ একটি রাজনৈতিক আকার গ্রহণ করল। রিপাবলিকান দল মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা আব্রাহাম লিঙ্কনকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য সুপারিশ করল এবং ১৮৮১ সনের ৪ঠা মার্চ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করলেন। তাঁর নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকায় যে ঘোরতর রাষ্ট্রবিপর্যয় দেখা দিয়েছিল সে ইতিহাস সুপরিচিত এবং এরই পরিণতি ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ১৮৬৩ সনের শুরুতেই যুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের বিপর্যয় ঘটতে লাগল। কিন্তু ঐ বছর ১লা জানুআরী তারিখে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। ঐদিন রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন Emancipation Proclamation বা দাসমুক্তি ঘোষণা জারি করে ক্রীতদাসের মুক্তি ঘোষণা করলেন। দাসত্বপ্রথাকে চিরতরে নির্মূল করার আদর্শ ঘোষিত হলো বটে, কিন্তু সংগ্রাম থামল না।

এই যুদ্ধ চলবার সময় সমগ্র জাতি বুঝতে পারল যে লিঙ্কনের প্রাজ্ঞতা কতো গভীর এবং তা কি পরিমাণ সতর্ক বিবেচনা ও গভীর চিন্তাশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রকৃত ব্যক্তিত্ব যে কতো বিরাট সেটা এতদিনে সকলে উপলব্ধি করতে পারল। সত্যের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল গভীর, তাঁর ধৈর্য ছিল অপরিসীম এবং তাঁর চরিত্রের উদারতা ছিল বিরাট। পররাষ্ট্রীয় নীতিতেও তাঁর আত্মমর্যাদা, মনোবল ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেল। ক্ষমতার সঙ্গে কৌশলের সমন্বয় ঘটাতে তিনি ছিলেন দক্ষ। সর্বোপরি, বলপ্রয়োগ কিংবা উৎপীড়নের মাধ্যমে নয়, আন্তরিকতা ও ঔদার্যের ভিত্তিতে সমগ্র দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সুসংহত করে রাখতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহশীল। মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক

স্বায়ত্ত শাসনে বিশ্বাসী। এই সব বিবিধ কারণে তিনি জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন করেছিলেন। আস্থা এবং শ্রদ্ধা। তাই তারা রাষ্ট্রপতির পদে তাঁকে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত করল ১৮৬৪ সনে।

লিঙ্কন দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হওয়ার পর (৪ঠা মার্চ ১৮৬৫) তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণের উপসংহারে বলেছিলেন—'কারো প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করে, সকলের প্রতি উদারতার ভাব নিয়ে, এবং ঈশ্বর আমাদের যে ন্যায়-দৃষ্টির অধিকারী করেছেন তদনুযায়ী দৃঢ় ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে যেকাজে আমরা ব্রতী হয়েছি তাকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে হবে; আমাদের জাতির ক্ষতস্থানকে নিরাময় করে তুলতে হবে, যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি যে বহন করেছে তার জন্য; তার বিধবাদের জন্য এবং তার পিতৃহীন শিশুদের জন্য। স্বদেশে আমরা সকলের সঙ্গে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী শান্তি রক্ষার জন্য যা-কিছু করণীয় সবই করতে কৃতসংকল্প।'

তিন সপ্তাহ পরে দক্ষিণের বিদ্রোহ শান্ত হলো, বিদ্রোহী জেনারেল লী আত্মসমর্পণ করলেন। ১৪ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট তাঁর মন্ত্রিসভার বৈঠকে শেষবারের জন্য যোগ দিলেন। তিনি তাঁর সচিববর্গকে অনুরোধ জানালেন যে, তাঁরা যেন রক্তপাত ও প্রতিশোধ গ্রহণের দিক থেকে তাঁদের চিন্তাধারাকে ফিরিয়ে নেন শান্তির দিকে। সেই রাত্রেই লিঙ্কন যখন একটি প্রেক্ষাগৃহে বসে অভিনয় দেখছিলেন তখন একটি অর্ধোন্মাদ ব্যক্তির পিস্তলের গুলির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি মাত্র ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন। লিঙ্কনের মৃত্যুর পরে কবি জেমস রাসেল লাওয়েল লিখেছিলেন—'যাঁকে কোনদিন তারা দেখেনি সেই রকম একজন মানুষের আকস্মিক মৃত্যুতে সেই হতচকিত এপ্রিলের সকালে অসংখ্য মানুষ যেমন ভাবে অশ্রু বর্ষণ করেছে—এমন আর কখনই করেনি। যেন ঐ ব্যক্তিটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের জীবন থেকে চলে গেছে একজন হিতৈষী বন্ধুর উপস্থিতি এবং তাদের জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। সেদিন অপরিচিত লোকের দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সমবেদনার যে বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধানিবেদনের যে কোনো বক্তৃতার চেয়ে তা বেশি হৃদয়স্পর্শী। সমগ্র মানবসমাজ সেদিন যেন এক পরমাত্মীয়কে হারিয়েছিল।'

মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানব-হিতৈষীদের তালিকায় 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' এই নামটি তাই চিরকালের মতো স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সঙ্গে চারিত্রিক মহত্ত্বের যে অপূর্ব সমন্বয় আমরা তাঁর জীবনে লক্ষ্য করি তা পৃথিবীর খুব কম রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই দেখা যায়। বস্তুত আব্রাহাম লিঙ্কনের চরিত্র মাধুর্য এবং মানবিকতাবোধ আর সেই সঙ্গে তাঁর দুর্লভ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান তাঁকে আমেরিকার জাতীয় ইতিহাসে যেমন, তেমনি বিশ্বের ইতিহাসেও চিরস্মরণীয় এবং চিরবরণীয় করে রেখেছে।

চার্লস ডারউইন

(১৮০৯—১৮৮২)

১৮৫৯, ২৪শে নভেম্বর। সেদিন লণ্ডনে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল যার তরঙ্গ অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র য়ুরোপ তথা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে মানুষের চিন্তা জগতে একটা তুমুল আলোড়ন এনে দিয়েছিল। শুধু আলোড়ন? প্রাচীন পৃথিবীটাই বুঝি সেদিন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল, অন্তত খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকগণ তাই মনে করেছিলেন।

ঐদিন ডারউইনের 'Origin of Species' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রথম সংস্করণের এক হাজার আড়াই শত বই বিক্রী হয়ে যায়। একটা প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় উঠেছিল সেদিন এই বইখানিকে কেন্দ্র করে। কোন একখানি গ্রন্থকে কেন্দ্র করে এমন ঘটনা এর আগে য়ুরোপে দেখা যায় নি। এ যাবৎকাল প্রচলিত বাইবেল-বর্ণিত বিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্বের ধারণাটাই একেবারে ধূলিসাৎ করে দিল ডারউইনের ঐ বইখানি। সনাতন খ্রীষ্টধর্মের ধারক বাহকগণ হলেন বিক্ষুব্ধ, তাঁরা আক্রমণ করলেন এই নূতন মতবাদকে, বিজ্ঞানীমহলেও দেখা দিল চাঞ্চল্য, তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থনে গর্জন করে উঠলেন। মসী যুদ্ধ চলল কয়েক বছর ধরে এবং অবশেষে ডারউইনই জয়লাভ করলেন এবং তাঁর এই মতবাদের সপক্ষে তিনি এমন কয়েক জনকে পেলেন যাঁদের সমর্থনই তিনি চেয়েছিলেন।

চার্লস রবার্ট ডারউইন একটি অতি সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতামহ ইরাসমাস ডারউইন তৎকালীন ইংলণ্ডের একজন কৃতবিদ্য ও খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন—তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং একাধারে ন্যাচারালিষ্ট, কবি ও দার্শনিক ছিলেন।

ডারউইনের পিতা ও অগ্রজ উভয়েই চিকিৎসক ছিলেন। সুতরাং পরিবারের সকলেরই এই প্রত্যাশা ছিল যে, চার্লসও বড়ো হয়ে ঐ বৃত্তি অবলম্বন করবেন তাই ডাঃ বাটলারের স্কুলে পড়া শেষ হলে পরে ডাক্তারি পড়ার জন্য তাঁকে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। অল্পকালের মধ্যে বোঝা গেল যে, ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা তাঁর মধ্যে আদৌ নেই। তখন তাঁর পিতা ঠিক করলেন যে ছেলেকে তিনি ধর্মযাজক করবেন এবং এই বিষয়ে যথাযথ শিক্ষালাভের জন্য তাঁকে কেমব্রিজে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ১৮২৭ সনে তিনি কেমব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজে ভর্তি হলেন। তখন ডারউইনের বয়স আঠার বছর।

বছর তিন-চার তিনি কেমব্রিজে ছাত্র হিসাবে অতিবাহিত করেন। এইখানে তিনি হামবোল্ড প্রণীত 'Personal Narrative' বইখানি পাঠ করে ন্যাচারাল

হিস্ট্রির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন ও একজন ন্যাচারালিষ্ট হিসাবে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁর মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা দিতে থাকে। এইখানেই তিনি উদ্ভিদবিদ্যার প্রখ্যাত অধ্যাপক হেনসলোর প্রিয় ছাত্ররূপে পরিগণিত হন। ছাত্র হিসাবে এই অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাই শেষ পর্যন্ত ডারউইনের জীবনের দিক্‌পরিবর্তন সূচিত করে দিয়েছিল। যথাসময়ে কেমব্রিজ থেকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি এবং স্নাতক হওয়ার পর আরো কিছুকাল তিনি ভূবিদ্যা সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে থাকেন।

ডারউইনের বয়স তখন বাইশ বছর যখন একদিন তিনি অধ্যাপক হেনসলোর কাছ থেকে একখানি অপ্রত্যাশিত পত্র পেলেন। ঐ পত্রে লেখা ছিল যে' ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের উদ্যোগে এবং ক্যাপ্টেন ফিজ্‌রয়ের নেতৃত্বে H.M.S. BEAGLE জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানে যাত্রা করবে এবং ক্যাপ্টেন তাঁর সঙ্গে এমন একজন শিক্ষিত লোককে নিয়ে যেতে চান যাঁর জীবজন্তু, গাছপালার প্রকৃতি অনুশীলনে আগ্রহ আছে। ঐ পত্রের শেষ ভাগে লেখা ছিল ; 'Don't put on any modest doubts or fears about your disqualifications, for I assure you that I think you are the very man Captain Fiz-Roy is in search of.' যার অনুশীলনে তিনি আশৈশব আনন্দবোধ করে এসেছেন, সেই বিষয়ে ব্যাপকভাবে জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ পেয়ে ডারউইন যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। অবশ্য বেতনের কথা পত্রে কিছু উল্লিখিত ছিল না এবং কাজটা একরকম অবৈতনিক ছিল।

১৮৩১, ২৭শে ডিসেম্বর। ডারউইন বিনা বেতনে একজন ন্যাচারালিস্ট হিসাবে অভিযানকারী ক্যাপ্টেন ফিজ্‌রয়ের সঙ্গে 'বিগল' জাহাজে চড়ে দক্ষিণ আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন কে জানত যে এই ভ্রমণ ও ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি আশ্চর্য মতবাদ প্রচার করবেন যা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে চিরাচরিত খ্রীস্টান-জগতের সংস্কারের মূল ধরে নাড়া দেবে আর পৃথিবীর মানুষের চিন্তায় নিয়ে আসবে একটা প্রবল আলোড়ন। পরবর্তীকালে ডারউইন যখন তাঁর বিবর্তনতত্ত্ব প্রচার করেন তখন এর বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্যাপ্টেন ফিজ্‌রয় এবং তিনি বলেছিলেন—'তখন যদি জানতাম যে, যে লোকটিকে আমার অভিযানের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম তিনি এইরকম ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করবেন তাহলে আমি কখনই তাঁকে সঙ্গে নিতাম না।'

পাঁচ বৎসরকালব্যাপী এই সমুদ্রযাত্রা যে ডারউইনস-মানস বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল এবং তাঁর পরবর্তীকালের আবিষ্কারের পথ সুগম করে দিয়েছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল অঞ্চল ব্যতীত কাপ্টেন ফিজ্‌রয়ের এই সামুদ্রিক অভিযান আরো কয়েকটি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, যথা,—গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ, তাইহিতি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, তাসমানিয়া, মালদ্বিভ দ্বীপপুঞ্জ, সেন্ট হেলেনা প্রভৃতি।

পাঁচ বছর পরে ডারউইন যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি একজন পুরোদস্তুর প্রাণিতত্ত্ববিদ্। কিছুকাল কেমব্রীজে অবস্থান করার পর ১৮৩৭ সনে তিনি এলেন লণ্ডনে এবং তাঁর ভ্রমণলব্ধ অভিজ্ঞতা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সেসব রচনা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি কিছুমাত্র আকর্ষণ করল না। এইখানে সেই সময় বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ চার্লস লায়ারের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন ও পরবর্তিকালে এই পরিচয় স্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। এই সময় থেকেই তাঁর প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল—তিনি অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যে নূতন চিন্তাস্রোত তখন তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে অলক্ষ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল, তাকে একটা সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিতে না পারা পর্যন্ত তিনি যেন কিছুতেই স্থির হতে পারছিলেন না। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর খুল্লতাত ভগ্নী এম্মা ওয়েজউডকে বিবাহ করেন। তাঁর এই পত্নীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র ও দুটি কন্যার জন্ম হয়। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল এম্মার সাহচর্য তাকে তাঁর কর্মে যে প্রেরণা ও শক্তি জুগিয়েছিল, সে কথা ডারউইন অকপটেই স্বীকার করেছেন।

অতঃপর দীর্ঘ ষোল বৎসরকাল ধরে ডারউইন একাগ্রচিত্তে তাঁর বিবর্তনতত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন করতে থাকেন তাঁর বন্ধু লায়াল তখন তাঁকে তাঁর গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। এইবার তিনি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এই সময় একদিন প্রাতঃকালে মালয় থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে একখানি পত্র ডারউইনের হাতে এসে পৌছল। পত্রলেখকের নাম—অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। এ নাম তাঁর পরিচিত, কারণ ওয়ালেস ছিলেন একজন প্রখ্যাত ন্যাচারালিস্ট ও অনুসন্ধানকারী। সেই পত্রের সঙ্গে একটি রচনাও ছিল। সেটি পাঠ করে ডারউইন যারপর নাই বিস্মিত হলেন, কারণ এতকাল যাবৎ যে বিষয়টি নিয়ে তিনি চিন্তা করে এসেছেন, ওয়ালেসের প্রবন্ধটির মধ্যে তিনি তারই একটা বিস্তৃত বিবরণ দেখতে পেলেন। 'চিন্তার এমন আশ্চর্য সাদৃশ্য আমি কখনো দেখিনি' পরে লিখেছেন ডারউইন। তিনি যেন কিছুটা হতবুদ্ধিও হয়ে গেলেন। তা'হলে বিবর্তনতত্ত্ব নিয়ে আরো একজন গবেষণা করছেন, ভাবলেন তিনি এবং তখন তাঁর মনে এই চিন্তার উদয় হলো যে, যদি এখনই তিনি তাঁর গবেষনার বিষয় প্রকাশ করেন তবে সেটা অসাধুতার পরিচায়ক হবে। বন্ধু লায়ালাকে তখন সব কথা তিনি জানালেন। তখন ঠিক হলো যে, একটি বিদ্বদ্‌সভায় ডারউইন তাঁর এবং ওয়ালেসের প্রবন্ধ পাঠ করবেন। ওয়ালেস যখন এই সংবাদ অবগত হলেম তখন তিনি ডারউইনকে লিখে পাঠালেন—'I withdraw from the field, leaving it open to you.' ওয়ালেসের এই মহানুভবতা ডারউইনকে বিস্মিত করিয়াছিল।

১৮৫৮, ১লা জুলাই, লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটিতে ডারউইন তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করলেন এবং এর এক বছর পরে প্রকাশিত হলো The Origin of Species

by means of Natural Selection, or Preservation of the Favoured Races in the Struggle for life'.—এই সুদীর্ঘ নামের একটি গ্রন্থ। তখন বিজ্ঞানীমহলে সাড়া পড়ে গেল এবং সকলের মনে এই ধারণা জন্মাল যে, পৃথিবীতে একটি নূতন বৈপ্লবিক চিন্তার অভ্যুদয় হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় শুধু বিজ্ঞানী নয়, একটি প্রেমিকের মনেরও পরিচয় আছে যে মন ব্যতিরেকে প্রকৃতির কোনো গূঢ় রহস্য উদঘাটন করা যায় না। কি গভীর অনুভূতির সঙ্গে তিনি তাঁর আলোচ্য বিষয়কে বুঝতে চেয়েছেন' তা এই গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। পড়তে পড়তে মনে হয় বিজ্ঞানের বই পড়ছি, না পড়ছি কোন কাব্য। 'ওরিজিন অব স্পীসিস' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এইখানেই। কয়েক বছরের মধ্যেই সভ্যজগতের প্রায় সকল ভাষাতেই এর অনুবাদ প্রকাশিত হলো। সেদিন ডারউইনের মতবাদের সর্বপ্রধান সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী টি. এইচ. হক্সলি। তাঁর মতবাদকে নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, তা নিরসন করবার জন্য ডারউইন ১৮৬৮ সনে Variation of Animals and Plants এবং ১৮৭১ সনে Decent of man এই নামে আরো দু'খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখন থেকেই সমস্ত বিতর্ক স্তব্ধ হয়ে যায় এবং বিবর্তনতত্ত্ব ধীরে ধীরে বিজ্ঞানী সমাজে সমাদৃত ও স্বীকৃত হতে থাকে।

১৮৮২, ১৯শে এপ্রিল, ডারউইনের মৃত্যু হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর গবেষণার কাজে লিপ্ত ছিলেন। মৃত্যুর পর ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে, নিউটনের সমাধির পার্শ্বেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এই দুর্লভ সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল।

মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে ডারউইনের অবদানের মূল্যায়ন প্রসঙ্গ পরবর্তিকালে প্রখ্যাত হিউম্যানিস্ট পল সিয়ার্স একটি গ্রন্থে লিখেছেন: 'The immidiate effect of Darwin on science was of magnificant release. It was not, properly speaking, a stimulus—The vast unexplored world of the unknown was stimulus enough for a newer and greater faith in universal order.' সত্যিই তাঁর জীবনব্যাপী গবেষণা গবেষণামাত্র ছিল না—তা ছিল একটি অনাবিষ্কৃত পৃথিবীর আবিষ্কার। বিজ্ঞানের এই একান্ত নম্র ও শান্তশিষ্ট পর্যবেক্ষক যে মতবাদ (idea) ঘোষণা করেছিলেন তার প্রচণ্ডতা আজো সারা পৃথিবীতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে।

চার্লস ডিকেন্স

(১৮১২-১৮৭০)

ভিক্টোরিয় যুগের ইংলণ্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন ডিকেন্স। জনপ্রিয় এবং যথার্থ শক্তিশালী লেখক। তাঁর লেখনী যা কিছু প্রসব করেছে তার সবই আজ বিশ্বসাহিত্যে স্থায়িত্ব অর্জন করেছে এবং ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে। ভিক্টোরিয় যুগের ইংলণ্ডের নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক এবং একমাত্র তাঁরই রচনার মধ্যে শাশ্বত হয়ে আছে বিগত যুগের ইংলণ্ডের সমাজজীবনের যথার্থ ছবি। যে কোনো শ্রেণীর পাঠকের কাছে তিনি প্রিয়। শেকসপিয়রের নাটক পড়েনি বা দেখেনি এমন লোক হয়ত থাকতে পারে, কিম্বা কবিতা বোঝেন না এমন লোকও হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু ডিকেন্সের উপন্যাস পাঠ করেননি এমন পাঠক পৃথিবীতে বিরল। একমাত্র তাঁরই উপন্যাস একাধিকবার পাঠ করা যায় এবং প্রত্যেক বারই তার স্বাদ গ্রহণ করে পাঠকের মন পরিতৃপ্ত হয়। ডিকেন্স তাই কালজয়ী লেখক। অথচ ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, কলম ধরবার আগে তাঁকে কারখানায় সামান্য মজুরের কাজ করতে হয়েছিল।

ডিকেন্সের জীবনকথা অতি বিচিত্র। ১৮১২ সনের ৭ই ফেব্রুআরি পোর্টসমাউথে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর পিতা জন ডিকেন্স নৌ বিভাগে একজন সামান্য কেরানির কাজ করতেন। বালক ডিকেন্সের ছিল অসীম পাঠানুরাগ। এটা তিনি লাভ করেছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর বাবার কাছ থেকে। জন ডিকেন্সেরও ছিল প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এবং তাঁর অভাব-অনটনের সংসারে আর কিছু না থাক, বই ছিল প্রচুর। ভদ্রলোক ধার করেও বই কিনতেন এবং সেগুলি যত্নের সঙ্গে পাঠ করতেন। পিতার বুকসেলফের বইগুলি পুত্র ডিকেন্স বারো বছর বয়সের মধ্যেই পড়ে শেষ করেছিলেন। তার সবগুলিই যে তিনি ঐ বয়সে বুঝতেন, তা নয়, তবে অধ্যয়নস্পৃহাটা তাঁর মধ্যে এইভাবেই বিকশিত হয়েছিল। অধ্যয়নস্পৃহা প্রতিভার একটি বিশেষ লক্ষণ। পরবর্তী জীবনে ডিকেন্স স্বয়ং এইকথা বলতেন। চাথামের স্কুলে যখন তিনি পড়তেন তখন সেখানে ছাত্র হিসাবে তিনি শিক্ষকদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এবং তারা সকলেই একবাক্যে কিশোর ডিকেন্সের পাঠানুরাগের প্রশংসা করতেন।

ডিকেন্সের বয়স যখন বারো বছর তখন তাঁকে স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে একটি কারখানায় চাকরি নিতে হলো। মাইনে প্রতিদিন এক শিলিং। তখনকার দিনে যানবাহনের তেমন সুবিধা ছিল না, তাই তাঁকে হেঁটেই বাড়ি থেকে কারখানা আর কারখানা থেকে বাড়ি যাওয়া-আসা করতে হতো। এই সময়টা ডিকেন্স পরিবারে খুবই দুর্যোগের মধ্য দিয়ে কেটেছিল ; তাঁর মাকে গৃহের বহু

প্রয়োজনীয় দ্রব্য একে একে বাঁধা রেখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হয়েছিল। ছোটবোন ফ্যানি তখন গানের স্কুলের ছাত্রী, চার্লস অতি কষ্টে তাঁর বোনের পড়ার খরচটা চালিয়ে যেতেন। কিছুকাল পরে দেনা শোধ হয়ে যাবার পর জন ডিকেন্স চার্লসকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে এনে আবার তাঁকে স্কুলে পাঠালেন। এবার চার্লস ভর্তি হলেন লণ্ডনের একটি স্কুলে। তখন তাঁর বয়স তেরো বছর। দুটো বছর নষ্ট হয়েছে, কিন্তু মেধাবী চার্লস অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর লেখাপড়ার ক্ষতিটা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং যদিও তিনি তাঁর সহপাঠিদের অনেক পিছনে পড়েছিলেন, তথাপি তাঁর বাল্যের সেই অধ্যয়নস্পৃহা এতটুকু হ্রাস পায়নি এবং স্কুল-পাঠ্য বই ছাড়া, হাতের কাছে যেসব বই পেতেন তা-ই তিনি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতেন। পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যে এই অধীত বিদ্যার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল।

১৮২৭। চার্লসের বয়স তখন পনের। সংসারের আর্থিক অবস্থায় আবার দেখা দিল অভাব-অনটন। লেখাপড়া বন্ধ রেখে চার্লস আবার চাকরি নিলেন। এবার কিন্তু কারখানায় নয়, এক সলিসিটারের অফিসে। অফিস বয় হয়ে ঢুকে, পরে তিনি কেরানির পদ লাভ করেছিলেন। অবসর সময়ে পিতার কাছে তিনি সর্টহ্যাণ্ডের পাঠ নিতেন এবং কয়েকমাস পরেই তিনি হলেন একজন কোর্ট রিপোর্টার। কাজ করতে ভালবাসতেন চার্লস। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে, একদিন তিনিও তাঁর পিতার সঙ্গে হাউস অব কমন্স-এর গ্যালারিতে গিয়ে বসবেন ও পার্লামেণ্টর একজন রিপোর্টার হিসাবে খ্যাতিলাভ করবেন। তখনকার দিনে ইংলণ্ডের সংবাদ-পত্রজগতে পার্লামেণ্টের রিপোর্টারের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। আদালতের রিপোর্টার হিসেবে যখন তিনি নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় চার্লস ডিকেন্স আদালতের প্রাঙ্গণে আনাগোনাকারী বহু ও বিচিত্র রকমের মানুষের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করতেন; পরে তাঁর উপন্যাসের একাধিক চরিত্ররূপে এরা আত্মপ্রকাশ করেছিল।

আদালতের চাকরি ছেড়ে এইবার তিনি হলেন পার্লামেণ্টের রিপোর্টার। এই কাজে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দক্ষতা প্রদর্শন করে অনেককেই বিস্মিত করলেন। তখন তাঁর ওপর 'মর্ণিং ক্রনিকল' পত্রিকার সম্পাদকের দৃষ্টি পড়ল। তিনি ডিকেন্সকে তাঁর কাগজের জন্য রিপোর্টার হিসাবে নিযুক্ত করলেন; মাইনে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ গিনি। পার্লামেণ্টের রিপোর্টার হিসাবে তিনি যে দু'বছর কাজ করেছিলেন, সেই সময় তাঁর কাজের প্রশংসা করে তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন—'a more talented reporter never sat in the Gallery.' তিনিই প্রথম রিপোর্টার যিনি পার্লামেণ্টের কঠিন সমালোচনা করতেন এবং তাঁর এই সমালোচনার ফলেই সেই সময় সংস্কার-বিমুখ পার্লামেণ্টের কার্য পরিচালনায় অনেকগুলি নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল।

পরবর্তী জীবনে তিনি 'ওল্ড মান্থলি' ম্যাগাজিনের লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন ও ঐ পত্রিকায় রাজনীতি-বহির্ভূত বিষয় নিয়ে তিনি ছদ্মনামে যেসব sketch

লেখেন তা পাঠকের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। এই ধারাবাহিক রচনার সময় ডিকেনস্ 'Boz' এই ছদ্মনামটি গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৩৪ সনে যখন তাঁর প্রথম বই Sketches by Boz প্রকাশিত হয়, তখন অতি অল্পদিনের মধ্যেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং লেখক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

১৮৩৬ সনে লেখক হিসাবে যখন তাঁর আবির্ভাব ঘটল, সেই বছরেই চার্লসের জীবনে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হয়ে এলেন ক্যাথেরিন হগার্থ। ক্যাথেরিন ছিলেন তাঁরই এক সতীর্থের কন্যা। এই বছরটি তাঁর সাহিত্যিক জীবনেও স্মরণীয় হয়ে আছে অন্য একটি কারণে। 'পিকউইক'- এরও সূচনা এই বছরে। লণ্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক চ্যাপমান য্যাণ্ড হল ভিক্টোরিয় যুগে প্রচলিত বিবিধ ধরনের খেলাধুলা সম্পর্কে একটি সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। এই গ্রন্থের জন্য ছবি আঁকার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ চিত্র শিল্পী রবার্ট সিমুরের উপর, আর রচনাংশের দায়িত্ব দেওয়া হয় ডিকেন্সকে। এই হলো তাঁর 'Posthumous Papers of the Pickwick club' গ্রন্থের জন্মকথা। ১৮৩৭ সনে যখন 'পিকউইক' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখনই ইংলণ্ডের সাহিত্য জগতে ডিকেন্স সসম্মানেই প্রবেশ লাভ করেন।

অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে, দারিদ্র্যের পঙ্কশয্যা থেকে এক অসাধারণ প্রতিষ্ঠার জগতে এইবার উত্তীর্ণ হলেন চার্লস ডিকেন্স। 'পিকউইক' প্রকাশিত হওয়ার অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তাকে অধিক ; পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ। তাঁর লেখনী থেকে বইয়ের পর বই বেরুতে থাকে এবং পরবর্তী ত্রিশ বৎসরকাল যাবৎ চলেছিল তাঁর অক্লান্ত সাহিত্যসাধনা। বিয়ের পর তিনি লণ্ডনে একটি ছোট্ট নীড় রচনা করে সপরিবারে সেখানে বাস করতে থাকেন। ১৮৩৮ সালে প্রকাশিত হয় ডিকেনসের 'অলিভার টুইস্ট"। ইংলণ্ডের উপেক্ষিত দরিদ্র সমাজের মর্মন্তুদ চিত্র এই উপন্যাসখানিরই পরিণত রূপ আমরা দেখতে পাই পনের বছর পরে প্রকাশিত 'ডেভিড কপারফিল্ড' নামক উপন্যাসে। ভিক্টোরিয় যুগের পাঠকদের চোখের সামনে তিনি তুলে ধরেছিলেন দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত করুণ পরিবেশ। ১৮৪২ সনে ডিকেনস্ সপরিবারে ভ্রমনে বহির্গত হন। ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজের স্নবারি (snobery) তাঁর কাছে যেন অসহ্য হয়ে উঠল— তিনি তাই সম্রাট-হীন নূতন পৃথিবী দর্শনের জন্য আমেরিকা যাত্রা করলেন। তখন তাঁর ছয়খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং এই ছয়খানি গ্রন্থের খ্যাতি তখন আতলান্তিক মহাসমুদ্র অতিক্রম করে নূতন পৃথিবীর পাঠকসমাজে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

বোষ্টনে তিনি যখন উপনীত হলেন তখন ইংলণ্ডের এই তরুণ ঔপন্যাসিক যেন রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে সম্বর্ধিত হলেন। যে ছয় মাসকাল ডিকেন্স ঐ দেশ ভ্রমণ করেছিলেন, তিনি সর্বত্রই জনসাধারণের কাছ থেকে সমান অভ্যর্থনা লাভ

করেছিলেন। তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্বেই ডিকেন্স রচনা করছিলেন 'এ টেল অব টু সিটিজ', 'গ্রেট এক্সপেটেশনস্'।

আমেরিকা ভিন্ন ডিকেন্স য়ুরোপের বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন—জেনোয়া, লুসান, প্যারিস, বুলোন প্রভৃতি স্থানে তিনি দীর্ঘকাল গ্রীষ্মাবকাশের দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর প্রকৃতিতে ছিল একরকমের অস্থিরতা যা তাঁকে সর্বদাই কর্মব্যস্ত রাখত। তবে যখন থেকে তিনি প্রকাশ্যে তাঁর স্বরচিত গ্রন্থের পাঠ শুরু করেন, অর্থের দিক দিয়ে এটা সাফল্যমণ্ডিত হলেও, এরই ফলে তখন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ১৮৬৯ সনেই তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে এবং দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৮৭০ সনের ৯ই জুন মস্তিষ্কজনিত অসুখে চার্লস ডিকেন্সের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আটান্ন বছর। তাঁর দেহ ওয়েস্টমিনিস্টার য়্যাবেতে সমাহিত করা হয়।

ভিক্টোরিয় যুগের ইংলণ্ডে ডিকেন্সের জীবন ছিল যেন একটি প্রদীপ্ত হোমশিখা। সমাজের যেখানে যত কদর্যতা, কুশ্রীতা, কার্পণ্য, নীচত্ব, সংকীর্ণত্ব, আভিজাত্যের অন্তরালে জীবনের যত গ্লানি ও দৈন্য —সবকিছুর উপর তিনি নির্মম কষাঘাত হেনেছেন। সাহিত্যিক সফলতার অধিক তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর লেখনী ধারণ সার্থক হয়েছিল, কারণ পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে একের পর এক যেসব সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল তার মূলে ছিল ডিকেন্সের চিন্তার সক্রিয় প্রভাব। তাই তো জর্জ বার্নার্ড শ বলেছে—'Of all English writersof the victorian age, it is only Charls Dickens who did much to cure the evils of his time.' তাই বলছিলাম, ডিকেন্সের পক্ষে লেখনীধারণ সার্থক হয়েছিল। 'ডেভিড কপারফিল্ড' ডিকেন্সের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম বলে অনেক সমালোচক অভিমত প্রকাশ করেছেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণতা এখানে লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজেও বলেছেন—'Of all my books, I like this the best,' এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার স্যার জন ফরস্টার বলেছেন যে, ডেভিড কপারফিল্ড আসলে ডিকেন্সেরই আত্মকথা। অন্ততঃ এর প্রথমাংশ তো বটেই। ছত্রিশ বছর বয়সে যখন তিনি এই উপন্যাসখানি রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাঁর দেরাজের মধ্যে এর প্রথম দশটি, এবং বিশেষ করে একাদশ অধ্যায়ের উপাদান সংরক্ষিত ছিল একটি অসমাপ্ত আত্মচরিতের খসড়া হিসাবে। এত সচ্ছন্দে তিনি তাঁর অন্য কোন উপন্যাস লেখেননি। রাসকিন, ম্যাথুআর্নল্ড, টেনিসন ও থ্যাকারে প্রভৃতির মতে এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি।

সোরেন কার্কিগার্ড
(১৮১৩—১৮৫৫)

উনিশ শতকের ডেনমার্কের ধর্মপ্রবক্তা অ্যাবে সোরেন কার্কিগার্ড তাঁর জীবিতকালে খ্রীস্টানধর্মের একজন কঠিন সমালোচক হিসাবে বহুনিন্দিত ব্যক্তি ছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেই কারণে তিনপুরুষ ধরে তিনি বিস্মৃতির অন্তরালে ছিলেন। তারপর তাঁর দেশের মানুষ এবং সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করল একজন বিশিষ্ট ক্রিশ্চিয়ান মিস্টিক হিসাবে যিনি একটি নতুন মতবাদের সূচনা করেন এবং বহু-বিতর্কিত অস্তিত্ববাদ দর্শন (Existentialism) প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীতে চিন্তার জগতে যুগান্তর নিয়ে এসেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর জন্মের একশো চব্বিশ বছর পরে, ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তাঁর রচনার কোন ইংরেজি অনুবাদই প্রকাশিত হয়নি এবং এই মানুষটি সম্পর্কে জনসাধারণ কিছুই অবগত ছিল না।

১৮১৩, ৫ই মে কোপেনহেগেনে সোরেন কার্কিগার্ড জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার সপ্তম ও শেষ সন্তান। তাঁর পিতা মাইকেল পেডারসন কার্কিগার্ড একজন সঙ্গতিসম্পন্ন, ধর্মপরায়ণ ব্যবসায়ী। জন্মকালে তাঁর বাবার বয়স ছিল ছাপ্পান্ন বছর। গৃহের পরিবেশ ছিল অদ্ভুত রকমের—সেখানে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল উগ্র রকমের। বাইবেল বর্ণিত নরকের কথা উল্লেখ করে মাইকেল তাঁর শিশু সোরেনকে বলতেন—বাইবেলের কথা না মানলেই সাক্ষাৎ নরকবাস। তাঁর শৈশবের শিক্ষাদীক্ষা সবই অত্যন্ত কঠিনভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। সোরেন ১৮৪০ সালে স্নাতক হলেন। অল্পদিনের জন্যই তিনি একবার দেশের বাইরে গিয়েছিলেন, নতুবা তাঁর বিয়াল্লিশ বছরের ঘটনা-বিরল জীবনের সবটাই তাঁর জন্মভূমিতে অতিবাহিত হয়েছিল।

তাঁর বয়স যখন চব্বিশ বছর রেজিনে ওলসেন নাম্নী সরলতার প্রতিমা এক চতুর্দশীর বাগদত্ত হন, এবং তাঁদের বিয়ের একটি দিনও ধার্য হয়েছিল। অবশেষে কার্কিগার্ডের মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিল ; সন্দেহ ও আতঙ্কে তাঁর মন ভরে ওঠে এবং আকস্মিক নৃশংসতার সঙ্গে তিনি বিয়ে ভেঙে দিলেন। বিমূঢ়া রেজিনে খ্রীস্টের নামে অনুনয়-বিনয় করলেন এবং তাঁর শ্বশুরের নামে তাঁকে পরিত্যাগ না করার জন্য কাতর অনুরোধ করলেন। কিন্তু তা নিষ্ফল হলো, এবং ভাবী বধূকে পরিত্যাগ করার সংকল্প আরো দৃঢ় হয়। অবশেষে তাঁর বাগদত্তা বধূকে পরিত্যাগ করে, কার্কিগার্ড বার্লিনে চলে গেলেন।

তাঁর অভিপ্রায় সম্পর্কে কার্কিগার্ড যতই যুক্তির দোহাই দিন না কেন, এ কথা খুবই স্পষ্ট যে তাঁর এই যুক্তি ছিল সত্য-মিথ্যায় মিশ্রিত। বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব পালনের চিন্তা তাঁর কাছে অপ্রীতিকর মনে হতো, কারণ বিবাহ মানে সুখ,

এবং যে মন দুঃখকষ্টে উল্লাস বোধ করতে অভ্যস্ত, তার কাছে পার্থিব সুখ তো পাপ বলেই গণ্য হবে। বাইরে প্রগাঢ় ধর্মানুরাগ আর গোপনে নানাবিধ দুষ্কর্মে লিপ্ত হওয়া—পিতার জীবনের এই বিপরীত আচরণ পুত্রকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল এবং এর ফলে তাঁর নিজের আত্মিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য কার্কিগার্ড সর্বদা অতিমাত্রায় সচেষ্ট থাকতেন।

কোপেনহেগেনে ফিরে এসে তিনি নিজেকে একান্ত ভাবেই নিয়োজিত করলেন ধর্ম ও দর্শনের চর্চায় এবং একাধিক ছদ্মনামে কয়েকটি বই ধারাবাহিক ভাবে রচনা করেন, যথা—'The Concept of Irony', 'Either…Or', 'Fear and Trembling', 'Stages on Life's Road' প্রভৃতি। 'আইদার অর' বইটি প্রকাশিত হওয়ার কালে কার্কিগার্ডের বয়স ছিল ত্রিশ বছর। তাঁর জীবনের কর্মসূচীর কথা বিশেষ করে তাঁর জীবনদর্শন উল্লিখিত হয়েছে এই বইটিতে। দুই শ্রেণীর মানুষের কথা আলোচিত হয়েছে। প্রথম, যারা আনন্দ উপভোগ বিশ্বাস করে ও যাদের কাছে এইপৃথিবী শুধু ভোগের জিনিস বলে প্রতিভাত হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়, যারা নীতিশাস্ত্র ও নৈতিক বিধান বিশ্বাস করে। যেহেতু মানুষ অসীম আকর্ষণ দ্বারা উত্তেজিত হয়ে থাকে সেইজন্য তার সিদ্ধান্তের ছক বাঁধা থাকে দুটির মধ্যে—হয় সে সবকিছু গ্রহণ করবে, নতুবা কিছুই করবে না। এই All আর Nothing-এর গণ্ডীর মধ্যে মানুষের সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এই মতবাদ, এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নরওয়ের নাট্যকার ইবসেন তাঁর 'ব্র্যাণ্ড' নাটকে রূপায়িত করেছেন।

ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হয়ে কার্কিগার্ড উপলব্ধি করলেন যে, ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতাগণের সংঘর্ষমূলক ও নিরুত্তাপ ব্যাখ্যা পাশ্চাত্যজগতে মানুষের ওপর শুধু যে প্রভাব বিস্তার করেছে তা নয়, তাদের চঞ্চলও করে তুলছে। তাই তিনি ধর্মশাস্ত্রকে নতুন রূপ দিতে চাইলেন। শ্লেষ, উদ্ভাবনীশক্তি ও অকপটতার সঙ্গে মিশ্রিত এক অপূর্ব মৌলিক ভাবধারা সহকারে রচিত তাঁর এই সময়কার লেখাগুলি কেবল মাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগত মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়নি, সমকালীন সকল প্রকার চিন্তার পদ্ধতির প্রতিও উদ্দিষ্ট ছিল। তাঁর লেখার মধ্যে থাকত সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সঙ্গে শান্ত ও নির্মল আশ্বাসের বাণী। কার্কিগার্ড বললেন, যান্ত্রিক উন্নতির গোলকধাঁধার মধ্যে আজকের মানুষ শুধু অসহায় নয়, তার কোন আশা-ভরসা নেই। তার একমাত্র আশা তার নিজের অস্তিত্বের উপলব্ধির মধ্যে—যে অস্তিত্ব হলো প্রত্যক্ষ বাস্তব। কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে এই উপলব্ধি আদৌ সম্ভব নয়, সম্ভব শুধু বিশ্বাসের দ্বারা; যুক্তি নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে নৈকট্যের সম্পর্ক স্থাপিত হলেই এটা সম্ভব। কোনরকম ধর্মীয় গোঁড়ামি দ্বারা এই নৈকট্য সম্ভব নয়; মানুষ ও ভগবানের মধ্যে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হলেই এই নৈকট্য সহজ ও সুনিশ্চিত হয়। বুদ্ধিকে শুধু বিনত করলেই হবে না। তাকে ক্রুশের দ্বারা বিদ্ধ করতে হবে, তবেই না তার পুনর্জীবন সম্ভব এবং তখনই ঈশ্বরের

অভিমুখে তার পদক্ষেপ সম্ভব হবে। এই যে বর্তমান মানুষ, এশুধু নিছক অস্তিত্ব বা Being নয়, এ অতিরিক্ত আর কিছু—এ Becoming. খ্রীষ্টান ধর্মও ঠিক তাই—উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা আর দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়েই তো এর অবিরাম অগ্রগতির, যে মুহূর্তে মানসিক শান্তির মধ্যে এ নিমগ্ন হয় সেই মুহূর্তে খ্রীস্টান ধর্ম আর খ্রীস্টান ধর্ম থাকে না।

নিঃসন্দেহে এ এক মৌলিক চিন্তা। এক সম্পূর্ণ নতুন জীবনদর্শন এবং এই দর্শনের উদ্গাতা বা প্রবক্তা হিসাবেই সোরেন কার্কিগার্ড বর্তমান যুগের পৃথিবীর প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গীর্জাই মানুষের স্বর্গ—প্রচলিত এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি আঘাত করেছিলেন কেন? কার্কিগার্ড দেখেছিলেন যে, যেসব মানুষ ভীরু, যারা আত্মসুখপরায়ণ তারাই গীর্জাকে স্বর্গ মনে করে থাকে এবং এজন্য তিনি গীর্জার ধর্মযাজকদেরই দায়ী করেছিলেন। এঁরা কোনদিন প্রকৃত ঈশ্বরের অন্বেষী নন; এঁরা দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে মুক্তি পেতে চান না—এঁদের লক্ষ্য সমাজে প্রভাব খাটানোর দিকে। এই জাতীয় যাজকদের তিনি মিথ্যাচারী বলে অভিহিত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর উক্তি খুবই স্পষ্ট—ক্রাইস্টের উপদেশাবলী এমন ভাবে তরল ও নিকৃষ্ট করা হয়েছে যার জন্য একথা আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, খ্রীস্টের দোহাই দিয়ে গীর্জা কার্যত খ্রীস্টান ধর্মের অবলুপ্তি সাধন করেছে।

যাজকশ্রেণীর প্রতি কার্কিগার্ডের এইরকম প্রতিকূল আচরণের সুতীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি আছে তার 'Attack upon Christendom' শীর্ষক গ্রন্থটিতে। এখানে তিনি একটি মৌল প্রশ্ন তুলেছেন এবং সেটি আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নামে খ্রীস্টান হলেও কেউ খ্রীস্টান হয় না; ধর্মের বহিরঙ্গ আচরণ বা ভড়ং করলেই তুমি লোকের কাছে একজন ধার্মিক বলে স্বীকৃত বা সম্পূজিত হবে, এর চেয়ে বড় মিথ্যাভাষণ আর কিছু হতে পারে না। গোঁড়ামি এবং আর ভণ্ডামির আবিলতা থেকে মুক্ত করে, তিনি খ্রীস্টানধর্মকে খ্রীস্টের জীবনালোকে পরিশুদ্ধ ও উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। এইখানেই তাঁর মৌলিকতা।

যে সমাজে তিনি বাস করতেন' কার্কিগার্ড ছিলেন তার একজন কঠিন সমালোচক এবং এর জন্য তিনি নিগৃহীত ও তিরস্কৃত হয়েছিলেন তাঁর সমসাময়িকদের হাতে। বিদগ্ধজন তাঁর পাণ্ডিত্যের ঠাট্টা করতেন; ধর্মপ্রচারকগণ তাঁর উদ্দেশ্যে অবিরাম গালিবর্ষণ করতেন তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে। 'The self assured beliver is a greater sinner in the eyes of God…than the troubled disbeliever'—কার্কিগার্ডের এই ঘোষণায় তীব্র নিন্দা হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলি তাঁকে নির্দয়ভাবে আক্রমণ করেছিল; এমন কি কার্টুনিষ্টরা পর্যন্ত তাঁকে রেহাই দেয়নি। কিন্তু বিদ্রূপকারীদের আক্রমণ যত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে, কার্কিগার্ডের প্রতি আক্রমণ ততই জোরালো হয়। গীর্জাকে যারা একটি সংঘবদ্ধ একচেটিয়া সম্পত্তি করে রেখেছে তাদের সম্পর্কে তাঁর পরবর্তী বইতে কার্কিগার্ডের

নিন্দা আরো উত্তাল হয়ে উঠেছিল। যা ব্যক্তি মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় সেই ধর্মের একচেটিয়া মালিকশ্রেণীর প্রতি অর্থাৎ যাজকদের প্রতি তাঁর লেখনী যেন আরো শাণিত হয়ে উঠেছিল। নিছক বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনকারীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নিন্দা করে, তিনি সরলতা ও নম্রতার সপক্ষে তাঁর সরব সমর্থন জানিয়েছিলেন।

'Man is the eternal paradox, he is his own reason for being and yet he is nothing without the transcendent power of God. উনিশ শতকের য়ুরোপে যে ধর্মীয় গোঁড়ামি যাজকদের প্রাণহীন, অর্থহীন যেসব বিধান, খ্রীস্টান ধর্মের সত্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, খ্রীস্টের বিকৃতভাবে ধর্মপ্রাণ নর-নারীদের কাছে উপস্থিতি করেছিল, তারই বিরুদ্ধে জীবনমহিমাকে একক যে সংগ্রাম করেছিলেন কার্কিগার্ড, সেই সংগ্রামের মূল বক্তব্য ছিল এই।

তেতাল্লিশ বছর বয়সে কার্কিগার্ড একদিন রাস্তায় মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়; চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করে দেখলেন তাঁর নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে। এর এক মাস পরেই ১৮৫৫ সালের ১১ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায় যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় সমালোচকদের প্রতি তাঁর রাগ আছে কিনা, অথবা তাঁর মতবাদ গ্রহণ না করার জন্য এই পৃথিবীর মানুষদের প্রতি তিনি বিরূপ কিনা, তখন এর উত্তরে কার্কিগার্ড বলেছিলেন; 'No not bitter—but afflicted'grieved and indignant in the highest degree, এই রকম মনোভাব নিয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার প্রধান কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, তাঁর জীবিতকালে কার্কিগার্ড ছিলেন একেবারেই অনাদৃত। আজ অবশ্য তিনি সেই বিরল ধর্মপ্রবক্তাদের মধ্যে একজন বলে স্বীকৃত হয়েছেন যাঁর সম্পর্কে হবেন তাঁর 'Four Prophets of Our Destiny' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন—'Soren Kierkegard stands out as one whose incisive truths and courageous personal fight have opened our eyes to the shallowness of much of our pseudo Christian life and to the outright deception in politics which Christianity has been made to serve, আত্ম প্রবঞ্চনার হাত থেকে মানুষের মুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করে, তাকে তার নিজস্ব অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে শিখিয়ে কার্কিগার্ড আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করে গিয়েছেন। ধর্মপ্রবক্তা এবং চিন্তানায়কদের মধ্যে তিনি তাই অবিস্মরণীয়।

ওটো এডওয়ার্ড ভন বিসমার্ক

(১৮১৫—১৮৯৮)

১৮১৫, ১ এপ্রিল। শোন হাউসেনের পারিবারিক জমিদারিতে ওটো ভন বিসমার্ক জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁকে জার্মানির লৌহমানব বলা হয়ে থাকে। জার্মান সাম্রাজ্যের তিনি ছিলেন অন্যতম নির্মাতা। পমেরানিয়াতে তাঁর শৈশব জীবনের কিছুকাল অতিবাহিত হয়; তারপর তাঁকে বার্লিনের একটি বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যায়ামাগারেও তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু স্কুলে তিনি খুব অসুখী বোধ করেন—চার দেয়ালের বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে লেখাপড়া করতে তাঁর প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠত এবং শোন হাউসেনের মুক্ত জীবনে ফিরে যাবার জন্য তীব্র আগ্রহ বোধ করতেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তাঁকে যথাসময়ে স্কুলের পাঠ শেষ করে, বার্লিন থেকে গাটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আইন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে হয়, কারণ তাঁর পিতা মাতার ইচ্ছা ছিল যে, বিসমার্ক উচ্চপদের সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডক্টরেট হন এবং সঙ্গে সঙ্গে সিভিল সার্ভিসে গৃহীত হন। আইন বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে শুরু হয়েছিল তাঁর কর্মজীবন। তিনি যখন পটসডামে কর্মনিরত ছিলেন তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। অতঃপর পিতার নির্দেশক্রমে বিসমার্ক সিভিল সার্ভিসের চাকরি পরিত্যাগ করে পিতার জমিদারি দেখাশুনা করার কাজে নিযুক্ত হলেন। তিনি ও তাঁর অপর দুই ভাইয়ের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের জমিদারির উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। জমিদারির আয় বৃদ্ধি পেলো, পরিসরও বৃদ্ধি পেলো। হাতে আর কাজ নেই, বিসমার্ক চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত ছিল তা যেন প্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে। বিসমার্ক সিদ্ধান্ত করলেন তিনি ভ্রমণে বহির্গত হবেন, এবং প্রথমে তিনি লণ্ডন গেলেন।

১৮৪৭। পিতার মৃত্যুর পর যোহানননা নাম্নী এক তরুণীকে বিসমার্ক বিয়ে করলেন এবং শোন হাউসেনেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। যাকে বলে 'country gentleman', ঠিক সেইভাবে বাকী জীবনটা তিনি অতিবাহিত করবেন, এই ছিল তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। কিন্তু অদৃষ্ট বাদ সাধল। ১৮৪৮ সালে প্যারিসে যে বিপ্লব শুরু হয়েছিল তা শীঘ্রই জার্মানি পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং কয়েকদিন বাদেই সংবাদ এলো যে, ভিয়েনাতে বিপ্লব শুরু হয়েছে। এই জার্মান বিপ্লবের দুটো দিক ছিল—একদিকে এটা ছিল উদার নৈতিক, অন্যদিকে জাতীয়ভাবে উদ্দীপ্ত। জাতীয় ভাবটা ছিল যেমন প্রবল তেমনি জাতির অন্তরে

এই ভাব ছিল গভীরভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণ আশা করেছিল যে, বিপ্লবের এই সুযোগে এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যার প্রতি সমগ্র জার্মানি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। রাজা একটি শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ভিয়েনার পথে পথে রাজকীয় সৈন্যদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের তুমুল সংগ্রাম চলতে থাকে। রাজা জনসাধারণের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, এবং সৈন্যদের প্রত্যাহার করতে হুকুম দিলেন। এই সংবাদে জার্মানির জনসাধারণ আনন্দে উৎসাহে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের বিপ্লব সার্থক হয়েছে।

মাসের পর মাস কাটতে লাগল, বার্লিনে বিপ্লব বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং সেইসঙ্গে শাসন পরিষদদের প্রচণ্ডতা ও সরকারের অসহায়তা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। তখন বিসমার্ক ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব দৃঢ় সংকল্প করলেন যে, সংঘবদ্ধভাবে তাঁদের বক্তব্য প্রচার করতে হবে যাতে রাজার কর্ণগোচর হয়। ১৮৪৮, জুলাই মাস। প্রকাশিত হলো New Pruisian Gazette' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। এই পত্রিকার লক্ষ্য ছিল ক্রিশ্চিয়ান রাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করা। বিসমার্ক ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি প্রায়ই এই পত্রিকায় লিখতেন। তখনকার সেই প্রচণ্ড সংকটের সময় এইভাবে এগিয়ে আসা ও বিপ্লব বন্ধ করতে প্রয়াস পাওয়া নিঃসন্দেহে খুব সাহসের পরিচায়ক ছিল। সেই বিপদসংকুল দিনেই তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন সংরক্ষণশীল দল নামে একটি রাজনৈতিক দল। দলের প্রভাব ছিল সামান্যই, কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বিসমার্ক নেপথ্য থেকে কাজ করে যেতে লাগলেন ও সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করতে লাগলেন এবং তাদের তিনি উৎসাহিত করতে লাগলেন যেমন তিনি করেছিলেন রাজাকে।

রাজা তখন নিজের ক্ষমতার প্রাধান্যে একটি নতুন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করলেন এবং সেটি আলোচনা ও অনুমোদন করার জন্য একটি নতুন বিধান সভার অধিবেশন ডাকলেন। এই নতুন পরিষদে বিসমার্ক নির্বাচনপ্রার্থী হলেন। একজন বিপ্লববিরোধী হিসাবেই তিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু-বিরোধীদের কাছেও তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। ১৮৫৫ সালে তাঁর স্কুলজীবনের সহপাঠী মোটলে এলেন বিসমার্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বিসমার্কদের সংসারের কথা উল্লেখ করে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে একটি চিঠিতে লিখিছিলেন যে, এমন অতিথিপরায়ণ পরিবার তিনি খুব কমই দেখেছেন ; এখানে অবাধ স্বাধীনতা এবং যার যা খুশি করতে পারে। বিসমার্কের জীবনের এই সময়কার ঘটনা মোটলে এইভাবে উল্লেখ করেছেন। 'একদিন বিসমার্ক বললেন যে, ফ্রাঙ্কফোর্টে রাষ্ট্রদূতের পদ গ্রহণের জন্য মন্ত্রী ম্যান্টেফেল তাঁকে যখন অনুরোধ করেন, তখন মুহূর্তের চিন্তার পর তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ। সেই দিনই রাজা তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি ফ্রাঙ্কফোর্টে যেতে সম্মত আছেন কিনা ; এর উত্তরেও তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁ। বিসমার্ক কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না, রাষ্ট্রদূত পদের শর্তাবলী পর্যন্ত জানতে চাইলেন না

দেখে রাজা খুবই বিস্মিত হয়েছিল। রাজাকে তিনি শুধু বলেছিলেন—রাজার যে কোন প্রস্তাব গ্রহণে তিনি সর্বদাই সম্মত।

মোটলে উল্লিখিত এই ঘটনাটির মধ্যে অতি সুন্দর ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে বিসমার্কের রাজানুগত্য। তাঁর বয়স তখন চত্রিশ বছর বিসমার্ক রাষ্ট্রদূতের পদ গ্রহণ করে ফ্রাঙ্কফোর্টে যান, এবং এইখানেই তিনি কূটনীতি সম্পর্কে সত্যিকারের প্রথম পাঠ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ফ্রাঙ্কফোর্টে যাওয়ার সময় পর্যন্ত তাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার স্বার্থ একসূত্রে গ্রথিত। কিন্তু ফ্রাঙ্কফোর্টে এসে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, প্রাশিয়াকে তার সমকক্ষ হিসবে মনে করতে অস্ট্রিয়া যদিও সম্মত ছিল তথাপি প্রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান শক্তিকে সংকুচিত করার জন্য অস্ট্রিয়া সচেষ্ট ছিল। এর ফলে বিসমার্কের মতের পরিবর্তন হলো এবং ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময়ে (১৮৫৪-১৮৫৫) জার্মান সৈন্যের সহায়তায় পূর্বাঞ্চলে অস্ট্রিয়ার স্বার্থ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী বাধা দিয়েছিলেন। ১৮৫৮ সালে প্রাশিয়ার রাজার স্বাস্থের অবনতি ঘটল এবং এর ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি অপারগ হলেন।

তিন বছর বাদে রাজা তাঁর সহোদর ভ্রাতাকে সাময়িক ভাবে প্রিন্স রিজেন্ট হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই একটির পর একটি বিশেষ পরিবর্তন ঘটে যেতে লাগল। ১৮৬১ সালের বসন্তকালে বিসমার্ক প্রাশিয়ার মন্ত্রী হিসাবে সেন্ট পিটার্সবার্গে প্রেরিত হলেন।

রাশিয়ার রাজদরবারে বিসমার্ক সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন এবং সম্রাট ও সম্রাট-পরিবারের সকলের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। এখানে তিনি রুশ ভাষাও শিক্ষা করেছিলেন। সেন্ট পিটার্সবার্গে তাঁর জীবন ভালভাবেই অতি-বাহিত হচ্ছিল। ১৮৬০ সালে তাঁর নিজের দেশে একটা সংকট ঘনিয়ে এলো। রাজা উইলিয়াম সৈন্যবাহিনার পুনর্বিন্যাস ও প্রসার করতে মনস্থ করলেন। তাঁর প্রস্তাবিত কয়েকটি বিষয়ের তীব্র বিরোধিতা করা হয় পার্লামেন্টে। পরিষদ-সদস্যদের বিরুদ্ধ প্রস্তাব রাজা প্রত্যাখান করেন। তখন পাছে নিজের কৃতকর্মের দ্বারা তিনি দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যান, সেই জন্য উদ্বিগ্ন ভাবে রাজা তাঁর পুত্রের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন। এই সময়ে রাজার এক মন্ত্রী, কাউন্ট ভন রুন, তাঁকে বোঝালেন যে, এই সংকটকালে তিনি বিসমার্কের ওপর নির্ভর করতে পারেন। কিন্তু বিসমার্ককে বার্লিনে এনে তাঁর হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি দোদুল্যমানচিত্ত ছিলেন এবং তাঁকে তিনি প্যারিসে বদলি করে দিলেন।

বিসমার্ক স্বাস্থ্যের অজুহাতে ছুটি নিয়ে সেন্ট সিবাসটিয়ান চলে গেলেন। এখানে কিছুকাল অবস্থানের পর তাঁর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। অবশেষে কাউন্ট ভন রুনের প্রস্তাব কার্যকরী হলো। রাজা বিসমার্ককে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে মন্ত্রীসভার প্রধান (Minister President) পদে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু বিসমার্কের কাজ বড় সহজ ছিল না। রাজাকে সমর্থন করার শপথ তিনি

নিয়েছিলেন। জনসাধারণের সমালোচনার হাত থেকে রাজাকে রক্ষা করতে হবে; প্রয়োজন হলে শক্রদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে হবে। রাজার ওপর তাঁর প্রভাব যাতে ক্ষুণ্ন হয় সেই বিষয়ে শত্রুদের চেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের অবধি ছিল না। নতুন পদে নিযুক্ত হয়ে প্রথম কয়েক মাস বিসমার্ক আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এই দুটি বিষয় নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন।

১৮৮৮, ৯ মার্চ বিসমার্কের জীবনে একটি দুঃখের বৎসর। তাঁর প্রিয়তম রাজা প্রথম উইলিয়াম মারা গেলেন। একানব্বই বছরে তাঁর পদার্পণ করার আর মাত্র কয়েক দিন বাকী ছিল। রাজার মৃত্যুতে যেন তাঁর ক্ষমতার স্তম্ভ ভেঙে গেল। উইলিয়ামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তিন মাস কাল রাজত্ব করেছিলেন; অতঃপর তিনিও গতাসু হন। দ্বিতীয় উইলিয়ামের সঙ্গে বিসমার্কের বিশেষ বনিবনা হয় না। সিংহাসনে আরোহণ করেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় তিনি বিসমার্কের সঙ্গে পরামর্শ না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জেনারেল ভন মোল্ট ও সাবেক যুগের অন্যান্য মন্ত্রিগণ অবসর নিলেন। রয়ে গেলেন শুধু বিসমার্ক। তিনি তখন চ্যান্সেলার। সংকট উপস্থিত হলো যখন সম্রাট তাঁর চ্যান্সেলারের ক্ষমতা কেড়ে নিতে উদ্যত হলেন।

বিসমার্ক পরিত্যক্ত হলেন। তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। সম্রাট জনসাধারণকে বোঝালেন যে, বিসমার্ক স্বেচ্ছায় ও বন্ধুভাবে পদত্যাগ করেছেন। তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর বছর; এর চল্লিশ বছর জনসাধারণের সেবায় তিনি ব্যয় করেছেন। তাঁর বুদ্ধি তখনো তীক্ষ্ণ আর কাজ করবার শক্তি অফুরন্ত ছিল। তাঁর রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গেছে। এখন তিনি নিঃসঙ্গ। তাঁর নিজস্ব গ্রাম্য বাসভবনে তিনি চলে এলেন, কিন্তু তাঁর মন-প্রাণ হৃদয় সব কিছু রাজনৈতিক কার্য-কলাপের কেন্দ্র বার্লিনে পড়েছিল। দ্বিতীয় উইলিয়াম ও বিসমার্কের মধ্যে বিবাদ দু'বছর বজায় ছিল। তারপর বিসমার্কের আশীতম জন্মদিনের উৎসবে সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। দুজনের মধ্যে পুনর্মিলন হলো। এই সংবাদে উল্লসিত হয় জার্মানীর জনসাধারণ। বিসমার্কের আয়ুসূর্য তখন অস্তাচলগামী, কিন্তু তাঁর মন, তাঁর প্রাণশক্তি তখনো অটুট ছিল। অবশেষে ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসের শেষ দিনে লোকান্তরিত হলেন জার্মান সাম্রাজ্যের স্রষ্টা, পিছনে রইলো তাঁর জীবনের কীর্তিকলাপ যা জার্মান জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

কার্ল মার্কস

(১৮১৮—১৮৮৩)

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রাইনল্যাণ্ডের অধিবাসী ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে হার্সকেল ও হেনরিয়েটা মার্কস নামে এক দম্পতি ট্রিয়ারে বাস করতেন। হার্সকেল ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। তাঁরা ছিলেন সম্পত্তিসম্পন্ন ও সম্মানিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক; রাইনল্যাণ্ডের খাঁটি জার্মান নাগরিকগণ তাঁদের সঙ্গে সমান ব্যবহারই করতেন, ইহুদী বলে কিছুমাত্র বৈষম্যের ভাব প্রকাশ করতেন না। ৫ই মে, ১৮১৮, হেনরিয়েটা তাঁর দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র প্রসব করলেন। নবজাত শিশুর নাম তিনি রেখেছিলেন কার্ল।

বারো বছর বয়সে কার্ল মার্কস ট্রিয়ারের উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন এবং পাঁচ বৎসর কাল তিনি সেখানে অধ্যয়ন করেন। স্কুলে তিনি একজন মেধাবী ছাত্র বলেই গণ্য হয়েছিলেন; প্রাচীন ভাষা, জার্মান সাহিত্য ও ইতিহাসে তিনি পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছিলেন। গণিতেও। স্কুল জীবনেই তাঁর মনের মধ্যে এক বিচিত্র সাধ জেগেছিল—মানুষের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করবেন। To sacrifice myself for humanity.—এ মার্কসেরই নিজের কথা।

স্কুলের পাঠ সাঙ্গ হলে ১৮৩৫ সনের অক্টোবর মাসে মার্কস বন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন আইনের ছাত্র হিসেবে। এই বিষয়টির প্রতি তাঁর কোনো অনুরাগই ছিল না, শুধু পিতার সন্তুষ্টি সাধনের জন্ত তিনি আইন পাঠ করতে থাকেন। এক বছর পরে এলেন তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এইখানে আইন পাঠের সঙ্গে তিনি কবিতা পাঠে ও কবিতা রচনায় বিশেষ আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন।

১৮৪১ সনে মার্কস বার্লিন থেকে এলেন জেনাতে এবং এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট' লাভ করলেন। এর এক বছর পরেই (জুন, ১৮৪৩) মার্কস, ডক্টর কার্লমার্কস, জেনি ভন ওয়েস্টফ্যালেন নামক এক সুন্দরীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। একজন ইহুদি সন্তানের সঙ্গে এক অভিজাত বংশের খাঁটি জার্মান তরুণীর এই বিবাহ সেদিনকার জার্মানীতে একটি বিশেষ ঘটনা বলে উল্লিখিত হয়েছিল। পরবর্তী আটত্রিশ বছর কাল—জেনির মৃত্যু পর্যন্ত—তাঁরা একত্রে দারিদ্র্যের অন্ন ভাগ করে খেয়েছেন। অপরিসীম দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি গভীর ভাবেই অনুরক্ত ছিলেন।

তাঁর কর্মজীবনের প্রথম থেকেই প্রতিকূল ভাগ্য তাঁকে বিড়ম্বিত করে তুলতে থাকে। আইনের অধ্যাপনার একটা চাকরি পাওয়ার জন্ত তিনি কতো চেষ্টা করলেন, কিন্তু সর্বত্রই তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হলো। অধ্যাপক হতে না পেরে মার্কস তখন হলেন একজন পুরোদস্তুর agitator বা আন্দোলনকারী। এক

পরিচ্ছন্ন ও সংস্কারমুক্ত মন এবং শক্তিশালী লেখনীর অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই সম্বল করে মার্কস নিজেকে মনে-প্রাণে নিয়োজিত করলেন সমকালীন বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে। স্বীয় প্রতিভাবলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারার নেতৃত্ব পদ লাভ করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। এই সময়ে দার্শনিক হেগেলের তরুণ শিষ্যগোষ্ঠীর কয়েকজন মিলে 'Rheinsche Zeiting' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের অনুরোধে মার্কস ঐ পত্রিকায় সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন থেকে (১৮৪২, মে) তিনি কলোনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এই পত্রিকায় তিনি একাধিক প্রবন্ধে সমকালীন প্রাশিয়ান সরকারের শাসন ব্যবস্থার যে রকম নির্ভীক ও তীব্র সমালোচনা করতেন তা জার্মান সাংবাদিকতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে চিরাচরিত নরমসুরের পরিবর্তে একটা নূতন দৃপ্ত সুর শোনা গেল এবং সেই হিসাবে জার্মানির উল্লেখযোগ্য প্রধান সাংবাদিকের মর্যাদা তিনিই লাভ করেছিলেন। নীরস সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মার্কস এই ক্ষেত্রে যে যুগান্তর এনেছিলেন তা পৃথিবীর সাংবাদিকতার ইতিহাসে অদ্যাপি স্মরণীয় হয়ে আছে। মার্কসের কঠিন সমালোচনার আঘাতে বিব্রত হয়ে প্রাশিয়ান সরকার অবশেষে পত্রিকাটি বন্ধ করে দিলেন। তখন মার্কস মনস্থ করলেন যে তিনি বিদেশে গিয়ে নূতন পত্রিকা প্রকাশ করবেন। তাঁর মস্তিষ্কে তখন চিন্তার যেন একটা উদ্দাম অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে। লেখনীকে তিনি একদণ্ড বিরাম দিতে পারতেন না।

১৮৪৩ সনের নভেম্বর মাসে পত্নীসহ মার্কস এলেন প্যারিসে। প্যারিস তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে একটি বিশেষ কারণে। এইখানেই তিনি ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর বন্ধুত্ব লাভ করেন। এঙ্গেলস বয়সে মার্কস-এর চেয়ে দু'বছরের ছোট ছিলেন। তিনি মার্কস-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তাঁর রাজনৈতিক কর্মে সহযোগী হন এবং অবশেষে মার্কস-এর মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থগুলি সম্পাদনা করেন। আধুনিক কালের ইতিহাসে মার্কস-এঙ্গেলসের বন্ধুত্ব একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। তাঁর দুর্ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনে এঙ্গেলসের সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব মার্কস-এর জীবনে দ্বিতীয় সৌভাগ্য বলা যেতে পারে। লেখনীর মাধ্যমে যে নূতন সমাজচেতনা তিনি জার্মান তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাগিয়েছিলেন, প্যারিসে এসে মার্কস পূর্ণোদ্যমে সেই কাজ শুরু করে দিলেন। য়ুরোপে তখন জার্মান থেকে ফ্রান্স—সর্বত্র যেন একটা সমাজ-বিপ্লব আসন্ন হয়ে এসেছিল। কার্ল মার্কসের অগ্নিস্রাবী রচনায় যেন তখন তারই আগমনী ঝঙ্কৃত হলো। গ্যেটে সাহিত্যের মাধ্যমে যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাই-ই এখন মার্কস-এর অর্থনৈতিক চিন্তায় প্রবলভাবে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। প্যারিসে এসে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীমুখে পুস্তিকার পর পুস্তিকা প্রকাশিত হতে লাগল আর সেগুলি পাঠ করে প্যারিসের বুদ্ধিজীবী মহলে জাগাল নূতন শিহরণ।

ভলটেয়ারের আত্মা কি এতদিনে তাঁর কবর থেকে উঠে এলো?—মার্কস-এর নির্ভীক রচনাবলী পাঠ করে অনেকের মনেই সেদিন জেগেছিল এই প্রশ্ন।

পৃথিবীর মেহনতী মানুষের কথা এইবার তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করলেন। সমাজের সকল দায় ও দায়িত্বের বোঝা যারা নিজেদের কাঁধে নিত্য বহন করছে তারাই সর্বপ্রকার সামাজিক সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত— এই কথা তিনি যতই চিন্তা করতে থাকেন ততই মার্কস এর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সমাজ বিপ্লবের চেয়ে বড়ো বিপ্লব আর কিছু হতে পারে না। এমন কথা তাঁর আগে আর কেউ চিন্তা করেননি। মার্কসের পরবর্তী রচনাবলী সেই সমাজ বিপ্লবেরই বেদী রচনা করে দিয়েছিল। এ পর্যন্ত দার্শনিকগণ বলে এসেছেন শুধু ঈশ্বরের কথা, পরলোকের কথা—কিন্তু মার্কসের বিবেচনায় ঈশ্বর তো শেষ সমস্যা, তিনি মানুষের আশু সমস্যা নিয়ে তার মস্তিষ্ক পরিচালনা করলেন। এই সময় ১৮৪৮। প্রকাশিত হোল তাঁর বিখ্যাত 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' যা পরবর্তিকালে শ্রেণী সংগ্রামের পথ এবং কর্ম পদ্ধতির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

১৮৫২। ইস্টার পরব দিন। মার্কসের একটি সন্তানের মৃত্যু হলো। এটি ছিল জেনি মার্কসের অত্যন্ত প্রিয় ফ্রান্সিস্কা। ব্রংকাইটিস হয়েছিল তার। ... দিন বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে তার মৃত্যু হয়। মৃতের সৎকার ... কেবল ফরাসী উদ্বাস্তু তাঁদের দুই পাউণ্ড দিলেন। তাই দিয়ে কফিন কেনা হয়। স্বয়ং জেনি মার্কস বলেছেন —'জন্মকালে মেয়েটিকে একটি দোলনায় শোয়াতে পারিনি, মৃত্যুকালেও তার জন্য একটি শবাধার সংগ্রহ করতে মুস্কিল হয়েছিল।' এইভাবে তাঁর ছয়টি সন্তানের মধ্যে তিনটির অকাল মৃত্যু হয়। এমন দারিদ্র্য বোধ হয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি বা শিল্পী সকলের কল্পনার বহির্ভূত। দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর ব্যাধি—কার্ল মার্কসের আবাসে এদের ছিল নিত্য আনাগোনা। যদিও তিনি তখন ঐ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলে স্বীকৃত, তথাপি জীবনে তিনি জাগতিক সম্মানে অক্ষম ছিলেন।

এইখানেই ফ্রেদারিক এঙ্গেলসের মহত্ত্বের কথা স্মরণে আসে। তিনি না থাকলে মার্কসকে সপরিবারে অনশনে থাকতে হতো এবং মৃত্যুমুখে পতিত হতে হতো। এঙ্গেলস নিজে খুব সঙ্গতি সম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু মার্কসের প্রয়োজন মেটাবার জন্য তিনি বার বার অর্থ সাহায্য করতেন।

মার্কসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এঙ্গেলস দিনের পর দিন অর্থ জুগিয়েছেন আর মার্কস একমনে রচনা করে চলেছেন তাঁর প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি—'ক্যাপিটাল' যে গ্রন্থটিকে বলা হয়ে থাকে 'Bible of the Proletariat।' মার্কস ও তাঁর 'Das Capital' আজ এমনই এক ও অভিন্ন হয়ে গিয়েছে যে, লেখক ও তাঁর গ্রন্থ এই দুটি মিলেমিশে গিয়ে যেন একটি জ্যোতির্ময় সত্তার অভ্যুদয় ঘটেছে যা ইতিহাসকে করে তুলেছে গতিময়, প্রাণবন্ত। 'ম্যানিফেস্টো' প্রকাশিত হওয়ার কুড়ি বছর পরে ১৮৬৭ সনে বেরুল তাঁর বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থ 'Capital'-এর প্রথম

খণ্ড। পরবর্তী দুটিখণ্ড প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর এঙ্গেলসের সম্পাদনায় যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ সনে। বিপুলায়তন এই গ্রন্থ রচনা করতে মার্কসের সময় লেগেছিল আঠার বছর। তথাপি মার্কস বলেছিলেন যে, তিনি মনের মতো করে এর রচনা শেষ করতে পারেন নি। এই গ্রন্থেই তিনি ইতিহাসের সম্পর্কে একটা নূতন ধারণা উপস্থাপিত করে বললেন, সকলের আগে অর্থনৈতিক বিচার-বিবেচনার উপরই ইতিহাসের পরিণতির ভিত্তিকে খুঁজতে হবে। মার্কস যে একজন দূরদ্রষ্টা ছিলেন তা বোঝা যায় যখন তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (১৮৭৭)—পৃথিবীতে প্রথম সমাজ বিপ্লব দেখা দেবে রাশিয়াতে।

ছাপান্ন বছর বয়স পর্যন্ত মার্কসের স্বাস্থ্য অটুট ছিল, কিন্তু তারপর থেকেই অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অপর্যাপ্ত আহারের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য জীর্ণ হতে থাকে। প্রথমে মারা গেলেন দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে তাঁর পত্নী জেনি মার্কস (ডিসেম্বর, ১৮৮১);‌ এর দুবছর পরে মারা গেলেন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা। কন্যার অকাল-মৃত্যুতে পত্নীশোক আরো ঘনীভূত হয় এবং অবশেষে তাঁর ছেষট্টিতম জন্মদিনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে, ১৮৮৪ সনের ১৪ই মার্চ কার্ল মার্কস লণ্ডনের একটি অন্ধকারময় ও অপরিচ্ছন্ন কক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিন দিন পরে যখন তাঁকে হাইগেট সমাধি ক্ষেত্রে তাঁর পত্নীর সমাধির পার্শ্বে শায়িত করা হয়, তখন মার্কসকে শেষ বিদায় জানাবার জন্য মাত্র দশ-বারো জন লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন একজন—তিনি ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। সেই সময় একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: 'His name and works will live on through centuries.' তারপর মার্কসের শবাধারটি যখন ধীরে ধীরে মাটির নীচে নামান হয়, তখন সেই দিকে তাকিয়ে একমাত্র তাঁরই চোখ দুটি অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। বিশ্বের বঞ্চিত ও নিপীড়িত নরনারীর চক্ষে আজো তাই অশ্রু ঝরে একটি মানুষের কথা স্মরণ করে যে মানুষ সারাজীবন কেবল তাদের কথাই চিন্তা করে গিয়েছেন। 'The man who wrote Capital died of starvation.'-মার্কস সম্বন্ধে বার্ণাড এর এই উক্তিটি সত্যিই মর্মস্পর্শী। মার্কস মানবপ্রেমিক, তাই জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিচারে পৃথিবীর মানুষ আজো তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে।

ওয়াল্ট হুইটম্যান

(১৮১৯-১৮৯২)

উনিশ শতকের আমেরিকায় নূতন চিন্তার প্রবক্তা হিসাবে প্রধানত তিনজনের নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে, যথা—এমার্সন, থেরো ও হুইটম্যান। এই তিনজনই ছিলেন নূতন যুগের 'New spirit' বা নূতন মানুষ। য়ুরোপীয় রেনেসাঁ যে বিচিত্র জীবনবোধের সৃষ্টি করেছিল তা ঐ মহাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, কালক্রমে তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। এক একটি প্রতিভাকে আশ্রয় করে এক-এক দেশে এই নবজাগরণের বর্ণ-দ্যুতি কিভাবে বিচ্ছুরিত হয়ে সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে ও কাব্যে নব নব চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছিল সে ইতিহাস আমরা প্রত্যক্ষ করেছি রেনেসাঁ-পরবর্তী বিভিন্ন শতাব্দীতে এবং বোধ হয় একমাত্র বিগত শতাব্দীতেই তার পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছে। এই যে প্রচ্ছন্ন বা অদৃশ্য জীবনের উদ্বোধন বা অভিব্যক্তি, তা ইতিহাসেরই এক নিগূঢ় প্রক্রিয়ার ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে। হুইটম্যান জন্মগ্রহণ করেন ১৮১৯ সনের ৩১শে মে এক গ্রাম্য সূত্রধরের গৃহে। লং আইল্যাণ্ড উপসাগরের দক্ষিণ তীরবর্তী হান্টিংটনের সন্নিকটে ওয়েস্ট হিলস্ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে হুইটম্যান পরিবার বাস করতেন। হুইটম্যানের পিতা ওয়াল্টার হুইটম্যান জাতিতে ছিলেন খাঁটি ইংরেজ আর তাঁর মা ছিলেন হল্যাণ্ড দেশীয় মেয়ে। পুত্র হুইটম্যানের স্বভাবে এই দুই জাতিরই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতো।

পিতা ওয়াল্টার লং আইল্যাণ্ডের বাসভূমি পরিত্যাগ করে ব্রুকলিনে এসে বসবাস করতে থাকেন এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা এখানে কোয়েকারদের সংস্পর্শে মানুষ হয়ে উঠতে থাকে। তাঁর শৈশবজীবনে হুইটম্যান গৃহে কোনোদিন সুখের মুখ দেখেন নি। শিশু হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ তাঁর মাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। জীবন সংগ্রামে পরাজিত পিতার কাছ থেকে তাঁর সন্তানদের কেউই বিশেষ কিছু শিক্ষালাভ করতে পারেনি। তিনি এক রকম মূক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ছেলেমেয়েরা তাই তাঁর সাহচর্য থেকে একরকম বঞ্চিত ছিল বলেই হয়। তাঁর শৈশবজীবনে গৃহের পরিবেশ এইরকম নিরানন্দময় হলেও বালক হুইটম্যানের কাছে ব্রুকলিনের বিচিত্র পরিবেশ আকর্ষণীয় ছিল। এই ব্রুকলিনকে কবি আমার শহর—My city—বলে গর্ববোধ করতেন এবং ব্রুকলিনের ফেরিনৌকোর স্মৃতি তাঁর 'Crossing Brooklyn Ferry' শীর্ষক কবিতায় অমর হয়ে আছে। বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে হুইটম্যানের এই কবিতাটি গণ্য হয়ে থাকে। এই বিচিত্র পরিবেশ থেকে শৈশবে তিনি যে প্রাণরস আহরণ করেছিলেন তাই-ই পরবর্তিকালে তাঁর কবিত্ব শক্তিকে এক নূতন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছিল।

ব্রুকলিনে তিনি পাঁচ বছর কাল সাধারণ শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং তাঁর বয়স যখন মাত্র এগার বছর তখন হুইটম্যানের ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কেতাবি বিদ্যা বলতে যা বোঝায়, তিনি তা লাভ করতে পারেননি সত্য কিন্তু প্রকৃতির পাঠশালা থেকে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা ছিল যেমন বিশাল, তেমনি গভীর এবং বিচিত্র। জীবনের যখন যে অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে যখন যে বৃত্তি তিনি অবলম্বন করেছিলেন, তখন প্রত্যেকটি ক্ষেত্র থেকেই জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁর মন উন্মুখ হয়ে থাকত। তার মনের গ্রহণশীলতা ছিল অসাধারণ। বছরের পর বছর তিনি ব্রডওয়েতে ফুলটন ফেরিঘাটে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন, বাসে যাওয়ার সময় ড্রাইভারদের সঙ্গে নিঃসংকোচে কথা বলেছেন, কারখানার কারিগরদের সঙ্গেও আলাপ করেছেন। শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট ব্যক্তি—সকলের সঙ্গেই তিনি নিজেকে সমান মনে করতেন। এইভাবে প্রত্যেকটি পাত্র থেকেই তাঁর সম্মুখে প্রবাহিত বিশাল ও বিচিত্র জীবন প্রবাহ তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব ধারায় হুইটম্যান তাঁর জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন—সেখানে কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। এর ফলে, তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল—জীবনের গভীরতম দেশ পর্যন্ত প্রসারিত হতে পেরেছিল।

কুড়ি বছর বয়সে যুবক হুইটম্যান আবার তাঁর মনের গতি বদলালেন। এইবার তিনি একজন পত্রিকা সম্পাদক হতে ইচ্ছা করলেন। তিনি একটা ছোট প্রেস কিনলেন এবং তাঁদের সেই হান্টিংটনের বাড়িতেই Long Islander এই নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। ছাপার সব কাজই তাঁর জানা ছিল, তাই নিজের কাগজ প্রকাশ করার জন্য যাবতীয় কাজ তাঁকেই করতে হতো। পত্রিকা-সম্পাদক হওয়ার এই উৎসাহ কিন্তু তাঁর এক বছর কালের বেশী স্থায়ী হয় নি। এক বছর পরে কাগজ উঠিয়ে দিয়ে, প্রেস বিক্রী করে দিয়ে তিনি অন্যত্র চাকরি গ্রহণ করলেন। পরবর্তী ছয় বৎসর কাল তিনি কমপক্ষে আধ ডজন দৈনিক ও অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সাতাশ বছর বয়সে হুইটম্যানকে আমরা 'ব্রুকলিন ঈগল' পত্রিকার সম্পাদকরূপে দেখতে পাই। ইতিমধ্যে তিনি গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং তার কিছু কিছু প্রকাশিতও হয়েছিল। উপন্যাস, ছোটগল্প ও কিছু কবিতা—সবই লিখেছিলেন। তাঁর এই সময়কার এই জাতীয় রচনাগুলি তাঁর জীবনীকারের মতে আদৌ উল্লেখযোগ্য ছিল না। কবিতা-গুলি ছিল একেবারেই নিকৃষ্ট ধরণের—ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক সবদিক দিয়েই। 'ঈগল' পত্রিকার সঙ্গে হুইটম্যান পুরো দুটি বছর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সময়ে তিনি গৃহনির্মাণের জন্য তাঁর পিতাকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন, পত্রিকা সম্পাদনার কাজ আন্তরিক ভাবেই করতেন, যদিও তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি নীরস হতো; থিয়েটার ও অপেরায় যেতেন এবং অন্য পত্রিকার জন্য পুস্তক সমালোচনাও করতেন। এছাড়া কতো রকমের পেশাদারী লেখার কাজ যে তিনি করতেন তার হিসাব নেই।

এইভাবে যখন তিনি ত্রিশ বছরে পদার্পণ করলেন তখন তাঁর মানস জগতে এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল। এইবার কবি হুইটম্যানের আত্মপ্রকাশের লগ্ন আসন্ন হয়ে এলো। 'ফ্রীম্যান' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর থেকেই হুইটম্যান [illegible] মনে একটা মহৎ কিছু সৃষ্টি করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। সেই সঙ্কল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করতে তাঁর সময় লাগল দীর্ঘ ছয়টি বৎসর। এক নতুন আঙ্গিকের কবিতা নিয়ে তিনি ১৮৪৭ সন থেকেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকেন। তখন থেকে খবরের কাগজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে হুইটম্যান ব্রুকলিনে এসে তাঁর পিতামাতার সঙ্গে বাস করেন। ব্রুকলিনে সেই সময় তিনি ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করতেন আর অন্তরে [illegible] চলত 'লীভস্ অব্ গ্রাস' রচনা। এতকাল প্রচলিত যে সব ছন্দে তিনি কবিতা রচনা করে আসছিলেন, তা থেকে এক স্বতন্ত্র নতুন ছন্দ এলো তাঁর লেখনী মুখে। কবিতা দেখা দিল সম্পূর্ণ নতুন রূপে—মুক্ত, নমনীয় ছন্দে। প্রতিটি চরণের মিল একেবারে [illegible] কোথাও দেখা [illegible] এই মানসিক চাঞ্চল্য, এই অস্থির চিত্তবৃত্তি, [illegible]। [illegible] আর এক চরিত্র—দুই ভিন্ন ভিন্ন [illegible] এই কাব্য [illegible]। [illegible] নতুন ও ইতিপূর্বে অপরিজ্ঞাত [illegible] কবিতা রচনার [illegible]

[illegible] রচনায় এই নতুন আঙ্গিক [illegible] হলো। তারপর ১৮৫৫ সালে, [illegible] 'ওয়াল্ট হুইটম্যান' এই [illegible]—লীভস্ অব্ গ্রাস। [illegible] মহৎ [illegible] জনশ্রুতি [illegible] হুইটম্যান তাঁরই প্রথম ও প্রধান [illegible]—[illegible] আমেরিকার নব্য যুগের নতুন [illegible]।

তখন [illegible] 'লীভস্ অব্ গ্রাস' [illegible] কেন্দ্র করে শুরু হতে থাকে বিতর্ক [illegible] থেকে [illegible] শেষদিন পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত [illegible] সহকারে এই বিতর্কটিকে [illegible]। 'লীভস্ অব্ গ্রাস' প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুইটম্যান নিজেকে [illegible] পত্রিকার একজন সহকর্মী হিসেবে—[illegible] প্রয়াস করলেন। সে যুগটা ছিল নির্লজ্জ আত্মপ্রশংসার যুগ, [illegible] গেল যে হুইটম্যান [illegible] ও ছদ্মনামে, কখনো বা বেনামে তাঁর বইয়ের সমালোচনা লিখতে শুরু করলেন। সেই সব সমালোচনাগুলি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ছিল। আমেরিকার জনসাধারণ যাতে তাঁকে গণতন্ত্রের [illegible] বলে স্বীকৃতি দেয়, এই উদ্দেশ্যেই তিনি এইসব সমালোচনা লিখতেন।

I celebr[illegible]te myself, and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.

উনিশ শতকের পৃথিবীতে এমন দীপ্ত ও দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয় আর কোনো কবির কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়নি। ১৮৫৫ থেকে আরম্ভ করে, হুইটম্যান তাঁর জীবনের প্রায় সমগ্র কাল এই একখানি বইয়ের সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করেছেন এবং যদিও এর দ্বারা তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছিল, তথাপি আর্থিক সুবিধা কিছুমাত্র হয় নি। তাই দেখা যায় যে, যুগান্তকারী এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর পরে হুইটম্যানকে প্রায় অনশনে দিনাতিপাত করতে হয়েছে এবং উদরান্নের সংস্থানের জন্য তাঁকে আবার গ্রহণ করতে হয়েছিল সাংবাদিকের বৃত্তি। ১৮৫৭ সনে, আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি 'ব্রুকলিন ডেইলি টাইমস' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময় ঐ পত্রিকার সম্পাদকরূপে নির্ভীক ভাবে লেখনী চালনা করে সর্বপ্রকার সামাজিক নীচতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি যে অবিশ্রান্ত 'জেহাদ' চালিয়েছিলেন, আমেরিকার সমকালীন সাংবাদিকতার ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

হুইটম্যানের জীবনের পরবর্তী কাহিনীতে আমাদের আর প্রয়োজন নেই। ১৮৬৫ সনের এপ্রিল মাসের যুক্তরাষ্ট্রের মানবদরদী প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের হত্যাকাণ্ডে কবি যার পর নাই মর্মাহত হন ও এই ঘটনার ওপর চারটি মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেন—তাঁর কাব্যের পরবর্তী সংস্করণে লিঙ্কন-সম্পর্কিত ঐ কবিতা চারটি সন্নিবেশিত হয়। ১৮৬২ থেকে ১৮৭৪—এই বারো বছর কাল তিনি ওয়াশিংটনে অবস্থান করেন। চুয়ান্ন বছর বয়সে কবি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে নিউজার্সিতে তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহোদর জর্জের গৃহে অবস্থান করেন। তিনি তাঁর পূর্বেকার জীবনীশক্তি আর ফিরে পান নি, ফিরে পাননি কর্মক্ষমতা। মৃত্যুকাল পর্যন্ত হুইটম্যান কিন্তু দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্ত ছিলেন না—এইটাই ছিল তাঁর জীবনের শোচনীয় নিয়তি। এই সময় তাঁর মায়ের মৃত্যুতে কবি অত্যন্ত কাতর হন এবং তখন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। বাহাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত কবি তাঁর মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থের নবম সংস্করণের উপর তাঁর শেষ স্বাক্ষর রেখে দেন কম্পিত হস্তে। ১৮৯২ সনে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হুইটম্যান সম্পর্কে এমার্সনের উক্তিটি স্মর্তব্য: 'The most extraordinary piece of wit and wisdom that America has get contributed.' আজকের অবক্ষয়ের দিনে সেই প্রচণ্ড বিদ্রূপ আর প্রজ্ঞার আবার প্রয়োজন হয়েছে।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল

(১৮২০-১৯১০)

যে মহীয়সী নারী উনিশ শতকের এই পৃথিবীতে সেবা-শুশ্রূষার ভিতর দিয়ে মানবহিতৈষণার একটি সুমহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চিরস্মরণীয়া হয়েছেন, তাঁরই নাম কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। ইতিহাসে ইনিই 'The Lady with the Lamp' এই নামে খ্যাত হয়েছেন। বিগত শতাব্দীতে য়ুরোপে আর কোন নারী এমন ভাবে বিশ্ববন্দিতা হয়ে ওঠেনি যেমন হয়েছিলেন নাইটিংগেল। ভিক্টোরীয় যুগের ইংলণ্ডের তিনিই ছিলেন গর্ব ও গৌরবের পাত্রী।

প্রায় দেড়শো বছর আগে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে তাঁর জন্ম হয়। তিনি জাতিতে ছিলেন ইংরেজ। পিতামাতা তাঁদের প্রিয় শহরের নামানুসারে নবজাত কন্যার নাম রাখেন ফ্লোরেন্স। ইংলণ্ডের ডার্বিশায়ার অঞ্চলে ছিল তাঁদের পুরাতন আমলের বনেদি বাড়ি। এই বাড়িতেই ফ্লোরেন্সের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবার, সচ্ছল অবস্থা, পিতামাতার যত্নে মেয়ের শিক্ষাদীক্ষার কোনো ত্রুটি হয়নি। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন ভাগ্যবতী।

জীবনের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু স্পৃহনীয় তার কিছুরই, অভাব ছিল না তাঁর। সুখ স্বাচ্ছন্দের মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, তখনকার দিনে মেয়েরা যতদূর শিক্ষালাভ করতে পারতো, তার অনেক বেশি শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে অর্থহীন যে অস্তিত্বের ভার তখন তিনি বহন করেছিলেন মানুষের সেবায় কি ভাবে তাকে সার্থক করে তুলতে পারা যায় অন্তর্নিহিত এই বিচিত্র আবেগের দ্বারা তাঁর সমগ্র সত্তা তখন আন্দোলিত হয়ে উঠেছে। তারপর যখন তাঁর অন্তরের এই নিঃশব্দ বিদ্রোহ বাইরে একটা প্রচণ্ড রূপ ধারণ করলো তার পাঁচ বছর কালের মধ্যেই সেই নারীর নাম হয়ে উঠলো বিশ্ববিখ্যাত। শুধু বিশ্ববিখ্যাত হওয়া নয়, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন মাতৃরূপিনী। মানবসভ্যতার ইতিহাসে সেই নামটি আজো বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে, থাকবেও চিরকাল। সেই নারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। হাসপাতালে রুগ্ন ও পীড়িতের তিনি সেবা শুশ্রূষার যে ধারা প্রবর্তন করেন, সভ্যতার ইতিহাসে তেমন মহৎ কাজ আজ পর্যন্ত আর কেউ করতে সক্ষম হননি।

সতের বছর বয়সে ফ্লোরেন্স তাঁর পিতামাতার সঙ্গে এলেন লণ্ডনে। ঠিক সেই বছরেই (১৮৩৭) মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহন করেছেন। লণ্ডনে এসে তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছিলেন। গতানুগতিক জীবনের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। বাড়ির সকলের প্রবল আপত্তি ও অনিচ্ছা সত্বেও তিনি কন্টিনেণ্টে গিয়ে শুশ্রূষা বিদ্যা (Nursing) অধ্যয়ন করতে

থাকেন। জার্মানিতেই বেশির ভাগ সময় তিনি এই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। প্যারিসে Sisters of Charity পরিচালিত একটি হাসপাতাল ছিল। এই হাসপাতাল পরিচালনা পদ্ধতি শিক্ষা করবার জন্য ১৮৫৩ সনে তিনি প্যারিসে যাওয়ার অনুমতি পেলেন। ঐ বছরের গ্রীষ্মকালেই তিনি লণ্ডনে ফিরে এসে একটি মেয়েদের হাসপাতালে পরিদর্শিকার কর্ম গ্রহণ করেন।

১৮৫৪। তুরস্ক ও রাশিয়ার যুদ্ধ বাধলো। ইংলণ্ড তুরস্কের পক্ষে যোগ দেয়, রাশিয়ার বিরুদ্ধে। ইতিহাসে এই যুদ্ধকেই বলা হয়েছে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ক্রিমিয়াতে অবতরণ করার ঠিক ছয় দিন পরেই প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে। 'আহতদের পরিচর্যার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়নি'—একটি ডেসপ্যাচে এইরকম লেখা হয়ে ছিল। শুধু যে উপযুক্তসংখ্যক চিকিৎসক বা সেবিকা শুশ্রূষাকারিণী পাঠানো হয়নি তা নয়, ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার জন্য কোনো উপকরণও প্রেরিত হয়নি। ক্রিমিয়ার রণক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের পরিচর্যার এই অব্যবস্থার সংবাদ যখন ইংলণ্ডে এসে পৌঁছল তখন সেখানকার সংবাদপত্রগুলিতে এই সম্পর্কে কঠিন মন্তব্য প্রকাশিত হতে থাকে। সে সব বিরূপ সমালোচনায় ইংলণ্ড যেন সচকিত হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে ইংলণ্ডের জনসাধারণ।

ক্রিমিয়া থেকে সংবাদ আসে আহত ইংরেজ সৈন্যদের জন্য অল্পসংখ্যক যে কয়টা হাসপাতাল খোলা হয়েছে তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যত না লোক মরেছে তার চাইতে অনেক বেশি মরছে হাসপাতালে ঔষধ-পথ্য এবং সেবা ও যত্নের অভাবে। সংবাদপত্রে এইসব মর্মান্তিক বিবরণ পাঠ করে কুমারী নাইটিংগেলের অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তিনি ক্রিমিয়াতেই যাবেন ঠিক করলেন। কিন্তু সুযোগ কোথায়? তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন সিডনী। হার্বার্ট। সিডনী সমর দপ্তরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং মন্ত্রিসভাতেও তিনি ছিলেন। সেবাশুশ্রূষার কাজে নাইটিংগেলের আগ্রহ ও অভিজ্ঞতার কথা তাঁর বিশেষ-ভাবেই জানা ছিল। নাইটিংগেল সিডনীকে একখানি পত্র লিখলেন এবং সে সময়ে সিডনী তাঁর বান্ধবীকে ক্রিমিয়া যুদ্ধে সেবিকার কাজ নিতে আহ্বান জানিয়ে একখানি সরকারী পত্র পাঠিয়েছিলেন। যথাসময়ে ওয়ার অফিস থেকে তাঁর নামে এলো অবিলম্বে একটি নিয়োগ পত্র। সুশিক্ষিতা ও উপযুক্ত ট্রেনিং পেয়েছে এমন একদল নার্স অবিলম্বে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ-হাসপাতালে পাঠাবার জন্য মন্ত্রিসভায় একটি সিদ্ধান্তও গৃহীত হলো। তাঁর অধীনে আটত্রিশজন নার্সকে সঙ্গে নিয়ে সপ্তাহকাল পরে নাইটিংগেল কনস্টান্টিনোপলের অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন থেকে শুরু হয় এই অভিজাত বংশীয়া কুমারীর জীবনে একটি নূতন অধ্যায়। যাত্রাকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

রণাঙ্গনে আহতদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য সেই প্রথম একজন ইংরেজ রমণী সেবিকার কাজ নিয়ে এসেছেন। এটাই ছিল সেদিন একটা বিরাট সমাজ-বিপ্লব এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে এই যে একটা নিঃশব্দ

বিপ্লব ঘটেছিল পরবর্তিকালের ইতিহাসে তার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। মানব সেবাব্রতের একটা নূতন দিগন্তই যেন উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল সেদিন নাইটিংগেলের এই আত্মোৎসর্গের ফলে। পরদুঃখকাতরতা আর মানবপ্রীতি যে রাজনীতির কতো উর্ধ্বে স্থান পেতে পারে, পৃথিবীর মানুষ এই শিক্ষাটাই লাভ করেছে তাঁর জীবন থেকে।

১৮৫৪ সালের শরৎকালে একদিন বসফরাসের তীরবর্তী স্কুটারীতে এসে অবতরণ করলেন ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। তখন বালাক্লাভার যুদ্ধ সবেমাত্র সমাপ্ত হয়েছে। বহুসংখ্যক ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্য আহত হয়েছে। কৃষ্ণসাগর অতিক্রম করে জাহাজ বোঝাই হয়ে আসছে সেইসব আহত সৈন্য। সংখ্যায় তারা প্রায় ছয়শত। অত আহতসৈন্যের পরিচর্যা করবার উপযোগী সরঞ্জাম সেখানে ছিল না। অর্থ সঙ্গতিও ছিল না। ইতিমধ্যে পার্লামেণ্ট থেকে রণাঙ্গনের অবস্থা তদন্তের একটি কমিশন গঠিত হয়েছে আর 'টাইমস' পত্রিকা একটি অর্থভাণ্ডারের আয়োজন করেছে। সেইখান থেকে যা পাওয়া গেল এবং নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয়—এই দিয়ে নাইটিংগেলকে সেদিন অসাধ্য সাধন করতে হয়েছিল। লণ্ডনের বহু প্রতিষ্ঠানে তিনি সাহায্যের জন্য আবেন পাঠালেন। নাইটিংগেলের সে আবেদন ব্যর্থ হয়নি। সমগ্র ইংলণ্ড সেদিন তুমুলভাবে সাড়া দিয়েছিল তাঁর সেই আকুল আবেদনে। কর্ম ক্ষেত্রে নারীর প্রতিভা কি অসাধ্য সাধন করতে পারে ফ্লোরেন্সের পূর্বে ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভূত আর কোনো নারী তার প্রমাণ দিতে পারেন নি। দশদিনের মধ্যেই তিনি স্কুটারী হাসপাতালের চেহারা একেবারে বদলিয়ে দিয়েছিলেন। চারমাইল স্থান জুড়ে ছিল এই হাসপাতালের আটটি বিভিন্ন ওয়ার্ড।

নাইটিংগেলের চেষ্টায় হাসপাতালে একটি নূতনবিভাগ খোলা হলো এবং সেইখানে তাদের পরিজনকে পাঠাবার জন্য সৈন্যরা যে টাকা জমা দিত তা অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন তিনি। এর ফলে সৈন্যদের মধ্যে একটা নূতন ধরনের প্রেরণা জাগল। হাসপাতালে আহতদের পড়াশোনার জন্য তিনি একটি ছোট গ্রন্থাগারও খুললেন এবং তাঁর আবেদন ক্রমে লণ্ডনের বহু প্রকাশক সেখানে বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠাতে থাকে। হাসপাতালে আহতদের পরিচর্যায় তিনি কখনো কখনো কুড়ি ঘণ্টা অতিবাহিত করতেন; স্বহস্তে তাদের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতেন তাদের সান্ত্বনা দিতেন। রুগীদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন যেন মূর্তিমতী দেবী এবং প্রতিদিন রাত্রে যখন তিনি একটি প্রদীপ হস্তে একটির পর একটি রুগীর শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়াতেন তখন সেই প্রদীপের আলোকে তাদের বালিশের ওপর সেই মমতাময়ী নারীর যে ছায়া পড়ত, তারা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই ছায়া চুম্বন করতো।

ক্রিমিয়ার রণাঙ্গনে আহত সৈনিকদের সেবাশুশ্রূষায় দু'বছর কাটিয়ে যুদ্ধশেষে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল যখন লণ্ডনে ফিরবেন তখন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁর জন্য একখানা রণতরী পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে সাধারণভাবেই দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। সমগ্র ইংলণ্ড তখন

তাঁর জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই দু'বছরেই তাঁর স্বাস্থ্যের অনেক অবনতি হয়েছিল। প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কারের নিগড় ভেঙে নারীদের জন্য তিনি যে একটি নূতন পথ, একটি নূতন বৃত্তি নির্দেশ করে দিতে পেরেছিলেন। এইজন্য কৃতজ্ঞ ইংল্যাণ্ড তাঁকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করতে চাইলো। এক বছরের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড চাঁদা উঠল। ১৮৫৯ সনে সেণ্ট টমাস হাসপাতালে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের তত্ত্বাবধানে ইংলণ্ডের প্রথম নার্সিং স্কুলটি স্থাপিত হয়। তারপরও তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে। লণ্ডনের এক প্রকাশ্য স্থানে একটি উচ্চবেদীর উপর ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের একটি মর্মরমূর্তি আছে। তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসীরপক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বাভাবিক। কিন্তু এইটাই সব নয়। 'Her truest monument is the modern profession of nursing.'—এই কথা বলেছিলেন ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে তাঁকে Order of Merit—এই দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল—তিনিই প্রথম নারী যিনি ইংলণ্ডে এই উচ্চতম রাজ সম্মান লাভ করেন। সমগ্র পৃথিবীই সেদিন এই মনাবহিতৈষিণী নারীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিল। ১৯১০, ১৩ আগষ্ট নব্বই বছরের কাছাকাছি উপনীত হয়ে, নাইটিংগেল জীর্ণ দেহভার ত্যাগ করে অনন্তলোকে যাত্রা করলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই জেনে পরম সন্তোষ লাভ করেছিলেন যে, মানবসেবার যে মহৎ আদর্শকে সামনে রেখে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ সেই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। সেই আদর্শের মূল কথা ছিল মানুষের প্রতি অনুকম্পা। I worked for a large and worthy object, in a pure spirit of duty, towards God and compassion for man. মৃত্যু-শয্যায় শায়িত সেই করুণাময়ী নারীর কণ্ঠে এই ছিল শেষ উচ্চারিত কথা। এরই মধ্যে যেন শোনা যায় এই মানবসেবিকার জীবন সংগীত।

গুস্তভ ফ্লবেয়ার

(১৮২১—১৮৮০)

১৮২১, ১২ ডিসেম্বর, নর্মাণ্ডির রুয়েতে গুস্তভ ফ্লবেয়ারের জন্ম হয়। সেখানকার পৌরসভা পরিচালিত চিকিৎসাগারের একটি কক্ষে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন; তাঁর বাবা ছিলেন এই হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ও প্রধান সার্জন। গুস্তভের বয়স যখন উনিশ তখন তিনি প্যারিসে এসে আইন অধ্যয়ন করেন, কিন্তু আইনের পাঠ্যপুস্তক তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। সিভিল কোড তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হতো। সেই বয়সে তাঁকে যেমন প্রাণোচ্ছল, তেমনি প্রিয়দর্শন ও শক্তিমান দেখাত। যেন একটি নিখুঁত গ্রীকমূর্তি, তারুণ্যের সজীবতা ঝলমল করতো তাঁর সারা অঙ্গে।

পড়াশুনা চলতে থাকে অনিচ্ছার সঙ্গে; এর মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও গুস্তভ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। এর পর থেকেই তিনি মূর্ছা অসুখে আক্রান্ত হন—অদ্ভুত ধরনের মূর্ছা। একে নিবারণ করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না, তবে তিনি সব সময়ে বলতে পারতেন কখন এই আক্রমণ আসবে। মূর্ছাহত হয়ে পড়বার আগে তিনি আচ্ছন্নের মতো হয়ে পড়তেন; সেই অবস্থায় তিনি গর্জনের মতো শব্দ শুনতে পেতেন এবং সোনালী আলো আর তার সঙ্গে অদ্ভুত ধরনের সব মূর্তি দেখতে পেতেন। চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু তরুণ গুস্তভের এই অসুখকে তাঁরা মূর্ছারোগ বলে স্বীকার করলেন না। 'রুগী অত্যধিক জীবনীশক্তির অধিকারী এবং সেই জিনিসটাই এখন মূর্ছারোগের (hysterico-epileptic) আকারে দেখা দিয়েছে। তাঁর বাবা নিজেই একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। ছেলেকে তিনিও পরীক্ষা করলেন। তবে তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতি ছিল একটু কঠিন রকমের। প্রথমে রক্তমোক্ষণ, উপবাস এবং অনবরত স্নান। গুস্তভ কিন্তু ব্যাধিমুক্ত হয়েছিলেন একেবারে তাঁর জীবনের শেষ বয়সে।

ফ্লবেয়ারের বাবা মোটামুটি বিত্তবান ছিলেন। ক্রয়সেটের কাছে তিনি একটা বাড়ি কিনলেন। জায়গাটি সীন নদীর ধারে একটি মনোরম গ্রাম, রুঁয়ের একটু নীচে। তিনি সপরিবারে এখানে এসে বসবাস করতে লাগলেন। ফ্লবেয়ারের জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ছবির মত সুন্দর এই গ্রামেই অতিবাহিত হয়েছিল—শুধু দু'বার তিনি দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তাঁর এক জীবনীকার বলেছেন, ফ্লবেয়ারের জীবন একটি মাত্র বাক্যে বর্ণনা করা যেতে পারে; তিনি বাড়িতে বাস করতেন এবং একমনে লিখতেন। কিন্তু সে জীবন ছিল নিরন্তর কষ্টের জীবন, মাঝে মাঝে তাঁকে শোকাবহ ঘটনার সম্মুখীন হতে হতো।

জানুআরি, ১৮৪৬।

নতুন জায়গায় এসে বসবাস করার এক বছরও তখন পূর্ণ হয়নি এমন সময়ে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর বাবা মারা গেলেন। এই ঘটনার তিন মাস পরে, একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে তাঁর বোন ক্যারোলিন বাইশ বছর বয়সে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ফ্লবেয়ারের জীবন যেন ধ্বংস হয়ে গেল। 'মনে হয় মূর্তিমতী দুর্ভাগ্য আমাদের আক্রমণ করছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেকে গ্রাস না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে যাবে না'—ফ্লবেয়ার লিখেছিলেন।

ক্রোয়সেটে থাকার কালে তিনি মাঝে মাঝে প্যারিসে যেতেন, এবং সেইখানে তখনকার ভাস্কর প্রাদিয়েরের স্টুডিওতে লুসি কোলেটের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। লুসির বয়স তখন পঁয়ত্রিশ, ছয় বছরের একটি কন্যার জননী সে, ফ্লবেয়ারের বয়স তখন চব্বিশ বছর'। তাছাড়া লুসি ছিলেন খ্যাতিসম্পন্না। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে, তিনি বিদ্বৎসভার সভ্য ও দার্শনিক ভিক্টর কাজিনের উপপত্নীরূপে বাস করছিলেন এবং এঁরই প্রভাবের জন্য তিনি কবিতায় আকাদেমির অনেকগুলি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তাঁর বন্ধুরা কিন্তু আশ্চর্য বোধ করেছিলেন ফ্লবেয়ারের মধ্যে এই রকম কামোন্মত্ততা দেখে। কি জন্য তিনি একটি নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন যিনি আত্মপ্রচারে পটিয়সী এবং কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কোন কিছু করতে যাঁর বিন্দুমাত্র বাধত না। আর যাঁর মধ্যে স্বাভাবিকতার লেশমাত্র ছিল না। লুসির এই রকম মনোভাব ফ্লবেয়ারের একেবারেই অজানা ছিল—তাঁর কাছে শুধু প্রত্যক্ষ ছিল লুসির রূপ আর বিমোহন-ভাব, এবং ঐ সময়ে তাঁর মধ্যে এই প্রবণতা যেন তীব্র হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন, যাঁর উপর তিনি নির্ভর করতে পারতেন; হারিয়েছেন তাঁর বোনকে যে ছিল তাঁর বিশ্বাসের পাত্রী। তখন বন্ধু বোহলহেটের উপদেশের ওপর ফ্লবেয়ার সবে মাত্র নির্ভর করতে শুরু করেছেন। গুস্তভ তাঁর চক্ষে একজন অপরিণত লেখক হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন তখন থেকেই। অপরিণত অথচ প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন।

যদিও তখনো পর্যন্ত ফ্লবেয়ার একটি বইও প্রকাশ করেন নি, এমন কি তাঁর বয়স যখন কুড়ি বছর তখনো তিনি আগে ছিলেন একজন লেখক এবং ঘটনাক্রমে একজন প্রেমিক। তাছাড়া, তিনি একজন লেখকমাত্র ছিলেন না—যাঁরা লেখার প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করে থাকে, তিনি ছিলেন ঠিক সেই শ্রেণীর লেখক। তাঁর কাছে ঘটনা অভিজ্ঞতা ও আবেগ—এই সবের ঠিক ততখানি মূল্য ছিল যার সাহায্যে একটি পৃষ্ঠা, একটি অধ্যায়, অথবা পরিশ্রম স্বীকার করে একটি বই লেখা যায়।

ফ্লবেয়ারের প্রতিভার স্ফুরণে তাঁর যৌবনকালে প্রেমঘটিত একটি ঘটনা যে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই তাঁর জীবনীকারগণ এই বিষয়টির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের অভিমত এই যে

দায়ের কাছে বেয়াত্রীস যা ছিলেন, গুস্তভের কাছে লুসিও ঠিক তাই হয়ে উঠেছিলেন। তিনিই ছিলেন ফ্লবেয়ারের মানসী। দু'জনের মধ্যে এই পত্রালাপ চলেছিল সুদীর্ঘ আট বছর ধরে। এই সময়ে ফ্লবেয়ার একসঙ্গে দুটি বই লিখছিলেন এবং এই সময়ে তাঁর বন্ধু দু ক্যাঁর সঙ্গে প্রাচ্য দেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁর এই ভ্রমণ শুরু হয় ১৮৪৯ সালের শরৎকালে আর দুই কি তিন বছর পর্যন্ত এই ভ্রমণ চলবার কথা ছিল। তরুণ পরিব্রাজকদ্বয় একে একে আলেকজান্দ্রিয়া, নাইল নদী নাজারেথ, সিরিয়া, কনস্তান্তিনোপল, এবং রোম দর্শন করেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর মা পুত্রের এই বিদেশ ভ্রমণে মত দিয়েছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই বাড়ির জন্য ফ্লবেয়ারের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। পাঁচ মাস তখনো হয়নি, তিনি ফিরে এলেন। ফিরে এসে তিনি তাঁর তৃতীয় উপন্যাস রচনায় হাত দেন। এইটির নাম 'Madam Bovary'—একটি বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে লেখা ফ্লবেয়ারের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস।

তাঁর বন্ধু বোইলহেট একদিন গুস্তভের কাছে প্রস্তাব করলেন চিকিৎসক ডেলামের জীবনের কাহিনী নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করতে। এই চিকিৎসক ফ্লবেয়ারের বাবার ছাত্র ছিলেন এবং পাশ করবার পর একটি গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। সেইখানে তাঁর স্ত্রীর বিশ্বাসহীনতায় ব্যথিত হয়ে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনাটিকে কাঠামো হিসাবে গ্রহণ করে, ফ্লবেয়ার চার বছর ধরে 'মাদাম বোভারি' উপন্যাসটি লিখেছেন। তাঁর প্রেমের পাত্রী লুসির ট্র্যাজিক জীবনকে সামনে রেখেই ফ্লবেয়ার তাঁর এই উপন্যাসের নায়িকা এমার চরিত্রটির পরিকল্পনা করেছিলেন। সামারসেট মমের কথায়, এই উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য এর চরিত্র চিত্রণে। এগুলিকে উপন্যাসের চরিত্র বলে মনেই হয় না—মনে হয় যেন বাস্তব জীবনের ছবি। কথাসাহিত্যে আধুনিক বাস্তবতার জন্ম এখান থেকেই। ফরাসী সাহিত্যে তিনিই প্রথম বাস্তবধর্মী ঔপন্যাসিক। তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'Salammbo' আর একটি অসাধারণ সৃষ্টি এবং এটি লিখতে গিয়ে তাঁকে অজস্র বই পড়তে ও গবেষণা করতে হয়েছিল।

পঞ্চাশ বছর বয়সে যখন তিনি উত্তীর্ণ হলেন তখন ফ্লবেয়ারের জীবনে আবার দুর্ভাগ্য নেমে এলো। প্রাসিয়ানরা ফ্রান্স আক্রমণ করল। তার ফলে তাঁর সেই পুরাতন মৃগীরোগ আবার দেখা দিল। এই সময়েই তিনি এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন—'আমার কাছে ফ্রান্সের পতন মানেই পৃথিবীর ধ্বংস'। এই সময়ে তাঁর পরিচর্যা করতেন তাঁর ভাগ্নী, ক্যারোলিনের মেয়ে। তখন তিনি যে উপন্যাসটিতে হাত দিয়েছিলেন সেটি আর শেষ করতে পারেন নি। তখনকার উদীয়মান তরুণ লেখক গী দ্য মোপাসাঁ যখন একদিন ফ্লবেয়ারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন তিনি তাকে সস্নেহে বলেছিলেন—তোমার লেখা কিছু গল্প পড়েছি—তুমিই হবে ফ্রান্সের আগামী কালের শ্রেষ্ঠ বাস্তবধর্মী লেখক। ফ্লবেয়ারের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। ফ্রান্স আক্রান্ত হওয়ার পর আরো ছয়টি বছর

তিনি বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁর উনষাটতম বয়সে, ১৮৮০ সালের ৮ মে, দুপুর বেলায় গুস্তভ ফ্লবেয়ারের মৃত্যু হয়। তখন তিনি তাঁর লাইব্রেরী কক্ষে মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পরিচারিকা আহার্য নিয়ে এসে দেখে ফ্লবেয়ার তাঁর সোফায় বসে অসহায়ের মতো নাভিশ্বাস টানছেন, কিছুক্ষণ বাদেই শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেল।

ফরাসী কথা সাহিত্যের মেজাজ বা প্রকৃতি ফ্লবেয়ারের সময় থেকেই পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল এবং সেই কারণে পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের ওপর তাঁর প্রভাব পড়েছিল। যা আগে ছিল না, ফরাসী কথা সাহিত্যে তিনি তাই প্রবর্তন করে এক যুগান্তর সাধন করেছিলেন। চরিত্র-চিত্রণ আর বাস্তবতা এই দুটিই ফ্লবেয়ারের বিশেষ দান বলে স্বীকৃত হয়েছে। জোলা বলতেন, 'আমাদের সাহিত্যে, উপন্যাসের ক্ষেত্র একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়ে গেছেন ফ্লবেয়ার। তাঁর পরবর্তী উপন্যাসিকরা তাঁর সৃষ্ট এমার চরিত্রটিকে সামনে রেখেই তাঁদের উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রের পরিকল্পনা করতেন।'

ডি এইচ লরেন্স ফ্লবেয়ারের সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেছেন, 'A novel, if it is to live, must deal with one or more of the few great passions of life. Flaubert's novels heve magnificent fullness of life in movement" 'মাদাম বোভারি' উপন্যাসটিতে আমরা যা অনুভব করি তা হলো একটি সচল জীবনের পরিপূর্ণ উদ্ভাবন। ফরাসী কথাসাহিত্যে তো বটেই, এমন কি সামগ্রিকভাবে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যে প্রকৃত বাস্তবতা এসেছিল এমার চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই। ফ্লবেয়ার প্রতিভার বৈশিষ্ট এইখানেই।

থিওডোর ডস্‌টয়েভস্‌কি

(১৮২১-১৮৮১)

ঊনিশ:শতকের সপ্তম দশকের গোড়ায় পিটার্সবার্গের কোন সাহিত্য-সম্মিলনে যদি কেউ নিমন্ত্রিত হতেন তাহলে তাঁর দৃষ্টিপথে পড়তেন অনতিদীর্ঘবয়স্ক একটি ব্যক্তি। মুখখানি তাঁর দাড়িতে ভরা, কৃশ তনু, বিবর্ণ মুখ, সে মুখে বিপুল বেদনার চিহ্ন। অস্থির প্রকৃতি। তাঁর আকৃতি এমন ছিল যে, তাঁকে দেখলে একজন কৃষক বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কারণ যে পরিচ্ছদে তিনি নিজেকে সজ্জিত রাখতেন সেটাও ছিল অদ্ভুত ধরনের। তাঁর মাথায় চুল অল্পই ছিল, সেগুলি পিছন দিকে বিলম্বিত আর তাঁর ললাটদেশ ছিল সর্বদা কুঞ্চিত। মুখটা সব সময়েই আনত, মুখমণ্ডল বিষণ্ণতায় পূর্ণ। সহজে কেউ তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হত না, কারণ বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি সেই মানুষটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মতো কিছুই ছিল না। কিন্তু যদি কোনো প্রতিবেশীর কাছে খোঁজ নেওয়া যেত, যদি প্রিয়দর্শন টুর্গেনিভকেই (১৮১৮-১৮৮৩) জিজ্ঞাসা করা হতো, তাহলে তখনই জানা যেত যে সেই মানুষটি আর কেউ নন—তিনিই বিখ্যাত লেখক ডসটয়ভস্কি।

সত্যিই তাঁর বাইরের আকৃতি দেখে এই বিরাট প্রতিভাধর লেখক সম্পর্কে কিছু ধারণা করা কঠিন ছিল। তাঁর চোখ দুটি আপাতত দেখতে যদিও বিষণ্ণ ও শান্ত, তবু সেই চোখের দৃষ্টিতে প্রতিভার বিভা উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। পাঁচ মিনিট তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করলেই বুঝতে পারা যেত যে, এক সজীব ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। চুম্বকের মতোই সেই ব্যক্তিত্ব আকর্ষণ করত সকলকে। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী তাঁর এই বহু-নিন্দিত স্বামী সম্পর্কে বলেছেন—'পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ যদি কেউ থাকেন তবে তিনি হলেন আমার স্বামী থিওডোর ডসটয়ভস্কি। যে কোনো নারী এমন স্বামী নিয়ে গর্ব ও গৌরব বোধ করতে পারে।' কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তিই সত্যি, কারণ প্রকৃতপক্ষে ডসটয়ভস্কি ছিলেন একজন সেই শ্রেণীর মানুষ, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাদের বলা হয়ে থাকে দ্বিধা-বিভক্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। একটা প্রবল মানসিক ও আত্মিক বিক্ষোভ দ্বারা তাঁর সমগ্র সত্তা সর্বদা স্পন্দিত থাকত। এই যে বিক্ষোভ, এটাই তো ছিল তাঁর যাবতীয় সাহিত্যচিন্তা ও সাহিত্যকর্মের Motive Power বা প্রেরণা এবং বিষয়বস্তু। তিনি ছিলেন যুগপৎ দুষ্ট এবং সৎ, নীচ ও মহৎ এবং অতিমাত্রায় অহংসর্বস্ব মানুষ। আবার তেমনি সহৃদয়চিত্ত, তেমনি সংবেদনশীল। সমগ্র মনুষ্যজাতির মুক্তির জন্য তাঁর ছিল আন্তরিক আগ্রহ। এইসব বিচিত্র এবং বিপরীত গুণ ও দোষের সমাবেশেই গঠিত ছিল ডসটয়-চরিত্র এবং তাঁর প্রতিভারও বিকাশ সাধিত হয়েছিল ঠিক

সেইরকম বিপরীত চিন্তা-ভাবনার ভিতর দিয়ে। বিশ্বসাহিত্যে তাঁর অনুরূপ লেখক তাই বিরল।

কিন্তু এই অদ্ভুত ও জটিল চরিত্রের মানুষটিকে বুঝতে হলে তাঁর শৈশব-জীবনের পরিবেশ ও তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলী জানতে হয়, বুঝতে হয়। অক্টোবর ৩০, ১৮২১ সনে মস্কো শহরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে ডসটয়ভস্কির জন্ম হয়। সম্ভ্রান্তবংশীয় হলেও পিতা ছিলেন কৃপণস্বভাব, মদ্যপ, বদমেজাজী একজন ডাক্তার। চিকিৎসক নন, সার্জন অর্থাৎ শল্যচিকিৎসক। তাঁর জন্মের সতেরো বছর পরে ডসটয়ভস্কির পিতা তাঁর নৃশংস আচরণের জন্ম তাঁরই গৃহ-ভৃত্যদের হাতে নিহত হন। তাঁর যৌবনকাল অতিবাহিত হয় পিটার্সবার্গে—এই শহরই তাঁর কল্পনাকে অতিমাত্রায় উদ্দীপ্ত করেছিল। এর বিরাট অট্টালিকাশ্রেণী, সুদৃশ্য গীর্জা, রাজপথের উপর শ্রেণীবদ্ধ সোনালী রঙের প্রাসাদ, অস্তগামী সূর্যের আভায় আলোকিত নেভা নদী, পথে ক্ষুধার্ত ভিখারীদের মিছিল আর নীল আকাশের পটে পুঞ্জীভূত ধূম্রজাল —এই সবই তরুণ ডসটয়ভস্কির মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলত একটি অবাস্তব ও ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য। কিন্তু তিনি ছিলেন দরিদ্র আর তাঁর জীবন ছিল বৈচিত্র্যহীন। পিটার্সবার্গের সামরিক পূর্তবিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। সেখানে সামাজিকতার দিক দিয়ে বিত্তবান সহপাঠিদের সঙ্গে তিনি কিছুতেই পাল্লা দিয়ে উঠতে পারতেন না এবং প্রায়ই তিনি তাঁদের হাতে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হতেন। সহপাঠিদের এই উদ্ধত আচরণ তাঁর মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটেছিল। এর উপর তাঁর ছিল মৃগীরোগ; এই অসুস্থতার দরুণ ছাত্রজীবনে তাঁকে প্রায়ই বিড়ম্বিত হতে হতো।

তাঁর বয়স যখন আটাশ বছর, তখন রাজনৈতিক কার্যকলাপের অপরাধে তিনি ধৃত হলেন ও জেলের আলোবাতাসহীন একটি ছোট্ট কুঠরীর মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ রাখা হয়। আট মাস পরে তাঁর বিচার হয়। বিচারে তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতি প্রদত্ত হয় মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা। জারের আমলে এই রকম ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। ফাঁসির দিন একটি প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অসামীদের নিয়ে এসে একটি মঞ্চের উপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। যথারীতি দণ্ডাদেশ পঠিত হলো এবং আসামীদের মাথার উপর তখন একটি অনতিদীর্ঘ ইস্পাতের ছোরা ভেঙে দু'টুকরো করা হলো। এইবার গলায় নেমে আসবে ফাঁসির দড়ি। স্থির, অবিচলিত ভাবে ডসটরভস্কি তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর জন্ম প্রতীক্ষা করছিলেন। এমন সময়—জীবন ও মৃত্যুর সেই চঞ্চল মুহূর্তে আসামীদের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা মকুব হয়। মৃত্যুর পরিবর্তে দ্বীপ নির্বাসন দণ্ড। তাঁরা সেই মুহূর্তেই নির্বাসিত হলেন সাইবেরিয়াতে। সাইবেরিয়াতে নির্বাসন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর—একথা আসামীদের জানা ছিল। এখানে চোর, খুনী এবং আরো ভয়ঙ্কর প্রকৃতির অপরাধীদের সঙ্গে ডসটয়ভস্কির জীবনের একটি যন্ত্রণাদায়ক বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। এই জীবন্ত নরককুণ্ড থেকেই ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করলেন ঔপন্যাসিক থিওডোর

ডসটয়ভস্কি। দেহে ও মনে তিনি অনেকখানি অবসন্ন হলেও তাঁর সত্তা ছিল অটুট ও অদমিত। মানবাত্মার অতলদেশ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল তাঁর দৃষ্টি আর এই দৃষ্টি এমনই সুগভীর ছিল যে তাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা চলে। কালক্রমে তাঁর এই আশ্চর্য ক্ষমতা এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করল যে সকলের কাছে তিনি একজন উচ্চকোটির প্রতিভা বলে স্বীকৃত হলেন। রাশিয়ার তৎকালীন পাঠকসমাজ সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল যে 'here was a genious of the very highest order. It is inded, an astonishing faculty, this unearthing of layer after layer of human cosciousness, until we come down to the very springs of human behaviour.' যদি বলি এইভাবে মানবমনের রহস্য উদ্‌ঘাটন আমাদের চিরাভ্যস্ত ধ্যান-ধারণার ব্যাঘাত জন্মিয়েছে, তাহলে এই মূল্যায়ন সঠিক হবে না। এ যেন আমাদের অস্তিত্বের মূলদেশ ধরে নাড়া দিল। প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই ডসটয়ভস্কি ও তাঁর পাঠকদের মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান রচিত হয়নি ; এই কারণে অনেকেই ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বই পড়তে সক্ষম। আমরা মুগ্ধ হই আবার সেই সঙ্গে ধাক্কাও খাই। তাঁর চিন্তার গভীর তলদেশে কি কৃষ্ণবর্ণ অশুভ চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয় না? এবং এই জিনিসটা এমনই ভয়াবহ যে সময় সময় আমরা তাঁর বই পাশে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হই। আবার কিছুক্ষণ পরেই সেই বই হাতে তুলে নিতে হয়, কেননা এই অসাধারণ শিল্পীর আবেদন সত্যিই অপ্রতিরোধ্য। ডসটয়ভস্কি আমাদের চিরন্তন আত্মপ্রসাদের মূল ধরে নাড়া দিয়েছেন এবং সেই একই সময়ে তিনি আমাদের মুগ্ধ করেন, আবার চিত্তের শান্তিভঙ্গও করেন। আমরা বেশ অনুভব করতে পারি যে, তিনি যা কিছু বলেছেন তা সবই তাঁর জীবনের তিক্ততম অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত, বানিয়ে কিছু বলেননি। এই মানুষকেই তাঁর পাওনাদারের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করে, য়ুরোপে নির্বাসিতের জীবন যাপন করতে হয়েছিল।

ডসটভস্কির সমগ্র জীবনই ছিল একটি সুদীর্ঘ অন্তর্দ্বন্দ—সত্তার সঙ্গে বাসনার সংগ্রাম, যাকে বলা যায়—'struggle between the flesh and the spirit. বাঁচবার জন্য তাঁকে লিখতেই হতো, আর তিনি লেখনী চালনা করতেন দিবারাত্র—লিখতেন অত্যন্ত দ্রুত এবং উত্তেজিত ভাবে। তাঁর মস্তিষ্ক সেই সময় সর্বদাই যেন প্রচণ্ড উত্তপ্ত থাকত। দেনা পরিশোধ করবার জন্যই তাঁকে অবিশ্রান্ত লিখতে হতো। স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর থেকে ডসটয়ভস্কির জীবনে বা মনে সুখের লেশমাত্র ছিল না। অথচ এমন আশ্চর্য নিরাসক্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ডসটয়ভস্কি যে, তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য তিনি সংসারে কাউকে দায়ী করেন নি। জীবনের শত অভাব, অত্যাচার, নির্যাতন, লাঞ্ছনা আর প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যেও শিল্পী ডসটয়ভস্কি কোনদিন ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি ছিলেন না বা স্বধর্মচ্যুতও হননি কোনো দিন। তাঁর ব্যক্তিগত সুখদুঃখ তাঁর সাহিত্যকর্মের উপর কোনদিন ছায়াপাত করতে পারেনি। আবার তাঁর জীবনে এও দেখা গিয়েছিল

যে তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভেই তাঁর ভাগ্যে এমন প্রশংসা লাভ ঘটেছিল যার ফলে তার মাথা ঘুরে যাওয়ার দাখিল হয়েছিল। 'সবাই মনে করে আমি বুঝি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য'—এই কথা বলেছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই।

লেখক ডসটয়ভস্কি কি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন? না তিনি ছিলেন একজন খাঁটি শিল্পী, ছিলেন একজন দূরদ্রষ্টা। 'পুওর পিপল্', 'ব্রাদার্স কারমাজোভ', 'দি ইডিয়ট', 'দি জেনটল্ মেডেন', 'ক্রাইম য়্যাণ্ড পানিসমেণ্ট' প্রভৃতি উপন্যাসগুলির মধ্যে একজন দূরদ্রষ্টা শিল্পীর পরিচয় আছে। এই সংসারে নরনারীর স্বভাবের মধ্যে ভালো ও মন্দ কি অদ্ভুতভাবে মিশে আছে, তার রহস্য উদ্ঘাটনে ডসটয়ভস্কি যেরকম মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত খুব কম লেখকই তা পেরেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভার প্রকৃত সার্থকতা হলো উপন্যাসে ও গল্পে সমসাময়িক রাশিয়ার জীবনকে তুলে ধরা। একমাত্র তাঁরই রচনার মধ্যে আমরা যেন উনিশ শতকের সেই বিশাল—সদা অসুখী, সদা চঞ্চল দেশটির হৃৎস্পন্দন অনুভব করি। এর মধ্যে আমরা যা পাই, রোমাঁ রোলাঁর কথায় তাকে "savage poetic beauty" বলা যেতে পারে এবং সম্ভবত সেইজন্য ডসটয়ভস্কির উপন্যাসগুলিতে পরিবেশের সৌন্দর্য যতটা না ফুটেছে তার শতগুণ ফুটেছে মানবতার চিরন্তন এষণার সৌন্দর্য। সময়ের গতি তাঁর কাহিনীতে যেন নিশ্চল।

জীবনে ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে ডসটয়ভস্কি নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করে গিয়েছেন তারই মধ্যে মানুষ ডসটয়ভস্কিকে খুঁজে পাওয়া যায়। সুখের সন্ধানে তাঁকে বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে মৃত্যুর পূর্বে তিনি শান্তি ও সফলতা দুই-ই লাভ করতে পেরেছিলেন। তিনিই প্রথম য়ুরোপীয় ঔপন্যাসিক যিনি মানুষের আত্মাকে আবিষ্কার করেছেন এবং তারপর থেকেই এই বিষয়টি সাহিত্যে স্থান লাভ করে। সেই অতন্দ্র আবিষ্কারকের জীবনে বিশ্রাম বলতে কিছু ছিল না—অবশেষে একদিন তিনি সেই বিশ্রাম লাভ করলেন শান্ত ও নির্জন সমাধিভূমির তলদেশে।

লুই পাস্তুর

(১৮২২-১৮৯৫)

ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ১৮২২ সালের ক্রীসমাস পর্বের ঠিক দু'দিন আগে পাস্তুরের জন্ম হয়। তাঁর পিতা যোসেফ পাস্তুর ফরাসী সৈন্যদলে একজন সৈনিক ছিলেন এবং নেপোলিয়নের পতনের পর তিনি স্বগ্রামে একটি ট্যানারি বা চামড়া তৈরির কারখানা খোলেন। লুই-এর জন্মের অব্যবহিত পরে পাস্তুর পরিবার আরবয় নামে অপর একটি অঞ্চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। জায়গাটা তাঁর স্বগ্রাম থেকে বিশেষদূরবর্তী ছিল না ; কিন্তু ঐ স্থানটি ছিল ফ্রান্সের যে অঞ্চলে অপর্যাপ্ত আঙুর জন্মাতো ঠিক তারই মাঝখানে। যোসেফ পাস্তুর এখানে এসেও তাঁর ট্যানারির ব্যবসা করতে লাগলেন আর তাঁর স্ত্রী তত্ত্বাবধান করতেন গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজকর্ম। ষোল বছর বয়সে যোসেফ তাঁর পুত্রকে প্যারিসের একটি মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন এবং ঐ স্কুলের ছাত্রাবাসেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অল্পদিনের মধ্যেই বুঝলেন যে এই ছাত্রটি প্রতিভাবান, তার কল্পনাশক্তি যেমন প্রখর, বিদ্যার্জনে আগ্রহ ও উৎসাহ তেমনি প্রবল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে বড়ো হয়ে লুই নিশ্চয়ই একজন কৃতী শিক্ষক হবে। উনিশ বছর বয়সেই তিনি স্নাতক হয়ে একজন ছাত্র-শিক্ষক (Student-teacher) হলেন। কুড়ি বছর বয়সে পাস্তুর সোরবোর্ণে প্রবিষ্ট হলেন এবং এখানে তিনি খ্যাতনামা অধ্যাপক জে. বি. ডুমার অধীনে রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগলেন। বাইশ বছর বয়সেই তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর পরেই স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আমন্ত্রণ পেলেন সেখানে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা করবার জন্য। স্ট্রাসবুর্গ পাস্তুরের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে একটি কারণে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ম'সিয়ে লরেন্টের পরিবারেই তিনি আশ্রয়-লাভ করেছিলেন ও অল্পদিন পরেই লুই তাঁর সুন্দরী কনিষ্ঠা মেরীর অনুরাগী হয়ে ওঠেন। দু'সপ্তাহ পরেই তিনি মেরীর পিতামাতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। মেরীর পিতামাতা উভয়েই এই প্রস্তাবে সানন্দে মত দিলেন। পাস্তুরের পিতামাতাও। ১৮৪৮ সালের ২৯শে মে এই পরিণয় কার্য সমাধা হয়। পাস্তুরের বয়স তখন মাত্র ছাব্বিশ আর মেরির বয়স বাইশ বছর যখন তাঁরা পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই বিবাহ তাঁদের উভয়ের জীবনে সুখের হয়েছিল। পত্নী হিসাবে মেরী পাস্তুর বহুগুণের অধিকারিণী ছিলেন এবং তিনি সর্বাংশে তাঁর স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী ছিলেন। স্বামীর বিজ্ঞান-সাধনায় তিনিই ছিলেন তাঁর প্রেরণাদাত্রী।

এইবার আমরা পাস্তুরের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কথা আলোচনা করব। তাঁর

সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজের মধ্যে। ১৮৫৪। লিল্‌লের (Lille) বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস্তুর বিজ্ঞানের ফ্যাকলটির ডীন এবং প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। ফ্রান্সের বৃহত্তম শিল্প তখন ছিল ব্রুয়ারি (Brewery) বা মদ তৈরি করা। এই স্থানটি তখন ছিল এই শিল্পের কেন্দ্র। ফরাসী সরকারের রাজকোষে এই একটিমাত্র শিল্প থেকেই প্রচুর অর্থাগম হতো। এইখানে এসে পাস্তুর যে বিষয়টির রহস্যের উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত হলেন, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তার নাম হলো fermentation অর্থাৎ গাঁজন। তাঁর গোড়ার দিকের গবেষণা ছিল ক্রিস্‌টাল নিয়ে। তারপর তিনি টার্টারিক এ্যাসিড নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তখন এক জার্মান রাসায়নিকও এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিলেন। তখন পাস্তুরেরও দৃষ্টি পড়ল এই বিষয়টির উপর। এই নূতন গবেষণায় হাত দিয়ে তিনি যে রহস্যের সন্ধান পেলেন, পরবর্তিকালে রসায়নে তা যুগান্তর এনে দেয়।

আঙুর পচিয়ে ফরাসী দেশে মদ তৈরি করা হতো। একদিন অধ্যাপক পাস্তুরকে একটি মদ তৈরির কারখানা পরিদর্শন করার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তখন এই শিল্পে একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে, উৎপন্ন বিয়ারের মধ্যে কতকগুলি নিকৃষ্ট-শ্রেণীর হয় আর কতকগুলি একেবারেই অপেয় হয়। কি জন্য এটা হয়, তা বোঝা যেত না, কিন্তু এর ফলে সরকারের প্রচুর লোকসান হতো। তাঁকে কারখানার ভিতরে নিয়ে গিয়ে দুটি চৌবাচ্চা (vat) দেখান হলো ; তার একটিতে ছিল উৎকৃষ্ট বিয়ার, অপরটিতে নিকৃষ্ট বিয়ার। পাস্তুর চৌবাচ্চা দুটির মধ্যেকার হরিদ্রা বর্ণের সফেন পদার্থটি (yeast) বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন এবং ঐ পদার্থের নমুনা নিয়ে এসে তাঁর ল্যাবরেটরিতে নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করলেন, যা ইতিপূর্বে কখনো কেউ লক্ষ্য করেন নি। উৎকৃষ্ট চৌবাচ্চা থেকে প্রাপ্ত ঐ হরিদ্রা বর্ণের পদার্থটির আকৃতি ছিল গোলাকৃতি অর্থাৎ spherical আর নিকৃষ্ট চৌবাচ্চার পদার্থটির আকৃতি ছিল লম্বাকৃতি অর্থাৎ elongated এবং হরিদ্রা পদার্থের বস্তুকণার এই পার্থক্য থেকে পাস্তুর সিদ্ধান্ত করলেন যে, গেঁজে যাওয়ার সময় চৌবাচ্চার মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোনো পদার্থের মিশ্রণ ঘটে থাকবে এবং তারই ফলে বিয়ার টকে যায়। আরো গবেষণা করে তিনি এই তথ্যে উপনীত হলেন যে, চৌবাচ্চার মধ্যেকার কোন পদার্থ বিশেষের সংস্পর্শে এই রকম পরিবর্তন সাধিত হয়নি, কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে বাইরের বাতাসের সংস্পর্শেই। এই সিদ্ধান্ত থেকেই তিনি আবিষ্কার করলেন যে বাতাসের মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য জীবাণু। সঙ্গে সঙ্গে এ-যাবৎকাল প্রচলিত বিজ্ঞানজগতের একটি ভ্রান্ত মতবাদের অবসান ঘটল— spontaneous generation-এর থিওরি বাতিল হয়ে গেল। অজৈব পদার্থ থেকে সজীব পদার্থ উৎপন্ন হয়—এই কথাই এতকাল বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে আসছিলেন। পাস্তুর তাঁর দীর্ঘ দশ বৎসরকালব্যাপী একাগ্র গবেষণার ফলে এই প্রচলিত মতবাদের পরিবর্তন ঘটালেন।

যুগান্তকারী এই আবিষ্ক্রিয়ার ফলে ১৮৬৪ সালে পাস্তুর তাঁর সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক বলে স্বীকৃত হলেন।

১৮৬৫। রেশম শিল্প ফরাসী দেশের অন্যতম শিল্প ছিল তখন। কিন্তু রেশমের মূল উপাদান গুটিপোকার মধ্যে হঠাৎ এমন একরকমের রোগ দেখা দিল যার ফলে ঐ শিল্পের প্রভূত ক্ষতি হতে থাকে। তখন ফরাসী সরকার পাস্তুরকে অনুরোধ করলেন এই বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য। তিন বছর গবেষণা করে তিনি দুইটি বিশেষ রোগের জীবাণু আবিষ্কার করলেন এবং তাদের হাত থেকে গুটিপোকাদের রক্ষা করার পদ্ধতিও উদ্ভাবন করলেন। শুধু তাই নয়—জীবাণুর সংক্রমণও বুঝবার পদ্ধতি বের করলেন। এই সময়ে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং তিনি প্রায় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু অদম্য ছিল তাঁর মানসিক বল; ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েই তিনি প্যারিসে এসে তাঁর গবেষণা কার্য চালাতে থাকেন। ১৮৬৭ সনে তিনি প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর পর থেকেই তিনি জীবাণু-তত্ত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা করতে থাকেন এবং ১৮৭৭ সালে এ্যানথ্রাকস্ সম্পর্কে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন এবং দুই বৎসরের মধ্যেই মুরগীর বাচ্চাদের মধ্যে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি মানবদেহে আধিব্যাধির স্বাভাবিক ইতিহাস অর্থাৎ রোগের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে সমর্থ হন। পাস্তুরের আবিষ্কারগুলির মধ্যে একটি স্বাভাবিক পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায়। ফার্মেনটেশন সমস্যার সমাধান থেকে তিনি বাতাসের মধ্যে রোগ বীজাণুর সন্ধান পান আর মুরগী-বাচ্চাদের কলেরা রোগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি রোগ উৎপাদনকারী জীবাণুর (microbe) সন্ধান পান। এর থেকে তিনি সাংঘাতিক ধরনের স্ফোটকের (চিকিৎসাবিজ্ঞানে এরই নাম হলো anthrux) কারণ নির্ণয় করতে সমর্থ হন। এই সাংঘাতিক অসুখ শুধু গবাদি পশুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মানুষেরও হতো। অবশেষে এলো তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। হাইড্রোফোবিয়া বা কুকুরে দংশন করার ফলে জলাতঙ্ক ব্যাধির কারণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করলেন। এ্যানথ্রাক্স ও জলাতঙ্ক ব্যাধির গবেষণা করতে গিয়েই তিনি inoculation যা রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করানব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। পাস্তুরের নাম যে আজ সমগ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত তা তাঁর এই inoculation পদ্ধতির আবিষ্কারের জন্যই। এই জলাতঙ্ক ব্যাধির বিরুদ্ধে তিনি যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তারই পরিণতি হলো ১৮৮৮ সনে স্থাপিত পাস্তুর ইনস্টিটুটি। আগে পাগলা কুকুরে কামড়ানোর কোনো চিকিৎসা ছিল না; গ্রামের কর্মকার ক্ষতস্থানে উত্তপ্ত লৌহশলাকা প্রয়োগ করত। তাঁর শৈশবে এই প্রক্রিয়ার ফলে একজন ভাগ্যবান রোগীর রোগমুক্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন পাস্তুর। অর্ধশতাব্দীকাল পরে তিনি ঐ হাতুড়ে চিকিৎসাকেই বিজ্ঞানসম্মত একটি নিরাপদ ও ফলপ্রদ পরিণতি প্রদান করেছিলেন।

তখন জলাতঙ্ক ব্যাধি সমগ্র ফরাসী দেশে তুমুল আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে এবং

চিকিৎসকগণ এই ব্যাধির চিকিৎসার কোনো সঠিক পদ্ধতিই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পাস্তুরের গবেষণাগারে এই মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক টীকা বা সিরাম আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু ঠিক কি পরিমাণ সিরাম ও কি শক্তির সিরাম ফলপ্রসূ হবে সেটা তখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এই কঠিন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বৈজ্ঞানিক মাসের পর মাস উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করতে লাগলেন। একটি রোগীর জীবনকে বিপদাপন্ন না করে, কেমন করে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত টীকা প্রয়োগ করবেন, এই চিন্তায় তিনি যেন অস্থির হলেন; কারণ বিনা পরীক্ষায় তো কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। অবশেষে সেই সুযোগ এলো।

যোসেফ মিস্টার নামক একটি বালককে একটা মারাত্মক পাগলা কুকুরে কামড়িয়েছিল। তাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো তখন সকলেই রোগীর জীবনের আশা ত্যাগ করেছেন। এই সংবাদ পেয়ে পাস্তুর (যিনি এযাবৎকাল তাঁর উদ্ভাবিত প্রতিষেধক প্রক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে কুকুরের শরীরে প্রয়োগ করে আসছিলেন) ঐ শিশুর উপর ঐ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে দেখতে চাইলেন। তারপর উপর্যুপরি নয়দিন ধরে পাস্তুর বিভিন্ন শক্তির সিরাম বালকের শরীরে প্রয়োগ করতে থাকেন এবং তিন সপ্তাহ পরে তিনি ঘোষণা করলেন যে, রোগীর জীবনরক্ষা সুনিশ্চিত। এই কথা শুনে হাসপাতালের চিকিৎসকগণ বিস্মিত হন, কেউবা সন্দেহ প্রকাশ করেন, আবার অন্তরালে উপহাসও করেন কেউ কেউ। কুকুরে কামড়াবার প্রায় চারমাস পরে যোসেফ মিস্টার যখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে হাসপাতাল থেকে বহির্গত হলো তখন পাস্তুরের আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না।

পৃথিবীর চারিপ্রান্তে এই সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে গেল। বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজ অভিনন্দিত করলেন পাস্তুরকে। এ্যান্টিসেপটিক সার্জারির আবিষ্কর্তা লিস্টার তাঁকে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনন্দিত করবার সময়ে প্রকাশ্যে পাস্তুরের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করলেন। ফরাসীর আকাদেমির তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। দেশ-বিদেশের বিদগ্ধমণ্ডলী থেকে আসতে থাকে অজস্র অভিনন্দন। ১৮৯২ সালে যখন তাঁর বয়স সত্তর বৎসর পূর্ণ হয়, তখন প্যারিসে যে উৎসব হয়, তাতে সমগ্র পৃথিবীর প্রতিনিধিস্থানীয় বিজ্ঞানীরা সমবেত হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। 'বিজ্ঞানকে এক নূতন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করে, নূতন তথ্য সমৃদ্ধ করে তিনি নিখিল মানবের নীরোগ ও সুস্থ জীবনের পথ যেভাবে সুগম করে দিয়েছেন, তার তুলনা নেই এবং আগামীকালের বিজ্ঞানীরা লুই পাস্তুরের কাছে অধমর্ণ হয়ে থাকবে'—এই উক্তি সেদিনকার উৎসব সভায় করেছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড লিস্টার। শিশুর মতো সরল, সন্ন্যাসীর মতো অনাড়ম্বর এবং বিরাট বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অধিকারী পাস্তুরকে বলা হয়েছে ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। ১৮৯৫, ২৭শে সেপ্টেম্বর পাস্তুরের মৃত্যু হয়। মানব সমাজের উন্নতি ও কল্যাণসাধনে এই বিজ্ঞানীর অবদানই তাঁকে প্রদান করেছে অমরত্ব।

যোসেফ লিস্টার

(১৮২৬-১৯১২)

উনিশ শতকের সূচনাকালে শল্য-চিকিৎসকগণ খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করতেন যে, শরীরের কোনো অংশে অস্ত্রোপচারের জন্য যদি কোন ব্যক্তিকে হাসপাতালের সার্জিকাল ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয় তাহলে রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈনিকদের মৃত্যুর আশংকা অপেক্ষা ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর আশংকা অধিক। তখনকার দিনে হাসপাতালে অস্ত্রোপচার বিভাগে রুগীদের মধ্যে গ্যাংগ্রিণজনিত মৃত্যুর প্রাবল্য রীতিমতো বিভীষিকার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দৈবক্রমে যদি কোনো রুগীর জীবনরক্ষা হতো তাহলেও আজীবন তাকে চিররুগ্ন (Invalid) হয়ে জীবন কাটাতে হতো। এই মহামারী এত ঘন ঘন দেখা দিত যে, সকলেই এই সিদ্ধান্ত করতেন যে অস্ত্রোপচারের অনিবার্য ফলরূপেই এর প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। কথাটা মিথ্যা ছিল না। রক্তদুষ্টি-জনিত (Sepsis) মৃত্যুর হার হাসপাতালে এমন ভয়াবহ ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার বিভাগে উন্নতির পথ একেবারেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। রুগীরা অস্ত্রোপচারের নামে আতঙ্কে শিউরে উঠত, কারণ সকলের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, অস্ত্রোপচার মানেই সুনিশ্চিত মৃত্যু। আর সে মৃত্যু ছিল যন্ত্রণাদায়ক। মৃত্যু যেন শরীরে গ্যাংগ্রিণের বেশে রুগীর শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে তার হিমশীতল হাতের স্পর্শ রেখে দিত। তখন চিকিৎসা বিজ্ঞানে anaesthetics-এর আবিষ্কার হয়েছে এবং এই মূল্যবান আবিষ্কারের ফলে অস্ত্র-চিকিৎসকগণ দুঃসাধ্য অস্ত্রোপচারগুলি করবার জন্য অনেকক্ষণ সময় পেতেন। কিন্তু এ্যানেসথিসিয়া পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও রক্তদুষ্টিজনিত মৃত্যুর হার কমল না। চিকিৎসা জগতের এই বিভীষিকা যিনি চিরদিনের মতো লুপ্ত করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর নাম যোসেফ লিস্টার। এ্যানেসথিসিয়ার আবিষ্কর্তাদের পাশেই এই যোসেফ লিস্টারকেও আধুনিক অস্ত্রোপচার বিজ্ঞানের জনক বলা হয়ে থাকে।

যোসেফ এক অতি মার্জিতরুচি, শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতি সুন্দর পরিবেশের মধ্যেই তাঁর শৈশব ও বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর শৈশব জীবনের কথা বলতে গিয়ে যোসেফ লিস্টার পরবর্তিকালে লিখেছিলেন। **'It was in a comfortable, cultured home atmosphere, amid beautiful surroundings that I grew up.'** এই পরিবেশের মধ্যেই পিতা ও পুত্রের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁরা দু'জনেই যে শুধু প্রকৃতির অনুরাগী ছিলেন তা নয়, বিজ্ঞানেও ছিল তাঁদের উভয়ের সমান আগ্রহ এবং মেজাজের দিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্ক এমন নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে, যখনই কোনো একটা বিষয়ের আলোচনায় যোসেফ অসুবিধার সম্মুখীন হতেন অমনি তার সমাধানের জন্য তিনি তাঁর পিতার আশ্রয় নিতেন। তাঁর বয়স যখন সবেমাত্র বারো বছর তখনই লিস্টার একজন চিকিৎসক হবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল যে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের পূর্বে পুত্র উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে। তাই পিতার ইচ্ছানুসারে প্রথম দু'বছর অধ্যয়নের পর তিনি সাহিত্যে স্নাতক হন এবং তারপর স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতালে প্রবিষ্ট হন। ১৮৫২ সনে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক হন এবং এর কিছুকাল পরেই রয়াল কলেজ অব সার্জন-এর ফেলোসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি কিছুকাল গবেষণার কাজ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল আইরিস—'musculature of the iris' অর্থাৎ চক্ষের যে সূক্ষ্মতম অংশটিকে 'আইরিস' বলা হয় তার পেশীসমূহের অবস্থান ও ক্রিয়া। এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি প্রমাণ করলেন (যা ইতিপূর্বে কোনো শারীর বিজ্ঞানী উপলব্ধি করতে পারেননি) যে, আইরিসের দুটি পেশী আছে যা চক্ষুতারকার প্রসারণ ও সংকোচন ঘটায়। একটি বিখ্যাত পত্রিকায় যোসেফ তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশ করলেন এবং তখন থেকেই চিকিৎসাজগতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন 'ডাক্তার যোসেফ লিস্টার'—এই নামটি তখন থেকেই চিকিৎসক সমাজে সকলের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

এরপর তিনি ত্বকের অনায়ত্ত পেশী (involuntary muscles of the skin) নিয়ে গবেষণা করেন। এই পেশীর ফলেই মানুষের ত্বকের উপর Grease flesh নামে দুরারোগ্য চর্মরোগ একপ্রকার দেখা দিত। এ গবেষণাতেও যোসেফ সাফল্য লাভ করেন। পরপর এই দুটি গবেষণায় সাফল্য লাভ করার ফল এই হলো যে, চিকিৎসা জগতে তিনি বিশেষ ভাবেই চিহ্নিত হলেন এবং তার সমকালীনদের মধ্যে তাঁর জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট হলো। তিনি কিছুকাল লণ্ডনের একটি হাসপাতালে হাউস-সার্জনের কাজও করেছিলেন। অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করার জন্য ইংলণ্ডে তখন যে কয়টি বিদ্যায়তন ছিল সেগুলির মধ্যে এডিনবরা মেডিক্যাল স্কুলটিই ছিল শীর্ষস্থানীয়। লিস্টার এইখানে একমাস অধ্যয়ন করার জন্য অনুমতি লাভ করেছিলেন এবং তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র চিকিৎসক অধ্যাপক জেমস সাইমসের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় ও উভয়ে উভয়ের প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে একমাসের অধ্যয়ন একাধিক মাসে গিয়ে দাঁড়াল। অতঃপর যোসেফ লিস্টারকে আমরা দেখতে পাই এডিনবরার একটি বিখ্যাত হাসপাতালের হাউস সার্জন রূপে। অধ্যাপক সাইমসও এই হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে এডিনবরা কলেজ অব সার্জনস-এর অস্ত্রচিকিৎসার অধ্যাপককে ক্রিমিয়া যুদ্ধে চলে যেতে হয় এবং সেখানেই অল্পকাল পরে কলেরায় তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বন্ধু অধ্যাপক সাইমস-এর

পরামর্শক্রমে লিস্টার ঐ পদের জন্য একজন প্রার্থী হলেন ও তাঁরই আবেদন পত্র গৃহীত হয়। এতবড়ো একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি সম্পূর্ণ-ভাবে কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন।

১৮৫৬ এ্যাগনেস সাইমস নাম্নী এক তরুণীকে তিনি ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য কন্টিনেন্ট ভ্রমণে বেরুলেন। এই সময়ে ডাক্তার লিস্টার বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই ফ্রান্স, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইতালির হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলি পরিদর্শন করে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে-ছিলেন। অধ্যাপনার অবসরে লিস্টার গবেষণা করতে থাকেন। আমন্ত্রণ এলো গ্লাসগো থেকে সেখানকার মেডিক্যাল কলেজে অস্ত্র চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার জন্য। তিনি পিতার অনুমতি চেয়ে পাঠালেন। পিতার অনুমতি পাওয়ার পর লিস্টার দম্পতি ১৮৬০ সনে গ্লাসগোতে চলে এলেন। গ্লাসগোর হাসপাতাল প্রতিভাধর এই অস্ত্রচিকিৎসকের জীবনের দিক-পরিবর্তন সূচিত করে দিয়েছিল। এইখানেই হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলি পরিদর্শন করবার সময় তাঁর মনে সর্বপ্রথম প্রশ্ন জেগেছিল—এই যে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করার পর গ্যাংগ্রিণজনিত মারাত্মক ক্ষত দেখা দেয়, এর কি কোনো প্রতিষেধক নেই? এবং তখন থেকেই এই বিষয়ে কিছু করবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হন।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ইংলণ্ডের হাসপাতালগুলিতে (এবং য়ুরোপের সব হাসপাতালেই) অস্ত্রোপচারে সময় যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হতো না, কারণ তখনো পর্যন্ত Surgical hygiene বা anti-sepsis hygienc এর তথ্য অপরিজ্ঞাত ছিল বললেই হয়। ডাক্তার এফ. উইলিয়াম কর্কের একটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে, 'The surgeon wore no sterilized gown or gloves; the instruments were handled freely; the wound was tied with ligatures taken form the buttom-hole of the assisting-surgeon.' এবং এই কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচারের পর রক্তদুষ্টিজনিত রোগ Septicaemia)দেখা দিত। তখনো পর্যন্ত অস্ত্রচিকিৎসকগণের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ওয়ার্ডের দূষিত পরিবেশের মধ্যে যেসব রোগজীবাণু (Germs) রয়েছে তাদের জন্যই অস্ত্রোপচারের পর রক্তদুষ্টি দেখা দেয়। প্রথম প্রথম লিস্টারও এই ধারণা সমর্থন করতেন। তখন তিনি দুইটি রোগীর শয্যার মধ্যবর্তী স্থানের ব্যবধান বৃদ্ধি করে দিলেন এবং দেখলেন তাতেও যখন রক্তদুষ্টি নিবারিত হলো না তখন তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল—'There must be another cause'—অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এর অন্য কারণ আছে।

বিষয়টি তাঁর মস্তিক আলোড়িত হতে থাকে এবং তিনি অস্ত্রোপচারের পর রক্তদুষ্টির কারণ সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করতে থাকেন। ক্ষতস্থানে ড্রেসিং করার পদ্ধতি নিয়েও নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর কোন কূল-কিনারা পান না। এমন সময়ে তাঁর এক সতীর্থ তাঁর কাছে ফরাসী

রাসায়নিক লুই পাস্তুরের গবেষণা-লব্ধ ফলের কথা উল্লেখ করেন। সেই যুগান্তকারী গবেষণার ফলের সূত্র ধরে ডাক্তার লিস্টার এইবার অগ্রসর হলেন। পাস্তুর দেখিয়েছিলেন যে, তিনটি উপায়ে রোগজীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব, যথা—filtration, heat ও antiseptics-এর প্রয়োগ। শেষোক্ত পদ্ধতিটি নিয়ে লিস্টার পরীক্ষা করলেন। অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থানটি তিনি কার্বলিক এ্যাসিড দিয়ে মুছে দিলেন। এর ফলে রক্তদুষ্টি নিবারিত হলো বটে, কিন্তু রোগীর ক্ষতস্থানে অসম্ভব জ্বালা অনুভূত হতো। তিনি তখন কার্বলিক এ্যাসিডের পরিবর্তে অপর একটি রোগ-জীবাণু নাশক বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। অতি ধৈর্যসাপেক্ষ ছিল তার এই গবেষণা। অবশেষে ১৮৬৭ সালে 'The Lancet' পত্রিকায় যখন তিনি Antiseptic surgery সম্পর্কে তাঁর গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ করলেন তখন চিকিৎসা জগতে তুমুল সাড়া পড়ে গেল। বিতর্কের সৃষ্টি হলো এবং অনেকে এর বিরুদ্ধে মতও প্রকাশ করলেন। ক্লোরোফর্মের আবিষ্কর্তা স্যার জেমস সিমসনই প্রবল ভাবে লিস্টারের মতের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন।

তিনি হতাশ হলেন না। প্রতিপক্ষদের সমস্ত আক্রমণকে বাধা দিয়ে তিনি একাগ্রচিত্তে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং ১৮৭৯ সনে তিনি চূড়ান্ত সফলতা লাভ করলেন। লণ্ডনের সমস্ত হাসপাতালে লিস্টার উদ্ভাবিত য়্যান্টিসেপটিক পদ্ধতি গৃহীত হলো। এবং এর ফলে হাসপাতালগুলির সার্জিকাল ওয়ার্ডের দৃশ্য যেন এক মুহূর্তে বদলে গেল। সমগ্র য়ুরোপে তার গবেষণার জয়ধ্বনি উঠল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করলো, ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁকে ব্যারনেট করলেন আর একাধিক বৈদেশিক রাষ্ট্র তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করলেন। তাঁর আশীতিতম জন্মদিবসে লিস্টার লাভ করলেন ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজসম্মান—'ফ্রীডম অব দি সিটি অব লণ্ডন।' এইভাবে অস্ত্রচিকিৎসায় যুগান্তর এনে দিয়ে, ১৯১২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে পঁচাশী বছর বয়সে এই বিজ্ঞানী পরলোক গমন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি আজ সমগ্র পৃথিবীতে 'লিস্টার য়্যান্টিসেপটিকস' এই নামে পবিচিত।

মৃত্যুর কিছুকালপূর্বে তাঁর জীবনব্যাপী বিজ্ঞান সাধনার প্রসঙ্গে লিস্টার বলেছিলেন, 'I am utterly convinced that science will trumph over ignorance, that the future will belong to those who have done the most for the sake of suffering humanity'. আজকের মানুষ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছে এই উক্তির সত্যতা।

হেনরিক ইবসেন

(১৮২৮–১৯০৬)

সেক্সপীয়রের বহুকাল বাদে য়ুরোপের নাট্যসাহিত্যে এক নতুন চেতনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন ইবসেন। বস্তুত তাঁর সময় থেকেই য়ুরোপের নাট্যসাহিত্যে একটা যুগান্তর দেখা দিয়েছিল। সেই যুগান্তরের পথেই পরবর্তিকালে দেখা দিলেন একাধিক নবীন নাট্যপ্রতিভা—বার্ণাড'শ, চেকভ এবং পিরানদেলো। এঁরা প্রত্যেকেই ইবসেনের নাট্যচেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

১৮২৮, মার্চ ২০। নরওয়ের দক্ষিণ অঞ্চলের স্কিয়েন শহরে জন্মগ্রহণ করেন হেনরিক ইবসেন। ইবসেন পরিবার বিত্তশালী ছিলেন। হেনরিকের বাবা তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ছিলেন এবং তাঁর অবস্থা বেশ ভালই ছিল। হেনরিকের বয়স যখন মাত্র আট বছর তখন তাঁর পিতা দেউলিয়া হয়ে গেলেন। আর্থিক দুরবস্থা পরিবারকে বাধ্য করল শহরের সুসজ্জিত গৃহ পরিত্যাগ করে একটা অপরিচ্ছন্ন খামার বাড়িতে গিয়ে বাস করতে।

শেষ পর্যন্ত তিনি ষোল বছর বয়সে নরওয়ের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত গ্রিমস্টাড নামে একটি বন্দরে এক ঔষধ বিক্রেতার দোকানে শিক্ষানবিশী করেন। এখানে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। অবসর সময়ে কবিতা লিখতেন—সে সব কবিতার বেশির ভাগ ছিল গ্রামের লোকদের নিয়ে লেখা ব্যাঙ্গাত্মক ছড়া' আর সেই সঙ্গে তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে, তিনি তাঁদের পারিবারিক সৌভাগ্য আবার ফিরিয়ে এনেছেন।

সাবালক হওয়ার আগেই সমকালীন সমাজ ইবসেনকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর প্রথম সার্থক সাহিত্যিক প্রয়াস ছিল এক বিদ্রোহীর জয়গান। বইটির নাম 'Catiline'—কবিতায় নাটক। ছন্দের দিক দিয়ে অপরিণত হলেও, নাটকটিতে এক বিদ্রোহীর সংগ্রাম ও পরাজয়ের কাহিনী চিত্তস্পন্দী ভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

'ক্যাটিলিন' প্রকাশিত হওয়ার পর ইবসেন ক্রিশ্চিয়ানাতে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য, কিন্তু পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন। তখন সাংবাদিক হওয়ার চেষ্টা করলেন। তেইশ বছর বয়সে উপনীত হয়ে তিনি দেখলেন তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন। সেই অবস্থা থেকে তিনি উদ্ধার পেলেন অপ্রত্যাশিত ভাবে। বার্গেনে তখন সদ্য স্থাপিত হয়েছে একটি থিয়েটার। এইখানে তিনি স্টেজ ম্যানেজারের চাকরি পেয়ে গেলেন। ছয় বছর বাদে তিনি ক্রিশ্চিয়ানার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের পরিচালকের পদে নিযুক্ত হলেন। বার্গেনের থিয়েটারটির তুলনায় এটি ছিল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। তখন তাঁর বয়স উনত্রিশ বছর।

এখানে তিনি পাঁচ বছর কাজ করেন, কিন্তু এর পরেই দর্শকের অভাবে এই থিয়েটারটি দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এই রঙ্গালয়ে চাকরি করার সময়ে উনত্রিশ বছর বয়সে ইবসেন সুসালা থোরেসেন নাম্নী একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। মেয়েটি ছিল এক জনপ্রিয় লেখকের কন্যা।

পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বছরের মধ্যে তিনি আধডজন নাটক লিখেছিলেন। লোকগাথার ভিত্তিতে রচিত এই নাটকগুলির মধ্যে জাতীয় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। একমাত্র 'Lover's Comedy' নাটকে পরিণত শিল্পকর্মের কিছু আভাস পাওয়া যায়। প্রেম ও বিবাহ নিয়ে রচিত শ্লেষাত্মক এই নাটকটি অনেক নাট্যরসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইবসেনের বয়স তখন ছত্রিশ বছর, জীবিকানির্বাহ কঠিন হয়ে উঠেছে—রঙ্গালয়হীন নাট্য পরিচালকের জীবন ক্রমেই যেন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। নাট্যকার অনন্যোপায় হয়ে রোমে চলে গেলেন। এখানে তাঁর জীবনের পাঁচটি বছর অতিবাহিত হয়েছিল। রোমে আসার কয়েক বছর পরে ইবসেন দুটি বিভিন্ন ভাবের ও ভিন্ন স্বাদের নাটক রচনা করেন—'Brand' ও 'Peer Gynt' এই ছিল নাটক দুইটির নাম। এই নাটক দুটি থিয়েটার জগতে প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়েছিল। এই নাটক দু'টিতেই ইবসেন তাঁর প্রতিভার প্রাথমিক স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

চল্লিশ বছর বয়সে ইবসেন জার্মানিতে এসে বেশির ভাগ সময় মিউনিখে বাস করতেন, এবং মাঝে মাঝে ইতালি যেতেন। ড্রেসডেনে অবস্থানকালে 'Emperor and Galileon' শীর্ষক তাঁর তৃতীয় বিপুলায়তন নাট্যকাব্যটির রচনা শেষ করেন। রোমে অবস্থানকালে তিনি এটি লিখতে শুরু করেছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীতে পৌত্তলিকতা ও খ্রীস্টানধর্মের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলেছিল তারই প্রেক্ষাপটে এটি রচিত হয়। যেহেতু পৃথিবীর জীবনে দুটি অসমঞ্জস শক্তির সংঘর্ষ হলো এই নাটকের বিষয়বস্তু, সেইজন্য নাট্যকার এটিকে বিশ্ব-ঐতিহাসিক নাটক ('World historical drama') বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ঐতিহাসিক জাঁকজমকের তলদেশে 'এম্পারার অ্যাণ্ড গ্যালিলিয়ান'-এর মূল সুরটি হলো ঐকান্তিক ধর্মোপদেশ যাকে বলা যেতে পারে নৈতিক ঐক্যের জন্য একটি ব্যক্তিগত আবেদন। ইবসেনের বক্তব্য হলো—যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে বিশ্বাস করতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যকে বিশ্বাস করতে পারে না। পঞ্চাশ বছরে উপনীত হয়ে ইবসেন অলংকার-ভূষিত রোমান্টিক নাটক রচনা পরিত্যাগ করলেন এবং আধুনিক জীবন নিয়ে বাস্তবতায় ভাস্বর গদ্যনাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন—যে নাটক, বার্নার্ড শ'য়ের কথায় 'আদর্শবাদিতার অনিষ্টকে অনাবৃত করে দেখাবে।' তাঁর প্রথম বাস্তবধর্মী নাটকটির নাম 'Pillars of the Society'; নাটকের এই শ্লেষাত্মক শিরোনামটিতেই এর বক্তব্য সুপরিস্ফুট। ভণ্ডামীর একটি কদর্য দলিল এই নাটক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মিথ্যা সম্ভ্রমবোধের প্রতি ইবসেনের ঘৃণা যেন সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে এখানে; বিভিন্ন ধরনের কত চরিত্রের সমাবেশ তিনি ঘটিয়েছেন এই

নাটকে ; মেদবিপুল ধর্মোপদেশ প্রদানকারী, কুৎসিত ব্যবসায়ী, মিথ্যাবাদী ও কালানুবর্তী ইত্যাদি। তাঁর লক্ষ্য ছিল সেই সম্প্রদায় যার প্রতি গড়পরতা নাগরিকের আনুগত্য সুস্পষ্ট। এই সম্প্রদায় যেন রাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র অনুলিপি আর রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের শত্রু। নিজেকে একজন দার্শনিক বিপ্লবী বলে ঘোষণা না করেও, ইবসেন স্বীকার করতেন যে তিনি আদৌ গোঁড়ামির উপাসক নন ; তাঁর কাছে স্বাধীনতা ছিল প্রথম ও সর্বোচ্চ বিবেচনার বিষয়।

এর পরেই ইবসেনের লেখনী থেকে নাট্যানুরাগীরা পেলেন 'A Doll's House' আর 'Ghosts' নামে দুটি যুগান্তকারী নাটক। চিরাচরিতের বিরুদ্ধে নাট্যকারের চ্যালেঞ্জ এখানে আরো উচ্চকিত, আরো বলিষ্ঠ। 'বিবাহ-বন্ধন অতি সুপবিত্র'—এই চিরাচরিত ধারণার মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন তিনি, 'এ ডলস্ হাউস' নাটকে।

'ঘোস্টস্' নাটকটি এক কুলবধূ ও জননীর জীবনের বিয়োগান্ত কাহিনী। ইবসেনের এই নাটকটির সঙ্গে কোন কোন গ্রীক ট্র্যাজেডির সাদৃশ্য আছে।

নাটক দুটি ক্রুদ্ধ সংবাদপত্রে নিন্দিত হলো ; ক্ষুব্ধ জনসাধারণও নাট্যকারের উদ্দেশ্যে জানাল প্রচণ্ড ধিক্কার। 'ডলস্ হাউস' নাটকটি দুর্নীতিমূলক নাটক বলে চিহ্নিত হলো। জার্মানীতে যখন এই নাটকটি অভিনীত হয় তখন বার্লিন, হামবুর্গ ও ভিয়েনার নাট্যামোদী দর্শকদের অনুরোধে ইবসেনকে নাটকের শেষ দৃশ্যের পরিবর্তন করতে হয়েছিল। সকলেই নাটকের মিলনাত্মক পরিণতি দাবী করেন। কিন্তু 'ঘোস্টস্' নাটকটিই নির্দয়ভাবে সমালোচিত হয়েছিল। বিখ্যাত নাট্য সমালোচক এবং ইবসেনের নাটকাবলীর ইংরেজী অনুবাদক, উইলিয়াম আর্চার বলেছেন যে, সেসব সমালোচনায় যেন বিষ মেশানো থাকত। নাটকখানি তো নির্মমভাবে সমালোচিত হয়েই ছিল, এমন কি সমালোচকরা নাট্যকারকে পর্যন্ত রেহাই দেননি—অকথ্য গালিগালাজ বর্ষিত হয়েছিল তাঁর প্রতি।

ইবসেন এর প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন 'An Enemy of the People' নামক পরবর্তী নাটকে। বিবাহের চিরাচরিত প্রথাকে আক্রমন করে সমাজে তিনি সাড়া জাগিয়েছিলেন ; এবার তাঁর আক্রমনের বিষয় ছিল ব্যবসাদারি রাজনৈতিক আদর্শ। প্রথমে তিনি এই নাটকটি কমেডি হিসাবে পরিকল্পনা করেন, পরে এটি একটি ক্রুদ্ধ শ্লেষের রূপ নিয়েছিল। এটি তিনি যখন রচনা করেন তখন ইবসেনের বয়স চুয়ান্ন বছর। সমাজের তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভণ্ডামী, ইতরামির চাপে এক সৎলোকের অধঃপতনের কাহিনী হলো এই নাটকের উপজীব্য এবং সেই সঙ্গে পেশাদার সংবাদপত্রগুলি অর্থের বিনিময়ে কিভাবে এই সম্প্রদায়কে সমর্থন করে থাকে তার নগ্নচিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে এই নাটকে। এদেরই সমাজের শত্রু বলা হয়েছে। পঞ্চাশের মাঝামাঝি এসে ইবসেনের চিন্তা তাঁর ভবিষ্যতকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে। তখন থেকে তাঁর নাটকের শুধু মোড়ই ফিরল না, একটা নতুন সুরও ধ্বনিত হতে থাকে রোমান্টিক থেকে রিয়ালিস্টিক—এই দুটি স্তর অতিক্রম

করে তাঁর নাটক এখন থেকে হয়ে উঠল প্রতীকধর্মী। এরই দৃষ্টান্ত হলে 'The Wild Duck, 'Hedda Gabler' ও 'The Lady from the Sea' প্রভৃতি নাটকাবলী। হেডা গ্যাবলারকে সমালোচগণ নরওয়ের লেডি ম্যাকবেথ বলে অভিহিত করেছেন। নোরার পরে এইটিই নাট্যকারের বলিষ্ঠতম নারী-চরিত্র।

তেষট্টি বছর বয়সে ইবসেন ক্রিশ্চিয়ানাতে ফিরে এলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট-কাল এখানেই অতিবাহিত করেন। যদিও এর পব তিনি আরো পনর বছর জীবিত ছিলেন তথাপি তিনি মাত্র তিনখানিব বেশি নাটক রচনা করতে পারেননি। এই তিনখানিই ট্র্যাজেডি। তখন তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকাব। রঙ্গমঞ্চে তাঁব নাটকগুলি এখন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয় ও দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সমাদৃত হয়। য়ুরোপের বারোটি ভাষায় তাঁর নাটকগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, জাপানী ভাষাতেও। লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে যখন তাঁর নাটকের অভিনয় ক্রুদ্ধ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করত তখন ইবসেনকে সমর্থন করতে লেখনী ধারণ করতেন বার্নার্ড'শ। পৃথিবীর প্রধান নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে তাঁর স্বীকৃতি ইবসেন তাঁর জীবিত কালেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাহাত্তর বছর বয়সে তিনি প্রথমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হন, দ্বিতীয় আক্রমণের ফলে তাঁর মস্তিষ্ক ও শরীর পঙ্গু হয়ে যায়। লেখার কাজ থেমে যায় চিরকালের মতো। তারপর আটাত্তর বছর বয়সে তৃতীয় আক্রমণের ফলে নাটকে নবযুগ প্রবর্তক নাট্যকারের জীবনদীপ নির্বাপিত হয় ১৯০৬ সালের ৬ই মে তারিখে। তাঁর মৃত্যুর পরে সমাজিক সমস্যাবলি নিয়ে নাটক রচনার পুরোধা হিসাবে ইবসেন সম্পর্কে আর কোন বাদানুবাদ বা বিতর্ক হয়নি।

তাঁর সর্বশেষ নাটক 'When We Dead Awakend' রচিত হয় এই শতাব্দীর সূচনায়। নাট্যকারের বয়স তখন বাহাত্তর বছর। য়ুরোপে নারী জাগরণের শঙ্খধ্বনি শোনা গিয়েছিল এই নাটকে। উত্তরকালে নরওয়ের এই নাট্যকারের প্রসঙ্গে বার্নার্ড'শ তাঁর 'দি কুইন্টএসেন্স অব ইবসেইনস' গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন: 'But I think, Ibsen has proved the right of the drama to take scriptual rank, and his own right to canonical rank as one of major prophets of modern Bible'.—এই মন্তব্য যথার্থ। ইবসেনের নাটক নিছক চিত্তবিনোদনের জন্য নয়, তা হলো মানুষের চিত্ত উদ্ভাসনের জন্য।

হেনরী ডুনাণ্ট

(১৮২৮-১৯১০)

'সলফেরিনের কথা' (Un Souvenir de Solferino')—এই বিচিত্র শিরোনামা সম্বলিত একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬২ সনে এবং প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র য়ুরোপকে এই বইটি নাড়া দিয়েছিল। সুইজারল্যাণ্ডের এক তরুণ ব্যবসায়ী উত্তর ইতালীর সলফেরিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে দৈবক্রমে যে করুণ ও মর্মান্তিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ঐ বইটিতে তারই চিত্তস্পর্শী কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল। ঘটনাটি তিনি চাক্ষুষ করেছিলেন ১৮৫৯ সনের ২৪শে জুন, আর তিনটি বছর ধরে ঘটনাকে অবলম্বন করে যে বইখানি তিনি রচনা করেন তা সমগ্র য়ুরোপে একটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-কর্ম বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই আলোড়ন-সৃষ্টিকারী বই থেকেই পরবর্তীকালে পৃথিবীতে যে তিনটি নূতন ধরনের সমাজ-কল্যাণ আন্দোলন সৃষ্টি হবে, এটা বোধ হয় সেদিন কেউই কল্পনা করতে পারেন নি।

রেডক্রস আন্দোলনের প্রবর্তক হিসেবে 'হেনরী ডুনাণ্ট' এই নামটি আজও জগদ্বিখ্যাত। যে ক্রুশে একদা মানবপ্রেমিক যীশু খ্রীষ্টের দেহ বিদ্ধ হয়েছিল ঈশ্বরের সন্তানের শোণিত ধারায় কলঙ্কিত সেই ক্রুশ আজ নূতন মহিমায় মণ্ডিত হয়েছে এই আন্দোলনের প্রতীক চিহ্নরূপে। পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বরাষ্ট্রে 'রেডক্রশ' হেনরী ডুনাণ্টের পবিত্র স্মৃতিকে শাশ্বত করে রেখেছে। ডুনাণ্ট সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান।

বয়োপ্রাপ্ত হলে তিনি জেনেভার একটি বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হন এবং সেখানে চার বছর অধ্যয়ন করেন। তারপর তাঁর পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তরুণ ডুনাণ্ট স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবেন ঠিক করলেন। তারপর ১৮৫৯, ২৪শে জুন সেই উচ্চাভিলাষী সুইস যুবক ইতালির উপর দিয়ে ফ্রান্সের পথে যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিলেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, কিছু পরিচয়-পত্র আর তাঁর প্রস্তাবিত কারখানা সম্পর্কে একটি মোটামুটি পরিকল্পনা। সপ্তাহকাল পরের কথা। এই সাত দিনে বেশ কিছু পথ অতিক্রম করে একটি গ্রামের সীমানায় তিনি উপনীত হলেন। অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে অদূরবর্তী গ্রামটার নাম সলফেরিনো। চললেন তিনি সেইদিকে। সলফেরিনো। সলফেরিনো। এই ছোট্ট গ্রামটির নাম তিনি দুইবার অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলেন। গ্রামটির প্রায় কাছাকাছি আসতেই ডুনাণ্টের মনে হলো গ্রামটি তো নিস্তব্ধ নয়, মনে হচ্ছে তুমুল কোলাহলে পূর্ণ। কিসের কোলাহল? আরো একটু এগিয়ে চলেন তিনি। তারপর তাঁর গতি রুদ্ধ হয়। সে কি বীভৎস দৃশ্য জেগে উঠল তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে। গ্রামের সম্মুখে একটি বিশাল মাঠ। মাঠটি যেন রক্তের নদীতে পরিপূর্ণ হয়ে

উঠেছে। নিহতদের রক্তাক্ত শবদেহে আকীর্ণ সেই প্রান্তরটিকে মনে হলো যেন একটি যুদ্ধক্ষেত্র। অথবা একটি শ্মশানভূমি।

ডুনান্ট জানতেন না যে, তার আগের দিনেই সেখানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়ে গেছে। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান অস্ট্রিয়ার কাছে দাবী জানালেন যে, তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিতে হবে, আনুগত্য নিবেদন করতে হবে তাঁর কাছে। অস্ট্রিয়া সে দাবী মেনে নিতে রাজী হলো না। নেপোলিয়ন সসৈন্যে যাত্রা করলেন অস্ট্রিয়া জয় করতে।

একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিল সারা দিন দুই পক্ষের সেনাদলের মধ্যে। সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি আর প্রচণ্ড ঝড়। দুর্যোগের ফলে উভয় পক্ষের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তারা ছড়িয়ে পড়ে দিগ্‌বিদিকে। কিন্তু রণক্ষেত্রে অসহায় অবস্থায় পড়ে রইল আহতরা। আর নিহতদের মৃতদেহগুলি শায়িত রইল অরক্ষিত অবস্থায়। আহতদের সেবাপরিচর্যা, নিহতদের শব সৎকার করবার মতো লোক সেখানে ছিল না।

সেই করুণ দৃশ্য দেখে ডুনান্টের সমস্ত অন্তর মথিত করে জাগল শুধু একটি প্রশ্ন—কী করা যায়? যারা মরে গেছে তাদের জন্য তো কিছু করার নেই, কিন্তু যারা এখনো পর্যন্ত জীবিত, যাদের জীবনের ক্ষীণ দীপশিখা স্তিমিত হয়ে এখনো কাঁপছে প্রভাতের মৃদুমন্দ বাতাসে, তাদের কি হবে? এই আহতদের মধ্যে উভয় পক্ষেরই সৈন্য ছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে এদের নিক্ষেপ করে কেমন নিশ্চিন্ত মনে সবাই চলে গেছে। চারদিক থেকে অব্যক্ত ভাষায় আহত সৈন্যদের আকুল আর্তনাদ যেন ডুনান্টের কানে ভেসে এল, বাঁচাও! আমাদের বাঁচাও! ডুনান্ট অধীর হয়ে উঠলেন।

পাগলের মতো ডুনান্ট ছুটে এলেন সলফেরিনোর নিকটবর্তী একটি ছোট শহরে এবং সেখানে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত ভাবে তিনি জনকতক অধিবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের বললেন সব কথা। তাঁর উচ্চারিত কণ্ঠস্বরে এমন একটি আন্তরিকতার ভাব ফুটে উঠেছিল যা সহজেই সকলের চিত্তকে দোলা দিল। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল। একটি মানুষ কথা বলছে, না সহৃদয়-সংবেদনশীল একটি হৃদয় কথা বলছে, তা ঠিক বোঝা গেল না। শ্রোতাদের মনে নাড়া দিল ডুনান্টের আবেদন, কিন্তু আশানুযায়ী সাড়া জাগতে পারল না। আবার সেই হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে—'বন্ধুগণ! আমরা সবাই মিলে যদি চেষ্টা করি তাহলে এখনো কিছু লোককে হয়ত বাঁচাতে পারি। মনে রাখবেন তাদেরও বাড়িতে হয়তো মা-বাপ ও ভাই-বোন আছে, স্ত্রী-পুত্র কন্যা ও পরিজন আছে এবং সেখানে বসে তারা দিন গুনছে এদের আসা-পথ চেয়ে। আরো মনে রাখবেন যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত বা আহত মানুষের কোন জাতি নেই, তারা শত্রু কি মিত্রপক্ষের লোক এ প্রশ্নও নিরর্থক, তারা মানুষ এবং তাদের স্বজাতি মানুষেরই সেবা-শুশ্রূষা তারা দাবী করে।

ডুনাণ্টের এই কথাগুলি তাদের মর্মে গিয়ে প্রবেশ করল এবং তখনি সেই শহরটি থেকে বেশ কিছু সংখ্যক লোক তার অনুগামী হয়ে এলো সেই যুদ্ধক্ষেত্রে। এখানে এসে যে দৃশ্য তারা প্রত্যক্ষ করল তা তাদের কল্পনার বাইরে। শুরু হয়ে যায় সেবা-শুশ্রূষার কাজ এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে উঠল একটি আশ্রয় শিবির সকলের সমবেত চেষ্টায়। তাঁদের সেবা-শুশ্রূষার ফলে সলফেরিনোর রণক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই যখন সুস্থ হয়ে তাদের প্রিয় পরিজনদের মধ্যে ফিরে গেল, তখন তারা অন্তর উজাড় করে কৃতজ্ঞতা ঢেলে দিয়ে গেল তাদের কাছে যাদের সযত্ন পরিচর্যায় তারা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আর সেই পরিচর্যাশিবিরে এক নূতন স্বপ্ন বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শুভ্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হেনরী ডুনাণ্ট।

তাঁর এই চিন্তার উপরেই গড়ে উঠেছে পরবর্তিকালের আন্তর্জাতিক সেবা-শুশ্রূষার প্রতিষ্ঠান যা আজ সমগ্র পৃথিবীতে রেডক্রশ নামে পরিচিত।

আলজিরিয়ায় ময়দাকল স্থাপনের চিন্তা ডুনাণ্টের মন থেকে একেবারে মুছে গেল। সলফেরিনোর যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবনে এক নূতন পথ-পরিক্রমা। তিনি তাঁর সাময়িক সেবা ব্যবস্থাকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপ দান করতে বদ্ধ পরিকর হলেন। সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার আগাগোড়া মনে মনে আলোচনা করলেন। বুঝলেন, কাজটা কত কঠিন, আর এর ক্ষেত্র কত বিরাট! এই যে একটা আইডিয়া তাঁর মাথায় এসেছে এটাকে সুষ্ঠু রূপ দেওয়ার জন্য প্রথমে দরকার এর অনুকূলে জনমত গঠন, দরকার অক্লান্ত প্রচার কার্যের। এ জিনিস যে বক্তৃতা করে সম্ভব নয়, সেটাও তিনি অনুধাবন করলেন।

তার সমস্ত সত্তা এখন নূতন ভাবে বিকশিত হতে চলেছে। সালফেরিনো তাঁর জীবন ধারার মোড় ফিরিয়ে দিল। শূন্য আশ্রয় শিবিরে দাঁড়িয়ে ডুনাণ্ট ভাবতে থাকেন, এই সেদিন এখানে যে যুদ্ধ হয়ে গেল, নিশ্চয় পৃথিবীর সেটাই শেষ যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ এর পরেও হবে আর যখনি হবে তখনি ঘটবে এমনি হানাহানি, এমনি হত্যাকাণ্ড। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা-পরিচর্যার জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থা ভাবেন আর মনের মধ্যে কল্পনা করেন—এখানে যে ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছে এটাকে একটা স্থায়ী রূপ দিতে পারলে কেমন হয়? এখানে যার সূচনা তাকে আরো ব্যাপক, আরো বেগবান করে তুলতে হবে। সাময়িক এই সেবা-ব্যবস্থাকে যেমন করে হোক একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের রূপ দিতে হবে এবং এর জন্য একটা নূতন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে—এমন আন্দোলন যা কোন দেশের সীমানার মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে না। তখন তিনি স্থির করলেন যে, সলফেরিনোর অভিজ্ঞতার কথা তিনি প্রচার করবেন মুদ্রিত পুস্তিকা' আকারে। ডুনাণ্ট তাই পুস্তিকা রচনায় মনোনিবেশ করলেন। সলফেরিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে যে বীভৎস দৃশ্য তিনি দেখেছেন, পুস্তিকার প্রতিটি লাইনে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠল তারই ছবি। আহত সৈনিকের যে করুণ আর্তনাদ তিনি শুনেছেন, পুস্তিকার বর্ণনায় বেজে উঠল তারই প্রতিধ্বনি।

এটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল সমকালীন য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রীদের মধ্যে, সেনাপতিদের মধ্যে ও কূটনীতিবিদদের মধ্যে। এ ছাড়া বহু-খ্যাতনামা লেখক ও জনকল্যাণ সমিতির নিকটেও প্রেরিত হয়েছিল। ডুনাণ্টের সেই পুস্তিকা পাঠ করে তাঁকে সকলেই অভিনন্দিত করলেন। ভিক্টর হুগো লিখলেন —'Yours of the greatest work of the century.' ডুনাণ্টের ওই পুস্তিকার অন্তর্গত আবেদন নিষ্ফল হলো না। তাঁর পরিকল্পনার সমর্থনে বহু স্থান থেকেই সাড়া পাওয়া গেল। আর্ত মানবতার সেবার আদর্শ সকলেরই অন্তর স্পর্শ করল। সকলের আগে এগিয়ে এল জেনেভার পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামক তাঁর স্বদেশের একটি ক্ষুদ্র জনকল্যান সংস্থা। এই সোসাইটি পাঁচ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করল। ডুনাণ্ট নিজে হলেন তার সম্পাদক। অতি ক্ষুদ্র সেই সংস্থাই কালক্রমে আন্তর্জাতিক রেডক্রশ কমিটির আকার ধারণ করে। তারপর ১৮৬৩ সনের অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে জেনেভায় বসল একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের ঠিক এক মাস পূর্বে বার্লিনে একটি আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল। এই কংগ্রেসে সমাগত প্রতিনিধিদের মধ্যে তাঁর আদর্শকে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে ডুনাণ্ট ডাচ প্রতিনিধি ডক্টর ক্রিশ্চিয়ান বাষ্টিং-এর শরণাপন্ন হন। ডক্টর বাষ্টিং ঐ কংগ্রেসে ডুনাণ্টের প্রস্তাবের সমর্থনে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেছিলেন। সেই বক্তৃতার ফলে, যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা-পরিচর্যার জন্য জাতিধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে একটি সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান গঠনের উপযোগিতা সকলেই স্বীকার করেন। জেনেভায় যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার আহ্বায়ক ছিলেন সুইস সরকার। বারোটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সে সম্মেলনে যোগদান করেন। আলোচনা শেষে সম্মেলন কর্তৃক এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, আহত, অসুস্থ ও বন্দী সৈনিকদের সেবা পরিচর্যার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হওয়া প্রয়োজন। এরপর ডুনাণ্ট ঝটিকার বেগে য়ুরোপের জার্মান ভাষাভাষী রাজ্যগুলিতে পরিভ্রমণ করে তাঁর আদর্শকে আরও ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তুললেন ও বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির সমর্থন সংগ্রহ করলেন। তারপর ১৮৬৩ সনের ২৬শে অক্টোবর য়ুরোপের ষোলটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জেনেভা কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং 'Society for Aid to Wounded Soldiers' এই নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই কনফারেন্সেই সুইস জাতীয় পতাকার আদর্শে, রঙ বদল করে, রেড ক্রসের পতাকার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পতাকা রেড ক্রশের জন্মদাতা হেনরী ডুনাণ্টের প্রতি সম্মানজ্ঞাপক ছিল। এইভাবেই একটি মানুষের সর্বস্বপণ, শ্রম ও সাধনা জয়যুক্ত হয়েছিল, আর এইভাবেই পৃথিবীর মানুষ আর্তত্রাণের মহৎ আদর্শের সন্ধান পেয়েছিল। মানবহিতৈষীদের তালিকায় 'হেনরী ডুনাণ্ট' তাই একটি অবিস্মরণীয় নাম। পরম শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার নাম।

লেভ টলস্টয়

(১৮২৮—১৯১০)

রাশিয়ার সাহিত্যজগতের বিরাটতম পুরুষ তলস্তয়। একটি প্রাচীন অভিজাত পরিবারে কাউন্ট লেভ নিকোলাইভিচ তলস্তয়ের জন্ম। মস্কো থেকে ১৩০ মাইল দূরে অবস্থিত ইয়াসানায়া পলিয়ানা নামক যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আছে, সেইটাই ছিল তলস্তয়দের পৈত্রিক আবাসস্থল।

টলস্তয়ের জন্ম সেইখানেই। ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮২৮ তিনি এই পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলেন। শৈশবেই তাঁর মধ্যে জ্ঞানার্জনের অদম্য তৃষ্ণা দেখা দিয়েছিল। প্রত্যেক বিষয়ের মূল জানবার জন্য তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ আর অনুসন্ধিৎসা। সেই সঙ্গে আরো একটি গুণ ছিল—উচ্চাভিলাষ। অতিমাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তিনি। কিশোর টলস্টয়ের মনের উপর রুসোর লেখা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ক্রুশের বদলে তিনি তাঁর বুকের উপর রুসোর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত একটি রৌপ্যপদক ধারণ করতেন। তরুণ বয়সেই ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে জাগে সংশয় এবং এর ফলে তিনি সময় সময় কল্পনা করতেন যে, পৃথিবীতে একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কিছুরই মূল্য নেই, অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তাঁর এই সংশয়ের ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি তাঁর জীবনে। এমন বিবিধ বিপরীত দোষ ও গুণের সমাবেশে গঠিত মানুষ রাশিয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসে, এমন কি য়ুরোপের ইতিহাসেও বিরল বললেই হয়। এই বিপরীতধর্মিতাই টলস্টয় চরিত্রের বাতাবরণ।

টলস্টয়ের পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি ঋণভারে এমন জর্জরিত ছিল যে, টলস্তয়ের পিতা তা গ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু পরিবারের সকল দায়-দায়িত্ব তখন ন্যস্ত হয়েছে তাঁর উপর এবং তাঁদের প্রতিপালনের জন্য তৎকালীন রাশিয়ান যুবকগণ যা করতেন তিনিও তাই করলেন—তিনি একটি সম্পত্তিসম্পন্না মহিলাকে বিবাহ করলেন। এই মহিলা শুধু ধনবতী ছিলেন না, রাজবংশের সহিত তাঁর ছিল রক্তের সম্পর্ক। রাজকুমারী মারিয়া নিকোলাইভনা ভোকনস্কি দেখতে কিন্তু সুন্দরী ছিলেন না। তবে তিনি বিদুষী ছিলেন, পাঁচটি ভাষা জানতেন এবং তাঁর মনটি ছিল খুব উঁচু। জমিদারী শাসনেও তাঁর ছিল অসামান্য দক্ষতা। স্বামীর চেয়ে বয়সে তিনি পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। যখন তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হন, তখন রাজকুমারীর বয়স ছিল বত্রিশ বৎসর। এঁরই গর্ভে টলস্তয় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন পিতামাতার চতুর্থ সন্তান। পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁকে লালন-পালন করেন পরিবারের বর্ষিয়সী আত্মীয়ারা। বাড়িতে গৃহশিক্ষকদের কাছেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেছিলেন। সতেরো বছর বয়সে তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি দিন

পড়া হলো না। দ্বিতীয় বছরেই লেখাপড়ার সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে দেশের জমিদারিতে ফিরে যাওয়াই ভালো, ঠিক করলেন তলস্তয়। সেখানে তাঁর যা পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল তাই দিয়ে তিনি একজন সুদক্ষ এবং আলোকপ্রাপ্ত জমিদার হওয়ার জন্য কৃতসংকল্প হলেন। তবে পাঠাভ্যাস তিনি একেবারে ত্যাগ করলেন না। পরবর্তী চার বছর অতিবাহিত হয় স্বগৃহে লেখাপড়া আর মস্কোর আমোদপ্রমোদপূর্ণ তরল জীবনের মধ্যে। গ্রামে তিনি ভূমি-দাসদের (Serf) অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকতেন।

তাঁর এক সহোদর ভাই নিকোলাই, সৈন্যদলে যোগদান করেছিলেন। তেইশ বছর বয়সে তলস্তয় তাঁর অগ্রজের পদাঙ্ক অনুকরণ করতে চাইলেন এবং সামরিক বিভাগে একজন শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ককেসাসের যুদ্ধে যোগদান করলেন।

কিন্তু তাঁর এই সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা বৃথা যায়নি। ভবিষ্যতের লেখক টলস্তয়ের জন্ম রণক্ষেত্রেই হয়েছিল বলা যেতে পারে। দিনলিপিতেই তার কিছু আভাস অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল, কারণ তলস্তয়ের দিনলিপি সাধারণ দিনলিপি ছিল না—এ ছিল যেন আত্মার সঙ্গে আত্মার কথোপকথন। এইবার তিনি তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন। তাঁর এই রচনার প্রতি যিনি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি রাশিয়ার সম্রাট—'জার'। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, কারণ সকলের সঙ্গেই তিনি অবাধে মিশতে পারতেন। দেখতে খর্বাকৃতি ও ক্ষীণদেহ হলেও, তাঁর শরীরে শক্তি ছিল খুব। তিনি যখন মুখে মুখে গল্প বলে তাদের শোনাতেন, সৈন্যরা সেইসব গল্প খুব উপভোগ করত। গল্প বলে সবাইকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। শ্রোতারা তখন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করত কী উজ্জল স্বপ্নময় হয়ে তাঁর সেই ছোট্ট চোখ দুটি আর সেই সঙ্গে হাসির বিজলী খেলে যেত তাঁর পুরু ঠোঁট দুটির কোণে। ১৮৫২, জুলাই মাস। তলস্তয়ের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর। 'কনটেমপোরারি' নামে তখন রাশিয়াতে একটি বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা ছিল। তরুণ তলস্তয় তাঁর প্রথম সত্যিকার রচনা, 'শৈশবজীবন' পাঠিয়ে দিলেন ঐ পত্রিকার সম্পাদকের কাছে। যথাসময়ে কনটেমপোরারির পৃষ্ঠায় তলস্তয়ের 'শৈশবজীবন' ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চব্বিশ বছর বয়স্ক অখ্যাত লেখক একটি অসাধারণ প্রতিভা হিসাবে তৎকালীন সমালোচকগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হলেন। 'শৈশবজীবন' প্রকৃতপক্ষে তলস্তয়ের আত্মচরিত, তবে উপন্যাসেরও কিছু স্পর্শ এতে আছে। তলস্তয়ের সকল রচনারই লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই। সারাজীবন যা কিছু তিনি লিখেছেন তার অধিকাংশই আত্মচরিতমূলক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতিরই পরিণত প্রকাশ ও প্রগাঢ় উদ্ভাসন। পরিণত লেখনী হাতে নিয়েই তিনি যেন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের সময় তিনি সিবাস্তপোলে বদলি হয়েছিলেন, এই

শহরটির প্রতিরক্ষায় টলস্তয় উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর 'সিবাস্তপোল কাহিনী' গ্রন্থে তাঁর সৈনিক-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ বইটিও পাঠকসমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল।

সাতাশ বছর বয়সে সামরিক জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলেন টলস্তয়। তখন তিনি একজন লেখক হিসাবে কিছুটা খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। ইয়াসনায়া পলিয়ানার নিভৃত বাসভবনে ফিরে এলেন তিনি। এর পর তিনি এক অষ্টাদশী তরুণীকে বিবাহ করেন। বিবাহিত জীবন তাঁদের সুখেরই হয়েছিল। সাহিত্য কর্মের মধ্যে নিবিষ্টচিত্ত থাকলেও, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনে টলস্তয় অবহেলা করতেন না। সোনিয়াও তাঁর স্বামীর সাহিত্যকর্মে আন্তরিক ভাবে সহায়তা করতে থাকেন। এই সময় তিনি তাঁর জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস 'ওয়ার য়্যাণ্ড পীস' রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি বিপুল খ্যাতি লাভ করলেন। 'ওয়ার য়্যাণ্ড পীস' শুধু একটি উপন্যাস নয়। প্রকৃত পক্ষে এটি গদ্যে মহাকাব্য। সমকালীন রাশিয়ার এক বিশাল পটভূমিকায় বিরচিত এই উপন্যাসে টলস্তয়ের ইতিহাস-বিচার ও ইতিহাস-দৃষ্টির মধ্যে মৌলিকতার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

'ওয়ার য়্যাণ্ড পীস' রচনাকালেই টলস্তয় ছোটগল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সাহিত্যের এই বিভাগে তিনি ছিলেন একজন সিদ্ধহস্ত শিল্পী। টলস্তয়ের গল্প বলার ক্ষমতার সঙ্গে পৃথিবীর কোন লেখকের তুলনা চলে না। তাঁর এই ক্ষমতা যেমন সজীব, তেমনি ঘনীভূত ও সত্য। টলস্তয় যখন তাঁর জীবনের অর্ধশতাব্দী কাল অতিক্রম করেছেন, তখন প্রকাশিত হয় 'য়্যানা ক্যারেনিনা'। বিশ্বের কথাসাহিত্যে য়্যানা একটি অবিস্মরণীয় চরিত্রের নারী এবং য়ুরোপের সমগ্র উনিশ শতকের মধ্যে প্রকাশিত স্মরণীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে এটি একটি অন্যতম উপন্যাস বলে স্বীকৃত। একদিকে প্রকৃতির উদ্দাম তাড়না, অন্যদিকে নীতির কঠোর নির্দেশ—একটি নারীচরিত্রকে কেন্দ্র করে এই দুটি বিষয়ের সংঘর্ষ যে রকম নিপুণ তুলিকাপাতে টলস্তয় ফুটিয়ে তুলেছেন তা অদ্যাবধি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের আলোচনার বস্তু হয়ে আছে। উপন্যাসের পটভূমিকায় এমন একটি নারীচরিত্র সাহিত্যে এর আগে আর কারো লেখনীমুখে সৃষ্টি হয়নি।

প্রৌঢ় টলস্তয়ের আপাত নিরুদ্বেগ ও শান্তিপূর্ণ জীবনধারা দেখে কারো পক্ষে কিছু বুঝবার উপায় ছিল না যে, শিল্পীর মনের মধ্যে তখন জেগেছে কী দারুণ অশান্তি। 'য়্যানা ক্যারেনিনা' উপন্যাস রচনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে দেখা দিতে থাকে এক প্রবল মানস বিক্ষোভ। এইবার তিনি জীবনে সম্পূর্ণতার সন্ধানের জন্য ব্যগ্র হলেন—চাইলেন একটা নৈতিক স্থিতিভূমি। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল—জীবনের লক্ষ্য কি? বাঁচার অর্থ কি? রাতদিন এই অশান্ত জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁকে অস্থির করে তুলল। জন্ম হলো এক নূতন টলস্তয়ের। এখন তিনি স্পষ্টতই উপলব্ধি করলেন যে, জীবনের এই অর্ধশতাব্দীকাল তিনি নানাবিধ

সমস্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। এর থেকে পরিত্রাণ চাই। তাঁর অন্তরাত্মা যেন আর্তস্বরে চীৎকার করে ওঠে, তাঁর চারদিকে পৃথিবীটা যেন একটা ভীষণ ভ্রম বলে মনে হলো। মরিয়া হয়ে এইবার তিনি গীর্জার দিকে তাঁর দৃষ্টি ফেরালেন এবং তাঁর স্বভাবসুলভ আগ্রহের সঙ্গে তিনি ধর্মযাজকদের আবাস স্থলগুলি পরিদর্শন কবতে লাগলেন। দিনের পর দিন তিনি যাজক ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। বুঝলেন, ধর্ম ভিন্ন আর কোনো কিছুই তাঁর আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। এই বিশ্বাস তাঁর মনে ক্রমে দৃঢ় হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় যুক্তিবাদী টলস্টয়ের মন প্রচলিত ধর্মাচরণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কিছুই দেখতে পেল না। তিনি কেবলমাত্র খ্রীস্টের উপদেশই বিশ্বাস করতেন।

অবশেষে টলস্টয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, অর্থই সকল অনর্থের মূল। তাঁর মানস দিগন্তে উদ্ভাসিত হয় নূতন চেতনার আলোক। ঠিক করলেন সর্বস্ব ত্যাগ করবেন তিনি, আর চাষীদের মধ্যে বিলিযে দেবেন তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ। কিন্তু বাদ সাধলেন কাউন্টেস। স্বামীর এই পাগলামির প্রতিবাদ করলেন তিনি। টলস্টয় কিন্তু বিচলিত হলেন না। তিনি স্বয়ং তখন কৃষকদের মতো সরল জীবন যাপন করতে কৃতসংকল্প হয়েছেন। কাউন্ট টলস্টয়, ভূ-স্বামী টলস্টয়ের মৃত্যু হলো। সেখানে দেখা গেল এক নূতন টলস্টয়কে—কৃষকদরদী সন্ন্যাসী টলস্টয়। শিল্পসৃষ্টির জগতে তিনি আর ফিরে আসেন নি। সেই ষাট বছর বয়সেই রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মৃত্যু হয়েছিল।

কিন্তু সত্যি কি শিল্পী টলস্টয়ের মৃত্যু ঘটেছিল? না। তাঁর জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। নূতন টলস্টয়ের জীবনের লক্ষ্য তখন হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সেবা।

ইয়াস্যানায়া পলিয়ানা তখন একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন দর্শকের দল আসেন টলস্টয়কে দর্শন করতে। তখন সমগ্র রাশিয়াতে গীর্জার বিরাট ঘণ্টার ধ্বনির মতো একমাত্র তাঁরই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতো। হাজার হাজার তরুণ নর-নারী তাঁর প্রতি অনুরক্ত হলো এবং তাঁর জীবনদর্শনকে সামনে রেখে তারা তাঁদের জীবন গঠনে সচেষ্ট হলো। তাঁর নামে রাশিয়ার বহু অঞ্চলে স্থাপিত হলো উপনিবেশ—টলস্টয় ফার্ম। রাশিয়ার ইতিহাসে সে এক নূতন আন্দোলন। শিল্পী টলস্টয় এখন ঋষি টলস্টয়। তাঁর প্রজ্ঞার নূতন আলোকে রাশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবন সেদিন দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীকে এক নূতন মানবতাবাদে দীক্ষা দিয়ে পৃথিবী থেকে তিনি বিদায় নিলেন। গৃহে নয়, গৃহের বাইরে, একটি সামান্য কুটীরে তিনি শান্তভাবে মৃত্যুকে বরণ করেন ৭ই নভেম্বর, ১৯১০ সালে।

এমিল জোলা

(১৮৪০-১৯০৪)

১৮৪০ সালের ২রা এপ্রিল তাঁদের একমাত্র পুত্রের জন্ম হয় প্যারিস শহরে। সেই ছেলের নাম রাখা হয়েছিল এমিল এডুয়ার্ড-চার্লস আঁতোয়া। ফরাসী কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী প্রতিভার জন্ম হয়েছিল সেদিন। পিতা, ফ্রানসেস্কো জোলা, মা, ফ্রাঁসোয়া-এমিল।

স্বামীর মৃত্যুর পরে জোলাদের যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রী হয়ে যায়। ফলে সমগ্র পরিবারটি দারিদ্র্যকবলিত হয়। যদিও এমিলের শৈশব ও যৌবনকাল এইরকম নৈরাশ্যময় অভাব-অনটনের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল এবং বার বার তাঁদের স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছিল, তথাপি জোলার মা পুত্রকে একটি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে জোলার মায়ের আর্থিক অবস্থা দিন দিন খুব খারাপ হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে দারুণ খাদ্যাভাব ঘটত, আর খাদ্যাভাব মানেই ছিল ক্ষুধার প্রবল জ্বালা। জোলার দাদামশাই, যিনি এতকাল তাঁর কন্যা ও দৌহিত্রের ভরণপোষণ চালিয়ে আসছিলেন, আর তাদের দেখাশুনা করতে পারলেন না। ঘরে এমন একটি জিনিসও ছিল না যা দিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা চলে। জোলার মা মরিয়া হয়ে উঠলেন। তিনি কয়েক ফ্রাঙ্ক ধার করে প্যারিসে চলে গেলেন এই আশা নিয়ে, যদি সেখানে তাঁর স্বামীর আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। যাবার পূর্বে ছেলেকে বলে গেলেন, দু'চারটি আসবারপত্র যা রইল সেগুলি বিক্রী করে সে যেন একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে প্যারিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়।

জোলার বয়স তখন আঠারো বছর যখন তিনি প্যারিসে এলেন তৃতীয় নেপোলিয়ানের সময়ে নূতন করে তৈরি জাঁকজমকপূর্ণ শহর—মুনাফাকারী ও পরাশ্রয়ী লোকদের মধুচক্র, চারদিকেই বিলাসিতার অত্যুগ্র প্রকাশ আর সেই সঙ্গে নীতিনৈতিকতা-বর্জিত জীবনধারা। শৈশব ও কৈশোরে যে গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, এ যেন ঠিক তার বিপরীত পরিবেশ। যুগপৎ স্তম্ভিত এবং আনন্দিত হলেন জোলা। স্থানীয় একটা স্কুলে একটা বৃত্তি মিলল, কিন্তু লেখা-পড়াতে তাঁর তখন না ছিল উৎসাহ, না ছিল আগ্রহ।

উনিশ বছর বয়সে জোলা টায়ফয়েড রোগে এমন গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হলেন যে, তাঁকে দু'মাস শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। অসুখের ফলে, স্কুল তাঁর কাছে আরো খারাপ মনে হলো। বিশ বছর বয়সে ডকে হিসাবরক্ষকের একটা চাকরি নিলেন। প্রতিদিন দু'মাইল হেঁটে তাঁকে চাকরি-স্থলে যেতে হতো। জায়গাটা ছিল নোংরা, মাইনে ছিল মাসে ষাট ফ্রাঙ্ক। অল্পকাল মধ্যেই তিনি ডকের কাজে ইস্তফা দিয়ে আবার চাকরির খোঁজ করতে থাকেন।

কিন্তু কর্মের অন্বেষণে বেশি দিন মন দিতে পারলেন না। দারিদ্র্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে, তিনি ধার করে নিজেকে উপবাসের হাত থেকে রক্ষা করলেন। কখনো কখনো অলসতা ঝেড়ে ফেলে তিনি কর্মের অন্বেষণে বেরুতেন। কিন্তু তাঁকে দেখলে কারো মনে হবে না যে, এই যুবক একজন কর্মপ্রার্থী। অর্থাভাবক্লিস্ট তাঁর মুখ, চশমার পেছনে অদ্ভুত দুটি চোখ, আর সমস্ত মুখে চোখে একটা তিক্ততার ভাব—এই সব দেখে কেউ জোলাকে কাজ দিতে চাইত না। তার ওপর তাঁর জীর্ণ মলিন পরিচ্ছদ চাকরি লাভের পক্ষে প্রবল অন্তরায়স্বরূপ ছিল।

হ্যাচেট অ্যাণ্ড কোম্পানিতে একটা চাকরি পেলেন জোলা। প্রতিমাসে নিয়মিত বেতন যেমন তাঁর হাতে আসতে লাগল তেমনি তিনি নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেলেন। তাঁর মুখে ক্রমে হাসি ফুটে উঠল আর বিভীষিকাময় যে অতীত তাঁর ভবিষ্যৎকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল তার থেকে তিনি যেন এখন উদ্ধার পেলেন। এতদিন ধরে তিনি যে সব রোমান্টিক গল্প লিখেছিলেন সেইগুলি তিনি একত্রিত করে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করলেন এবং নতুন কয়েকটি লিখলেন। পঁচিশ বছর বয়সে জোলার প্রথম বই 'Stories for Ginou' প্রকাশিত হলো। এক বছর বাদে জীবনের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'Confessions de Claude'. কিন্তু উপন্যাসটি যখন অশ্লীল বলে সমালোচিত হলো তখন জোলা যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছিলেন। উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল।

জোলা সম্পর্কে তাঁর মনিব হ্যাচেট অ্যাণ্ড কোম্পানি দু'রকম মত পোষণ করতেন। প্রথম, এই তরুণ লেখক তাঁদের কর্মচারী, এজন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের গর্বের সীমা ছিল না; দ্বিতীয়, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'Confessions' লিখে জোলা যে কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেজন্য তাঁরা খুবই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তিন বছর এখানে চাকরি করার পর, জোলা পদত্যাগ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্যারিসের 'The Issue' নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রে নিযুক্ত হন নিয়মিতভাবে লিখবার জন্য। পত্রিকাটির সাহিত্য বিভাগেই তিনি লিখতেন। পত্রিকার প্রকাশক তাঁর কাগজে জোলাকে 'সর্বকলা বিশারদ এক তরুণ লেখক' বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই ঘোষণায় আরো বলা হয়েছিল—'সংখ্যায় কম হলেও তাঁর বইগুলি ইতিমধ্যে সাড়া জাগিয়েছে।'

পরবর্তী বৎসরগুলিতে নতুন উপন্যাসের পরিকল্পনা করলেন তিনি—এমন উপন্যাস যা যুগপৎ আলোড়নের সৃষ্টি করবে ও সত্যকে উদ্ঘাটিত করবে। 'My Hates' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করলেন—এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি রোমান্টিসিজমের প্রতি তাঁর বিরুদ্ধ মত ঘোষণা করলেন। জোলার বয়স তখন সাতাশ বছর যখন তাঁর 'Therese Raquim' নামে নতুন উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ব্যাভিচার, খুন ও অনুতাপ—এই ছিল উপন্যাসটির বিষয়বস্তু এবং ঔপন্যাসিক স্বয়ং এটিকে 'an objective study of passions' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

এটিই ছিল জোলার প্রথম উল্লেখযোগ্য বই। এমন উপন্যাস একমাত্র ফ্লবেয়ারের লেখনী থেকেই আশা করা যায়। পাপ ও পুণ্যের এমন বিশদ ছবি ফরাসী উপন্যাসে সেই প্রথম দেখা দিয়েছিল। তথাপি বইটি অশ্লীল বলে নিন্দিত হলো; ফলে অল্পদিনের মধ্যে এর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন দেখা দিল।

এরপর মানুষের জীবনে পরিবেশ ও বংশপরম্পরায় প্রভাবকে ভিত্তি করে জোলা একাধিক উপন্যাস লিখতে মনস্থ করেন; তাঁর বিশ্বাস হলো যে গাণিতিক সুনিশ্চয়তার সঙ্গেই এই জিনিস প্রমাণ করা যায়। তাদের পরিবেশ, শিক্ষাদীক্ষা ও বংশপরম্পরা ধরে উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রগুলির গতিবিধি ঠিক সেইভাবে নির্ণয় যায় যেভাবে একজন বৈজ্ঞানিক তাঁব লেবোরেটরিতে বসে রাসায়নিক পদার্থগুলির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কবেন। ব্যালজাকের 'Comedie Humane-এর' অনুরূপ একটি বিরাট বই লিখবেন ঠিক করলেন। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য জোলা প্যারিসেব গ্রন্থাগারগুলি তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করলেন। এই গবেষণার ফল এবং যে সমাজ তাঁর প্রতি এবং আরো অনেকের প্রতি অবিচার কবেছিল সেই সমাজের প্রতি ঘৃণা—এই দুইয়ের পরিণতি ছিল বিশ খণ্ডে লেখা একটি উপন্যাস। পঁচিশ বছর লেগেছিল তাঁর এই এপিক উপন্যাসখানি লিখতে। ফরাসী সাহিত্যে ত বটেই, বিশ্বসাহিত্যেও এমন বিপুলায়তন উপন্যাস আজ পর্যন্ত আর কোন ঔপন্যাসিক রচনা করতে পারেন নি। দুটি পরিবারের ইতিহাস নিয়ে লেখা এই উপন্যাসখানি সম্পর্কে অাঁরি বারবুস বলেছেন: In the entire history of intellectual creation there is scarely another example of a man seeing so far advance with such precision the concrete contours of a multiform work. যাঁরাই এই উপন্যাসটি পাঠ করেছেন তাঁরই স্বীকার করবেন যে, এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিশখণ্ডে সমাপ্ত এই উপন্যাসটির প্রত্যেকটি খণ্ড স্বতন্ত্র, তাদের নামও আলাদা। প্রতিটি খণ্ডই যত্নসহকারে পৃথকভাবে পরিকল্পিত তথাপি খণ্ডগুলির মধ্যে ঐক্য সুপ্রত্যক্ষ—ঠিক যেমন বহুতল-বিশিষ্ট একটি বিরাট অট্টালিকার প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ড পৃথক হয়েও এক। প্রথম কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর জোলা না পেলেন খ্যাতি, না পেলেন অর্থ। সপ্তম খণ্ডটি, 'L'Assommoir' রীতিমতো সাড়া জাগাল পাঠকসমাজে। ঔপন্যাসিকের ভাগ্যে জুটল বিরূপ সমালোচনা—'সাহিত্যের ঝাড়ুদার' এই বিশেষণে বিভূষিত হয়েছিলেন জোলা সেদিন। কিন্তু বিক্রী বাড়তে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে জোলা হয়ে উঠলেন ফ্রান্সের সর্বাধিক আলোচিত লেখক। খ্যাতির সীমা পরিসীমা রইল না। ত্রয়োদশ খণ্ড (Germinal' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজসংস্কারক হিসাবে স্বীকৃত হলেন তবে এই পর্যায়ের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসটি ছিল ' Nana' —সর্বোত্তম নয়, কিন্তু সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নভেল। 'নানা'র জনপ্রিয়তা আজও অবিসম্বাদিত। আজও এই উপন্যাসটি পাঠকদের মুগ্ধ করে।

জোলার বয়স যখন ষাটের কাছাকাছি তখনই 'ড্রেফাস ঘটনায়' সমগ্র ফরাসীদেশ ও পৃথিবী আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। ১৮৯৫ সালে রাজদ্রোহের অপরাধে ক্যাপ্টেন আলফ্রেড ড্রেফাসের, বিচার হয় ও তাঁকে ডেভিলস দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। এই মামলার ফলে ফ্রান্সের রাজনীতি প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই রাজনীতি তখন অত্যন্ত দুর্নীতিপূর্ণ ছিল। ড্রেফাস দণ্ডিত হওয়ার দু'বছর বাদে তাঁর পত্নীর অনুরোধক্রমে মামলার কাগজপত্রগুলি পাঠ করে জোলা বুঝলেন যে ক্যাপ্টেন সম্পূর্ণ নির্দোষী। একজন নিরপরাধী ব্যক্তি এই ভাবে লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হবে আর যারা প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক তারা সৈন্যবাহিনীতে মাথা উঁচু করে থাকবে—জোলার কাছে এটা ছিল অসহনীয়। তিনি দণ্ডিত ড্রেফাসের পক্ষে কলম ধরলেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে তিনি লিখলেন একটি 'খোলা চিঠি'। অগ্নিবর্ষী সেই চিঠিতে বিশ্বাসঘাতকদের উদ্দেশে ধিক্কারবাণী যে ভাষায় ও যেভাবে ঝংকৃত হয়েছিল তা ইতিহাস হয়ে আছে। চিঠির প্রত্যেকটি প্যারা-গ্রাফের আরম্ভে ছিল—'I Accuse'—'আমি এই অভিযোগ আনছি'। তিনি এই ঐতিহাসিক পত্রের উপসংহারে বলেন, 'মনুষ্যত্বের নামে আমি ক্যাপ্টেন ড্রেফাসের পুনর্বিচার দাবী করছি।'

এই চিঠিখানির জন্য জোলা ধৃত হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীকে অপমান করার জন্য অভিযোগ নিয়ে আসা হলো এবং বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা প্রচারের অপরাধে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। বিচারে তাঁর এক বছর কারাদণ্ড ও তিন হাজার ফ্রাঙ্ক জরিমানা হয়। আবেদনের ফলে এই দণ্ড খারিজ হয়। ড্রেফাস মামলার যখন পুনর্বিচার হলো তখন ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে জোলাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি আরো চারখানি নতুন উপন্যাস রচনা করেন ও ড্রেফাস মামলা নিয়ে Justice নাম দিয়ে একটি নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন—এটি জোলার সর্বশেষ সাহিত্য কর্ম। কিন্তু তিনি এটি শেষ করে যেতে পারেন নি। ইংলণ্ডে থাকার সময় যখন তিনি জানতে পারলেন যে, পুনর্বিচারের ফলে ড্রেফাস নির্দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তখন জোলা বলেছিলেন 'পৃথিবীতে চিরকালই সত্য ও ন্যায়ের জয় হয়ে থাকে।'

শরৎকালের এক রাত্রে জোলা সকাল সকাল শয্যা গ্রহণ করেন। পরিচারকগণ শীত নিবারণের জন্য তাঁর শোবার ঘরের অগ্নিকুণ্ডটি (fireplace) একটু বেশি মাত্রায় প্রজ্জলিত করে রেখেছিল। অগ্নিকুণ্ডের চিমনি খারাপ হয়ে যায়—ঘর ধোঁয়ায় ভরে ওঠে ও শয়নকক্ষটি শ্বাসরোধী কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় এই গ্যাসের বিষাক্ত ধোঁয়ায় জোলার মৃত্যু হয় (সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯০২)। তাঁর শবযাত্রায় ত্রিশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল। আনাতোল ফ্রাঁস বলেছেন—'জোলা আজীবন ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। মনুষ্যত্ব আর বিবেকের তিনি জীবন্ত প্রতিমূর্তি।'

ফ্রেডরিক উইলহেলম্‌ নীটশে

(১৮৪৪-১৯০০)

১৮৪৪, ১৫ই অক্টোবর তারিখটি ছিল প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডরিক উইলহেলমের জন্ম তারিখ। ঐ তারিখে স্যাক্সনি প্রদেশের অন্তর্গত রকেন নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে নীটশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা, যিনি রাজ পরিবারের অনেকের গৃহশিক্ষক ছিলেন, রাজার জন্মদিনে তাঁর এই পুত্রটির জন্ম হওয়াতে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন এবং সেইজন্য রাজার নামেই ছেলের নামকরণ করেছিলেন। নীটশের বাবা ছিলেন মার্টিন লুথারের মতাবলম্বী একজন ধর্মযাজক এবং সেই কারণেই প্রচলিত খ্রীস্টান ধর্মের তিনি বিরোধী ছিলেন। মা ছিলেন ধর্মপ্রাণা পিউরিটান মহিলা। পিতার মনোভাব উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র নীটশের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার তৃতীয় সন্তান; তাঁর অগ্রজ যোশেফের শৈশবেই মৃত্যু হয়েছিল; দিদি থেরেসা এলিজাবেথ। ইনিই তাঁর প্রখ্যাত কনিষ্ঠ সহোদরের শুধু জীবনীকার ছিলেন না, নীটশের শেষ বয়সে তাঁর দুর্ভাগ্যের দিনে এলিজাবেথই করেছিলেন তাঁর সযত্ন পরিচর্যা।

ফ্রেডরিকের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তিনি পিতৃহীন হন। তখন নীটশে পরিবার নাউমবুর্গে চলে আসতে বাধ্য হয়। এইখানে ঠাকুরমা, মা, দুইজন অবিবাহিতা মাসী, এবং দিদি এলিজাবেথ—এই কয়জন ধর্মপ্রাণা মহিলাদের স্নেহ ও শাসনের মধ্যে নীটশের শৈশব জীবন গড়ে উঠেছিল।

এক আশ্চর্য প্রতিভাধর মানুষ ছিলেন নীটশে। চার বছর বয়সেই তিনি পড়তে পারতেন, পাঁচ বছর বয়সে লিখতে শিখেছিলেন আর ছ'বছর বয়সে বীটোফেনের সুর বাজাতে পারতেন। দশ বছর বয়সে তিনি কবিতা লিখতেন; সে সব কবিতা ছিল প্রধানতঃ ধর্মমূলক, গানও লিখতেন এবং পিয়ানো বাজাতেন। যখন তিনি গ্রামের স্কুলে ভর্তি হলেন তখন বালক নীটশের মধ্যে ধর্মভাব দেখে তাঁর সহপাঠীরা নীটশেকে ক্ষুদে যাজক ('The Little Pastor') বলে ডাকত। যখন তিনি বাইবেলের কোন অংশ নিয়ে উৎসাহভরে আলোচনা করতেন, তাই দেখে তাঁর এক শিক্ষকের মনে দ্বাদশবর্ষীয় যীশুর কথা স্মরণ হয়েছিল। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন, কিশোর নীটশে স্কুলের সহপাঠীদের আদৌ পছন্দ করতেন না। এমন কি তাদের তিনি তাঁর সঙ্গী হওয়ার যোগ্য বলেই মনে করতেন না। 'সেই বয়স থেকেই', এলিজাবেথ লিখেছেন, 'নীটশে কেমন যেন অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে দেখতাম; তার উন্নত নম্রস্বভাব অন্য ছেলেদের কাছে এমন আশ্চর্য মনে হতো যে তাঁর সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব অকল্পিত ছিল।'

চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি একটি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হলেন। এইখানে ছুটি

বিষয়ের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন—ভাষাতত্ত্ব ও ভাগনারের গান এবং এইদুটি বিষয় তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ধর্মের অনুশীলনে তাঁর মধ্যে ভক্তি-ভাবের প্রকাশ দেখে সবাই বিস্মিত হতো। ছয় বৎসর পরে নীটশে বন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। শৈশবাবধি তিনি ক্ষীণদৃষ্টি ছিলেন। খুব জোরালো আলো তাঁর চক্ষে সহ্য হতো না; সূর্যের আলোতে তাঁর মাথা ঘুরত; অন্ধকার ঘরের মধ্যেই বসে তিনি ভালোভাবে কাজ করতে পারতেন। কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সের পর থেকে তাঁর চোখের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেতে থাকে; যা কিছু করতেন তাতেই তাঁর কষ্ট হতো। বাইশ বছর বয়সে যখন তিনি লাইপজিগ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বদলি হন তখনই তিনি রীতিমত রোগাক্রান্ত ছিলেন। শোপেন-হাওয়রকে তিনি এইখানেই আবিষ্কার করেছিলেন। যখন তিনি এই দার্শনিকের 'The World As Will and Idea' বইখানি পাঠ করলেন তখন নীটশের মনের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল।

শোপেনহাওয়ারের দার্শনিক চিন্তা নীটশের মনে দাগ কেটেছিল। বেঁচে থাকার ইচ্ছার মধ্যে তিনি শুধু নিজের জন্য একটা রাস্তা পেলেন না, সেই সঙ্গে পেলেন একটা দর্শন যা দুঃখবিদ্ধ মানুষকে যন্ত্রণা ও আনন্দের ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি ভাগনারের সঙ্গে পরিচিত হলেন; তাঁকে দেখে তাঁর মনে হলো ইনি যেন শোপেনহাওয়ারের স্বপ্নের প্রতিমূর্তি। সংগীতের চিরাচরিত পদ্ধতির শুধু প্রতিবাদ নয়, ভাগনারের গান সমকালীন যাবতীয় নীতি-নৈতিকতারও প্রতিবাদ ছিল। তরুণ নীটশে বয়োবৃদ্ধ সুরকারের শিষ্য হলেন। ১৮৬৭ সালে ভাষাতত্ত্বে ডক্টরেট হলেন তিনি এবং পঁচিশ বছর বয়সে একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি ঐ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ভাগনার-এর খুব কাছেই তিনি বাস করতেন এবং দু'জনে প্রায়ই মিলিত হলেন। ১৮৭২ সালে নীটশে প্রকাশ করলেন তাঁর প্রথম ও একমাত্র সম্পূর্ণ বই 'The Brith of Taagedy out of the Spirit of Music', এবং এটি তিনি তাঁর প্রিয়তম সুরকারের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি ধর্মসম্পর্কে পৌরাণিক ধ্যান-ধারণার বিশেষ করে গ্রীক চিন্তাদর্শের ওপর শোপেনহাওয়ারের মতবাদ আরোপ করে, পিতৃ-পুরুষদের আচরিত ধর্মকে যথেচ্ছ আক্রমণ করেন এবং পৌত্তলিকতার জয়গান করেন। স্বভাবতই শিক্ষিত মহলে বইটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। বন্ধুদের শঙ্কিত করে তুলেছিল, এমন কি তাঁর চাকরি যাবার আশংকাও হলো। ক্রমে তাঁর ক্লাসে ছাত্র-সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল, কিন্তু নীটশে তাঁর মতবাদে অটল রইলেন। ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন দেখা দিল। তখন থেকে তিনি অসংশয়িত বিশ্বাস আর অখণ্ডনীয় যুক্তি সহকারে কথাবার্তা বলতে থাকেন। তখন থেকেই তাঁর যাবতীয় ভাষণ ও রচনার মধ্যে 'আমি' অর্থাৎ অহং ভাবটা প্রবল হয় উঠতে থাকে। যখন তাঁর বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর তখন তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি একটা পেনসন পেলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সে সামান্য আয় ছিল, তাই দিয়ে অতঃপর তিনি তাঁর মনের মতো কাজে আত্ম-নিয়োগ করার সুযোগ পেলেন। সেই কাজ ছিল দুটি—লেখা আর ভ্রমণ। তিনি সুখের আশায় আর একবার প্রয়াস পেলেন। যখন তিনি রোমে অবস্থান করছিলেন সেই সময়ে লেখক পলবী'র মাধ্যমে নীটশে এক বিদুষী তরুণীর সঙ্গে পরিচিত হন; রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের এই তরুণীর নাম ছিল লউ স্যালোমে। পরিচয় হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সেই বিদুষী মেয়েটির প্রেমে পড়লেন। স্যালোমে এই অস্থিরচিত্ত দার্শনিকের প্রশংসা করলেও তাঁর মধ্যে অতিযাচকের ভাব দেখে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। নীটশে এই তরুণীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন; সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলো। এর চেয়ে আরো দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল ভাগনারের সঙ্গে নীটশের বন্ধুত্বের অবসান। তাঁদের প্রথম বন্ধুত্বের সময়ে নীটশে এই স্বনামধন্য সুরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। পরবর্তীকালে একদা খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী এই সুরকারের মধ্যে মিস্টিসিজম্-এর ভাব দেখে নীটশে তাঁর প্রতি এমনই বিরূপ হয়েছিলেন ও তাঁর সম্পর্কে তাঁর মোহ এতদূরে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ভাগনারের এই পরিবর্তনকে কঠিনভাবে পরিহাস করে তিনি দু'খানা বই লিখেছিলেন। বই দুটি ছিল এক প্রতিভা সম্পর্কে আর এক প্রতিভার বিষোদগার। বন্ধুর উদ্দেশে তিনি যে কত রকমের অভিযোগ এনেছিলেন তা বলে শেষ করা যায় না। নীটশের এই সময়কার প্রকৃতি এই রকমই রূঢ় হয়ে উঠেছিল।

চল্লিশে উপনীত হয়ে তিনি যেন সকলের সামনে এক নতুন মানুষ হিসেবে প্রতিভাত হলেন। এই সময়ে তাঁর লেখনী থেকে যে কয়খানি বই নির্গত হয়েছিল তার প্রত্যেকটির মধ্যে ছিল একটি স্পর্ধিত মনের স্বাক্ষর। সেদিনের য়ুরোপ রীতিমত সচকিত হয়ে উঠেছিল নীটশের 'Untimely Thoughts'; 'Hnman' 'All too Human,' 'The Dawn of day'; 'The Joyful Wisd.m' ও 'Thus Spake Zarathustra—এই বইগুলি পাঠ করে। শেষোক্ত বইটিকে বলা হয়ে থাকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। যেমন দীপ্যমান এর লিখনভঙ্গী, তেমনি বিস্তৃত এর দৃষ্টিভঙ্গী। এই পাঁচখানির মধ্যে দ্বিতীয় বইটি প্রকাশিত হওয়ার এক বছর পরে, ১৮৭৯ সালে, জীবন মধ্যাহ্নেই নীটশের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল, শারীরিক ও মানসিক, এবং তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি অন্তিম সময়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর স্নেহময়ী সহোদরাকে বলেছিলেন— আমার মৃত্যুকালে কেবলমাত্র আমার বন্ধুরা এসে আমার শবাধারের পাশে দাঁড়াবে, যেন অনুসন্ধিৎসু কোন জনতার ভীড় না হয়। দেখো আমি যখন আর নিজেকে রক্ষা করতে পারব না তখন যেন কোন পুরোহিত অথবা আর কেউ এসে আমার কবরের পাশে মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ না করে। আমি যেন একজন সৎ অবিশ্বাসী হিসাবে কবরের তলায় যেতে পারি।' কিন্তু সে যাত্রায় নীটশে আরোগ্য লাভ করলেন।

এই প্রাণসংশয়ী অসুখ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত

হলো একটা আশ্চর্য পরিবর্তন। তিনি যে শুধু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন তা নয়, জীবনের যা কিছু সুন্দর ও কাম্য সেই বিষয়ে তাঁর মধ্যে দেখা গেল তীব্র অনুরাগ এবং এর থেকেই তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল মৃত্যু-বিজয়ী একটা প্রবল ইচ্ছা-শক্তি। নীটশের এই সময়কার মানসিক অবস্থার প্রতিফলন আছে 'The Dawn of Day' (১৮৮১) আর 'The Joyful Wisdom' (১৮৮২) বই দুটির মধ্যে। ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হলো 'জরথুস্ত্র'। ভেনিসে রিচার্ড ভাগনার যখন অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন তখন এই বইটির রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা একথা নীটশে জানতেন, সুনিশ্চিত ভাবেই জানতেন। ঊনিশ শতকের য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ বইগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রকাশিত হওয়ার পর, বইটির মাত্র চল্লিশ কপি বিক্রী হয়েছিল; সাতখানি বিতরণ করা হয়েছিল; একজন মাত্র প্রাপ্তি স্বীকার করেছিলেন; প্রশংসা কেউ করেননি। সেদিন নীটশে নিজেকে নিঃসঙ্গ ভেবেছিলেন।

তথাপি অক্লান্ত ছিল তাঁর লেখনী, অপরাজেয় ছিল তাঁর মনের শক্তি। তাই দেখা যায় যে, 'জরথুস্ত্র' প্রকাশিত হওয়ার অল্প কয়েক বছর পরে যদিও উদ্বেগজনক স্নায়ুরোগের লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল, তবু অদম্য ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে নীটশে রচনা করেছিলেন একে একে 'Beyond Good and Evil' (১১৮৬), 'The Genealogy of Morals' (১৮৮৭) এবং আত্মচরিতমূলক 'Ecce Homo' (১৮৮৮)। ১৮৮৯ সালে, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তিনি যখন টিউরিণে অবস্থান করছিলেন সেই সময়ে একদিন রাস্তায় নীটশে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান। তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল এবং তারপরে একটি উন্মাদাগারে। তাঁর মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং সেই অবস্থায় বারো বছর তিনি বেঁচে ছিলেন—বাঁচা নয়, জীবন্মৃত। যখন তাঁকে নউমবার্গে তাঁদের পৈতৃক ভবনে নিয়ে আসা হলো তখন তাঁর মা ও সহোদরা খুবই আশা করেছিলেন যে হয়ত একদা এই চিরনির্ভীক মন আবার নিজেকে আগের মতো প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু তাঁদের এই আশা দুরাশা ছিল। শেষের দিকে তিনি নির্বাকভাবে রোগশয্যায় শুয়ে থাকতেন, তারপর ১৯০০ সালের ২৫ আগস্ট নীটশের মৃত্যু হলো।

নীটশেরূপী জরথুস্ত্র বলে গিয়েছেন—

'God is dead. I touch you the Superman. Man is someting that is to be surpassed. What have you doneto surpass man ? The Superman is the meaning of the earth ? Let your will say : The Supernan shall be the meaning of the earth.

তাঁর এই বৈপ্লবিক চিন্তার মধ্যে আজো বেঁচে আছেন ফ্রেডরিক উইলহেলম নীটশে।

মাদাম সারা বার্ণহার্ড

(১৮৪৪-১৯২৩)

বিশ্ববন্দিতা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ডের (Madame Sarah Bernhardt) জন্ম হয় ১৮৪৪ সালে প্যারিসে। তাঁর মা, জুডিথ ভ্যান হার্ড, ছিলেন একজন ডাচ্ ইহুদী ; পিতা, এডুয়ার্ড বার্ণহার্ড, ছিলেন একজন আইনের ছাত্র। শহরের আবহাওয়া থেকে পল্লীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে সারার জীবনের প্রায় আট বছর অতিবাহিত হয়েছিল। এইবার জুডিথ তাঁর কন্যার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করলেন ; পাঠিয়ে দিলেন তাকে একটি ক্যাথলিক কনভেন্টে। এইখানে সারা একাদিক্রমে সাতটা বছর কাটিয়েছেন। তাঁর বয়স যখন ষোল বছর তখন কুমারী সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হবেন ঠিক করলেন। অভিনয় শিক্ষার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'কনজারভেটয়েরে' এ চার বছর অধ্যয়নের পর তিনি এখান থেকে যথারীতি স্নাতক হলেন। যে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখে একদিন তিনি অভিনয়কেই জীবনের পেশা রূপে গ্রহণ করার সংকল্প নিয়ে ছিলেন সেই রঙ্গমঞ্চেই শুরু হয় সারার অভিনেত্রী জীবন। র‍্যাসিনের একটি ছোট্ট ভূমিকায় তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন ১৮৬২ সালের আগস্ট মাসের এক সন্ধ্যায়। ঐ রঙ্গমঞ্চের প্রধানা অভিনেত্রী সারার অভিনয় দেখে বুঝলেন, রঙ্গমঞ্চে এক নতুন নক্ষত্রের আবির্ভাব হলো। কিছুকাল পরে তখনকার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক আলেকজান্দার ডুমার কাছ থেকে একটি পরিচয়-পত্র সঙ্গে নিয়ে সারা এলেন বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে। তখনকার দিনে প্যারিস ও লণ্ডনের পরে নাট্যকলার জন্য খ্যাতি ছিল এর। এখানকার একটি বিখ্যাত থিয়েটারে একটি নাটকের একটি জটিল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সারা শুধু ব্রাসেলস জয় করলেন না, সেই সঙ্গে বেলজিয়ামের এক সম্ভ্রান্ত রাজ-পরিবারের এক তরুণ যুবকের চিত্ত জয় করলেন। ১৮৬৯ সাল থেকেই সারা হয়ে উঠলেন প্যারিসের সরকারী থিয়েটারে একজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। প্যারিসের থিয়েটারমোদী লোকের মুখে মুখে তাঁর নাম ফিরতে লাগল। যখনি হ্যাণ্ডবিলে তাঁর নাম থাকতো তখনি প্রেক্ষাগৃহে দর্শকসমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত।

১৮৭০ সালের জুলাই মাসে বাধল ফ্রাঙ্কো-প্রশিয়ান যুদ্ধ। যুদ্ধের পর সারা শুরু করলেন তাঁর অভিনেত্রী জীবন। ভিক্টর হুগোর একটি নাটকে রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি প্যারিসের রঙ্গমঞ্চের প্রধানা অভিনেত্রীর স্থান লাভ করলেন। ক্রমে এখানকার রঙ্গমঞ্চে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। কিছুকাল পরে অভিনয়ের ম্যানেজারের অশিষ্ট ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়ে সারা ঐ রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করেন। তখন কমেডিয়া ফ্রঁসোয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন তাদের মঞ্চে যোগদান করবার জন্য। পরবর্তী সাড়ে সাত বছর তিনি এই থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও অভিনেত্রী হিসেবে প্রত্যেকটি নাটকেই বিপুল

খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকেন। জনচিত্ত বিজয়িনী অভিনেত্রী হিসেবে সমগ্র ফরাসী দেশ তাঁর নামে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে ঠিক এমনটি এর আগে কখনো দেখা যায়নি। সকলের মুখেই সারার কথা, তার চমকপ্রদ অভিনয়ের আলোচনায় প্যারিসের প্রত্যেকটির কাবারে, রেস্তোরাঁ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেন মুখর হয়ে উঠল। তিনি যেন হয়ে উঠলেন 'ফরাসীর জাতীয় সম্পদ।

সারার প্রতিভার অনুরাগীদের মধ্যে ছিলেন ভিক্টর হুগো, এমিল জোলা সুয়েজ খালের নির্মাতা ফার্দিনান্দ ড লেসেপ্স, কবি দ্যুনানজিও এবং অস্কার ওয়াইল্ড। তাঁর আবাসভবনে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ছিল নিত্য আনাগোনা। তাঁর সাহচর্য ছিল সকলেরই কাম্য। মার্কিন রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্ট যখনি প্যারিসে আসতেন সারার সঙ্গে একটিবার সাক্ষাৎ না করে তিনি ফিরে যেতেন না। কিন্তু এত খ্যাতি সত্বেও সারা মনে মনে সুখী ছিলেন না। কারণ কমেডিয়া ফ্রাঁসোয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গীর মিল ছিল না। গতানুগতিক অভিনেত্রী তিনি ছিলেন না, তাঁর ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আর অভিনয়ের মধ্যে একটি নতুন ধারা প্রবর্তনের সংকল্প। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে এইবার আত্মপ্রকাশ করবার দিন এল সারার জীবনে। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে নূতন তারকার উজ্জ্বলতা নিয়ে তিনি দাঁড়াবেন, তিনি পৃথিবী জয় করবেন—এই চিন্তায় যখন তিনি অস্থির ভাবে দিনাতিপাত করছিলেন, এমন সময়ে একদিন গেইটি (Gaiety) থিয়েটারের ম্যানেজার এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা লণ্ডনে একটা সীজন অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সারা তাদের সঙ্গে লণ্ডন যাবেন? সারা তৎক্ষণাৎ তার সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। মাসিক পাঁচ হাজার পাউণ্ডে তিনি চুক্তিবদ্ধ হলেন গেইটি থিয়েটারের সঙ্গে।

১৮৭৯, জুন মাস। গেইটি থিয়েটারের আগমনের জন্য সমস্ত লণ্ডন উন্মুখ হয়ে আছে। সারার এই প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। প্যারিসে তাঁর অনুরাগীবৃন্দ তাঁকে জানাল বিদায় সম্ভাষণ। তাদের সকলের শুভেচ্ছা সম্বল করে তিনি চললেন জীবনের অগ্রগতির পথে। শেক্সপিয়ারের লণ্ডনে তিনি অভিনয় করতে চলেছেন—আবেগে, উল্লাসে ও আশংকায় তাঁর সমগ্র সত্তা যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। লণ্ডনে উদ্বোধন রজনীতে প্রেক্ষাগৃহে লোক ধরে না। সকলেই সারার অভিনয় দেখবার জন্য উন্মুখ। র‍্যাসিনের একটি নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন সারা। সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে সেই অভিনয় এক অভূতপূর্ব শিহরণ এনে দিল প্রতিটি দর্শকের চিত্তে। লণ্ডনের কোন থিয়েটারে কোন কালে এমন দৃশ্য দেখা যায়নি। পরের দিন প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ডের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ছবি সমেত। এর আগে আর কোন অভিনেত্রীর জীবনে এমন সম্মান লাভ ঘটেনি ইংলণ্ডে।

একদিন লণ্ডনের বিখ্যাত ইম্প্রেশারিও এডওয়ার্ড জ্যারেট তাঁর সাজঘরে এসে সারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনার প্রতিভা আছে —আপনি কি ঐশ্বর্যবতী হতে ইচ্ছা করেন?' ঐশ্বর্যের প্রতি তিনি কখনো বিরূপ ছিলেন না। তাই সারা জানতে চাইলেন—'কি উপায়ে?' জ্যারেট উত্তরে বললেন—'ছ মাসের জন্য আমার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সফরে চলুন।' কিন্তু আমি তো শুধু ফরাসী ভাষায় অভিনয় করতে পারি।' তখন জ্যারেট তাঁকে বললেন, 'মাদাম আপনি চীনা ভাষায় অভিনয় করলেও ক্ষতি নেই। আমেরিকার দর্শকরা আপনার অভিনয় দেখে পাগল হয়ে যাবে।' জ্যারেটের সঙ্গে ছ'মাসের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন সারা। ঠিক হলো তাঁর নির্বাচিত আটটি নাটকের অভিনয় করবেন তিনি। এবং এর জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী তিনিই বাছাই করবেন ও নাটকগুলির পরিচালনাও করবেন তিনি। প্রতিটি অভিনয়ের জন্য তাঁর পারিশ্রমিক ধার্য হলো এক হাজার ডলার ও লাভের অর্ধাংশ। ১৮৮০। অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে সারা সদলে নিউইয়র্কে পদার্পণ করলেন। ব্রডওয়ে থিয়েটারে উদ্বোধন রজনীতে সে কি বিপুল দর্শক সমাগম। সারার অপূর্ব অভিনয় আর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হলো দর্শকবৃন্দ। বিখ্যাত লেখক লিটন স্ট্রেচি সারার কণ্ঠস্বর প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—'This was more than gold, there was thunder and lightning, there was heaven and hell'. অভিনেত্রী সারার কণ্ঠস্বরের এই ছিল বৈশিষ্ট্য।

ব্রডওয়েতে প্রথম রজনীর অভিনয়ে সারার সাফল্য এমন অভাবনীয় হয়েছিল যে সমস্ত আমেরিকা ঐ একটি নামে—'দি বার্ণহার্ড'—মুখর হয়ে উঠেছিল। নিউইয়র্ক শহরের উন্মাদনার পুনরাবৃত্তি বোস্টন শহরে হলো—বরং এখানে সারার সংবর্ধনা আরো সমুচ্ছ্বসিত ছিল। তিয়াত্তর বছর বয়স্ক কবি লংফেলো চমৎকার ফরাসী ভাষা জানতেন। তিনি একদিন সারাকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানালেন ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হলেন। মঞ্চে তিনি যে জাদু বিস্তার করতেন, এই রকম ঘরোয়া বৈঠকেও সারা অনায়াসে সকলের চিত্ত জয় করতে পারতেন। ক্ষীণাঙ্গী হলেও, এমন এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এই অভিনেত্রী যার সংস্পর্শে এলেও অভিভূত হতে হতো।

আমেরিকার বিভিন্ন শহরে সারা মোট ১৫৭টি অভিনয় করেছিলেন। এই অভিনয়ের শেষে দেখা গেল যে তিনি প্রায় দু'লক্ষ ডলার স্বর্ণমুদ্রা উপার্জন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার একটি ফল এই হলো যে, সেই থেকে এই অভিনেত্রীর মধ্যে ভ্রমণের নেশা প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে সারা সমগ্র য়ুরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, মাসোয়া, হনলুলু, অকল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া —কোথায় না তিনি গিয়েছেন আর প্রদর্শন করেছেন তাঁর অনুপম অভিনয় কলা। ১৮৮১ সালের শীতকালে তিনি সর্বপ্রথম রাশিয়া যান। এখানে সেন্ট পীটার্সবর্গের বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে তাঁর সাফল্যলাভ হয়েছিল রীতিমতো জাঁকজমকপূর্ণ। প্রতি রজনীতে তিনি যখন থিয়েটার অভিনয় করতেন, তখন প্রবেশ পথ থেকে মঞ্চ

পর্যন্ত লাল কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হতো পাছে বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে তাঁর কষ্ট হয়।

জীবনের শেষভাগে, সারা তাঁর নিজস্ব একটি থিয়েটার গঠন করেন। প্যারিসের বিখ্যাত থিটেটার দ্য নেশন্স-এর মঞ্চটি পঁচিশ বছরের লীজ নিয়ে তিনি এই থিয়েটাব স্থাপন করেন এবং এর নাম দেওয়া হলো থিয়েটার সারা বার্ণহার্ড'। তিনি যে শুধু একজন অভিনেত্রী হিসেবেই প্রতিভাময়ী ছিলেন তা নয়, মঞ্চ পরিচালনা এবং অভিনয় শিক্ষাদানেও তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন। তাঁব নিজস্ব মঞ্চে নাট্যকার সার্দ্য-র 'ফিদোরা' (Fedora) নাটকে একটি ছোট ভূমিকায় সারা অপূর্ব অভিনয় করেন। এই সময়ে নাট্য শিক্ষার জন্য প্যারিসে তিনি একটি স্কুলও খুলেছিলেন ও এর যাবতীয় ব্যয়ভার তিনিই বহন করতেন। ১৯১৪ সালের ৬ই মার্চ সারার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। জীবনের শেষভাগে তাঁর স্বজাতির কাছে এই বিশ্ববন্দিতা অভিনেত্রী যেন হয়ে উঠেছিলেন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে তাঁকে ফরাসীর সর্বোচ্চ সম্মান লিজ্রিয় দ্য অনার' (Le'gion Honneni) উপাধিতে ভূষিত করা হলো। ফরাসী দেশের আর কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ভাগ্যে আজ পর্যন্ত এই সম্মানলাভ ঘটেনি।

১৯২৩, ২৫শে মার্চ। ফরাসী দেশে তখন বসন্তের পুষ্পিত সমারোহ। বসন্তঋতু ছিল সারার বড় প্রিয়। ঐ দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার কিছুক্ষণ পূর্বে সংবাদপত্রের লোকদের তিনি বলেছিলেন: 'এই বসন্তঋতুর পথ দিয়েই আমি বিশ্বরঙ্গমঞ্চ থেকে এইবার বিদায় নেব। রঙ্গমঞ্চকে আমি আজীবন ভালোবেসেছি আর অভিনয়কে আমি চিরকাল ধর্মের সমান বলে মনে করেছি।' পৃথিবীর নাট্যামোদী মানুষ তাই রঙ্গমঞ্চের এই প্রতিভাকে আজো বিস্মৃত হয় নি।

টমাস আলভা এডিসন

(১৮৪৭-১৯৩১)

এই শতাব্দীর সূচনায় একবার প্রশ্ন উঠেছিল। পৃথিবীতে কার মাথার নগদ দাম সব চেয়ে বেশি? এর একটাই সর্ববাদীসম্মত উত্তর পাওয়া গিয়েছিল—এডিসনের—টমাস আলভা এডিসন। তাঁর প্রতিভা তাঁর সময়ের পুরোগামী ছিল না, ছিল সম্পূর্ণভাবেই তাঁর কালোপযোগী। শিল্প-সমৃদ্ধির বিস্ময়কর যুগে এডিসনের অত্যাশ্চর্য অবিক্রিয়াগুলি শুধু যান্ত্রিক পদ্ধতির দিক দিয়ে অসাধারণ ছিল না, উন্নতির নব নব ক্ষেত্রেরও দিক্ নির্দেশ করেছিল। আক্ষরিক অর্থেই তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে তাঁর পৃথিবীকে অসন্দিগ্ধ আলোক উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন এবং লিপিবদ্ধ শব্দের ইন্দ্রজাল দিয়ে একে স্পন্দিত করেছিলেন। যাইহোক, তাঁর পূর্ববর্তী উদ্ভাবকদের মতো তাঁকে কিন্তু স্বর্গ থেকে পুরস্কার পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি; উপকৃত এবং কৃতজ্ঞ এই পৃথিবী থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণেই তিনি তা পেয়েছিলেন।

এডিসনের মৃত্যুর পরে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল: 'ইতিহাসে এডিসনের মাথারই সব চেয়ে বেশি নগদ দাম।' উদ্ভাবনীশক্তি সম্পন্ন এমন মস্তিষ্ক পৃথিবীতে আগে বা পরে আর দেখা যায়নি কখনো। এডিসন পরিবার বিপ্লবের পূর্বেই আমেরিকায় এসেছিলেন। স্যামুয়েল এডিসন এসেছিলেন এক ওলন্দাজ বংশ থেকে, আর তাঁর পূর্বপুরুষগণ অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে হল্যাণ্ড থেকে এসে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মার্কিন উপনিবেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন, এবং পরে তাঁরা কানাডায় চলে গিয়েছিলেন।' সেখানে এডিসন পরিবারে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন টমাস আলভা; ১৮৪৭, ১১ই ফেব্রুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মকালে তাঁর বাবার বয়স ছিল তেতাল্লিশ আর মায়ের সাঁইত্রিশ। টমাসের শৈশবজীবন ছিল নিরুদ্বিগ্ন—এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন খুবই সৌভাগ্যবান। সুসংহত পরিবার আরামদায়ক গৃহ আর জীবনযাত্রা খুব আড়ম্বরপূর্ণ না হলেও বেশ সচ্ছন্দ ছিল। টমাসের মা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটির কল্পিত ক্ষীণস্বাস্থ্যের জন্য তাকে অপরিমিত ভাবে ভোজন করাতেন। টমাসের বয়স যখন সাত বছর, তখন তাঁদের পরিবারবর্গ মিচিগানে পোর্ট হারান নামক একটি নাতিজনবহুল শহরে উঠে এসেছিলেন। এখানে কাঠের ব্যবসা ভালই চলতে লাগল। এখানে এডিসন পরিবার একটি নতুন কুপকিসর-বাড়িতে বাস করতেন। টম (ছোট ছেলেটিকে পিতামাতা আদর করে এই নামে ডাকতেন) এখানকার একটি স্কুলে ভর্তি হলো; তার মা ছেলেকে সব সময় বলতেন—'তোমাকে সকল ছাত্রদের মধ্যে সেরা ছাত্র হতে হবে।' কি জানি কেন টমের উপর তাঁর খুব আশা ভরসা ছিল। কিন্তু টম একটু স্বাপ্নিক ছিল, আর তার এই অভ্যাসকে

শিক্ষকেরা অমনোযোগিতা বলে ধরে নিতেন। স্কুল থেকে নালিশ এলো টমের বিরুদ্ধে—সে নাকি অমনোযোগী। টমের মা বিশ্বাস করলেন না ; ছেলেকে তিনি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। মোট তিন মাস ছিল তাঁর ছাত্রজীবন। জীবনে আর কখনো তিনি স্কুলের চৌকাঠ মাড়ান নি। কিন্তু শৈশবাবধি শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তাঁর মা ছেলেকে নিজের কাছে রেখেই লেখাপড়া শেখাতে থাকেন।

পাঠের সঙ্গে তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখার একটা অদম্য আগ্রহ। এই সব পরীক্ষার ফল হতো অদ্ভুত। তাঁর বয়স যখন বারো বছর তখন বাড়ির ভূগর্ভস্থ ঘরটি বাক্স ও বোতল দিয়ে সাজিয়েছিলেন ; বলতেন এটা তাঁর ল্যাবোরেটরী। এইখানে বসে তিনি পরীক্ষা ও গবেষণার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। এর থেকেই একটি অসাধারণ প্রতিভার সূচনা হয়েছিল—অসাধারণ এবং অসন্দিগ্ধ। আরো বই, আরো উপকরণের প্রয়োজন এবং সে সব সংগ্রহ করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই টম একদিন তাঁর বাবা ও মাকে বললেন যে, তিনি ব্যবসায় নামবেন। ছেলের মুখে এই কথা শুনে তাঁরা দু'জনেই যারপরনাই বিস্মিত হলেন। কিন্তু তাঁদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে, তিনি কয়েকটি অর্থকরী উদ্যোগে লিপ্ত হলেন। তের বছর বয়সে তিনি সংবাদ-পরিবেশনার কাজ শুরু করে দিলেন। টম হলেন 'নিউজ বয়' (news boy) এবং সেই সঙ্গে তিনি ফেরিওয়ালাও হলেন—ট্রেনে পোর্ট হুরোন ও ডেট্রয়েট স্টেশনের মধ্যে বাদাম আর পিপারমিন্ট বিক্রী করতে লাগলেন। খবর পেলেন সস্তায় একটা ছাপাখানা বিক্রী হবে, অমনি বেশ লাভেই সেটা কিনে ফেললেন। তাঁর সেই মুদ্রাযন্ত্র থেকে প্রকাশিত হলো এক পৃষ্ঠার সংবাদপত্র। স্থানীয় সংবাদ তিনি নিজেই সংগ্রহ করতেন, নিজেই সম্পাদনা করতেন ; তারপর ছাপা হলে পরে নিজেই বিক্রী করতেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর গ্রাহকের সংখ্যা বেশ ভালই দাঁড়িয়েছিল। এই সময় ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস কাগজ করে এডিসন লাভ করেছিলেন এক শো ডলার। পনর বছর বয়সের একজন ছেলের পক্ষে এটা একটা ছোটখাটো সম্পদ ছিল বললেই হয়।

এডিসন বলেছেন—'এই একটা আইডিয়া (Idea) থেকে অর্থাৎ এইভাবে কাগজ বিক্রী করে অল্পদিনের মধ্যে আমি যথেষ্ট টাকা করেছিলাম আর তাতেই আমার টেলিগ্রাফি শিখবার সুযোগ হলো।' কিশোর মনে জাগে অদম্য কৌতূহল সাংকেতিক লিপি পাঠাবার পদ্ধতি শিখতে। তিনি মাউন্ট ক্লিমেন্স স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ও তার বাবুর (Telegrapher) কাছ থেকে মর্সের সাংকেতিক লিপি (Morse code) আর সেই সঙ্গে তারবার্তা পাঠাবার মোটামুটি পদ্ধতি শিক্ষা করেছিলেন।

টেলিগ্রাফি শিখবার পর থেকে ট্রেনই হয়ে উঠেছিল এডিসনের ঘরবাড়ি। ট্রেনের যাত্রীদের মালপত্র যে কামরাতে রাখা হতো সেইখানে একটা ল্যাবোরেটরি

বানাবার অনুমতি তিনি পেয়েছিলেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে কয়েকটি সফল উদ্যোগের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো অবস্থা হলো টমের। টেলিগ্রাফ অপারেটরের কাজ শিখে তিনি মাসিক বেতনে প্রথম চাকরি পেলেন কানাডাতে। পরিশ্রমী ছিলেন তিনি; কিন্তু পরিশ্রমের সঙ্গে ছিল চঞ্চল স্বভাব। পরবর্তী পাঁচটি বছর তাঁকে আমরা ক্রমাগত ভ্রমণ করতে দেখি। এক স্থানে থাকতে টম অসম্মত হতেন বলে তিনি যে চাকরি হারাতেন তা নয়, তার প্রাত্যহিক কাজের ক্ষতি করে, তিনি তাঁর পরীক্ষা চালাতেন এবং এই কারণেই তাঁকে চাকরি হারাতে হতো। এইসব পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তাঁকে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হতো।

একুশ বছর বয়সে উপনীত হয়ে টমের মনে হলো, তিনি যথেষ্ট ভ্রমণ করছেন, এইবার তাঁর জীবনে দিক পরিবর্তনের সময় এলো। বোস্টনে একটা চাকরি পেলেন—ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ অফিসে তিনি রাত্রিবেলায় একটা কাজ পেলেন দিনের বেলায় তাঁর অফুরন্ত অবসর; সেই অবসর টম বৃথা নষ্ট করতেন না। দিনের বেলায় তিনি তাঁর ভাড়া করা ল্যাবোরেটরিতে বসে তাঁর চিন্তাগুলিকে রূপ দিতেন; মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমাতেন তিনি। টেলিগ্রাফের বহুবিধ যন্ত্রপাতি তিনি এই সময়ে উদ্ভাবন করেছিলেন, কিন্তু কেউই আগ্রহ দেখাল না। তখন এডিসন ভোট রেকর্ড করার একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন, এবং এই যন্ত্রটি দিয়েই তিনি ১৮৬৮ সালে, তাঁর প্রথম 'পেটেন্ট (patent) বা বিশেষ অধিকারপত্র গ্রহণ করেছিলেন। এডিসনের আত্মবিশ্বাস তখন সুনিশ্চিত হলো। অতঃপর তিনি সংকল্প করলেন যে, তিনি সেই সব জিনিসই উদ্ভাবন করবেন যা লোকের প্রয়োজন এবং যা তারা স্বেচ্ছায় কিনবে। তিনি নিউইয়র্ক চলে গেলেন। তরুণ যুবক শহরে এলেন একেবারে কর্পদকহীন অবস্থায়, কিন্তু টেলিগ্রাফে যারা কাজ করত তাদেরই একজন অপারেটার এডিসনকে এক ডলার ধার দিলেন। শুধু তাই নয়; তাদের চেষ্টায় তিনি গোল্ড ইণ্ডিকেটর কোম্পানির ব্যাটারি ঘরে থাকবার একটা জায়গাও পেয়ে গেলেন একদিন। এই প্রতিষ্ঠানটির একটি যান্ত্রিক গোলযোগ মেরামত করে দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ মাসিক তিনশো ডলার মাইনেতে কোম্পানির ফোরম্যান নিযুক্ত হলেন টমাস।

আগের মতোই, মাইনের টাকা দিয়ে এডিসন একটা ছোটখাটো কারখানা (workshop) তৈরী করলেন, কিছু যন্ত্রপাতি কিনলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি গোল্ড ইণ্ডিকেটর কোম্পানি উদ্ভাবিত ticker system অপেক্ষা উন্নততর একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন এবং এটা করবার জন্য তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি এই নতুন আবিষ্ক্রিয়াটির পিছনে তাঁর সমস্ত সম্বল নিয়োগ করলেন। যন্ত্রটি যখন সম্পূর্ণ হোল তখন তিনি সেটি তার পূর্বতন মনিবকে বিক্রী করতে ইচ্ছা করলেন। দামের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে, এডিসন একটু ইতস্তত করলেন—পাঁচ হাজার ডলার চাইলে খুব বেশি হবে,

কি তিন হাজার ডলার বললে খুব কম হবে, সেটা তিনি ঠিক করতে পারলেন না। তখন তিনি দামের বিষয়টা কোম্পানির বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলেন। চল্লিশ হাজার ডলার পেলে আপনি কি সন্তুষ্ট হবেন? —কোম্পানীর পক্ষ থেকে যখন এই উত্তর তিনি পেলেন তখন, আমরা অনুমান করতে পারি, এডিসন, নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়ে থাকবেন। তখনো তাঁর বয়স বাইশ বছরও হয়নি।

এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যখন তাঁর হাতে এলো তখন টম একটা বড় কারখানা খুললেন। দিবারাত্র কারখানায় কাজ চলতে লাগল; দিনে ও রাতে তিনি নিজেই ফোরম্যানের কাজ করতে লাগলেন। যতই কাজ বাড়ুক, আর যতই কম তিনি ঘুমাতেন, তার মাথায় আবিষ্ক্রিয়াগুলি যেন ভীড় করে আসতে লাগল। ১৮৭৬ সালের মধ্যে তাঁকে একশো বাইশটি পেটেন্ট নিতে হয়েছিল। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি মেরি স্টীল ওয়েলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ইনি এডিসনের ল্যাবোরেটরিতে তাঁকে সাহায্য করতেন। বিয়ের ছ'বছর কালের মধ্যে তাঁদের এক কন্যা ও দুই পুত্রের জন্ম হয়। ১৮৭৮ সালে এডিসন নিউ জার্সির অন্তর্গত মেনলো পার্ক নামে একটি ছোট শহরে উঠে এলেন। এইখানে তাঁর গৃহের সন্নিকটেই তিনি একটা ওয়ার্কশপ খুললেন। তাঁর নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভা নতুন নতুন আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে সার্থক হয়ে উঠতে লাগল। তারের ভেতর দিয়ে দূরতম স্থানে মুহূর্ত মধ্যে সাংকেতিক লিপি প্রেরিত হয়ে পৃথিবীতে চমকের সৃষ্টি করেছিল টেলিগ্রাফ; কিন্তু সে তো মূক বাণী। এই বার মুখর বাণীকে দূরতম স্থানে তারের ভেতর দিয়ে প্রেরণ করার কৌশল আবিষ্কার করলেন এডিসন। মানুষের কণ্ঠস্বর মুহূর্তমধ্যে দূরতম স্থানে প্রেরণের উপায় প্রথমে উদ্ভাবন করেন আলেকজান্দার গ্রেহাম বেল। এরই নাম টেলিফোন বা দূরভাষ যন্ত্র। বেলের উদ্ভাবিত যন্ত্রটি প্রয়োগের দিক দিয়ে ততটা উন্নত ছিল না। এডিসন কার্বন ট্রান্সমিটার উদ্ভাবন করে টেলিফোনকে সম্পূর্ণতা প্রদান করেন।

ত্রিশ বছর বয়সে এডিসন ফনোগ্রাফ (বর্তমান গ্রামোফোন রেকর্ড) আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করে দিলেন। মানুষের কণ্ঠস্বরকে ধরে রাখা ও ইচ্ছামতো তাকে আবার শোনানো সত্যিই এটা সেদিন অকল্পিত ছিল। এর দু'বছর পরে, ১৮৭৯ সালের শেষ দিনটিতে পৃথিবীর মানুষকে তিনি আর একটি জিনিস উপহার দিলেন—ইলেকট্রিক বালবের আধারে বিধৃত বৈদ্যুতিক আলো। বত্রিশ বছর বয়সে তিনি জাতির গৌরবের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে উদ্ভাবক হিসাবে তিনি বিশ্ব-বিশ্রুত হয়ে উঠেছিলেন। উদ্ভাবনের ক্ষমতায়, খ্যাতিতে ও অর্থে এডিসন যেন পৃথিবীর একটি বিস্ময় হয়ে উঠেছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কর্মঠ ছিলেন। ১৯৩১, অক্টোবর ১৮ তারিখে চুরাশি বছর বয়সে মানুষের পৃথিবীকে আরো আরামপ্রদ করে দিয়ে, এই উদ্ভাবকশ্রেষ্ঠ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

টমাস গ্যারিগুয়ে ম্যাসারিক

(১৮৫০-১৯৩৭)

১৮৫৭ সালের ৭ মার্চ মোরাভিয়ার অন্তর্গত হেভোডিনের ছোট্ট শহরটিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাবী মুক্তিদাতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মনে হয় যিনি একদিন শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষদেশে আরোহণ করবেন, অদৃষ্ট সেই টমাস ম্যাসারিকের জন্য নির্বাচন করেছিলেন এমন পিতামাতা যাঁরা একেবারেই নগণ্য ছিলেন। ম্যাসারিকের বাবা অস্ট্রিয়ার রাজপরিবারের কোচম্যান ছিলেন ও তাঁদের জমিদারিতে সামান্য অশ্বপালকের জীবন যাপন করতেন। সে জীবন ছিল মধ্যযুগীয় ক্রীতদাসের জীবন। তাঁর মা এসেছিলেন এক চেক পরিবার থেকে। তাঁর পিতামাতা দু'জনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে টমাস অনেক বিষয়ে অন্য ছেলেদের থেকে স্বতন্ত্র; এমন কি তাঁর নিজের দুই সহোদর থেকেও। গ্রামের স্কুলে পাঠ শেষ হলে পরে স্কুলের প্রধানশিক্ষক ম্যাসারিকের পরীক্ষার ফল দেখে এমন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি ছেলের অভিভাবকদের ম্যাসারিককে একটা উচ্চতর স্কুলে দেওয়ার কথা বললেন। শিক্ষকের এই কথা শুনে ম্যাসারিক-জননী যারপরনাই আনন্দিত হলেন। শিক্ষকের প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলেন, স্বামী অবশ্য খুব উৎসাহ দেখালেন না। যাই হোক হুসটোপেজে একটি উচ্চবিদ্যালয়ে ম্যাসারিক ভর্তি হলেন; স্বামীর কোচম্যানের পোশাকটি কেটে মা নিজের হাতে তাঁর পুত্রের জন্য স্কুলের একটি স্যুট তৈরি করে দিলেন।

এই উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁর পিতামাতা টমাসকে মাত্র দুটি বছর পড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং তারপর তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এইখানে টমাস তাঁর গ্রামের স্কুলটিকে সাহায্য করবার জন্য শিক্ষকতা করতে লাগলেন। কিছুকাল বাদে টমাসের বাবা তাঁর ছেলেকে সোজা ভিয়েনাতে এক তালার কারিগরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন তার শিক্ষানবিশি করতে। তখন তাঁর বয়স পনর বছর।

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, সেই পনর বছর বয়সে, ভাগ্যের পরিবর্তন প্রসন্ন মনে গ্রহণ করার ক্ষমতা টমাসের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। শিক্ষকতার কাজে আবার বহাল হওয়ার পর, তাঁর জীবনের গতি যেন আবার তাঁর পুরাতন লক্ষ্যের প্রতি নিবদ্ধ হলো। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তিনি কাজের মধ্যে নিয়োগ করলেন। নিজেকে আবার তিনি শীঘ্রই অধ্যয়নের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন আর সেই সঙ্গে গ্রামের ছেলেদের বোধোদয়ের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পেতে থাকেন। তাঁর শিক্ষকতার ধরণ-ধারণ দেখে ছেলেরা তো চমকিত হলোই, এমন কি তাদের অভিভাবকরাও। একদিন ক্লাসে ভূগোল পড়াতে পড়াতে টমাস বললেন—'পৃথিবী গোলাকার, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে আর সূর্য স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে।' তখন এই কথা শুনে ছাত্ররা

বিস্মিত হলো। গ্রামের বর্ষিয়সী মহিলাগণ এর প্রতিবাদ করলেন আর ফাদার ক্রানজ্ টমাসকে এজন্ত তিরস্কার করলেন। কিন্তু তিনি অবিচল রইলেন। হস্টোপেজের স্কুলে পড়বার সময়ে তিনি যেসব উপদেশ লাভ করেছিলেন সেখানকার শিক্ষকদের কাছ থেকে, তা বৃথা হয়নি। সেই উপদেশাবলীর সঙ্গে তিনি আরেকটা উপদেশ যোগ করলেন এবং সেটি তিনি তাঁর নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন, তাঁকে যদি একজন যথার্থ শিক্ষক হতে হয় তাহলে তিনি সত্যের অন্বেষণ করবেন এবং তাঁর ছাত্রদের তিনি নির্ভয়ে সেই সত্য শিক্ষা দেবেন। এরপর ব্রুনোতে যে স্কুলে তিনি বদলি হয়েছিলেন সেটি ছিল জার্মান-নিয়ন্ত্রিত এবং সরকারীভাবে ক্যাথলিক। নিয়ন্ত্রণকারী এই দুই শক্তির সঙ্গে শীঘ্রই ম্যাসারিকের সংঘর্ষ বাধল। তিনি ভিয়েনাতে চলে গেলেন, এবং খুব সহজেই সেখানকার একটি স্কুলে শিক্ষকতার একটা কাজ পেয়ে গেলেন। এখানে স্কুলের কাজ-কর্মে বেশী চাপ ছিল না; অবসর সময়টা তিনি সংগীত, দর্শন, এবং বিভিন্ন চেক সমিতির উন্নতিবিধানে ব্যয় করতেন। এছাড়া এখানকার একটি কলেজ থেকে তিনি সম্মানিত স্নাতক হন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়ে স্কুল মাস্টার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দর্শনশাস্ত্রকে তাঁর অধ্যয়নের প্রধান বিষয় হিসাবে নির্বাচিত করে, তিনি এর ওপর মনঃসংযোগ করলেন। দর্শনে সুগভীর এবং ব্যাপকতম জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ম্যাসারিক একে একে লাতিন ও গ্রীক, ইংরেজি, ফরাসী, পোলিশ ও রাশিয়ান ভাষাগুলি দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করলেন এবং সেই সঙ্গে শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও শারীরবিদ্যার ক্লাসগুলিতেও যোগদান করতে থাকেন। একেই বলে অধ্যয়ন; অধ্যয়ন-স্পৃহার এই রকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।

১৮৮২ সালটি ম্যাসারিকের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর পাণ্ডিত্য, এবং তিনি একজন চেক—এই দুইটি কারণে প্রা-র (Prague) চেক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করলেন। তখন টমাসের বয়স বত্রিশ বছর। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হওয়ার দু'বছর আগে তিনি শার্লোটি গ্যারিগুয়ে নাম্নী এক সুন্দরী তরুণী মার্কিন মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই খুব আর্থিক সংকটের ভেতর দিয়ে দিনাতিপাত করতেন। তবু তিনি বোধ করলেন যে, তাঁর জীবনের কাজ তাঁর স্বজাতির মধ্যেই রয়েছে। এইসব চিন্তা করে এবং সেইসঙ্গে তাঁর পত্নীর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে, টমাস প্রা-তেই চলে এলেন। শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন—অধ্যাপনার জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করেই তিনি প্রবীন অধ্যাপকদের চমৎকৃত করেছিলেন। তাঁর দর্শন ছিল নবীনতায় সজীব আদৌ গতানুগতিক নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল বন্ধুর মতো। এর ফলে ডক্টর ম্যাসারিক তাদের বিশ্বাস ও ভক্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর অধ্যাপনার একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ছাত্রদের মধ্যে তিনি স্বজাতিপ্রিয়তা সঞ্চার

করে দিতেন। ক্রমে তাঁর খ্যাতি শহর অতিক্রম করে গ্রামে এবং চেকো-স্লোভাকিয়ার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। নবাগত যে তরুণ অধ্যাপকটি প্রা-তে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন সর্বত্রই তাঁর নাম যেন গর্ব ও আশার সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকে। তাঁর চিন্তা শুধু ক্লাস-রুমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এতে তিনি সন্তুষ্ট বোধ করতে পারতেন না। রাজনৈতিক বিচার-বিতর্কের সূচনা করে, একাধিক চেক সোসাইটি গঠন করে, জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করে ম্যাসারিক নিজেকে প্রকাশ্যে নির্যাতিতের পৃষ্ঠপোষক বলে ঘোষণা করলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ে যেমন, তেমনি এই রাজনৈতিক অভিযানে তিনি সত্য ও সততার ওপর জোর দিতেন। কোন মিথ্যার আশ্রয় তিনি নিতেন না, কোন রাজনৈতিক শঠতা বা চাতুরীর আশ্রয় নিতেন না।

১৮৯৩। ম্যাসারিকের জীবনে আর একটি স্মরণীয় বৎসর। ইয়ং চেক পার্টি তাঁকে ভিয়েনার অস্ট্রিয়ার পার্লামেন্টে নির্বাচিত করল। দীর্ঘদেহী, কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন এই মানুষটি অস্ট্রিয়ার সরকারী দলের (Government Party) তেমনি ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন যেমনি তাঁকে ভালবাসত তাঁর স্বদেশবাসী। সরকার পক্ষ থেকে তাঁদের নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য যেসব অপ্রীতিকর বিষয় উদ্ভাবন করা হতো, ম্যাসারিক সব সময়ই সেইগুলির ওপর তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। পার্লামেন্টে তাঁর বক্তৃতাগুলি শুধু নির্ভীক ছিল না, সেগুলি ছিল অলঙ্কার-বর্জিত, সুস্পষ্ট ও নির্ভীক। এবং তাঁর সেইসব বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া ছিল সাংঘাতিক। এইভাবে জনসাধারণ বা ব্যক্তি বিশেষের ওপর সরকারী অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। তাঁর বাস্তব নীতি ও অপ্রিয় ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার পিছনে ছিল ম্যাসারিকের নিজস্ব দর্শন। একদিকে জার্মান মানসিকতার ঔদ্ধত্য এবং অন্যদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাধা দানে স্লাভদের পরাজিত মনোবৃত্তি—এই দুইয়ের মধ্যে তিনি সর্বদাই ন্যায় ও বিচারের মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন।

ম্যাসারিকের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে হ্যাবসবুর্গ সরকার ম্যাসারিকের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর ওপর তাঁর স্বদেশবাসীর বিশ্বাস টলেনি। তিনি আবার পার্লামেন্টে নির্বাচিত হলেন এবং তখন থেকে কয়েক বৎসর যাবৎ দেশবাসীর ক্রমবর্ধমান শক্তির সমর্থন পেয়ে তিনি পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর ১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধল তখন সমস্ত য়ুরোপে একজন মাত্র মানুষ ছিলেন যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, অস্ত্রের এই প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে রয়েছে য়ুরোপের অবদমিত জাতিগুলির স্বাধীনতা-লাভের সত্যিকার আশা। 'ম্যাসারিকের বয়স তখন পঁয়ষট্টি বছর, তথাপি, তিনি তেমনি ঋজু, তেমনি শক্তিশালী—তাঁর চক্ষের বা মস্তিষ্কের সজীবতা তখনো অম্লান। অতীতে তিনি বহু বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এখনো তিনি পশ্চাদপদ হবেন না। তিনি জানতেন যে স্বজাতির স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করবার জন্য

মিত্র শক্তিবর্গের সাহায্য প্রয়োজন। সুতরাং তিনি অষ্ট্রিয়া ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তারপর একদিন সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে কন্যা ওলগাকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাসারিক ইতালির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। প্রথমে ইতালিতে, তারপর জেনিভাতে তিনি অষ্ট্রীয়া ও কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য চেকজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে বিশ্বের জনমত গঠনে অক্লান্ত প্রয়াস পেয়েছিলেন।

এরপর শুরু হয় কঠিন সংগ্রাম ও সংঘর্ষের জীবন। প্রা-তে তাঁর বন্ধুগণ ধৃত হলেন, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা এলিস কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন এবং ম্যাসারিকের ওপর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বিঘোষিত হলো। বিদেশে তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য অষ্ট্রিয়া সরকার বহুবার চেষ্টা করেছিলেন, এমন কি তাঁর জীবন নাশেরও চেষ্টা হয়েছিল। জেনিভা থেকে প্যারিসে এসে চেকজাতির স্বার্থের অনুকূলে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন। প্যারিস থেকে লণ্ডনে এসে ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাস উৎপাদন করলেন ও তাঁদের সমর্থন লাভ করলেন। এইভাবে আঠার মাসকাল বিদেশে বহু বিপদের মধ্য দিয়ে অক্লান্ত প্রচারকার্য চালিয়ে ম্যাসারিক তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে সফল হয়েছিলেন। ঠিক হলো, মিত্রশক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করলে সর্বপ্রথমে চেকো-শ্লোভাকিয়ার জনসাধারণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে।

তা-ই হয়েছিল। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ও প্রত্যেকটি মিত্রশক্তি চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁরা প্যারিসে গঠিত ন্যাশনাল কমিটিকে নতুন রাষ্ট্রের অস্থায়ী সরকার বলে স্বীকৃতি দিলেন। ১৯১৮, নভেম্বর ১৪। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রথম জাতীয় পরিষদ টমাস গ্যারিগুয়ে ম্যাসারিককে তাঁরই সৃষ্ট প্রজাতন্ত্রের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত করলেন। তখন তিনি প্রায় সত্তরের কোঠায় উপনীত হয়েছেন, এই বয়সে লোকে সাধারণতঃ বিশ্রাম সুখ উপভোগ করে থাকে। কিন্তু তাঁর জন্য বিশ্রাম ছিল না। সারাজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন এবং সংগ্রাম করে জয়লাভ করেছেন। এখন জাতির নির্বাচিত প্রেসিডেন্টরূপে তিনি যৌবনোচিত উদ্যম ও সতেজ মন নিয়ে তাঁর যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রের নির্মাণ কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্বে স্লাভজাতি সেদিন কী অসাধ্য সাধন করেছিল তা ইতিহাস হয়ে আছে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই নব-গঠিত এই রাষ্ট্রটি সম্পদের পথে পদাক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী ম্যাসারিককে তাঁর জীবিতকালে আরো তিনবার—১৯২০, ১৯২৭ ও ১৯৩৪—প্রেসিডেন্টের পদে নির্বাচিত করেছিল। ১৯৩৫ সালে পঁচাশী বছর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তী দুটি বছর তিনি গ্রন্থ রচনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। 'My Life' শীর্ষক আত্মচরিতে ম্যাসারিক তাঁর জীবনের কাহিনী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তারপর ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে শান্তভাবে তিনি মৃত্যুকে বরণ করেন। ম্যাসারিকের মৃত্যুতে সমগ্র চেকজাতি শোক প্রকাশ করেছিল। পৃথিবীর লোকও। বিশ্ব ইতিহাসে তিনি নিজ নামের মুদ্রাঙ্কিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জর্জ বার্ণার্ড শ

(১৮৫৬-১৯৫০)

২৬শে জুলাই, ১৮৫৬, আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিনে লুসিন্দা এলিজাবেথ ও জর্জ কার শ-র তৃতীয় সন্তান ও একমাত্র পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন বার্নার্ড শ। এঁদের প্রথম দুটি সন্তান ছিল কন্যা—লুসি বড়ো মেয়ে, আর মেজমেয়ে অ্যাগনিস। পর পর দুটি মেয়ের পরে লুসিন্দা যখন আবার সন্তানসম্ভবা হয়েছিলেন, কথিত আছে, তিনি যীশুখ্রীষ্টের কাছে একটি পুত্র সন্তান কামনা করেছিলেন। ভগবান তাঁর প্রার্থনা শুনেছিলেন। পুত্রকে তিনি খুব যত্নের সঙ্গে মানুষ করেছিলেন।

সানিকে (ছেলেবেলার শ-র ডাকনাম ছিল 'সানি') মানুষের মতো মানুষ করে তোলার আগ্রহে লুসিন্দা তাকে একটা স্কুলে ভর্তি করে দেবার জন্য তার স্বামীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। একটি সানডে স্কুলে তাঁর প্রথম পাঠাভ্যাস আরম্ভ হয় এবং যখন তাঁর বয়স তেরো বছর তখন তাঁকে ডাবলিনের সেণ্ট্রাল মডেল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো।

তাঁর বয়স যখন পনর বছর শ-পরিবারে দেখা দিল দারুণ ভাগ্যবিপর্যয়। জর্জ কারের ব্যবসায় মন্দা এলো; সংসারের অবস্থা প্রায় অচল। ছোট একটি বাড়িতে তাঁদের উঠে আসতে হলো। ডাবলিনের একটি ল্যাণ্ড এজেন্টের অফিসে অফিস বয়ের কাজ নিলেন কিশোর শ—মাইনে মাসে আঠারো শিলিং। পাঁচ বছর তিনি এখানে কাজ করেছিলেন এবং কর্মদক্ষতার গুণে অল্প দিন পরেই তিনি কেশিয়ারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন; তখন তাঁর মাইনে হয়েছিল মাসে সাত পাউণ্ড। কিন্তু চাকরিতে আর মন বসল না। মা ও দিদিরা সবাই তখন লণ্ডনে; তাঁর মন লণ্ডন যেতে চাইলো। অতঃপর তিনি এলেন লণ্ডনে—শেকস্পিয়র-শেলির লণ্ডন তাঁকে সেদিন প্রবলভাবেই আকর্ষণ করেছিল।

পেটে অন্ন নেই তবু জ্ঞানার্জনে তিনি বিরত ছিলেন না। প্রতিদিন যেতেন লণ্ডনের বৃহত্তম পাঠাগার ব্রিটিশ মিউজিয়মে। পড়তেন সেখানে কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' আর ভাগনারের গানের বই। এইখানেই দৈবক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় নাট্যকার-সমালোচক উইলিয়াম আর্চার এবং তরুণ সিড্‌নি ওয়েবের সঙ্গে। তারপর হেনরী জর্জের বক্তৃতা শুনে তিনি হয়ে উঠলেন একজন সমাজতন্ত্রবাদী আর শেলির কবিতা পাঠ করে তিনি হয়ে উঠলেন নিরামিষভোজী। হেনরী জর্জের লেখার মধ্যে এক নূতন পৃথিবীর সন্ধান পেলেন শ। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সোসালিজমের প্রচারকার্য অতঃপর হয়ে উঠল তাঁর জীবনব্রত। ঠিক এই সময়েই তিনি ফরাসী ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে মার্কসের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ভিক্টোরিয় যুগের ঘুণ-ধরা জীবনাদর্শ বর্জন

করে এইবার দীক্ষা নিলেন সমাজতন্ত্রের অগ্নিমন্ত্রে। এক নবীন প্রাণচেতনার কল্লোল নেমে এলো তাঁর চিন্তায়, তাঁর কল্পনায়। বুর্জোয়া সভ্যতার অসারত্ব এমন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে যিনি প্রমাণ করেছেন সেই কার্ল মার্কসকে শ তখন থেকে তাঁর চিন্তায় স্থায়ী আসন দিলেন। কিছুকাল পরে একটি শ্রমিক বিক্ষোভের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে শ-র চিন্তাধারায় পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি বুঝলেন বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে উত্তেজিত করা যায়, কিন্তু তাকে সংঘবদ্ধ ও শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে তাদের কোনো উপকারই করা যায় না। সেদিন থেকেই তিনি জনসাধারণের নেতৃত্বের মোহ বিসর্জন করলেন।

এবার তিনি সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। নাটক ও সংগীত সম্বন্ধে সমালোচনা লিখতে গিয়ে শ' ঐ দুটি বিষয়ের সমালোচনায় এক নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দিলেন যা ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারল না। তবে ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের 'স্যাটারডে রিভিয়ু' পত্রিকাতেই সমালোচক রূপে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। এখানেই সতীর্থরূপে তিনি পেয়েছিলেন এইচ. জি ওয়েলস ও অস্কার ওয়াইল্ডকে। তাঁর নাটকের সমালোচনা রঙ্গমঞ্চে সাড়া জাগিয়েছিল সেদিন। সমালোচক শ এইবার রূপান্তরিত হলেন নাট্যকার শ হিসাবে। শ'র প্রথম নাটক 'দি উইডোয়ার্স হাউসেস'। ১৮৯২ সনের ২রা ডিসেম্বর নব-নাট্য আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা জ্যাক গ্রেন তাঁর নিজস্ব মঞ্চ—ইনডিপেনডেন্ট থিয়েটারে শ-র ঐ নাটকখানির অভিনয় করলেন। প্রাচীরপত্রে নাট্যকারের নাম অবশ্য বিজ্ঞাপিত হয় নি। উদ্বোধন রজনীতে শ এলেন দেখতে তাঁর নাটক। একদল দর্শক জানালো অভিনন্দন আর অতি সাধারণ স্তরের দর্শক যারা তাঁর ঐ নাটক গ্রহণ করল না; তাদের পক্ষ থেকে এলো ঠাট্টা, বিদ্রূপ, গোলমাল আর গালাগাল। ঠিক সেই মুহূর্তে মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন শ। উত্তেজিত দর্শকবৃন্দ সবিস্ময়ে দেখল তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ছ'ফুট লম্বা, পাতলা চেহারার একটি মানুষ, যেন খাপখোলা একটি তলোয়ার। কোনো রকম ভূমিকা না করেই অনর্গল ইংরাজিতে তিনি শুরু করলেন বক্তৃতা—বক্তৃতা নয়, যেন তরল লাভাস্রোত। বললেন তিনি—'আমি, জর্জ বার্নার্ড শ, জাতিতে আইরিশ, এই নাটকের নাট্যকার। সস্তা ও হাল্কা নাচ গানের জন্য থিয়েটার নয়। শেক্সপিয়র এ যুগে অচল। এখন থেকে থিয়েটারে শুরু হয়েছে ইবসেন বার্নার্ড শ-র যুগ। এখনকার থিয়েটার হবে শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি দর্শকদের জন্য।' এই কয়টি কথা শোনার পর উত্তেজিত দর্শকবৃন্দ শান্ত হলো এবং তারা নিঃশব্দে অভিনন্দন জানালো ইংলণ্ডের এই উদীয়মান নাট্যপ্রতিভাকে।

এইবার শ-র মনে হলো তাঁর প্রতিভার বাহন হতে পারে নাটক। এতদিন বক্তৃতামঞ্চে, বিতর্ক সভায় ও সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি যে পথের সন্ধান করছিলেন, এখন তাঁর মনে হলো তাঁর দৃষ্টিপথে সেই পথ আজ সমুদ্ভাসিত। ইংলণ্ডের জীর্ণ অতিবৃদ্ধ নাট্যশালার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন তিনি।

প্রাচীনপন্থীদের হাত থেকে উদ্ধার করে এর কালোপযোগী সংস্কারসাধন করতে হবে। নাটকের ক্ষেত্রে তখন ইবসেনের নূতন কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। ইবসেনের নাটকের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেলেন যুগোপযোগী নাট্যচিন্তার সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ইঙ্গিত। সেই থেকে শ হলেন ইবসেনের একলব্য শিষ্য। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ইংলণ্ডের থিয়েটারকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে নূতন ভাবধারায় নাটক দরকার। প্রথম নাটক রচনার তিন বছরের মধ্যে শ রচনা করলেন আধডজন নাটক—এর প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু ছিল নূতন। এর মধ্যে 'দি ফিলানডার' নাটকটি ছিল একটি নির্মম স্যাটায়ার আর 'মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেসন' নাটকটি ছিল গণিকাবৃত্তি নিয়ে। ধনতান্ত্রিক সমাজেরই অন্যতম পাপ হলো এই গণিকাবৃত্তি এবং এর জন্য সমগ্র সমাজই দায়ী। এই নাটকের বিষয়বস্তু স্পষ্টতই ভিক্টোরিয়ো ইংলণ্ডের প্রচলিত মানসিকতাকে একটা প্রচণ্ড আঘাত দিলো। নীতিবাগীশরা এই নাটক সহ্য করতে পারলেন না এবং তাঁদের চাপে পড়ে পার্লামেণ্ট এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে দিলেন। পরে ১৯২৪ সনে ইংলণ্ডের সেন্সর কর্তৃপক্ষ জনমতের চাপে এই নাটকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অপর চারখানি নাটকের নাম ছিল—'আর্মস য়্যাণ্ড দি ম্যান', 'ক্যাঁদিদা' 'দি ম্যান অব ডেসটিনি' ও 'ইউ নেভার ক্যান টেল'। এই ছয়খানি নাটক একত্রে যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন ইংলণ্ডের সমালোচকবৃন্দ বিরূপ সমালোচনাই করলেন। অতলান্তিকের পরপারে সমালোচনার ঝাঁজ ছিল আরো উগ্র, আরো তীব্র।

বার্নার্ড শ-র বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তিনি বিদুষী সার্লোট পেইন টাউনসেণ্ড নাম্নী এক আইরিশ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। শ' যখন তাঁর খ্যাতির পথে পদার্পণ করেছেন তখন তাঁর সাহিত্যিক কর্মের তত্ত্বাবধান করবার জন্য এইরকম একজন বিদুষী মহিলার প্রয়োজন ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে তাঁর স্বামীর গৃহিনী, সচিব ও বান্ধবী। তাঁর জীবনের পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল এই সেবাপরায়না পত্নীর সুনিপুণ পরিচর্যার ফলে সুখের হয়েছিল, শান্তির হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে তখন দু'বছর বাকী যখন বানার্ড শ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'সীজার য়্যাণ্ড ক্লিওপাত্রা' লিখে শেষ করেন। তারপর নূতন শতাব্দীকে তিনি অভিনন্দিত করলেন তাঁর যুগান্তকারী নাটক 'ম্যান য়্যাণ্ড সুপারম্যান' দিয়ে। শ-প্রতিভার এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হলো এই নাটকে। ১৯০৫ সনে স্টেজ সোসাইটির পক্ষ থেকে তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতা গ্র্যানভিল বার্কার স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে এই নাটকখানি অভিনয় করেন। তখন শ কোর্ট থিয়েটারে যোগদান করেছেন নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও নাট্যশিক্ষক হিসাবে। সেই রঙ্গালয়েই খুব সাফল্যের সঙ্গে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। দর্শক ও সমালোচক একবাক্যে শ-কে অভিনন্দন জানালেন। লণ্ডনের খ্যাতি পৌঁছল নিউইয়র্কে। সেখানকার বিখ্যাত অভিনেতা রবার্ট লোরেন ঐ বছরটি হাডসন থিয়েটারে

'ম্যান য়্যাণ্ড সুপারম্যান' মঞ্চস্থ করলেন। লণ্ডনের চেয়ে নিউইয়র্কের সাফল্য শ'কে বিস্মিত করলো। তিনি রয়্যালটি বাবদ পেলেন পঞ্চাশ হাজার ডলার।

শ-র জীবন কিন্তু সাহিত্য-সর্বস্ব ছিল না। রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতার সঙ্কটজনক মুহূর্তে যখনি যে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাঁর নির্ভীক কণ্ঠ আমরা তখনি শুনতে পেয়েছি। নাট্যকারের জগৎ-জোড়া খ্যাতির চেয়েও শ-র জীবনের বড়ো কীর্তি হলো এই যে, যে সমাজতন্ত্রবাদ একদা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজসভায় নিতান্ত কৌতুকের বিষয় ছিল, অবিচ্ছিন্ন প্রচার ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সেই সমাজতন্ত্রবাদকে তিনি ইংলণ্ডের সমাজজীবনে ও রাজনীতিতে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি দেখে গিয়েছিলেন যে, সমাজতন্ত্রী সরকার ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। ১৯১৪ সনে যখন য়ুরোপে বিশ্বযুদ্ধ বাধলো তখন তাঁর একটি বিবৃতিতে যুদ্ধের নিন্দা করে তিনি যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাঁর উপর রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়েছিল। শ-র শান্তির আবেদনে কেউ কর্ণপাত করেনি সে দিন। চার বছর পরে যুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন দেখা গেল যে, য়ুরোপে একটা যুগ শেষ হয়ে আর একটা নূতন যুগের অভ্যুদয় ঘটেছে। এই যুগের আভ্যুদয়িক তিনি রচনা করলেন চিন্তাগর্ভ নূতন নূতন নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করে। আবার তিনি অভিনন্দিত হলেন এ যুগের অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক রূপে। যুদ্ধোত্তর কালে রচিত তাঁর নাটকগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো 'সেণ্ট জোয়ান'। ইতিহাসের অন্ধকার থেকে এই মহীয়সী নারী যেন এক নূতন রূপে উদ্ভাসিত হলেন বিংশ শতকের পাঠকদের কাছে।

১৯২৫। সাহিত্যকর্মের পুরস্কার হিসাবে শ লাভ করলেন নোবেল প্রাইজ। সত্তর বৎসরে পদার্পণ করলেন শ। সমগ্র পৃথিবী তাঁকে জানালো অভিনন্দন —অভিনন্দন জানালেন ভারতের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। দেখতে দেখতে আরো বিশ বছর অতিক্রান্ত হলো। শ নব্বুই-এর কোঠায় পৌঁছলেন। মস্তিষ্ক তেমনি সক্রিয়, লেখনী তেমনি অক্লান্ত। লেখার যেন বিরাম নেই। বার্ধক্যে শরীর জীর্ণ হয়েছিল সত্যি কিন্তু তাঁর সেই অদম্য প্রাণশক্তি যেন যৌবনের সতেজ দীপ্তি নিয়ে অটুট ছিল। সব কিছুর ঊর্ধ্বে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—যুগের পটে আঁকা একখানি চিত্রের মতো। রঙে রেখায় ও বর্ণসুষমায় অনুপম, অত্যাশ্চর্য সেই চিত্রের নাম—জর্জ বার্নার্ড শ। তার শিল্পী—জি, বি. এস.—অন্য কেউ নয়। নভেম্বর ২,১৯৫০। মানব-শিক্ষক এবং সভ্যতার প্রিয় শত্রু বার্নার্ড শ এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। পিছনে রেখে গেলেন তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার অজস্র সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি আজও এযুগের মানুষের মনকে সতেজ ও উদ্দীপ্ত করে রেখেছে।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

(১৮৫৬-১৯৩৯)

বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানের ইতিহাসে একটি ভাস্বর নক্ষত্র ফ্রয়েড। আধুনিক পৃথিবীতে মনঃসমীক্ষণ বিদ্যার জনক তিনি। বিংশ শতাব্দীর চিন্তা নায়কদের মধ্যে অন্যতম এবং একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রধানতম ব্যক্তি বলে স্বীকৃত। বস্তুর অতীত মন এবং তার গতি প্রকৃতিকে বুঝবার ও চেনবার পথের এক পরিপূর্ণ আবিষ্কারকে ত্বরান্বিত করে গেছেন তিনি। এই আবিষ্কারের পর থেকেই মানুষের চিন্তার জগতে সূচিত হয়েছে একটি যুগান্তর।

১৮৫৬ সনের ৬ই মে অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত মোরাভিয়া শহরের নিকট ফ্রেবার্গ নামক স্থানে ফ্রয়েড জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে মোরাভিয়া চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত। ফ্রয়েডের জন্মকালে তাঁর মা অ্যামেলিয়ার বয়স ছিল একুশ বছর আর পিতা জ্যাকব ফ্রয়েডের বয়স ছিল একচল্লিশ। জ্যাকব ছিলেন একজন ইহুদী, পশম ব্যবসায়ী, সৎ, দানশীল ও ধর্মভীরু ব্যক্তি হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া অ্যামেলিয়া ছিলেন তাঁর স্বামীর দ্বিতীয়া পত্নী।

ফ্রয়েডের বয়স যখন চার বছর তখন তাঁর পিতা ভিয়েনায় চলে এলেন এবং অতঃপর তিনি সেইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ভিয়েনার একটি স্কুলেই ফ্রয়েডের শৈশব-শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু তাঁর শৈশবে মায়ের অপরিসীম স্নেহ আর প্রশ্রয়ের ফলে ফ্রয়েডের প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেছিল। ছেলেবেলা থেকেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন দুরন্ত, সাহসী আর অতিমাত্রায় জেদী।

তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন ফ্রয়েড ভিয়েনার স্পার্ল হাইস্কুলে প্রবিষ্ট হলেন। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন; বিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। স্কুলের আর কোন ছাত্রের পক্ষেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঐ স্থান থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব হয়নি।

স্কুলে তিনি দুটি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছিলেন, যথা—রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা। ঠিক এই সময়েই তিনি ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এর ফলে তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে জেগে উঠল এষণা এবং তাঁর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এই এষণা তাঁর মধ্যে সমান বলবৎ ছিল। জ্যাকবের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সিগমুণ্ড একজন আইনজীবী হন এবং তাঁর স্কুলজীবনে ফ্রয়েডও ঠিক করেছিলেন যে তিনি আইন পড়বেন। কিন্তু গ্যেটে ও ডারউইনের চিন্তাধারা তখন তাঁর জীবনের ভবিষ্যৎ পথ অনেকটা নির্দেশ করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ডাক্তারী পড়বেন ঠিক করলেন ও সতেরো বছর বয়সে তিনি ভিয়েনার

মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হলেন। ফ্রয়েড প্রথমে শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে খুব মনোযোগী হলেন এবং স্নায়ুতন্ত্রের উপর কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যাপকগণ ঐ প্রবন্ধগুলি পাঠ করে এই ছাত্রটির প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন। ১৮৮১ সনে তিনি 'ডক্টর অব মেডিসিন' উপাধি লাভ করেন। ফ্রয়েডের বয়স তখন ছাব্বিশ বছর। তাঁর পরীক্ষকগণ সকলেই তাঁর উত্তর-পত্র দেখে একবাক্যে 'সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র'—এই বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

এইবার শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। ডাক্তারি পাশ করলেন বটে, কিন্তু প্র্যাকটিস তিনি করলেন না। তিনি ভিয়েনার বিখ্যাত জেনারেল হাসপাতালে একজন Neurologist (স্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞ) হিসাবে চাকরি নিলেন। তখন থেকেই তিনি স্নায়বিক ও মানসিক রোগ সম্পর্কে খুব মনোযোগী হয়ে পড়েন। ১৮৮৫ সনে তিনি ভিয়েনার মেডিকেল কলেজের নিউরো-প্যাথোলজির লেকচারার নিযুক্ত হলেন ও পর বৎসর তিনি মার্থা বার্ণেজ নাম্নী এক তরুণীকে বিবাহ করেন। এইবার তিনি স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করলেন, তবে সাধারণ চিকিৎসক হিসাবে নয়, একজন বিশেষজ্ঞ বা Specialist হিসাবে তিনি একটি ক্লিনিক খুললেন। ভিয়েনা শহরে স্নানবিক রোগ চিকিৎসার সেই প্রথম ক্লিনিক। এবং অল্পদিনের মধ্যেই ঐ রোগের চিকিৎসক হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করলেন। খ্যাতির সঙ্গে অর্থও। কিন্তু বাধা পেলেন চিকিৎসকসমাজ থেকে। তাঁদের মতে স্নায়ুর রোগ আবার একটা রোগ নাকি—যে, তার জন্য ডাক্তারি চিকিৎসার দরকার। ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে ভিয়েনার চিকিৎসক সমিতির পক্ষ থেকে ঐ সময় একখানা পুস্তিকা পর্যন্ত মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়েছিল। সেদিন ফ্রয়েডকে এইসব বিবিধ বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায়ের শুরুতেই। স্নায়বিক রোগসংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রথম প্রথম কেউই বিশ্বাস করে নি। না করুক, তিনি কিন্তু আপন মনে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়েই ফ্রয়েডকে তাঁর পথ করে নিতে হয়েছিল। ১৮৯৫ সনে 'Studies in Hysteria' নামক গ্রন্থে যখন তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ করলেন তখন সবাই নিঃসংশয়ে জানতে পারল যে, মানুষের শরীরের মধ্যে অবচেতন মন (Unconscious mind) বলে একটি বস্তু আছে এবং তাই-ই হলো যাবতীয় স্নায়ুরোগের উৎস।

এই মতবাদ এত অভিনব ছিল যে, চিকিৎসা জগতে সেদিন এই নিয়ে তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সকল বাধা-বিপত্তি ও বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও ফ্রয়েড তাঁর সিদ্ধান্তে স্থিরবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ধারণা যে অভ্রান্ত সেটা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন তা ছিল অভাবনীয়। তিনি মানব মনের প্রকৃতিকে আবিষ্কার করলেন এবং শীঘ্র তিনি এই সম্পর্কে এমন সব কথা বললেন যাকে কেন্দ্র করে বিদগ্ধ মহলে আরো বিতর্কের ঝড় উঠল। তাঁর

মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলবার জন্য ১৯০০ থেকে ১৯৩২ এই দীর্ঘকালের মধ্যে ফ্রয়েডকে এগারখানি গ্রন্থ রচনা করতে হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে দেখা যায় যে, ধীরে ধীরে তাঁর মতবাদের সমর্থনে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল; অ্যাডলার গ্রাফ, স্থাক, স্টেকল প্রভৃতি প্রতিভাবান যুবকবৃন্দ তখন এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। পরবর্তিকালে ফ্রয়েডিয় চিন্তার পূর্ণতা সাধনে এঁদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অবদান ছিল। জুরিখে রেনস্তার ও ইয়ুং ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল। ১৯০৯ সনে আমন্ত্রণ এলো আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা করবার জন্য। ইয়ুংকে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে ফ্রয়েড এলেন আমেরিকায় এবং মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। এখানে তাঁর কাজ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং আমেরিকা ফ্রয়েডিয় ভাবধারা গ্রহণ করেছিল, বলা চলে।

সারা জীবনই ফ্রয়েডকে ঝড়-ঝাপটার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে উপনীত হয়ে তাঁকে যে প্রকাণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার সামনেও তিনি ছিলেন অবিচলিত। তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, চোয়ালের ক্যান্সার রোগে তিনি তখন দীর্ঘকাল যাবৎ ভুগছিলেন যখন জার্মানিতে নাৎসীনায়ক হিটলারের অভ্যুদয় ঘটল। ক্ষমতা লাভের পর নাৎসী সরকারের আদেশে জার্মানিতে ফ্রয়েডের সমস্ত রচনা 'Jewish pornography' বলে ধিকৃত হলো ও প্রকাশ্যে তাঁর যাবতীয় বই অগ্নিদগ্ধ করা হলো। ১৯৩৭ সনে অস্ট্রিয়ার পতনের ফলে হিটলারের ইহুদী বিদ্বেষ যখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল তখন ফ্রয়েডের বন্ধুবান্ধব সকলেই উৎকণ্ঠিত হলেন ও অবিলম্বে ভিয়েনা ত্যাগ করার জন্য সকলেই তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। তখন তাঁর বয়স বিরাশী বছর এবং দুরারোগ্য ক্যান্সার তাঁর স্বাস্থ্য জীর্ণ করে দিয়েছে। তিনি কিছুতেই ভিয়েনা ত্যাগ করতে সম্মত হলেন না। হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করলেন; নাৎসী সরকারের নির্দেশে ফ্রয়েডের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ সব বাজেয়াপ্ত করা হয়। সে কী দুঃসহ অবস্থা। এমন কি তাঁর পাশপোর্ট পর্যন্ত বাতিল করে দেওয়া হলো। তখন ফ্রয়েডের পক্ষে ভিয়েনা ত্যাগ করার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। তাঁর বন্ধু ও অনুরাগীজন যখন ফ্রয়েডের এই দুর্ভাগ্যের কথা জানতে পারলেন তখন বিদেশে সর্বত্র তাঁর স্বপক্ষে জোর প্রচার কার্য চলতে থাকে ও তাঁকে ইংলণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়। কিন্তু নাৎসী সরকার তাঁর ভিয়েনা পরিত্যাগের মূল্য ধার্য করলেন কুড়ি-হাজার পাউণ্ড। এত টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? গ্রীসের রাজকুমারী এই অর্থপ্রদান করেন। ১৯৩৮, ৪ঠা জুন ফ্রয়েড লণ্ডনে এলেন। এর পনর মাস পরে, ১৯৩৯ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর এই প্রতিভাবান ও মানবদরদী পুরুষের মৃত্যু হয়। ফ্রয়েডের মৃত্যুর পর ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সংঘের সভাপতি ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু বলেছিলেন—'যাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্বের আলোকে মানব মনের গভীরতম প্রদেশে

পৌঁছবার পথ আজ সুগম ও সুনিশ্চিত হয়েছে, সেই সিগমুণ্ড ফ্রয়েড এই শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক।'

ফ্রয়েডের চরিত্র ও প্রতিভা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন একটি আদর্শ জীবনের প্রতিচ্ছবি। বাইরে থেকে এই মানুষটিকে মনে হতো অত্যন্ত গম্ভীর ও কঠোর প্রকৃতির, কিন্তু যাঁরা তাঁর জীবনের নিকটতম পরিমণ্ডলে এসেছিলেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন যে, এমন সহৃদয় ও বন্ধুবৎসল ব্যক্তি বিরল। তাঁরা সকলেই দেখেছিলেন তাঁর মধ্যে একদিকে অদম্য প্রাণশক্তি, অন্যদিকে কৌতুক ও হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাঁর নিজের ছোট পরিবারের মধ্যে শান্তিতে ও প্রীতিতে তিনি দিন কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন যেন মূর্তিমান উদারতা, সহানুভূতির একটি সজীব বিগ্রহ। ফ্রয়েড-চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি পশুপাখী খুব ভালবাসতেন ; যে কোনো গৃহপালিত কুকুরেরর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেন। তিনি যেমন বিজ্ঞানী ছিলেন, তেমনি প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস ও বিভিন্ন প্রকার শিল্পে তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ।

ফ্রয়েড নিজে ছিলেন একজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, এবং চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকাকালে তিনি নানান রোগীর নানান মানসিকতা পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করতে করতে মনোবিজ্ঞানের এই শাখাটির—যা এখন Psychoanalysis বা মনঃসমীক্ষণ এই নামে পরিচিত, সৃষ্টির বীজ বপন করেন। তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক রূপ ও তাঁর চিন্তাধারার বিবর্তন তাঁর উদ্ভাবিত এই জটিল শাস্ত্রটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই শতকের সূচনায় জার্মান ভাষায় রচিত ফ্রয়েডের যুগান্তকারী দ্বিতীয় গ্রন্থ *The Interpretation of Dreams* বিজ্ঞান-সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ সংযোজন। এর মধ্যে নূতনতর জ্ঞানের আস্বাদের যে প্রতিশ্রুতি সেদিন পাওয়া গিয়েছিল তার সঙ্গে একমাত্র কোপারনিকাসের বিপ্লবকারী চিন্তার তুলনা করা যেতে পারে।

ভিয়েনার যে চিকিৎসক একদিন বলেছিলেন 'Life is a problem for everybody.'—সেই সিগমুণ্ড ফ্রয়েড আজীবন এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, তাঁর আবিষ্কার মানুষকে একদিন সুস্থ করবে! 'কর্ম এবং প্রেমই হলো সুস্থতর পরিপূর্ণতার বীজমন্ত্র।'—তাঁর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতালব্ধ এই সত্য নিঃসন্দেহে স্মরণযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য। আমাদেব জীবনসমস্যার সমাধানের জন্য এর চেয়ে বড়ো কথা আর কিছু হতে পারে না।

জগদীশচন্দ্র বসু

(১৮৫৮—১৯৩৭)

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর বরপুত্র জগদীশচন্দ্র ছিলেন বিজ্ঞান জগতের একজন বড়ো যোদ্ধা। নানা বিষয়ে নানা রকমের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সার্থক তাঁর প্রতিভা। নিউটন, ডারউইন প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের স্থান যে সারিতে ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর স্থানও ঠিক সেই সারিতে। আজ বিজ্ঞানীরা তাঁর আবিষ্কারের প্রকৃত মূল্য বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রথম জীবনের আবিষ্কৃত তত্ত্ব বিনা বাধায় সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল বটে, কিন্তু উদ্ভিদ ও জীববিদ্যা বিষয়ে তাঁর মৌলিক আবিষ্ক্রিয়াগুলি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁকে অনেক বছর বাধা-বিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার ফলে আজ সমস্ত বিজ্ঞান-জগৎ এই বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, অতুলনীয় প্রতিভার কাছে শ্রদ্ধায় নতশির। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন একবার জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্বন্ধে বলেছিলেন—'ডক্টর বসুর গবেষণা আমার মনকে বিস্ময়ে পূর্ণ করেছে।' তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা যে সাধারণ স্তরের ছিল না, তার পরিচয় সেদিন য়ুরোপের বিজ্ঞানী সমাজ বিশেষভাবেই পেয়েছিলেন। নিউটন ও ডারউইনের মতো তিনিও প্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি শুধু একজন দিগ্বিজয়ী বিজ্ঞানী ছিলেন না—ছিলেন একজন ঋষিপ্রতিম সত্যসন্ধানী মানুষ। এমন মনীষী বিজ্ঞানের ইতিহাসে বেশী নেই।

জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। পিতার স্বজাতি-প্রীতি ও সবল মনুষ্যত্ববোধও পুত্র জগদীশচন্দ্রের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাঁরই নিকট তিনি শৈশবে যে শিক্ষা ও দীক্ষা পেয়েছিলেন তাই-ই জগদীশচন্দ্রের জীবনের গতি অনেকখানি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। একটা সহজাত বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি নিয়েই যেন তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং তাঁর শৈশবকালেই এর আভাস দেখা গিয়েছিল। পাঁচ বছর বয়সে জগদীশচন্দ্রের শিক্ষা শুরু হয় পাঠশালায়। সেই সময় তিনি গৃহে তাঁর পিতামহীর কাছে রামায়ণ ও মহাভারত এই মহাকাব্য দুটি পড়তে শেখেন। জগদীশচন্দ্রের বয়স তখন ন'বছর যখন তিনি কলকাতায় পড়তে এলেন। ভর্তি হলেন হেয়ার স্কুলে। এখানে তিন মাস পড়ার পর তাঁকে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। থাকতেন ছাত্রাবাসে। ষোল বছর বয়সে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জগদীশচন্দ্র সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রবিষ্ট হলেন। কলেজে প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়াতেন ফাদার লাফোঁ; পদার্থ-বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো তিনি ছাত্রদের কাছে সযত্নে পরীক্ষা করে

দেখাতেন, সঙ্গে সঙ্গে অতি বিশদভাবে সেগুলো তাদের বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর পড়ানোর গুণে জগদীশচন্দ্র ক্রমে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ রকম আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। যথা সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হলেন জগদীশচন্দ্র। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি বিলাত গমন করেন। বিলাতে পৌঁছে জগদীশচন্দ্র লণ্ডনে ডাক্তারি পড়তে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে dissection বা মড়া-কাটা শিখতে গিয়ে তাঁর প্রবল জ্বর হয়। তখন চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি ডাক্তারিপড়া ছেড়ে কেমব্রিজে গেলেন বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য। ভর্তি হওয়ার পর প্রথম বছর তিনি স্থির করতে পারেননি, তিনি বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ বিষয় পড়বেন; ঐ সময় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরবৃত্ত, প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা—সব বিষয়েই লেকচার শুনতেন, পরীক্ষাগারে গিয়ে পরীক্ষা দেখতেন। দ্বিতীয় বছরে তিনি কেবল পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদ্বিদ্যায় মনোযোগ দিলেন। কেমব্রিজে অধ্যয়নকালে তিনি বিলাতের কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান; তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক লর্ড র‍্যালি ও অধ্যাপক ভাইনমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় চার বছর বিলাতে থাকার পর, কেমব্রিজের ট্রাইপস ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮৫ সনে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে ফিরে আসেন।

জগদীশচন্দ্রের বয়স যখন পঁচিশ বছর তখন তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯৪। জগদীশচন্দ্র পঁয়ত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করলেন। তাঁর জীবনের সেই ৩৫তম জন্মদিনে তরুণ বিজ্ঞানী প্রতিজ্ঞা করলেন, অতঃপর তিনি তাঁর জীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসর্গ করবেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত সরঞ্জাম ছিল না। উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবে ইচ্ছামত পরীক্ষা করার বা মৌলিক গবেষণা করার সুবিধা ছিল না। জগদীশচন্দ্র তাতে দমলেন না। ১৮৯৫। জগদীশচন্দ্র কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর মৌলিক গবেষণার ফল সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। এই গবেষণার বিষয় ছিল, বিদ্যুৎরশ্মির দিক্ পরিবর্তন। এই সময়েই নিয়োলাইট, সার্পেনটাইন প্রভৃতি পাথরের বৈদ্যুতিক কম্পন পরিবর্তন করার শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিছুকাল পরে লণ্ডনের 'The Electrician' নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের দুইটি দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের শেষ দিকে বিলাতের রয়েল সোসাইটি তাঁর গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঐ সময় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ও কোন পরীক্ষা না নিয়েই তাঁকে D.Sc. (বিজ্ঞানাচার্য) উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। তাঁর পূর্বে আর কোনো ভারতীয় এই সম্মান লাভ করেননি।

১৮৯৬। জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণার ফল প্রচারের জন্য এবং য়ুরোপীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য ভারত সরকারের অর্থসাহায্যে

বিলাত গেলেন। সেখানকার বিজ্ঞানীরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। এবার তিনি সস্ত্রীক বিলাত গিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার কিছুকাল পরে অবলা বসুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ইনিও একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। ঐ বছর লিভারপুলের ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের একটি বিশেষ অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র বৈদ্যুতিক রশ্মি সম্বন্ধীয় তাঁর যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাদি দেখাবার সুযোগ পেলেন। এই অধিবেশনেই বিলাতের বিখ্যাত বিজ্ঞানী বৃদ্ধ লর্ড কেলভিন তাঁর কাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। বিলাতের পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় বিজ্ঞানীর আশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ প্রকাশিত হলো। তারপর লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিট্যুশন থেকে তিনি আমন্ত্রিত হলেন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। এখানে বক্তৃতা দেওয়ার পর জগদীশচন্দ্রের মর্যাদা শতগুণে বৃদ্ধি পেল। তিনি ফ্রান্স ও জার্মানী থেকেও বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। এইভাবে য়ুরোপে গিয়ে ভারতের বৈজ্ঞানিক মনীষীরা পরিচয় দিয়ে ১৮৯৭ সনের এপ্রিল মাসে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন 'বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর জয়মাল্য' মাথায় নিয়ে। দেশে ফিরে তিনি কোনো রকম বিশ্রামের কথা চিন্তা না করেই কলেজের অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের গবেষণাও চালিয়ে গেলেন। তিন বছর পরে ১৯০০ সনে শুরু হয় তাঁর দ্বিতীয় বারের অভিযান। ঐ বছর প্যারিসে একটি মহাপ্রদর্শনী হয়; এই উপলক্ষে সেখানে বৈজ্ঞানিকদের একটি মহাসভা বসেছিল। ভারত সরকার এই মহাসভায় জগদীশচন্দ্রকে যোগ দেওয়ার সুযোগ দিলেন। প্যারিস থেকে তিনি এলেন লণ্ডনে। এখানে তিনি ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের ব্রাডফোর্ড সভায় যখন জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করলেন, তখন উপস্থিত পদার্থবিজ্ঞানীরা তাঁর সত্য সাদরে স্বীকার করে নিলেন বটে, কিন্তু শারীরবৃত্তবিদগণ নীরব রইলেন। জগদীশচন্দ্রের মত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁদেরও স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। কারণ, তাঁর এই নূতন তত্ত্বটি পদার্থবিদ্যা ও শরীরবৃত্ত উভয় বিদ্যার সঙ্গেই জড়িত। এই সভায় জগদীশচন্দ্র তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্র-সাহায্যে সাড়া-লিপি এঁকে দেখিয়েছিলেন যে, বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় জড় ও জীব একই প্রকার সাড়া দিতে পারে। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, এই সাড়ার মূল কারণ পদার্থের আণবিক বিকৃতি।

দ্বিতীয় বারের বৈজ্ঞানিক অভিযানের পর, ১৯০৩ সনের শেষভাগে জগদীশচন্দ্র জীব ও উদ্ভিদের স্নায়ুর সাড়া সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ রচনা করে রয়্যাল সোসাইটিতে প্রকাশের জন্য পাঠালেন। তিন বছর ধরে তিনি বহু পরীক্ষা চালালেন এবং সেসব পরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত দু'খানি বিরাট গ্রন্থ লিখে ফেললেন। ১৯০৬ সনে তাঁর 'উদ্ভিদের সাড়া' এবং ১৯০৭ সনে 'তুলনামূলক বৈদ্যুতিক শারীরবৃত্ত' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। ইতিপূর্বে (১৯০২) তাঁর আর একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর য়ুরোপের বিজ্ঞানী মহলে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বইটির নাম 'জীব ও জড়ের সাড়া'। এই প্রথম গ্রন্থেরই জের টেনে জগদীশচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে প্রমাণ করলেন যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী বাইরের আঘাতে

শরীরের আকুঞ্চন প্রসারণাদির দ্বারা যে সাড়া দেয় তার মধ্যে চমৎকার মিল দেখা যায়। এরপর ১৯০৭ সনে তিনি তাঁর তৃতীয় বৈজ্ঞানিক অভিযানে যাত্রা করেন, তাঁর পরীক্ষা-প্রণালীগুলো নিজে গিয়ে দেখাবার জন্ত। ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরে জগদীশচন্দ্র তাঁর পরীক্ষাগুলো দেখিয়ে এলেন। তাঁর এই সময়কার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাগুলোর সমাদরও হলো। ১৯১৪ সনে তিনি তাঁর চতুর্থ বৈজ্ঞানিক অভিযানে গিয়ে চূড়ান্ত কৃতকার্যতা লাভ করেন। এইভাবে জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান দূরীভূত করে, এই ভারতীয় মনীষী বিজ্ঞানের ভাষায় বহুত্বের ভিতর একত্ব প্রমাণ করে বিজ্ঞানের এক নবদিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিলেন সেদিন।

এইবার জগদীশচন্দ্র তাঁর সমস্ত কর্মজীবনের লক্ষ্যটিতে পৌছলেন। ১৯১৭ সনের ৩০শে নভেম্বর তারিখে 'বসু-বিজ্ঞান মন্দির' (Bose Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়। তেইশ বছর আগে যে সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন আজ তা সার্থক হলো। এই বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি যে 'নিবেদন' পাঠ করেন, সেটিতে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের ধ্যান-ধারণা সুন্দর ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। সেদিন তিনি তাঁর স্বজাতিকে জানালেন, ভারতবাসীর পক্ষে যে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্ভব, এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত তাঁকে বহু দুঃখ ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে। বিজ্ঞান সার্বভৌমিক, তাই তিনি সেদিন ঘোষণা করলেন—'সর্বজাতির সকল নরনারীর জন্ত এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে' এবং সর্বশেষে বললেন 'মৃত্যু সবজয়ী নহে, জড়সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানবচিন্তা-প্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে জগদীশচন্দ্রের আজীবনের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ সেদিন এক পত্রে তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন—'আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্য দিয়ে আজ এর বিকাশ হতে চলল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়—তোমার প্রাণের সামগ্রীতে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী করে দিয়ে যাবে—তারপর থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চলতে থাকবে।… আজ তুমি তোমার মানবপথের বিজ্ঞান সরস্বতীকে দেশের হৃদয়পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করছ।'

জগদীশচন্দ্র শেষবার য়ুরোপ যান ১৯২৮ সনে। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা তাঁকে সাদরে নিজেদের মধ্যে স্থান করে দিলেন, য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা তাঁর আবিষ্কারের অসাধারণ গুরুত্ব বুঝে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন। রোমাঁ রোলাঁ ও বার্নার্ড শ তাঁকে তাঁদের গ্রন্থ উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন। ১৯৩৭ সনের ২৩শে নভেম্বর তারিখে এই যুগন্ধর বিজ্ঞানী তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। নব ভারতের সর্বসাধনার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার দান কোনদিনই লুপ্ত হবার নয়।

আন্তন চেখভ

(১৮৬০-১৯০৪)

ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে তখনো চল্লিশ বছর বাকী ছিল তখন আন্তন পাভলোভিচ চেখভ প্রথম চোখ মেলেছিলেন তাগানরোগ শহরের এক মুদীর দোকানের উপরের একটি স্বল্প পরিসর ঘরে। নববর্ষের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর মায়ের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে তাঁদের এই তৃতীয় সন্তানটি ক্ষণজন্মা হবে। চেখভের পিতার নাম প্যাভেল চেখভ। তাঁর ছিল একটি মুদীর দোকান। শুধু দোকানদারি করে পরিবারের অতগুলি লোকের ভরণপোষণ সম্ভব নয়, তাই প্যাভেলকে স্থানীয় গীর্জার বাদকের (Choirmaster) কাজ নিতে হয়েছিল। ক্রীতদাসসুলভ নির্দয়তা আর নীচতা তাঁর চরিত্রে ও স্বভাবে বিশেষ প্রকট ছিল। পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। দরিদ্র হলেও গর্বিত। মা ছিলেন এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর কন্যা। ভাইবোন মিলে তাঁরা ছয়জন। আন্তন তাঁর পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। এই পরিবারের সুখ বা শান্তি বলে কিছু ছিল না। চেখভের শৈশবজীবন ছিল একেবারে নৈরাশ্যময়।

আন্তনের বয়স যখন ষোলো, তখন চেখভ-পরিবারে দেখা দিল দুর্দিন। কারবার বন্ধ হয়ে গেল আর প্যাভেল দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখালেন। অবশেষে তিনি একদিন সপরিবারে দেশত্যাগ করে মস্কো চলে গেলেন। রইলেন শুধু চেখভ। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ না করা পর্যন্ত তিনি দেশেই থাকবেন ঠিক করলেন। সেই কর্ণধারহীন অবস্থায় শুধু আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে তাঁর জীবনকে গড়ে তুলতে তিনি কৃতসংকল্প হলেন।

উনিশ বছর বয়সে চেখভ প্রবেশিকা পাশ করলেন। মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি ডাক্তারী পড়তে কৃতসংকল্প হলেন আর সেই একই সময়ে তিনি সাংবাদিকতার কাজ করে ও গল্প লিখে সাধ্যমত পরিবারের ভরণপোষণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

চব্বিশ বছর বয়সে ডাক্তারী পাশ করলেন চেখভ। পাশ করেই তিনি প্র্যাকটিস শুরু করেন। ডাক্তারী আর সাহিত্য-চর্চা—দুই-ই চলতে থাকে সমানভাবে।

চিকিৎসা-ব্যবসায় আর সাহিত্যচর্চা—তাঁর এই দুটি পেশার মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। চেখভের বয়স যখন ছাব্বিশ বছর তখন প্রকাশিত হলো তাঁর প্রথম গল্পসংগ্রহ। তাঁর অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা যে অগুণতি সেটা জানা গেল এই বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর। তিন মাসের মধ্যে গল্পসংগ্রহের প্রথম সংস্করণের পাঁচ হাজার কপি নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখনকার রাশিয়ার পুস্তক প্রকাশনের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা বলে গণ্য হয়েছিল। এইভাবেই

সেদিন হয়েছিল চেখভ-প্রতিভার স্ফুরণ। লেখকের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি যতই সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন, চেখভের সৃজনধর্মী প্রতিভা ততই যেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে।

পরিশ্রমের অন্ত ছিল না চেখভের। এইটাই ছিল তাঁর স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ। একা তাঁকে সমগ্র পরিবারের দায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল। একজন মানুষের শরীরে এই রকম পরিশ্রম কি সহ্য হয়? শীঘ্রই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দিল—চেখভের শরীরে দেখা দিল যক্ষ্মারোগের লক্ষণ। এই মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণ উপলব্ধি করতে তাঁর বিলম্ব হয়নি—গোড়া থেকেই তিনি উপসর্গগুলি সঠিক ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি এমন সচেতন ছিলেন যে, বাড়ির কাউকে তিনি জানতেই দিলেন না যে তাঁর এই রকম একটা মারাত্মক অসুখ করেছে। তাছাড়া, তিনি নিজেই এই বিষয়টা একটু লঘু করে দেখেছিলেন। লঘু করে দেখার অবশ্য কারণও ছিল। এই অসুখের জন্য যে পরিচর্যা আর দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হলে তাঁকে ডাক্তারী ছাড়তে হয়, সাহিত্যচর্চা ত্যাগ করতে হয়। ডাক্তারী বরং তিনি ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু লেখনী পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। রাশিয়ার চির দরিদ্র, চির অবহেলিত কৃষক তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিশেষভাবে। দারিদ্র্য-অভিশপ্ত তাদের জীবন তাঁকে অস্থির করে তুলত, তাদের শত দোষ ত্রুটী ও উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও চেখভ তাদের ভালবাসতেন। এই জীবনকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করতে চাইলেন। সমাজের অন্যত্র—আদালতে, সন্ন্যাসীদের মঠে, গ্রাম্য সরাইখানায় এমন কি হাসপাতালে সাহিত্যের উপাদানের অভাব ছিল না—কিন্তু কৃষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-বেদনার মধ্যেই চেখভ যেন সত্যিকার জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

তাঁর ছোটগল্পের প্রথম সংকলন প্রকাশিত হওয়ার পর, চেখভ উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। লিখলেন একখানি উপন্যাস, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারলেন না। এবার তিনি লিখলেন একটি নাটক। নাম দিলেন—'আইভানভ'। নাটকখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার বিদগ্ধ পাঠকসমাজ তাঁকে জানালেন বিপুল অভিনন্দন এবং মঞ্চে এই নাটকের সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় তাঁর খ্যাতিকে আরো সুদৃঢ় করে দিল। তাঁর ছোটগল্পের জন্য এই সময়ে চেখভ লাভ করেন বহুজন-আকাঙ্ক্ষিত 'পুসকিন পুরস্কার'। তরুণ বয়স্ক একজন লেখকের পক্ষে এটা ছিল দুর্লভতম সম্মান। তখনো চেখভ ত্রিশের কোঠায় উত্তীর্ণ হননি। এই পুরস্কারের পরিমাণ ছিল পাঁচশত রুবল। এতো বড় একটা সম্মান লাভের পর তিনি কিন্তু কিছুমাত্র আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন না। রাশিয়ার সাহিত্যজগতে তখন টলস্টয়ের প্রতিভা আলো বিকীরণ করে চলেছে এবং সমকালীন বহু লেখকের মতো চেখভও সেই আলোর উত্তাপ গ্রহণ করেন। তিনি টলস্টয়ের অনুরাগী ছিলেন, শিল্পী হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু তাঁর দর্শনচিন্তার সঙ্গে চেখভের চিন্তার পার্থক্য

ছিল এবং এই হেতু স্বমতপ্রধান টলস্টয়কে তিনি বিশ্বাস করতেন না। মানসিকতার দিক থেকে এই দুই মহান শিল্পীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল; প্রেম এবং যৌন-আকাঙ্ক্ষা, এই দুটি জিনিসের মধ্যে টলস্টয় কোনো সঙ্গতি দেখতে পেতেন না; অন্যদিকে চেখভ পারিবারিক জীবনে এই দুটি বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতেন।

ক্রমে চেখভ ত্রিশ বৎসরে উত্তীর্ণ হলেন। লেখক হিসাবে তিনি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করার জন্য তাঁর প্রকাশক তাঁকে এইবার পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু যদিও তাঁর স্বাস্থ্য তখন ক্রমাবনতির পথে। তথাপি চেখভের মনে হলো তাঁর জীবনধারণের পক্ষে দুটোই প্রয়োজন—ডাক্তারী আর লেখা। পরিবার পোষণের জন্য আর্থিক চিন্তা দ্বারা তিনি এতদূর বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁর বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না—ছিল না এতটুকু বিশ্রাম সুখ। ঠিক এই সময়ে চেখভের জীবনপথে এলেন লিডিয়া আভেনোভা। কিন্তু এই তরুণী ছিলেন বিবাহিতা ও একটি সন্তানের জননী। এই সুন্দরী তরুণীর প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করলেও, শেষ পর্যন্ত চেখভকে নিরাশ হতে হয়েছিল। জীবনের সেই চরম নৈরাশ্যের দিনে নিজেকে শান্ত ও সংযত রাখার জন্য তিনি সাখালীন দ্বীপের উপর অবস্থিত অপরাধী ব্যক্তিদের কুখ্যাত উপনিবেশে গিয়ে তিন মাস অবস্থান করলেন। এখানে তিনি শিল্পী হিসাবে নয়, একজন বিজ্ঞানী হিসাবেই বন্দীদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করে, একটি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই বিবরণের উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন—"ঈশ্বরের পৃথিবীতে কত সৌন্দর্য; এর মধ্যে একমাত্র আমরাই অসুন্দর। তাঁর এই বিবরণের ফলেই পরবর্তিকালে রাশিয়ার দণ্ডিত ব্যক্তিদের উপনিবেশগুলিতে সংস্কার সাধিত হয়েছিল।

প্রথম নাটকের সাফল্যের পর 'দি উড ডেমন' নামে তিনি দ্বিতীয় নাটক রচনা করেন। এরপর লিখলেন 'দি সী গাল' এবং তাঁর এই নাটকখানিকে আশ্রয় করেই মস্কো আর্ট থিয়েটারের জন্ম হয়। এই মস্কো আর্ট থিয়েটার চেখভের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এইখানেই অভিনেত্রী ওলগা-নিপারের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ। ওলগা ছিলেন একজন য়্যালসেসিয়ান তরুণী; বয়সে তাঁর চেয়ে দশ বছরের ছোট। চেখভের নাটকেই তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন এবং নাট্যকারের প্রতি তাঁর মন অনুরাগে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি অনুরাগ আরো অনেক তরুণী তাঁর প্রতি প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে চেখভ তখনো পর্যন্ত কারো সঙ্গেই পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হননি। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ প্রতিভাবান লেখকের প্রতি অভিনেত্রী ওলগা এমন প্রবল অনুরাগ ও আকর্ষণ বোধ করেন যে চেখভের পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করা সহজ হলো না। মৃত্যুর মাত্র তিন বৎসর পূর্বে তিনি ওলগার সঙ্গে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। জীবনের এই তিনটি বছর তাঁর প্রকৃত সুখের ও শান্তির হয়েছিল। উনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি রাশিয়ান আকাদেমির

সদস্য নির্বাচিত হন ; কিন্তু এই আকাদেমি যখন গোর্কির নির্বাচনে বিরোধিতা করেন তখন একমাত্র চেখভ তার প্রতিবাদ করে সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

এরপর তিনি আর দুখানি নাটক রচনা করেন—'দি থ্রী সিসটার্স' ও 'দি চেরী অর্চার্ড'। 'চেরি অর্চার্ড' চেখভের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। সমুদ্রতীরবর্তী ইয়াল্টা শহরে তিনি যখন আরোগ্য লাভের জন্য শীতকালে অবস্থান করতেন, সেই সময় এই নাটকখানি রচিত হয়। তখন তাঁর জীবনের আর কোনো আশাই ছিল না। ব্যাধির যন্ত্রণায় তিনি এই সময় এমনই কাতর হয়ে পড়তেন যে, দিনের মধ্যে তিনি মাত্র কয়েক ছত্রের বেশি লিখতেই পারতেন না। যে লেখনী সতেজে ও দ্রুততালে চলত, আজ যেন তা নিস্তেজ হয়ে এল। দেহে তিনি দুর্বল, অবসন্ন, কিন্তু তখনো চেখভের মানসিক ক্ষমতা ছিল অটুট। শীত ঋতুতে ইয়ালটার সমুদ্রতীরে বাস করেও তাঁর ব্যাধির কোনো উপশম হয়নি। অবশেষে তাঁর চিকিৎসকগণের পরামর্শে তাঁকে জার্মানির ব্যাডেনভাইলারের স্বাস্থ্যনিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়। সঙ্গে এলেন স্বামী অনুরাগিনী ওলগা নিপার। এখানে পাইন গাছের নির্মল হাওয়ায় স্বামী আরোগ্যলাভ করতে পারেন, এই ছিল তাঁর আশা। এই স্বাস্থ্যনিবাসেই ১৯০৪ সনের ২রা জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন চেখভ। আর ছ'মাস উত্তীর্ণ হলেই তিনি পঁয়তাল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করতেন। I am dying—মৃত্যুর পূর্বে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন শান্তভাবে এই কয়টি কথা। জীবদ্দশায় যেমন, অন্তিম-কালেও তেমনি, অপরিসীম সাহসের সঙ্গেই তিনি মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। চির-কালের শান্ত-শিষ্ট মানুষ বরণ করলেন একটি শান্ত মৃত্যু, তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী ওলগা নিপারকে পাশে রেখে।

জীবনধর্মী নাটক রচনায় ইবসেনের পর তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। কিন্তু নাটকে স্বভাববাদের প্রবর্তক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই স্বভাববাদ কোন উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছতে পারে, 'চেরী আর্চর্ড' নাকট তারই একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। জীবনের পূজারী ছিলেন চেখভ—জীবনকে তিনি সহজভাবে নিয়েছিলেন এবং দেখেছিলেন গভীরভাবে। তাঁর ধ্রুপদী নাট্য চেতনার এই হলো প্রকৃত রহস্য। কমেডির আচরণে ট্র্যাজেডি রচনায় সিদ্ধহস্ত চেখভ যে প্রাণ-প্রাচুর্য আর নিবিড় সৌন্দর্যবোধ নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন তার অভ্রান্ত স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর পাঁচখানি নাটক আর শতাধিক গল্পের মধ্যে। তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে আছে মানবহিতৈষী এক শিল্পী হৃদয়ের মহত্ত্বের ছাপ।

জগলুল পাশা

(১৮৬০-১৯২৭)

নব্য তুরস্কের মুক্তিপ্রদাতা যেমন কামাল আতাতুর্ক, নব্য মিশরের মুক্তিপ্রদাতা তেমনি জগলুল পাশা। আধুনিক মিশরের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী এই মহান দেশপ্রেমিকের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। ইংরেজের অধীনতা থেকে তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তিসাধন তিনি যেভাবে করেছিলেন তা আজ বিশ্বইতি-ইতিহাসেরই একটি বিশেষ অধ্যায়রূপে পরিগণিত। যে লয়েড জর্জ, তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না সেই তিনিই পরবর্তীকালে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন মিশর বলে কিছু থাকত না যদি না সেই দেশে জগলুল পাশার মতো নেতা জন্মগ্রহণ করতেন। এই ধরনের উক্তি পরবর্তীকালে আরো অনেক ইংরেজ কূট-নীতিবিদ্ ও ঐতিহাসিক করেছেন। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক জন গান্থার তাঁর 'Inside Asia' গ্রন্থে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক আন্দোলনের বর্ণনা প্রসঙ্গে মিশরের এই সর্বজনমান্য গণনেতা সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। গান্থার লিখেছেন: Rebellion against every form of authority was the breath of life to Jaglul Pasha—the greatest nationalist leader of modern Egypt.' জগলুল পাশা সত্যিই ছিলেন বীরত্ব ও বিদ্রোহের মূর্তবিগ্রহ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় দশকের সূচনাকালেই জগলুল পাশা মিশরের এক দরিদ্র কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই জগলুল ছিলেন বুদ্ধিমান ও সাহসী। জাতীয়তার বীজ এই সময়েই তাঁর মনে উপ্ত হয়েছিল। তিনি ছিলেন ইতিহাসের ছাত্র; স্কুলে ও কলেজে তিনি মিশরের প্রাচীন ইতিহাস খুব মনোযোগের সঙ্গেই পাঠ করেছিলেন ও সেই ইতিহাস থেকেই তিনি বিশেষ প্রেরণা লাভ করেছিলেন, এই কথা জগলুল নিজেই বলেছেন। মিশরের রুক্ষ মরু প্রকৃতি, সুপ্রাচীন ইতিহাস আর নীল নদ তাঁর মানসগঠনে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। তাঁর ছাত্রজীবনেই জগলুলের বাগ্মিতাশক্তি প্রকাশ পেয়েছিল। তখন থেকেই ছোটখাটো আলোচনাসভায় ও বিতর্কসভায় তিনি বক্তৃতা দিতে থাকেন। তিনি যখন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন থেকেই তিনি দেশের অবস্থা গভীরভাবে আলোচনা করতে থাকেন ও তাঁর সহপাঠীদের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করতেন। এছাড়া, তিনি মিশরের দরিদ্র জনসাধারণদের সঙ্গেও খুব অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন ও তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করতেন। পরবর্তীকালে জগলুলের এক রাজনৈতিক সহকর্মী বলেছিলেন যে, মিশরীদের সুখদুঃখ জগলুল পাশা যেভাবে

অনুভব করতেন এবং যে ভাষায় তিনি তা প্রকাশ করতে, আজ পর্যন্ত আর কোন নেতাই তা পারেন নি। মিশরের জনসাধারণ তাঁর আপনজন ছিলেন।

কায়রোর বিখ্যাত 'আল্-আজহার' বিশ্ববিত্তালয় থেকে রাজনীতি-বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে জগলুল আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকেন এবং যথাসময়ে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ঐ বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি যদি ব্যবহারজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করতে চাইতেন তাহলে এই বৃত্তিতে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারতেন, কারণ সে প্রতিভা তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি দেশসেবার কণ্টকময় পথই বেছে নিলেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দেশের স্বাধীনতার কাজে উৎসর্গ করে দিলেন। দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস তিনি যত্নের সঙ্গে পাঠ করতে থাকেন। কিছুকালের জন্য তিনি কায়রো বিশ্ববিত্তালয়ে অধ্যাপনাও করেন এবং তাঁর তরুণ ছাত্রদের মনে তিনি দেশপ্রেমের অগ্নিময় বাণী সঞ্চার করে দিতেন। ভবিষ্যতে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ তিনি করবেন, মনে মনে তিনি তার একটি পরিকল্পনাও তৈরী করেন এই সময়ে এবং তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ-স্থানীয়দের সঙ্গে তিনি এই নিয়ে আলোচনা করতেন। দেশের যুবকদের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবধারা প্রচারের জন্য তিনি এই সময়ে 'দি ভ্যানগার্ড' নামে ইংরেজিতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা সম্পাদনের ব্যাপারে তিনি এক শিক্ষিতা তরুণী মিশরীয় রমণীর যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। এঁর নাম ছিল জুবেদিয়া। পরবর্তীকালে জগলুল ও জুবেদিয়া উভয়েই পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন ও মাদাম জগলুল পাশারূপে এই মহীয়সী রমণী মিশরের স্বাধীনতা-সংগ্রামে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯১৪। য়ুরোপে আরম্ভ হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তুরস্ক যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তার শত্রু জার্মানির সঙ্গে যোগদান করল, তখন ইংলণ্ড ঘোষণা করল যে, মিশরের স্বার্থে মিশর রক্ষণাবেক্ষণের ভার সে নিজের হাতে তুলে নেবে। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ-সৈন্য এসে মিশরের বুকে বসল। ইংরেজরা খেদিভকে 'সুলতান' উপাধি দিয়ে সম্মান দেখাল এবং প্রতিশ্রুতি দিল যে, যুদ্ধশেষ হয়ে গেলেই তারা তাঁরই হাতে রাজ্য ছেড়ে দেবে। ১৯১৮। যুদ্ধ শেষ হলো, কিন্তু মিশরের দুঃখের দিনের অবসান আর হলো না; ধন দিয়ে, সৈন্য দিয়ে তারা এই যুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করেছিল—এই আশায় যে, যুদ্ধশেষে তারা নিজেদের দেশের উপর নিজেদের শাসন কর্তৃত্বের অধিকার ফিরে পাবে। কিন্তু সে আশা তাদের পূর্ণ হলো না। ইংরেজ সৈন্যদল আগে যেমন ছিল, এখনো তেমনি রয়ে গেল মিশরে। যুদ্ধের পর প্যারিসে শান্তি বৈঠক বসল, কিন্তু মিশর সেখানে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার পেল না। এর ফলে মিশরীরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে গেল এবং তখন তারা বুঝল ইংরেজরা তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে না। অতএব মিশরীয়রা তখন একটি দল গঠন করে দেশের স্বাধীনতার জন্য শুরু করে দিল প্রবল

আন্দোলন। ইহাই ছিল ইতিহাস বিখ্যাত ওয়াফ্‌দ্ দল আর জগলুল ছিলেন এই দলের নেতা। এই স্বর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও শক্তি প্রয়োগ করলেন এবং জলন্ত ভাষায় দেশের স্বাধীনতার দাবী প্রচার করতে লাগলেন ওয়াফ্‌দ দলের মঞ্চ থেকে। মিশরে দেখা দিল এক নূতন জাগরণ, এক অভূতপুর্ব প্রাণচাঞ্চল্য ;দলে দলে স্বাধীনতাকামী তরুণ মিশরীরা এসে সমবেত হয় ওয়াফদের পতাকাতলে। এই আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করবার জন্য ইংরেজ ১৯১৯ সনের মাঝামাঝি জগলুল পাশাকে গ্রেপ্তার করল এবং বিনা বিচারে তাঁকে ও ওয়াফদ দলের আরো তিনজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে নির্বাসিত করল।

এর ফল কিন্তু বিপরীত হলো। মিশরীরা তাদের প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা করত অন্তরের সঙ্গে। তাঁর নির্বাসনের পর তাহা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং সেই ক্ষিপ্ত জনসাধারণের বিদ্বেষবহ্নি ফেটে পড়ল। সেই পথ দিয়ে মিশরে এলো সশস্ত্র বিপ্লব। সে বিপ্লবের উগ্র মূর্তি দেখে ইংরেজ ভয় পেলো। টেলিগ্রাফের তার কেটে, রাজধানী কাইরো শহরের চারদিকের রেললাইন ও রাস্তা নষ্ট করে, বিদ্রোহীরা ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। এক জায়গায় সন্ত্রাসবাদীরা কয়েকজন ইংরেজকে হত্যা করে বসল। নবজাগ্রত মিশরের এই আন্দোলনের সংবাদ যখন ইংলণ্ডে এসে পৌছল তখন প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ প্রমাদ গণলেন। একটা মিটমাটের আশায় তিনি স্থানীয় রাজপ্রতিনিধিকে নির্দেশ পাঠালেন, অবিলম্বে জগলুল ও তাঁর তিনজন সহকর্মীকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য।

ইংলণ্ড থেকে লর্ড মিলনারের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধিদল মিশরে পাঠান হলো। জগলুল পাশা কিন্তু এই কমিশন বয়কট করবার জন্য মিশরীদের আহ্বান জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা আবার তাঁকে নির্বাসিত করল। কিন্তু মিশরীরা তাঁর আহ্বান ভুলল না। মিলনার কমিশন যখন কায়রোতে এসে পৌছল একজন মিশরীও তাঁদের অভ্যর্থনা জানাল না, তাঁরা সম্পূর্ণভাবে কমিশনকে বর্জন করল। হতাশ হয়ে কমিশন দেশে ফিরে গেলেন। এইভাবে প্রায় চার বছর তুমুল আন্দোলন চলবার পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নরম হয়ে তাঁদের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। ১৯২২। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট থেকে ঘোষণা করা হলো— 'Egypt will no longer remain a protectorate of the Great Britain'—অর্থাৎ মিশরকে আর ইংলণ্ডের রক্ষণাধীনে রাখা হবে না, মিশরকে স্বাধীন দেশ বলে স্বীকার করা হলো। কিন্তু ঐ ঘোষণার সঙ্গে এমন কয়েকটি শর্ত ছিল যা জাতীয়তাবাদী দলের নেতারা মেনে নিতে পারলেন না। একটি শর্তে বলা হলো যে মিশরকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে ইংলণ্ডই রক্ষা করবে এবং এজন্য সেখানে কিছু ব্রিটিশ সৈন্য থাকবে। সুদানের উপর ইংরেজ তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখল।

এত শর্তকণ্টকিত এই স্বাধীনতা কিন্তু মিশরীরা মেনে নিল না। এর শাসন-ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত প্রতিক্রিয়ামূলক। রাজা প্রথম ফুয়াদের হাতে অপরিমিত

ক্ষমতা অর্পণ করা হলো। আসলে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্রস্বরূপ। যাই হোক, দেশের নির্বাচন আরম্ভ হলো এবং দেশের লোকের ভোটেই গঠিত হলো পার্লামেন্ট। ওয়াফদ দলের লোকেরাই অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হলেন ; পার্লামেন্টের অধিকাংশ আসন তাঁরাই দখল করলেন। নবগঠিত মিশরীয় সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচিত হলেন জগলুল পাশা। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও প্রতিবাদ আন্দোলন চরমে উঠল। কয়েকজন উচ্চ রাজকর্মচারী নিহত হলেন এবং একদিন কায়রোর প্রকাশ্য রাজপথে নিহত হলেন মিশরের সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি স্যর লী স্ট্যাক। রাজা ফুয়াদ ভয় পেয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং জগলুলকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন।

জগলুল আবার জনসাধারণের মধ্যে ফিরে এলেন এবং আন্দোলনকে দিলেন আবার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। এবারকার আন্দোলন আরো প্রবল ও সংঘবদ্ধ রূপ নিলো এবং দমননীতিও উগ্ররূপ ধারণ করল। ইংরেজ বন্ধুদের পরামর্শে স্বৈরাচারী রাজা ফুয়াদ, দলে দলে লোককে কারারুদ্ধ করতে লাগলেন। মিশরীদের এই এই মৃত্যুপণ সংগ্রামের দিনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল মিশরের দিকে। জগলুলের এই সময়কার বক্তৃতাগুলিতে যেন আগুনের ফুলকি ঝরত এবং নীলনদ- বিধৌত সেই দেশটির আকাশ-বাতাস সেদিন এক নবউদ্দীপনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। নবীন প্রাণচাঞ্চল্যে জেগে উঠেছিল মিশরের জনসাধারণ। নবপর্যায়ে মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলন চলেছিল তিন বছর এবং এর প্রতিক্রিয়া ভারতের সমসাময়িক স্বাধীনতা আন্দোলনেও অনুভূত হয়েছিল। মিশর ও ভারতের ভাগ্য একই পরাধীনতার শৃঙ্খলে সেদিন আবদ্ধ ছিল। তবে মিশরের সৌভাগ্য যে, সে পেয়েছিল একজন ইংরেজবিরোধী নেতাকে। ১৯২৬ সনে আবার পার্লামেন্টের নির্বাচন হলো। এবারও জগলুলের দলই পার্লামেন্টের অধিকাংশ আসন দখল করলেন। লর্ড লয়েড তখন মিশরে ইংরেজদের প্রতিনিধি। রাজা ফুয়াদ তাঁরই পরামর্শে চলতেন। লর্ড লয়েড জগলুলকে প্রধানমন্ত্রী করতে কিছুতেই সম্মত হলেন না ; রাজা ফুয়াদও জগলুলকে ডেকে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে বলবার সাহস পেলেন না। মন্ত্রীত্বের বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না জগলুলের— তিনি চেয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীনতা যে তাঁর জীবিতকালেই পরিপূর্ণভাবে না হলেও, অনেক পরিমাণে যে সম্ভব হয়েছিল, এতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি জানতেন যে, মিশরীদের মনের মধ্যে তিনি দেশাত্মবোধের যে ভাবধারা সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন' তাঁর মৃত্যুর পরেও তার প্রভাব গণচিত্তে সুদূরপ্রসারী হবে। মিশরের বর্তমান ইতিহাস তারই সাক্ষ্য বহন করছে। জগলুলের বিপ্লব-চিন্তা পরবর্তীকালে নাসেরের বিপ্লব-চিন্তার মধ্যে ঐতিহাসিক পরিণতি লাভ করেছিল। ১৯২৭ সনে সাতষট্টি বছর বয়সে জগলুল পাশার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু মিশরীদের মনে নব্য মিশরের স্রষ্টা জগলুল পাশার নাম আজো অম্লান রয়েছে এবং থাকবেও চিরকাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১)

কলকাতার চিৎপুর রাস্তার (এখানকার নাম রবীন্দ্র সরণী) পূর্বে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে ১৮৬১ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা—সারদাদেবী। যে পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন সেই ঠাকুর পরিবার ছিল বাংলার নবজাগরণের পীঠস্থান। ধনে মানে প্রতিপত্তিতে এবং সংস্কৃতিতে এই পরিবারটি ছিল বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই এই বংশের মান-মর্যাদার সূচনা। দ্বারকানাথ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ও বন্ধু। দেবেন্দ্রনাথ এঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম সিভিলিয়ান (I.C.S.)।

ঠাকুর-বাড়ির আবহাওয়া সর্বদা ছিল সাহিত্য, গান প্রভৃতির আনন্দ-কোলাহলে ভরপুর। এই বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল কবির শৈশবজীবন। লেখাপড়া চলতো ঘরেই, মাধব পণ্ডিতের কাছে। তারপর একটু বড়ো হলে রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নামক এক স্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু সেখানে বেশি দিন পড়েন নি। সেখান থেকে এলেন নর্মাল স্কুলে—বিলাতি ধরনের স্কুল। সেখানে ইংরেজিতে পড়ানো হতো। স্কুলের পড়াশুনা ছাড়াও, বাড়িতেও শিক্ষার নানা রকম আয়োজন ছিল। নর্মাল স্কুল থেকে ছাড়িয়ে বালককে ভর্তি করে দেওয়া হলো বেঙ্গল একাডেমি নামে এক ফিরিঙ্গী স্কুলে। এগার বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের পৈতা হলো। উপনয়নের পর পিতার সঙ্গে হিমালয় গেলেন। হিমালয়ে চার মাস কাটিয়ে বালক বাড়ি ফিরলেন। বেঙ্গল একাডেমি স্কুলে আবার যেতে হয়। স্কুলের চার-দেওয়াল-ঘেরা ঘরকে কয়েদখানা বলে মনে হয়। মনে জাগে নানা আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিচিত্র সাধ। এগারো বছর বয়সে লেখা 'অভিলাষ' কবিতায় প্রকাশ পায় সেইসব মনের কথা। তখন স্কুল থেকে ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে ঘরে পড়ানো ঠিক হলো। কিছুকাল পরে ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ বছর। এই সময়ে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। এরপর থেকে স্কুলে যাওয়া খুবই অনিয়মিত হতে থাকে। বছর শেষে 'প্রমোশন' পেলেন না ; স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়। আবার ঘরে পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়। এই বয়সেই তিনি লিখেছিলেন 'ভানুসিংহের পদাবলী' যা আজো বাঙালী গান করে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সতেরো বছর তখন তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠকে আমেদাবাদে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন ইংরেজিটা সড়গড় করে দেওয়ার জন্য। তিনি সেখানকার জজ ছিলেন। সাত মাস পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজদাদার

সঙ্গে বিলাত চলে যান (১৮৭৮, সেপ্টেম্বর ২০)। লণ্ডনে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে ভর্তি হলেন। দেড় বছর বাদে বাবার নির্দেশে কোন বিদ্যা আয়ত্ত না করে, কোন ডিগ্রী না নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন। তখন তাঁর বয়স উনিশ। বিলাত থেকে ফেরার পর হিন্দুমেলার বার্ষিক অধিবেশনে একটা নাটক-অভিনয়ের কথা হলো। নাটক লিখবার ভার পড়ল রবীন্দ্রনাথের ওপর। লিখলেন 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয় হলো ঠাকুর বাড়িতেই; রবীন্দ্রনাথ সাজলেন বাল্মীকি। তারপর একে একে বেরুলো তাঁর 'সন্ধ্যাসংগীত, 'প্রভাত সংগীত, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি কাব্য ও উপন্যাস। এইভাবে বাইশ বছর বয়সে যখন তিনি উপনীত হলেন তখন রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হলো খুব আকস্মিক ভাবে (১৮৮৩, ডিসেম্বর ৯) বারো বছর বয়সের একটি মেয়ের সঙ্গে। বিয়ের পর তাঁর পিতার নির্দেশে রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের শিলাইদহের জমিদারী কাজকর্ম দেখতে হয়। পদ্মার তীরে শিলাইদহ; জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা ভালই লাগছে। তিনি এখন জমিদার রবীন্দ্রনাথ; কিন্তু এই জমিদারি কাজের হিসাব-নিকাশের মধ্যে থেকেও তাঁর সাহিত্যকর্ম অব্যাহত ছিল। নতুন পরিবেশে নতুন রচনা লেখবার প্রেরণা পেয়েছেন চিরকাল। শিলাইদহে বসে লিখলেন 'বিসর্জন' নাটক এবং অনেকগুলি ছোটগল্প। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই ছোট গল্পের স্রষ্টা। ত্রিশ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়ার পর তাঁর জীবনে দেখা গেল অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য। এর মধ্যে তিনি আর একবার বিলাত ঘুরে এসেছেন। এই সফরের ফলে বাংলাভাবা পেয়েছিল য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' নামে একটি সুন্দর রোজনামচা। অক্লান্তকর্মা মানুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জমিদারির তদারকি করেছেন, বোলপুর-শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্রহ্ম মন্দির ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে ছেলেদের জন্ম একটা আবাসিক স্কুল; ঠাকুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত নতুন পত্রিকা 'সাধনা'র জন্ম বেশির ভাগ লেখা তাঁকেই লিখতে হতো।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে চলেছে। রাজনৈতিক চেতনা জাতির মধ্যে নতুন রূপ নিতে চলেছে। নতুন শতাব্দীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' নব পর্যায়ে প্রকাশিত হলো। এখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। রবীন্দ্র-প্রতিভার একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো নতুন পত্রিকার দায়িত্ব পড়লেই কবির মন সজাগ ও লেখনী সচল হতো। এইবার নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হলো উপন্যাস—'চোখের বালি; বাংলা সাহিত্যে মনোবিশ্লেষণমূলক উপন্যাসের সূত্রপাত হলো এখান থেকেই। এই সময়ে (১৯০২) কবির জীবনে শোকাবহ ঘটনা তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু। মৃত্যুকালে কবি পত্নীর বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ বছর।

১৯০৫-এর স্মরণীয় বঙ্গভঙ্গের উত্তাল যুগে রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই জাতির চারণ কবি হিসাবে। এই সময় কবি 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি রচনা করেন। বঙ্গচ্ছেদ হওয়ার দশমাস পরে কলকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। এই সময়ে তিনি শিক্ষা

সমস্যা, শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে অনেকগুলি চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেন। দুই বৎসর তিনি পরিষদের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পরিচালক ও পরীক্ষক ছিলেন।

১৯১১। এই বছরের পঁচিশে বৈশাখ কবি পঞ্চাশ বৎসরে পড়লেন। তাঁর জন্মোৎসব হলো অত্যন্ত ঘরোয়া ভাবে। সেই থেকে তাঁর মৃত্যুর বৎসরটি পর্যন্ত প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রজন্মতিথি হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। চিরকালই হবে। ১৯১২ সালটি কবির জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছরের ১২ই মে তিনি বিলাত যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন 'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেজী তর্জমা। ইয়েটস্ প্রমুখ ইংলণ্ডের বিশিষ্ট কবিগণ উচ্চ-আধ্যাত্মভাব পূর্ণ কবিতাগুলি পাঠ করে মুগ্ধ হলেন। গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ 'Song-Offerings' নামে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। য়ুরোপ ও আমেরিকার চিত্ত জয় করে, প্রায় দেড় বছর বাদে, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। ১৯১৩, নভেম্বর ১৫, রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেমন, তেমনি ভারতবাসীর কাছে একটি অবিস্মরণীয় তারিখ রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। ঐদিন সন্ধ্যায় বিলাত থেকে তারবার্তা এলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের জন্য 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন। এশিয়াবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি এই স্বর্ণভ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে য়ুরোপে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। শান্তিবাদী কবির মন দারুণ আঘাত পেল। এই সময়ে শান্তিনিকেতনে একদিনের প্রার্থনায় তিনি বলেছিলেন—'বিশ্বের পাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে, সেই বিশ্বপাপকে দূর করো।...বিনাশ থেকে রক্ষা করো।'

১৯১৫, জুন ৩। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কবিকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করলেন। সাহিত্যের জন্য ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেছিলেন। চার বছর পরে, পাঞ্জাবের জালিয়ান ওয়ালাবাগে, নৃশংস সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদে কবি এই মানের মুকুট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জাতির মান রক্ষা করেছিলেন। শাসক সম্প্রদায় সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের এই সাহস দেখে। বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে যে খোলা চিঠিখানি লিখে তিনি সরকার-প্রদত্ত নাইটহুড্ বা স্যার উপাধি ত্যাগ করেন, অতুলনীয় ভাষায় রচিত কবির সেই পত্রখানি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মূল্যবান দলিল বলে গণ্য হয়ে থাকে। সমগ্র জাতির অন্তরের বিক্ষোভ বলিষ্ঠধারায় অভিব্যক্ত হয়েছিল এই চিঠিতে।

বিদ্যালয়ের তহবিলে দারুণ অর্থাভাবে বিচলিত রবীন্দ্রনাথকে অর্থ সংগ্রহের জন্য আবার বিদেশ সফরে বেরুতে হয়। তিনি প্রথমে আমেরিকা পরে য়ুরোপ গিয়েছিলেন। জাপানেও গিয়েছিলেন। যুদ্ধবিরতির দু'বছর পরে এই সফর শুরু হয়েছিল। কবি যখন বিদেশে (১৯২০-২১) সে সময়ে ভারতে আরম্ভ হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন। স্বাধীন চিন্তার পূজারী রবীন্দ্রনাথ সেদিন গান্ধীজির মহত্ত্ব স্বীকার করে তাঁকে 'মহাত্মা' বলে অভিহিত করেন; গান্ধীজিও কবিকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করলেন।

শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কীর্তি 'বিশ্বভারতী।' ১৯২০ সালে এটি স্থাপিত হয়েছিল আর ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত পৌষ-উৎসবের দিন কবি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানকে সর্ব সাধারণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি শেষবারের মতো য়ুরোপ ভ্রমণ করেন। এই বছরেই কবি অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল Religion of Man বা 'মানুষের ধর্ম।'

অবশেষে কবি উপনীত হলেন সত্তরের কোঠায়। তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী, এই উপলক্ষে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের এক বর্ণাঢ্য আয়োজন করেছিল। শান্তিনিকেতনেও কবির সত্তর বৎসর পূর্তিতে পরিমিত সমারোহে সুন্দর করে জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেদিনের ভাষণে কবি বলেছিলেন—'একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছু নয়, আমি কবি মাত্র।' এই উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব সমিতির পক্ষ থেকে 'The Golden Book of Tagore' নামে একটি মূল্যবান অভিনন্দন গ্রন্থ কবিকে উপহার দেওয়া হয়। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানীগুণী ও সাহিত্যিকের রচনা ও প্রশস্তিতে পূর্ণ এই রকম চিত্তাকর্ষক অভিনন্দন গ্রন্থ এদেশে ইতিপূর্বে কখনো প্রকাশিত হয়নি।

১৯৩৭। কবির জীবনে আর একটি স্মরণীয় বৎসর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ছাত্রদের নিকটে ভাষণ দিতে কবির আহ্বান এলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। বেসরকারি কোন ব্যক্তিকে এপর্যন্ত এমন সম্মানের আসনে আহ্বান করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় তাঁর ভাষণ পাঠ করে মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে একটা নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সেদিন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি. লিট.' (সাহিত্যাচার্য) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলো। এই মর্মান্তিক সংবাদে কবি যারপর নাই ব্যথিত হন। কবির দেহমন ক্লান্ত। বিশ্বসমস্যায় ভারাক্রান্ত। অতীতকে দেখছেন মনশ্চক্ষের সামনে। অস্তাচলগামী রবি নবারুণকে দেখছেন মনশ্চক্ষের সামনে। অস্তাচলগামী রবি নবারুণকে দেখছেন মুখ ফিরিয়ে। এই সময় (১৯৪০, আগস্ট ৭) শান্তিনিকেতনে খুব জমকালো অনুষ্ঠান করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে 'ডক্টরেট' উপাধি দিলেন। পৃথিবীর মানুষের কাছে এই ছিল তাঁর শেষ সম্মান লাভ। তারপর তাঁর জীবনের শেষ নববর্ষ এলো ১৯৪১ সালে। জন্মদিনে কবির কণ্ঠে শেষবারের মতো ঝঙ্কৃত হলো—'ঐ মহামানব আসে।

১৯৪১, আগস্ট ৭ (১৩৪৮, ২২শে শ্রাবণ)। সেদিন ছিল রাখীপূর্ণিমা। ঐদিন জোড়াসাঁকোর পৈতৃক ভবনে—যেখানে তিনি একদিন প্রথম চোখ মেলেছিলেন—মধ্যাহ্নকালেই রবি অস্তমিত হলেন। এ মৃত্যু নয়—একটি মহিমান্বিত নির্বাণ। সারাজীবন ধরে যাঁর কণ্ঠে বিশ্বমৈত্রীর বাণী, শান্তির বাণী ঝঙ্কৃত হয়েছে—সেই কণ্ঠ আজ চিরকালের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

হেনরি ফোর্ড

(১৮৬৩-১৯৪৭)

আমেরিকার অদ্বিতীয় শিল্পপতি হেনরি ফোর্ড ১৮৬৩ সালের ৩০শে জুলাই মিচিগানের অন্তর্গত ডিয়ারবর্নের কাছে একটি ছোট্ট খামারবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ফোর্ডের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল কাজ, তাঁর ইষ্ট ছিল কাজ। তিনি ছিলেন একজন মহান কর্মবীর। বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে কৃষিকর্ম নিয়ে থাকে এবং সেইজন্য প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার আগে ও স্কুল থেকে আসার পরে বালক ফোর্ডকে খামারের কাজকর্ম দেখাশুনা করতে হতো। উত্তরকালে যদিও মাটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অল্পই ছিল তথাপি তিনি কখনো এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন না। ফোর্ড সম্বন্ধে আর একটি কথা প্রচলিত আছে—'He put America on wheels.' কথাটি সত্য। প্রচুরসংখ্যক ট্র্যাক্টর ও মোটর গাড়ি তৈরি করে এবং অপেক্ষাকৃত কম দামে সেইগুলি জনসাধারণের কাছে পৌছে দিয়ে, তিনি যেন একটা অকল্পিত গতিময়তা এনে দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্র মার্কিনের জনজীবনে। যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন ক্ষেত-খামারের কাজে যা তখন পর্যন্ত মন্থরগতি গরু ও ঘোড়ার সাহায্যে করা হতো। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সামনেই গতির যুগ আসছে, আসছে mass production-এর যুগ। ফোর্ডের কর্মপ্রয়াস ও চিন্তার মধ্যে সেই অনাগত যুগের আগমনী বেজে উঠেছিল।

কথিত আছে, ট্র্যাক্টর দেখার পূর্বেই তিনি নিজের মাথা খাটিয়ে এর একটা ড্রয়িং তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর মায়ের সেলাইয়ের সূচ পিটিয়ে স্ক্রু ড্রাইভার তৈরি করেছিলেন আর পাঠ্যপুস্তকের আড়ালে তিনি নানারকম যান্ত্রিক খেলনা তৈরি করতেন। চৌদ্দ বছর বয়স হওয়ার আগেই তিনি নিজে নিজে এক পকেট ঘড়ির সমস্ত অংশগুলি খুলে, আবার পৃথক সেই অংশগুলি একত্রিত করতে পারতেন। ষোল বছর বয়সে তিনি দিনের বেলায় ডেট্রয়েটের একটি কারখানায় সপ্তাহে আড়াই ডলার বেতনে শিক্ষানবিশি করতেন আর সন্ধ্যাবেলায় ঐ বেতনে এক জুয়েলারের দোকানে কাজ করতেন। বছর দুই বাদে তিনি ইঞ্জিন তৈরির কারখানায় একটা চাকরি পেলেন; উনিশ বছর বয়সে আবার তিনি ক্ষেতখামারের কাজে ফিরে আসেন এবং চাষের কাজে সুবিধা হবে বলে নিজেই এক-সিলিণ্ডারযুক্ত একটি বাষ্পচালিত ট্র্যাক্টর তৈরি করেন। চব্বিশ বছর বয়সে ফোর্ড বিবাহ করেন এবং ডেট্রয়েটে চলে যান। শহরটিতে অসংখ্য কল-কারখানা। এইখানে তিনি এডিসন ইলিউমিনেটিং কোম্পানিতে একটা চাকরি পেলেন। তারপর যোগ্যতার বলে দু'বছর বাদে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এজন্যও পদ লাভ করে, হেনরি ডেট্রয়েট অটোমোবাইল ক্লাবের

সভ্য হলেন, এবং এইখানে তাঁর অবসর সময়ে, তিনি তাঁর প্রথম মোটর গাড়ি তৈরি করেন। তাঁর আকৃতি ছিল দীর্ঘ এবং দোহারা গড়ন ; সমস্ত অবয়বের মধ্যে বেশ তীক্ষ্ণতার ভাব। মুখখানি বুদ্ধিদীপ্ত। মানুষটি ছিলেন সরল বিশ্বাসপ্রবণ। উৎসর্গকৃত পূজারীর নিষ্ঠা সহকারে তিনি যন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। যন্ত্র হয়ে উঠেছিল হেনরির জীবনের মন্ত্র। যন্ত্র দ্বারা তিনি একদিন অসাধ্য সাধন করবেন, এমন স্বপ্নও তিনি দেখতেন।

তারপর সবাই একদিন সবিস্ময়ে দেখতে পেলো যে অশ্ববিহীন এক অদ্ভুত গাড়ি চালিয়ে চলেছেন ফোর্ড। গাড়িটা ছিল গ্যাসোলিনচালিত। এরপর তিনি আরো অনেকগুলি গাড়ি তৈরি করে, নৈরাশ্যব্যঞ্জক একটির পর একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অবশেষে তিনি একটি রেসিং গাড়ি (racing car) তৈরি করেন। সেই গাড়িটি নিয়ে একটি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করলেন। এ পর্যন্ত জীবনের পথে তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তারপর নতুন শতাব্দীর সূচনায় তাঁর জীবন নতুন পথে মোড় নিল। ১৯০৩ সালে ফোর্ড তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। ফোর্ডের নবগঠিত কোম্পানির অংশীদারদের মধ্যে ছিলেন দু'জন আইনজীবী, একজন কয়লা ব্যবসায়ী ও তাঁর হিসাবরক্ষক, আর ছিলেন অন্য একটি কারখানার দু'জন মালিক, একজন করনিক ও হাওয়াকলের (windmill) একজন উৎপাদনকারী। কোম্পানির মোট মূলধন ছিল আটাশ হাজার ডলার। পাঁচ বছর পরে ফোর্ডের কারখানায় তৈরি প্রথম মোটর গাড়ি 'Model T' আমেরিকার রাস্তায় প্রথম দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এতকালের পায়ে হাঁটা জাতি হয়ে উঠলো ফোর্ডের কথায়, 'a race of driver' এবং আমেরিকায় শুরু হয় একটা নতুন যুগ—মোটর গাড়ির যুগ।

অবিশ্বাস্যভাবেই কোম্পানির লাভ হলো। ষোল বছরের মধ্যে এর বিপুল পরিমাণ লাভ হয়েছিল। তখন লোকের মুখে মুখে ফোর্ডের নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে আর সকলেই গাড়ি চড়তে থাকে। ফোর্ড এটা লক্ষ্য করলেন। তিনি যে একজন বড়ো আবিষ্কারক ছিলেন তা নয়, এমন কি নূতন ইঞ্জিন বা নূতন কোনো তথ্যের উদ্ভাবকও তিনি ছিলেন না। তিনি অন্যের উদ্ভাবিত আইডিয়াগুলিকে কাজে লাগাতেন ; এই কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। সত্যিই তাঁর বৈপ্লবিক উৎপাদন প্রণালী সেদিন আমেরিকার নর-নারীর জীবনযাত্রায় এক অকল্পিত পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। মোটর গাড়ি যে আগে ছিল না, তা নয়। সেসব গাড়ির গতি ছিল মন্থর, দাম ছিল অত্যন্ত—একমাত্র ধনীব্যক্তি ভিন্ন আর কেউ সে গাড়ি কিনতে পারতেন না। ফোর্ড তৈরি করলেন দ্রুতগামী গাড়ি, তৈরি করলেন সস্তা দামের গাড়ি। মোটর গাড়ি এখন আর বড়লোকের একচেটিয়া জিনিস নয়—নয় বিশিষ্ট শ্রেণীর জন্য ব্যয়বহুল বিলাসিতার সামগ্রী। সকল শ্রেণীর লোকের জন্য—সাধারণ মানুষ শ্রমজীবি মানুষ আর জীবনে যাদের কখনো নিজস্ব গাড়ি ছিল না—সকলের জন্য গাড়ি তৈরি করতে লাগলেন। তিনি

তাঁর কারখানার শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করলেন আর গাড়ির দাম অবিশ্বাস্য ভাবে কমালেন। এর পুরস্কারও পেলেন তিনি। মাত্র এক বছরে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ Model T গাড়ি বিক্রী হয়েছিল ; এর অধিকাংশ মাত্র ২৯০ ডলার দামে বিক্রি হয়েছিল। মূল্য হ্রাসের পক্ষে ফোর্ডের থিওরি নির্ভুল ছিল। কম দাম মানেই বাজারে অধিক চাহিদা, আর সে চাহিদা ছিল ক্রম-বর্ধমান। এর ফলে আমেরিকার রাস্তায় প্রত্যেকটি গাড়ি ছিল ফোর্ড গাড়ি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এনে দিয়েছিল সংহতি, পরস্পরের মধ্যে পরিচয় স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল এবং সমগ্র দেশে যোগাযোগকে করে তুলেছিল দ্রুত। শুধু যে ক্ষিপ্রতার রূপান্তর সাধিত হয়েছিল তা নয়, জাতির মেজাজও রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল অকথিত ভাবে। এ ছিল এক বিস্ময়কর যুগান্তর।

কিছুকাল বাদে রাস্তায় দেখা গেল নতুন মডেলের গাড়ি—Model A—মসৃণ, দেখতে সুশ্রী চার সিলিণ্ডারের গাড়ি ও আধুনিক ধরনের গিয়ার। দামও ছিল আকর্ষণীয়। এই নতুন ডিজাইনের গাড়ি সকলকে মুগ্ধ করলো এবং এর দাম দেখে সবাই বিস্মিত হলো। দামে কম অথচ দেখতে সুন্দর। তেমনি মসৃণ এর গতি। এই নতুন মডেলের গাড়ি প্রবর্তিত হওয়ার একমাস পরে ফোর্ডের কারখানায় দৈনিক ছয় হাজার করে গাড়ি তৈরি হলো। লোকের যেন বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না। ফোর্ড কি যাদুকর? এই প্রশ্ন অনেকেই সেদিন করেছিলেন। আসল কথা, তখন তাঁর কারখানায় উৎপাদনের প্রত্যেকটি ব্যবস্থা উন্নততর হয়েছিল। ফোর্ডের জীবিতকালে তিন কোটিরও বেশি মোটরচালিত গাড়ি তাঁর কারখানায় উৎপন্ন হয়েছিল এবং মিনিটে একখানি করে গাড়ি তৈরী হতো। পৃথিবীতে যান্ত্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এতবড়ো যাদুকর আর দেখা যায় নি। সত্যিই এইভাবে বিপুল উৎপাদনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে সেদিন হেনরি ফোর্ড এই শিল্পে যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন। মোটর গাড়ি ছাড়া ফোর্ডের কারখানায় আরো অনেক জিনিস তৈরী হতো। একটি থেকে একাধিক কারখানা গড়ে উঠেছিল এবং এইসব কারখানায় নিযুক্ত মোট শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল কয়েক লাখে।

কালক্রমে ফোর্ডের কারখানাগুলি থেকে সমুদ্ভূত হলো এক বিশাল ফোর্ড সাম্রাজ্য। য়ুরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্র সহকারী বা subsidiary কোম্পানি স্থাপিত হয়েছিল। ১৯২৩ সালের ফোর্ড কোম্পানির বার্ষিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঐ বছরে একমাত্র আমেরিকায় অবস্থিত ফোর্ডের বিভিন্ন কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ছিল ত্রিশ লক্ষ। একটি কোম্পানীর অধীনে এত অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ নিঃসন্দেহে এক অকল্পিত ব্যাপার। ১৯৪০ সালের পর তাঁর সম্পদের হিসাব করা অসম্ভব ছিল, কিন্তু সেই বছরে একটি হিসাবে বলা হয়েছিল যে ফোর্ড পরিবারের সম্পত্তির মূল্য ষাট কোটি ডলার। যিনি তাঁর প্রতিভা, দূরদৃষ্টি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই অতুল ঐশ্বর্য গড়ে উঠেছিলেন সেই

অদ্বিতীয় শিল্পপতি হেনরি ফোর্ড মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন তা জানবার কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক।

ফোর্ড ছিলেন অনেকটা খামখেয়ালী মানুষ। তিনি সর্বদাই বৈপরীত্যে অর্থাৎ বিপরীত ভাবের মধ্যে বাস করতেন। শিল্প ও সংস্কৃতির ওপর তাঁর ছিল প্রবল বিতৃষ্ণা; এর মধ্যেই যে মানবজাতির প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি এ তিনি গ্রাহ্যই করতে চাইতেন না। কদাচিৎ তাঁকে বই পড়তে দেখা যেত। ফোর্ড অনেক বিষয়ে যা বলেছেন তাকে তাঁর অভিমত বা views বলা চলে, কিন্তু দর্শন বা philosophy বলে গণ্য করা চলে না। কিন্তু তাঁর গোঁড়ামি তাঁকে বিশ্বাস করিয়েছিল যে পৃথিবীতে অন্ততঃ একজন দার্শনিক অভ্রান্ত ছিলেন। তিনি এমার্সন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হটাৎ ফোর্ডকে একজন ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গিয়েছিল; সেদিন তিনিই ছিলেন পৃথিবীর শান্তিকামীদের মধ্যে অন্যতম। একটি বিশেষ জাহাজে চড়ে তিনি এই সময়ে য়ুরোপ যাত্রা করেন; সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এক শতজন সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ। তাঁরা এই সংকল্প নিয়েই গিয়েছিলেন যে য়ুরোপের যুদ্ধরত জাতিগুলিকে আপোষ রফায় আসবার জন্য সম্মত করাবেন। কিন্তু তাঁর সদিচ্ছা পূর্ণ হয়নি। অবস্থার তীব্র বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে, তিনি নরওয়ে থেকে ফিরে আসেন। তাঁর শান্তি-অভিযান ব্যর্থ হয়।

শেষ বয়সে ফোর্ড রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন ও মিচিগান থেকে সেনেটর (Senator) হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়াস পান। যদিও তিনি একজন রিপাবলিকান ছিলেন তবু এই দলের মনোনয়ন তিনি লাভ করতে পারেন নি। এমন কি ডেমোক্রাট দলের মনোনয়ন লাভেও তিনি অসমর্থ হয়েছিলেন। তখন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন—'I am not a politician' রাজনীতি এমন মানুষের জন্য নয়; কিন্তু তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। আশী বছর বয়সে ফোর্ডের স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে, কিন্তু তাঁর মন তখনো সজীব ছিল। এর দু'বছর বাদে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁরপর ১৯৪৭ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে, চুরাশী বছর বয়সে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হেতু রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। এই যন্ত্র যুগের একটি উজ্জ্বল প্রতীক হিসাবে হেনরি ফোর্ডের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'Modern civilization will stand on the shoulders of industry and technology and work will take the second place to worship of God'—তাঁর সত্তরতম জন্মদিনে ফোর্ড এই বাণীটি দিয়েছিলেন। এরই মধ্যে আভাসিত হয়েছে এই কর্মবীরের জীবনদর্শন।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

(১৮৬৪-১৯৩৮)

ব্রজেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই, সার্বভৌমিক জ্ঞানের সাধনাকেই তিনি জীবনের ব্রত করেছিলেন এবং এই ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করে গেছেন অক্লান্ত অধ্যয়নে, নিরাসক্ত ও একনিষ্ঠ অনুধ্যানে। পদ-পদবী, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, ধন-দৌলতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই তিনি বিচরণ করেছেন স্বাধীন চিত্তে মুক্তাকাশে বিহঙ্গের মতো, সামগ্রিক জ্ঞানের সন্ধানে। মানব মনের যে চিরন্তন জিজ্ঞাসা—জীবনের ও সৃষ্টির রহস্য জানবার—তারই উত্তর তিনি খুঁজেছেন জ্ঞানের সাধনায় তাই পরা-অপরা উভয়বিধ জ্ঞানের সকল শাখাই—বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম, অধ্যাত্মবিদ্যা ইত্যাদি ছিল তাঁর অধ্যয়ন ও অনুশীলনের অঙ্গীভূত। ছাত্রজীবনেই ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর বহুমুখী জ্ঞানস্পৃহার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৮১ সালে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (এখনকার নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) তিনি যখন বি, এ. ক্লাসে পড়েন, নরেন্দ্রনাথ দত্তের (ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে তাঁর পরিচয়। নরেন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথের চেয়ে এক বছরের বড় হলেও এক ক্লাস নীচে পড়তেন। দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব ও হৃদয়ের যোগ ছিল। এসময়ে দুই বন্ধুই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন এবং তাঁরা সমাজের উপাসনায় নিয়মিত যোগদান করতেন।

১৮৮৪ সালে এম. এ. পরীক্ষায় হেস্টি সাহেবের আগ্রহাতিশয্যে ব্রজেন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রই নিয়েছিলেন এবং পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। অন্য কোন ছাত্রই সে-বছর ঐ বিষয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে পারে নি। এম. এ. পাশ করার পর ব্রজেন্দ্রনাথ সিটি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়েই (১৮৮৪) তাঁর বিবাহ হয়। পত্নী ইন্দুমতী ছিলেন বিদুষী—ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ও রসবোধ ছিল। সিটি কলেজে এক বছর অধ্যাপনার পর ১৮৮৫ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ নাগপুরে আসেন। এখানে মরিস কলেজে প্রথমে অধ্যাপকরূপে এবং পরে অধ্যক্ষরূপে প্রায় তিন বছর কাজ করেন (১৮৮৫-৮৭)। ১৮৮৭ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ লিভিংস্টোন যখন চলে যান—ঐ পদে তখন ব্রজেন্দ্রনাথকে আহ্বান করা হয়। অগ্রজ রাজেন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে তিনি বহরমপুর কলেজে অধ্যক্ষপদে যোগ দেন। অতঃপর ব্রজেন্দ্রনাথ এই কলেজেই নয় বছর অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এরপর তাঁকে আমরা দেখতে পাই কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে। ১৮৯৬ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে খ্যাতি ও সম্মানের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধ্যাপক জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী,

শিশিরকুমার যখন প্রভৃতি কুচবিহার কলেজে তখন অধ্যাপনা করতেন। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর ব্রজেন্দ্রনাথের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। কলেজের সর্ববিধ উন্নতিসাধনে নতুন অধ্যক্ষের প্রয়াস মহারাজা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতেন।

১৮৯৯ সালে রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্ সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি যোগদান করেন। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে প্রাচ্য দেশীয় বিবুধমণ্ডলী ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। সারা য়ুরোপেই ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নাম। কুচবিহারে থাকতে ১৯১১ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত Universal Races Congress-এ ভারতের প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ তৃতীয়বার য়ুরোপ গমন করেন, দ্বিতীয়বার গিয়েছিলেন স্বাস্থ্যলাভের জন্য। এই কংগ্রেসে তিনি প্রথম বক্তা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর ভাষণে সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভিক্টোরিয়া কলেজের সুখ্যাতি তাঁকে টেনে আনল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আশুতোষের আহ্বানে ১৯৩৩ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাশাস্ত্রে প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এখানে তিনি জ্ঞানের অনুশীলন, অনুসন্ধান ও অধ্যাপনার বৃহত্তর ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। স্নাতকোত্তর বিভাগে তাঁর অধ্যাপনা তাঁর ছাত্রদের মনে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার তুলনা নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যে সাত বছর সংযুক্ত ছিলেন সেই সময়ে অধ্যাপনা ব্যতিরেকে স্নাতকোত্তর বিভাগগুলির উন্নতি বিধানে ব্রজেন্দ্রনাথ আশুতোষকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন।

আরো কয়েকটি কারণে তাঁর কলকাতা জীবন স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে বহু বছর ধরে অনুসন্ধানের ফলে তিনি যেসব তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, সেইসব তথ্য একত্র করে ব্রজেন্দ্রনাথ Ph. D উপাধির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নিবন্ধ দাখিল করেন। এই নিবন্ধই ১৯১৫ সালে 'The Positive Sciences of the Ancient Hindus' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানও তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও বিশ্লেষণ শক্তির অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। এই বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত D. Sc. উপাধি প্রদান করেন। স্যাডলার কমিশনের চেয়ারম্যান, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পণ্ডিত স্যার মাইকেল স্যাডলার যখন ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন তখন তিনি তাঁকে 'এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী' বলে অভিহিত করেছিলেন।

অতঃপর তাঁকে আমরা দেখতে পাই সুদূর মহীশূর রাজ্যে শিক্ষা ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। মহীশূরের তদানীন্তন মহারাজা স্যার মাইকেল স্যাডলারকে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণের জন্য যখন অনুরোধ করেন, স্যাডলার

সাহেব তখন ঐ পদে নিয়োগের জন্য আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম প্রস্তাব করেন। ১৯২১ সালে তিনি এই পদে যোগদান করেন এবং ১৯৩০ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক দশক কাল ব্রজেন্দ্রনাথ ঐ গৌরবময় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে তখন ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র মহীশূরেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যটি খুবই প্রাগ্রসর ছিল। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, গভীর জ্ঞান ও প্রশাসনিক বিচার বুদ্ধির জন্য ১৯২২ সালেই মহীশূরের শাসনতন্ত্র সংস্কারের জন্য বহু সংসদ গঠিত হয়। তাঁকে তার সভাপতি করা হয় এবং ১৯২৪ সালে মহীশূর সরকারে কার্যকরী পরিষদের অন্যতম সভ্য নির্বাচিত হন। এই বছর মহীশূর রাজ্যের শাসনতন্ত্র সংস্কার সম্বন্ধে তিনি যে মূল্যবান বক্তৃতা দেন, প্রধানত তারই ভিত্তিতে ঐ রাজ্যের নতুন শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছিল। এইখানে অবস্থানকালেই ব্রজেন্দ্রনাথ Knight ('স্যার') উপাধিতে ভূষিত হন (১৯২৬) এবং মহীশূর ত্যাগ করার কিছু আগে মহীশূরের রাজা তাঁকে 'রাজতন্ত্র প্রবীবণ' উপাধি দান করে সম্মানিত করেন।

ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ১৯৩০ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরলেন এবং তখন থেকে কম বেশি নয় বছর কাল তিনি আমাদের মধ্যে জীবিত ছিলেন। যদিও তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি এবং স্মরণশক্তি হ্রাস পেয়েছিল, তথাপি কর্মশক্তি অটুট ছিল। জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়েও তাঁর বিশ্রাম ছিল না। নানা প্রতিষ্ঠান ও বহু ব্যক্তির সঙ্গে ছিল তাঁর নিত্য সংযোগ। ১৯৩৩ সালে রাজা রামমোহন রায়ের মৃতশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে একটি উৎকৃষ্ট ভাষণ দেন। ১৯৩৫ সালে নিখিল ভারত দর্শন কংগ্রেস আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের বাহাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে সেনেট হলে জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেন। সেদিন তাঁর আজীবনের সুহৃদ রবীন্দ্রনাথ যে সুদীর্ঘ প্রশস্তি রচনা করেছিলেন তার কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত হলো:

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্ধ্বে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধন শিখর শ্রেণী; যেথায় গহন-গুহা হতে
সমুদ্রবাহিনী বার্তা চলেছে প্রস্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি। সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দক্ষিণ পানি। বিদায়কালের অর্ঘ মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখী ডোরে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কলকাতার টাউন হলে ১৯৩৭ সালে ধর্ম মহাসম্মেলনের স্মরণীয় অধিবেশনে পৌরহিত্য করেন। প্রকাশ্যে এই তাঁর সর্বশেষ ভাষন ১০৩৮,৩ ডিসেম্বর কলকাতার আটাত্তর নম্বর ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্ব থেকেই ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী লিখবার পরিকল্পনা করেন। তখন তাঁর

দৃষ্টিশক্তি ও স্মরণশক্তি দুই-ই ক্ষীণ, নিজে লিখতেও পারেন না মুখে মুখে যা বলে যেতেন তাঁর সেক্রেটারি তাই-ই লিখে নিতেন। আত্মচরিতখানি দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ হবে, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা কিন্তু প্রথম খণ্ড শেষ করেই তিনি মৃত্যুলোকে প্রয়াণ করেন। এই আত্মজীবনী এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও অপরিসীম জ্ঞানের নিদর্শন হিসাবে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ আমাদের জন্য রেখে গেছেন মাত্র খান তিন-চার বই ও কয়েকটি ভাষণ, প্রবন্ধ ও লেখা। কিন্তু প্রত্যেকটি বই বা প্রবন্ধ তাদের আপন আপন বিষয়ে একটি অতুলনীয় ও অমূল্য সম্পদ। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁর 'Positive Science of the Ancient Hindus' বইটিতে তিনি সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞান ও অসাধারণ অধ্যবসায় এবং অপূর্ববিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন যুগে যখন ভারত থেকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যায় দেশ দেশান্তরে, তারই লুপ্ত গৌরব ও কীর্তিকাহিনী উদ্ধার করে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থে।

এই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠের জীবনের মূল কথাটা কি? ব্রজেন্দ্রনাথ জীবনকে এক অখণ্ড সত্তা বলে স্বীকার করেছিলেন। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সংস্থিতির ঐক্যমূলক মহাসংশ্লেষণে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন সেইজন্য তিনি বলতে পেরেছিলেন— 'আমাদের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।' রামমোহনের মতোই এক মহাঐক্যের পুরোহিত ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। এই সার্বভৌমিকতা তাঁর কাছে শুধু পুঁথিগত ছিল না; এ ছিল তাঁর কাছে উপলব্ধ সত্য। তাই তো ধর্ম মহাসম্মেলনে তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল— বিশ্বের মধ্যে মানুষকে আর মানুষের মধ্যে বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই মানবতাকে সকল রকম সংকীর্ণতা মুক্ত করা যেতে পারে।'

এডিথ ক্যাভেল
(১৮৬৫-১৯১৫)

১৮৬৫ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর নরফোকের অন্তর্গত সোয়ারডেস্টন গ্রামে এডিথ লুইসা ক্যাভেল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা রেভারেণ্ড ফ্রেডরিক ক্যাভেল ছিলেন একজন পল্লীযাজক। একটি সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ যুগে এই গ্রামটি ছিল সমৃদ্ধশালী। তখন ক্রিমিয়া যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং আমেরিকাতেও একটি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তখন এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির ভেতর দিয়ে তাঁর স্বজাতির ভাগ্য-পরিচালনা করেছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তখন একটি প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছে। পল্লীযাজক ফ্রেডরিক ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। ধর্মপ্রাণ এবং নম্র প্রকৃতি। তাঁর অন্তঃকরণের সহৃদয়ভাব উত্তাপ পল্লীর সকল নর-নারীর হৃদয়কে স্পর্শ করত। তিনিই ছিলেন সেই গ্রামের আদর্শ পুরুষ। তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে একমাত্র কন্যা এডিথের মধ্যে তিনি বহুবিধ সদগুণ লক্ষ্য করেছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি এডিথের মধ্যে প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলেন। তার স্বভাবের মধ্যে আর একটি গুণ ছিল। বালিকা খুব পরিশ্রমী। তাই পিতা তাঁর এই কন্যাটিকে একটি ভাল বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন এবং বড়ো হয়ে এডিথ তাঁর পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করেছিলেন।

স্কুলে ছাত্রী হিসাবে এডিথ সকল বিষয়েই পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন এবং খুব যত্নের সঙ্গে ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেন। ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একটা দায়িত্বপূর্ণ চাকরি পেয়ে এডিথ খুবই উৎসাহিত বোধ করলেন। ব্রাসেলসের যে ফ্রাঁসোয়া পরিবারে তিনি গৃহশিক্ষিকা হয়ে এলেন সেই পরিবারটি ছিল তাঁর মনের মতো। গৃহকর্তা ছিলেন একজন আইনজীবী। সে পরিবারে সর্বদাই আনন্দ বিরাজ করছে। ব্রাসেলসের সার্বজনীন ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশটিও এডিথের খুব ভাল লাগল। ফ্রাঁসোয়া পরিবারের ছেলেমেয়েদের তিনি যে স্নেহ দিয়েছিলেন এবং যেভাবে তাদের তিনি শিক্ষিত করে তুলেছিলেন, উনিশ শতকের ব্রাসেলে তা ছিল দুর্লভ, অর্থের বিনিময়েও তা পাওয়া যেত না। কিছুকাল ঐ পরিবারে কাজ করার পর এডিথ ফিরে এলেন বাড়িতে অসুস্থ পিতার পরিচর্যার জন্য। কন্যার সযত্ন শুশ্রূষার ফলে বৃদ্ধ ফ্রেডরিক শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করলেন এবং এডিথ তখন আবার বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেলেন। আর ছেলে-পড়ানো নয়; এবার তিনি সেই বৃত্তি গ্রহণ করবেন যার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি সেবিকার বৃত্তি গ্রহণ করবেন—নার্স হবেন এই ছিল তাঁর মনের অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা। তখন যদিও এডিথ ত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করেছেন, তথাপি তিনি ঐ অধিক বয়সেই হোয়াইট চ্যাপেল রোডে অবস্থিত লণ্ডন হাসপাতালে একজন শিক্ষানবীশ নার্স

হিসাবে যোগদান করলেন। শিক্ষাসমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি দায়িত্ব-পূর্ণ কাজও পেয়ে গেলেন। তাঁর অধীনে কয়েকজন নার্স দিয়ে তাঁকে মেডস্টোন নামক একটি আধা পল্লীগ্রাম, আধা শহরে প্রেরণ করা হলো। তখন সেই অঞ্চলে মহামারীরূপে দেখে দিয়েছে টাইফয়েড। এইকাজে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। নার্স এডিথ ক্যাভেলের নাম তখন অনেক হাসপাতালে ছড়িয়ে পড়ল। এরপর তাঁকে আমরা দেখতে পাই লণ্ডনের একটি হাসপাতালের মেট্রনরূপে। এই ক্ষেত্রে তাঁর সংযত আচরণ, স্বাভাবিক বুদ্ধি, পরিচর্যার নৈপুণ্য এমনভাবে প্রকাশ পেতে থাকে যে সকলেরই শান্ত বিনম্র-প্রকৃতির এই সেবিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। এখানে তিনি সকলেরই চিত্ত জয় করেছিলেন।

বেলজিয়ামে তখন উপযুক্ত নার্সের বিশেষ অভাব ছিল, এমন কি সাধারণ ভাবে দক্ষ নার্সও পাওয়া যেত না। সেখানকার বিখ্যাত সার্জন অ্যান্টোআইন ডিপেজ তাঁর ক্লিনিকে কাজ করার জন্য একজন অভিজ্ঞ নার্স খুঁজছিলেন। ইংরেজ নার্সদের প্রতি তাঁর খুব শ্রদ্ধা ছিল। নার্স এডিথ ক্যাভেলের খ্যাতি জানবার পর তিনি তাঁকেই তাঁর ক্লিনিকে কাজ করার জন্য আহ্বান করলেন। তাঁর ক্লিনিকে যে দু'চারজন স্বল্প শিক্ষিতা বেলজিয়াম নার্স তখন কর্মে নিযুক্ত ছিল, এডিথের উপর ভার পড়ল তাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। ডাক্তার অ্যান্টোআইনের ক্লিনিকটিই ছিল ব্রাসেলসে সমধিক প্রসিদ্ধ ও বেলজিয়ামের নানাস্থান থেকেই চিকিৎসিত হওয়ার জন্য এখানে রোগী আসত। সেইসব রোগীর পরিচর্যা করা ও ক্লিনিকের অন্যান্য তরুণী নার্সদের ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা—প্রধানতঃ এই ছিল এডিথের কাজ। এই কাজে তাঁর খ্যাতি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, শীঘ্রই তাঁর আকর্ষণে ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও সুইজারল্যাণ্ড থেকে একদল গ্র্যাজুয়েট নার্স সেই ক্লিনিকে এসে যোগদান করল। এদের সাহায্যে বেলজিয়ামে বহু নার্স উপযুক্তভাবে শিক্ষা পেতে থাকে। ডাক্তার অ্যান্টোআইনের ক্লিনিকের নূতন মেট্রন এডিথ প্রত্যেককেই ঐ কাজে অনুপ্রাণিত করে তুললেন।

১৯১৪ সনের মধ্যে তিনি খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। শিক্ষা দেওয়া ভিন্ন তিনি তখন প্র্যাকটিক্যাল নার্সিং-এর কাজেও খুব ব্যস্ত থাকতেন। ব্রাসেলসে প্রত্যেকটি হাসপাতাল থেকে তাঁর ডাক আসতো ঐসব হাসপাতালে সার্জনদের সহকারী হিসাবে কাজ করার জন্য। রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় যে ধারা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন, এডিথ ক্যাভেল তাকেই একটা সুপরিণত রূপ দান করেন। তাঁর জীবনের সার্থকতা এইখানেই। নারী-হৃদয়ের সমস্ত মমতা ঢেলে দিয়ে রোগীর পরিচর্যা করাই নার্সদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত—এই সত্যটাই তো তিনি তাঁর দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। এইভাবেই তিনি মেয়েদের এই বৃত্তিকে আধুনিক কালে একটা নূতন মর্যাদায় স্থাপিত করে গিয়েছেন। তাঁর মহত্ব এইখানেই।

তাঁর বয়স যখন আটচল্লিশ বছর তখন এডিথ শেষবারের মতো ইংল্যাণ্ডে এলেন

তাঁর পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। গুরুতর পরিশ্রমের ফলে ঐ বয়সেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। হাসপাতালের কাজে তিনি শ্রান্তি জানতেন না, ক্লান্তি মানতেন না। ঐ বয়সে তাঁর স্বাস্থ্যহানির এইটাই ছিল প্রধান কারণ। তিনি ইংলণ্ডে এসে পৌছবার তিন সপ্তাহ পরে ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনে তিনি ব্রাসেলসে ফিরে গেলেন। এতে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ আপত্তি ছিল। কিন্তু এডিথের কর্তব্যবোধের কাছে সেসব আপত্তি টিকল না। তিনি প্রত্যাবর্তন করতেই অন্যান্য নার্স'রা খুব আনন্দিত হলো। ফিরে আসার পর প্রথম যে কর্তব্যটির ভার তাঁকে দেওয়া হয় সেটি হলো তাঁর সঙ্গে যে কয়টি জার্মান মেয়ে কাজ করেছিল তাদের রক্ষক হয়ে তাদের রেলওয়ে স্টেশনে নিরাপদে পৌছে দেওয়া। তারা চলে যাবে জেনে তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। যুদ্ধ বাধবার তিন সপ্তাহ পরে এডিথ 'দি টাইমস' পত্রিকার মাধ্যমে জানালেন যে আহত ইংরেজ সৈন্যদের পরিচর্যার জন্য তাঁর হাসপাতালের দরজা উন্মুক্ত আছে এবং সেই সঙ্গে তিনি হাসপাতালটির প্রসার সাধনের জন্য তিনি ইংরেজ জনসাধনের নিকট মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানালেন। তাঁর এই আবেদন ব্যর্থ হলো না। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য আসতে লাগল এবং আহত সৈন্যদের পরিচর্যার কাজে এডিথ তাঁর সহকারিণীদের নিয়ে দিবারাত্র নিযুক্ত রইলেন। যখন হাসপাতালটির সবেমাত্র প্রসারলাভ ঘটেছে এমন সময়ে ব্রাসেলসের পতন হলো। বিজয়ী জার্মান সৈন্য বেলজিয়ামের রাজধানী দখল করল এবং এটা ঘটল যুদ্ধ ঘোষণা হওয়ার ঠিক এক মাসের মধ্যেই। এডিথ ক্যাভল ও অন্যান্য ইংরেজ নার্সদের নিরাপদে হল্যাণ্ড যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং অনেকেই তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। সেই সময় তিনি একটি কথা বলেছিলেন: **Our work is for humanity, whether it be Belgiam, British, French or German, and we will stay where we are.** সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর হাসপাতালের সহকারিণীদের নিয়ে এডিথকে আহত জার্মান সৈন্যদের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকতে দেখা গেল।

যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠতে থাকে; ব্রাসেলস তখন জার্মানদের একটি বড় ঘাঁটিতে পরিনত হয়েছে। কাইজার শীতকালের মধ্যে বিজয় অভিযান শেষ করবেন পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি তাঁর নির্ধারিত পরিকল্পনা মতো এগিয়ে চলেছেল; পশ্চিম সীমান্তে কামানের ধ্বনি তখন ক্রমশই মিলিয়ে আসছিল। এমন সময় হঠাৎ মার্নে'র কাছে বিজয়ী জার্মান সৈন্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হলো। পরিকল্পনা যখন এইভাবে মাঝ পথে বাধাপ্রাপ্ত হলো তখন জার্মানরা নৃশংসতার আশ্রয় নিল। ব্রাসেলস থেকে বিশ মাইল দূরে অবস্থিত লুভের বিশ্ববিদ্যালয়টি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো ও এর অধিবাসীদের পুড়িয়ে মারা হলো। সমগ্র সভ্যজগৎ এই সংবাদে হতচকিত হয়ে গেল এবং এডিথের চেয়ে আর কেউ বোধ হয় বেশি বিচলিত হয় নি।

হাসপাতালে পরিচর্যা করার মতো আর একটিও সৈন্য নেই; জার্মানদের তাদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মিত্রশক্তির একটি আহত সৈন্যকেও চিকিৎসার জন্য এখানে প্রেরণ করা হয় নি। হাসপাতালের রোগীরা তখন সবাই বেলজিয়ামের নাগরিক। জার্মান সামরিক গভনর নিয়ম জারি করেছিলেন যে, আঠার বছর উপরের সমস্ত পুরুষ রোগীকে হাসপাতাল থেকে মুক্ত হওয়ার পর সামরিক পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। এর অর্থ অন্তরীণাবদ্ধ হওয়া ও বাধ্যতামূলক শ্রম-সাধ্য কর্মে তাদের নিয়োগ করা। এডিথ ক্যাভেল অবশ্য সোজাসুজি এই সামরিক বিধানের বিরুদ্ধাচরন করলেন না, তবে এর অভিপ্রায় খর্ব করার জন্য, হাসপাতাল থেকে মুক্ত হওয়ার পর প্রত্যেক রোগীকে তিনি নির্দেশ দিতেন এই বলে—যদি খুঁজে পাও তবে তুমি মিলিটারী পুলিশের সদর দপ্তরে গিয়ে রিপোর্ট করবে, নতুবা মাদাম অমুকের গৃহে আশ্রয় নেবে। ইতিমধ্যে ফরাসী সীমান্তে একটি স্থানে বেলজিয়ামের রাজকুমারী তাঁর প্রাসাদকে একটি হাসপাতালে পরিণত করেছেন। তিনি এখান থেকে মিত্রশক্তির সৈন্যদের গোপনে ইংলণ্ডে প্রেরণের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করেন। কাজটা ছিল খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু এতখানি পথ একটানা যাওয়া সম্ভব নয়, কোথাও একটু থামা দরকার। কোথায় থামা যায়? ব্রাসেলসে হাসপাতালের কথা রাজকুমারীর মনে পড়ল এবং তিনি এই বিষয়ে এডিথ ক্যাভেলের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বিনা দ্বিধায় তিনি এই অনুরোধে সম্মত হলেন, যদিও তাঁর সহকারিণীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে নিষেধ করেছিল, কেননা এই ব্যাপারে ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য।

ক্রমে জার্মানরা জানতে পারে যে মিত্রপক্ষের সৈন্যদের ব্রাসেলসের একটি হাসপাতালে আশ্রয় দেওয়া হয়। তারা গুপ্তচর নিয়োগ করে সমগ্র বিষয়টি জানতে পারে। তারপর যে অনিবার্য নিয়তি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল তাই ঘটল ১৯১৫ সালের ৫ই অগষ্ট তারিখে এডিথ তাঁর এক সহকারিণীসহ ধৃত হন। তিনি সমস্ত দোষ স্বীকার করলেন। কোর্ট মার্শালের বিচারে তাঁর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো। **In death her goal will be achieved—the service of humanity, through the service of nursing**—তাঁর মৃত্যুর পর এই কথা লিখেছিলেন জ্যাকেলিন ভ্যান টিল নাম্নী এডিথেরই হাতে গড়া একজন সেবিকা। সেবা শুশ্রূষার ভেতর দিয়ে মানবতার সেবা এই তো ছিল এডিথ ক্যাভেলের জীবন।

উইলিয়াম বাটলার য়েট্‌স

(১৮৬৫-১৯৩৯)

আইরিশ নবজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি য়েটস। ডাবলিনের শহরতলী স্যাণ্ডিমাউণ্ট নামক স্থানে এক প্রোটেস্টান্ট পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয় মাতুলালয়ের একটি গ্রামে। সেখানকার পল্লী-প্রকৃতি, লোকসাহিত্য, উপকথা তাঁর প্রথম দিকের রচনাকে প্রভাবিত করেছে। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে য়ুরোপে তাঁর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি খুব বিরল। ১৯২৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকেই কবি য়েট্‌স এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। য়ুরোপের একাধিক ভাষায় এবং কয়েকটি প্রাচ্য ভাষায়ও তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে। এশিয়া ভূখণ্ডে জাপান তাঁর সবচেয়ে অনুরাগী; সেই সূর্যোদয় দেশের য়েটসভক্ত সাহিত্যিকগণ 'য়েট্‌স সোসাইটি' নামে একটি সাহিত্য সংস্থা স্থাপন করে এই আইরিশ কবির প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন য়েট্‌সের বিশেষ গুণমুগ্ধ; তিনি য়েট্‌সকে 'বিশ্বজগতের কবি' বলে সম্মান দেখিয়েছেন।

'কবি য়েট্‌স' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'কবি য়েট্‌স নিজের সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্যের সমস্ত কৃত্রিমতাকে সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করিয়াছেন। তাহার কাব্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের হৃদয় ব্যক্ত হইয়াছে।' জীবনধর্মের একজন অকৃত্রিম কবি য়েট্‌স। তাঁর পিতা জন বাটলার য়েটস ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী। কিছুকাল তিনি সপরিবারে লণ্ডনে বাস করেছিলেন। তখন য়েট্‌স ছিলেন বালকমাত্র। তাঁর সহোদর জ্যাকবও ছিলেন একজন তরুণ চিত্রশিল্প। তাই অনেকের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, য়েট্‌সও বুঝি তাঁর পিতার এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবেন। উনিশ বছর বয়সে য়েট্‌স ডাবলিনের মেট্রোপলিটান শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন ও কিছুকাল চিত্রাঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করেন। কিন্তু য়েট্‌স সত্যিকার আনন্দ পেতেন লেখার মধ্যে। তুলি নয়, কলমই তাঁর ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম—এই সত্যটা বুঝতে তাঁর খুব বিলম্ব হয়নি।

য়েট্‌সের যৌবনকাল কেটেছে ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে। তাঁর বয়স যখন এগারো বছর তখন তাঁকে লণ্ডনের অন্যতম শহরতলী হ্যামারস্মিথের একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু মামার বাড়ি আসার জন্য তাঁর মন খুব অস্থির হয়। তাঁর ছাত্রজীবনের অবশিষ্ট কাল ডাবলিনে অতিবাহিত হয়েছিল। জীবনের অধিকাংশ সময় বিদেশে অতিবাহিত হলেও, য়েট্‌স কিন্তু সারা জীবন তাঁর অন্তরে জন্মভূমি আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি নিবিড় অনুরাগ পোষণ করতেন। বাইশ বছর বয়সে তিনি ফিরে আসেন লণ্ডনে। তাঁর কবি-খ্যাতি তখন থেকেই অল্প-

বিস্তর ছড়িয়ে পড়েছিল। ছাব্বিশ বছর বয়সে য়েট্‌স ডাবলিনে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে তিনি লণ্ডন শহরে 'আইরিশ সাহিত্য সংঘ' স্থাপন করেছেন; এই সংঘের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন তৎকালীন আয়ার্ল্যাণ্ডের উদীয়মান সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ। পরের বছর তিনি ডাবলিনে অনুরূপ একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতিকে কেন্দ্র করেই তিনি আইরিশ জাতীয় নাট্য আন্দোলন ও রঙ্গালয় স্থাপন করবেন, এই ছিল য়েট্‌সের জীবনে সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষা। আট বছর পরে উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে তাঁর এই স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। ইতিপূর্বে গেলিক লীগের (Gaelic League) নেতৃত্বে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রাচীন রূপকথা ও লোকগাথা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। এই সময়টা ছিল কেলটিক পুনরভ্যুত্থানের যুগ এবং য়েট্‌স ছিলেন সেই আন্দোলনের সর্বপ্রধান ব্যক্তি।

এইভাবেই সেদিন য়েটস আইরিশ সাহিত্য ও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ক্রমে তাঁর মনে এই বিশ্বাস জন্মালো যে, স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে জনসাধারণের মনে চেতনা জাগ্রত করতে পারলেই ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে যে কাজ হয়নি, সেই কাজ অনায়াসে সম্পন্ন হবে। সেদিনকার আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় আন্দোলনে কবি য়েট্‌সের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেদিন তাঁর রচিত উদ্দীপনাময়ী কবিতা কণ্ঠে নিয়ে মুক্তিপথে অগ্রসর হয়েছিল আয়ারর্ল্যাণ্ডের মুক্তিসেনার দল। সেদিন য়েট্‌স সত্যিই আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় কবি বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আরেক জন আইরিশ কবি—জর্জ রাসেল। পরবর্তীকালে এই স্বাধীন আইরিশ রাষ্ট্রের অন্যতম সিনেটররূপে য়েট্‌স একাদিক্রমে ছয় বৎসরকাল দেশের সেবা করেছিলেন।

এইবার আইরিশ নাট্য আন্দোলনের কথা। নর্থ ক্লেয়ারে তৎকালীন প্রসিদ্ধ লেখিকা লেডি গ্রেগরির সঙ্গে য়েট্‌সের পরিচয় হয়। এঁরা দু'জনেই পরস্পরের আজীবন বন্ধু ছিলেন। লেডি গ্রেগরির বাড়িতেই আইরিশ সাহিত্যের নবজন্মের সূচনা এবং এইখানেই আইরিশ নাট্য আন্দোলন ক্রমে রূপ পরিগ্রহ করে। এরই পরিণতি এ্যাবি থিয়েটার (Abbey theater)। এখানে যখন প্রথম নাটক অভিনীত হয় তখন মুখ্যত নাটকের দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, দৃশ্যপট প্রভৃতি ছিল গৌণ। জে. এম. সীঞ্জ, জর্জ রাসেল, জর্জ মুর, শীন ও'কেসি প্রভৃতি তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিকগণ এই আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। য়েট্‌স প্রণীত 'কাউণ্টেস ক্যাথলীন' ও এডওয়ার্ড মার্টিনের 'হিদারফিল্ড' নাটক দু'খানি ডাবলিনের এ্যাবি থিয়েটারে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। তখন থেকে য়েট্‌স ও লেডি গ্রেগরির সহায়তায় ডাবলিনে যে সব অভিনয় হয় তার ভিতর দিয়েই গড়ে উঠল 'আইরিশ ন্যাশনাল সোসাইটি' এবং সেই সঙ্গে ডারিউ. জি. ফে'র নেতৃত্বে আইরিশ অভিনেতৃগোষ্ঠি। এর দু'বছর পরে ডাবলিনের এ্যাবে থিয়েটারটি নূতন পরিকল্পনায় পুনর্নির্মিত হয় এবং অতঃপর সোসাইটির স্থায়ী কেন্দ্র সেখানেই স্থাপিত

হয়। এই নবনাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করা ও তাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দেওয়া য়েট্‌সের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে গণ্য হয়ে থাকে।

এই আইরিশ থিয়েটারেই য়েট্‌সের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় মডগন নাম্নী এক অভিজাত সুন্দরীর। এই তরুণী ছিলেন একজন যথার্থ দেশপ্রেমিকা এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশও গ্রহণ করেছিলেন। কাব্যরসিকা এই তরুণী য়েট্‌সের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দি ওয়ানডারিংস অব অয়সিন' পাঠ করে। এই কাব্য সূত্রেই তাঁরা দু'জনে পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হন। এই প্রেম তাঁদের জীবনে স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ হলো 'ক্যাথলীন'। দর্শকরা এই নাটকখানি খুবই উপভোগ করত এবং নাটকের অন্তর্গত নায়িকা চরিত্রের মধ্যে তারা যেন আয়ার্ল্যাণ্ডের শাশ্বতী নারীকেই দেখতে পেত। এই খাঁটি আইরিশ নাটকখানির জনপ্রিয়তার কারণ সম্পর্কে য়েট্‌স স্বয়ং একবার বলেছিলেন—'আমি সেই জীবনকেই প্রকাশ করেছি যা কখনো অভিব্যক্তি পায়নি।'

য়েট্‌স সমালোচকদের বিবেচনায়, নাট্যকার হিসাবে য়েট্‌সের স্থান ততটা নয়, যতটা কবি হিসাবে। তাঁর নাটকাবলীর মধ্যে 'ক্যাথলীন' ও 'দি ল্যাণ্ড অব হার্টস ডিজ্যায়ার' সর্বাধিক সুপরিচিত নাটক। এই নাটক দু'খানি যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন যে, নাট্যকার য়েট্‌স অপেক্ষা, কবি য়েট্‌সই প্রাধান্য লাভ করেছেন এই দু'খানি নাটকে। এ দু'খানিই মূলত কাব্যনাট্য। এইবার কবি য়েট্‌সের কথা। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, একটি সংবেদনশীল কবি-মন নিয়েই তাঁর জন্ম। খুব ছেলেবেলা থেকেই ধর্ম এবং তৎকালীন অস্তিবাদী উপযোগিক বস্তুসর্বস্ব ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানচর্চার ভিক্টোরিয় অনুশীলনতায় বিরক্ত এই তরুণ কবি তাই আয়ার্ল্যাণ্ডের জেলে-জোলা ও গরীব চাষীদের লোকগাথা আর গানে সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নির্জন মিনারের কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি জনজীবনের হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারতেন ও তাকে উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করতে জানতেন।

য়েট্‌সের কবিজীবন এক হিসাবে আধুনিক কবিতার বিবর্তন তুল্য। ললিত স্বপ্নালুতায় শুরু করেছিলেন তিনি; তখন তাঁর কবিতা ছিল স্পেন্সার, শেলী উইলিয়ম মরিসের কবিতার প্রতিধ্বনি। উনিশ শতকের শেষ দশক ছিল সাহিত্যে, উন্মাদনার যুগ। তরুণ সমাজ ওয়ালটার পেটার, হুইসম্যান প্রভৃতিকে গুরুর আসনে বসিয়েছিল, আবার ভিক্টোরিয় যুগের শেষ রশ্মিটুকুও তখনো অস্তমিত হয়নি। য়েট্‌স ছিলেন হেনলে ও মরিসের ভক্ত। শেলী এবং সম্ভবত টেনিসনের কাছেও তাঁর ঋণ প্রচুর। তথাপি টেনিসন ও ব্রাউনিং-এর পর ইংরেজিভাষী কবি হিসেবে তিনি মহত্তম, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় কেলটিক উপকথার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ইংল্যাণ্ডের কাব্য জগতে য়েট্‌সের বিশেষ প্রভাব ছিল।

প্রথম জীবনে তরুণ য়েট্‌সকে আমরা দেখতে পাই স্বপ্ন কল্পনার নির্জন বেলাভূমিতে কল্পনার বর্ণ দীপ্ত ঐশ্বর্য আহরণ করছেন আর পরবর্তীকালে তিনিই অতীন্দ্রিয় রহস্যানুভূতিসর্বস্ব কবি হয়ে উঠেছিলেন। তথাপি তাঁকে একজন বাস্তবচেতনাসম্পন্ন কবি বলতে আমাদের বাধা নেই এবং তাঁর রোমান্টিক কবিচিত্তের আবেগের মধ্যে প্রচণ্ড বেগের (Dynamism) অভাব কখনো দেখা যায়নি। কবি য়েট্‌স আবিষ্টচিত্ত ও স্বপ্নতন্ময়, একথা যেমন সত্য, তেমনি তিনি তাঁর জন্মভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান রূপকার, একথাও কম সত্য নয়। তাঁর কাব্যে যেমন আছে স্বপ্নাচ্ছন্ন গোধূলি ধূসরতা, তেমনি আছে প্রখর বাস্তববোধ। এইখানে তিনি জার্মান কবি গ্যেটের সমগোত্র। গ্যেটের মতোই তাঁর রোমান্টিক কাব্যধারা তাঁর জীবনের রাজনৈতিক কর্ম ও চিন্তা দ্বারা কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, তাঁর রচনায় উপর রাজনীতির প্রভাবটা তাঁর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক চেতনার জাগরণে পরোক্ষভাবে অনেকখানি সহায়তা করে থাকবে। য়েট্‌সের রচনা একই সঙ্গে বিপুল ও বিচিত্র। কাব্য ও নাটক দুই-ই তিনি রচনা করেছেন। উগ্র জাতীয়তাবোধ সত্ত্বেও য়েটস-প্রতিভা আঞ্চলিক দোষে দুষ্ট নয়। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের বাণীকে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পেরেছেন। সেইজন্য নোবেল কমিটি তাঁকে নোবেল পুরস্কার দানে সম্মানিত করেছিলেন।

য়েটসের কবিচরিত গভীরভাবে অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, জীবনের পথে তিনি যেমন অগ্রসর হয়েছেন, যেমন তিনি নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। কবি তখনি চিত্ররূপময় স্বপ্নমন্থর জগৎ থেকে স্বচ্ছন্দে ফিরে তাকিয়েছেন। ক্রম-বর্ধমান কবি প্রজ্ঞার অভ্রান্ত ইঙ্গিতে তিনি 'কালের যাত্রাধ্বনি' অর্থাৎ নূতন কালের সঞ্চার শুনতে পেয়েছিলেন। মৃত্যুর দু'বছর আগে তিনি যে কবিতার সংকলন প্রকাশ করেন তার ভূমিকায় য়েট্‌স যে প্রশস্ততর, স্বচ্ছতর, কবিদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ই বলেছেন—'কল্পনা তাঁহার পক্ষে কেবল লীলার সামগ্রী নহে, কল্পনার আলোকে তিনি যাহা দেখাইয়াছেন, তাঁহার সত্যতাকে তিনি জীবনে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন।...কবি য়েট্‌সের সঙ্গে নিভৃতে যতবার আমার আলাপ হইয়াছে ততবার এই কথাই আমি অনুভব করিয়াছি।'

বস্তুগত ঐতিহ্য থেকে বিষয়গত ঐতিহ্যে উত্তরণের মধ্যেই এই মহান কবিপ্রতিভার সার্থকতম পরিণতি খুঁজে পাওয়া। আজীবন আত্মবিশ্বাসে অবিচল এবং এক অভিজাত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এই কবির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপে তেমন কবি আর কেউ নেই।

সুন ইয়াৎ সেন

(১৮৬৬—১৯২৫)

নব্য চীনের স্রষ্টা সুন ইয়াৎ সেন। চীনদেশের কোয়াংটুং প্রদেশে সিয়াংসান নামে ক্ষুদ্র শহরটির পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে এক দরিদ্র কৃষকের ঘরে ১৮৬৬ সনের ২রা নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন সুন ইয়াৎ সেন। ছেলেবেলায় তাঁর ডাক নাম ছিল সুন-ওয়েন; চীনের জনসাধারণের কাছে তিনি আজো আজো ঐ নামেই পরিচিত। সুন ছিলেন তাঁর পিতামাতার তিনটি সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর বাবা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং সুন নিজেকে সর্বদাই একজন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বলে গৌরব বোধ করতেন।

তেরো বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে সুন এলেন হাওয়াই দ্বীপের হনলুলু শহরে তাঁর অগ্রজের কাছে। ইনি বয়সে সুনের চেয়ে পনর বছর বড়ো ছিলেন ও হনলুলুতে ব্যবসা করতেন। সেখানে মিশনারীদের একটি স্কুলে সুন ভর্তি হলেন। পড়াশুনা করেন আর অবসর সময়ে তিনি তাঁর অগ্রজের দোকানে বসে তাঁর কাজে সহায়তা করেন। স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হতো ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে; গণিত, ইতিহাস ও বাইবেল এই তিনটি বিষয়ে সুন বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। বাইবেল ছিল তাঁর নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী আদব-কায়দা এত সুন্দরভাবে আয়ত্ত করলেন যা দেখে তাঁর অগ্রসর আশঙ্কা হল। পোশাকে-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে কনিষ্ঠের সাহেবিয়ানাটা তিনি আদৌ পছন্দ করলেন না, সমর্থনও করলেন না। তাই সতর বছর বয়সে হনলুলুর স্কুলে পড়া যখন তাঁর শেষ হলো, তাঁর অগ্রজ সুনকে আবার স্বদেশেই তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন।

সুন দেশে ফিরলেন শুধু একজন কৃতবিদ্য যুবক হিবাবে নয়, একজন পুরোদস্তর বিপ্লবী হয়ে! তাঁর দৈনন্দিন জীবনে চিরাচরিত প্রথার বিপরীত আচরণ দেখে তাঁর পরিজনবর্গ শঙ্কিত হলেন। তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, পারিবারিক উপাসনা পদ্ধতি মানতে চাইলেন না এবং পুরাতন কোনো লৌকিক আচারের প্রতি তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধার ভাব দেখা গেল না। গ্রামের সমাজজীবনে প্রচলিত কুসংস্কারগুলির তিনি তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন, চিত্রিত দেবালয়গুলিকে পরিহাস করতে লাগলেন, এমন কি একদিন কাষ্ঠনির্মিত একটি বিগ্রহের হাতের আঙুলগুলি ভেঙে দিলেন। সমস্ত গ্রাম শঙ্কিত হয়ে উঠল তাঁর এই কালাপাহাড়ি আচরণে। তিনি নির্বাসিত হলেন গ্রাম থেকে—কোয়াংটুং প্রদেশ থেকে।

সুন এলেন হংকং শহরে। এখানে তিনি কুইন্‌স্ কলেজে ভর্তি হন।

কিছুকাল পরে ঐ কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি হংকং মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন ও সেখান থেকে যথাকালে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে এক গ্রাম্য কৃষক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। ১৮৯২ সনে সুন চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন, কিন্তু এই পেশায় তিনি বেশি দিন লিপ্ত থাকতে পারেননি। যে সময় তিনি ডাক্তারি পড়েন ঐসময়ে তিনি গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতির কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন এবং তখন থেকেই কনফুসিয়াসের সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি—'The Earth, the Universe, belongs to everyone'—তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠতে থাকে। সমভাবাপন্ন কয়েকজন দুঃসাহসী তরুণকে নিয়ে তিনি একটি বৈপ্লবিক দলও গঠন করলেন। প্রথম বৈপ্লবিক প্রয়াসের একটি পরিকল্পনাও তিনি করেন; কিন্তু পরিকল্পনাটি জানাজানি হয়ে যায়, তাঁর সহকর্মিগণ ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সুন পলায়ন করে তাঁর জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু তখন থেকেই বিদ্রোহ হয়ে উঠল তাঁর জীবনব্রত। তখন থেকেই তাঁর মনে এই ধারণা দৃঢ় হলো যে, প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা সমূলে উচ্ছেদ না হলে চীনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

প্রথম চেষ্টা বিফল হয়। ফলে সুনকে বাধ্য হয়ে দেশ দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতে হয়। দীর্ঘকালের জন্য এই সময় তাঁকে চীনের বাইরে থাকতে হয়েছিল এবং বিদেশ থেকেই তিনি দেশের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হাওয়াই, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় গিয়ে তিনি তাঁর ঈপ্সিত কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে থাকেন। রাজতন্ত্রের সমূলে উচ্ছেদ সাধনের চিন্তা ভিন্ন তখন অন্য কোন চিন্তাই তাঁর মনে স্থান পায়নি। প্রথমে তিনি গেলেন জাপানে, তারপর আমেরিকায়। শেষে লণ্ডনে রাস্তায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে বারো দিন চীন-দূতাবাসে আটক রাখা হয়। কিন্তু তাঁর বন্ধু ডাক্তার জেমস ক্যান্টলির সাহায্যে তিনি য়ুরোপ পালিয়ে যান। সেখানে দেশে দেশে ঘুরে সেখানকার শাসন প্রণালী, অর্থনীতি, শিক্ষা ও জনজাগরণের ব্যবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকেন। মাঞ্চু সরকার তখন তাঁর মাথার দাম ধার্য করেছে একলক্ষ পাউণ্ড।

১৮৯৮। চীনের নির্বাসিত নেতা ডাক্তার সুন ইয়াৎ সেন নামটি তখন চীনের বাইরে বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরিচিত হয়ে উঠেছে। তখন থেকেই তিনি তাঁর বৈপ্লবিক কর্মসূচীর তিনটি মূল নীতি প্রচার করতে শুরু করেন—প্রথম জাতিগত একতা, দ্বিতীয় গণতন্ত্র স্থাপন এবং তৃতীয় হলো সমাজের সকলকে সমান অধিকার দান। তাঁর এই মতবাদ 'সান-মিন-চুই' এই নামে পরিচিত হয় এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে, এই বৈপ্লবিক মতবাদ অনুসরণ করলে চীনদেশ আবার জগৎ সমাজে তার নিজের আসন ফিরে পাবে। দেশ-দেশান্তরে তিনি যখন পলাতকের জীবন অতিবাহিত করছিলেন, এবং বিপদ যখন সর্বদাই এই নির্বাসিত বিপ্লবীকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছিল, সেই সময় তাঁর এক বিদেশী বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ডাক্তার সুন ইয়াৎ সেন এইভাবে থাকতে আপনার মনে ভয়ের উদ্রেক হয় না?' উত্তরে সুন বলেছিলেন, 'ভয় কথাটির মানে আমি জানি না।'

নির্বাসিত নেতার অবিশ্রান্ত প্রচার কার্যের ফলে চীনে ক্রমশ গণচেতনা দানা বাঁধতে থাকে। এই গণচেতনা তাদের মনে জাগিয়ে দিয়ে, বিদেশ থেকেই সুন আসন্ন বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘকালের পলাতক জীবন বৃথা হয়নি।

১৯০৫। টোকিওতে চীনা বিদ্রোহীদের এক বিরাট সভা হয়। এই সভাতেই 'চায়নীজ্ রিভোলিউশনারি লীগ' সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। অতঃপর সুন বিদেশ থেকে লীগের মাধ্যমেই তাঁর বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস পরিচালিত করেন। চীনের গণজাগরণের ইতিহাসে এই লীগের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ করে চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চীনের প্রত্যেক প্রদেশ থেকে বিদ্রোহীরা এসে এই সভায় যোগ দেয় আর বিদ্রোহকে সফল করে তোলার জন্য প্রবাসী চীনা ব্যবসায়ীরা দেয় প্রচুর টাকা। এই সাহায্য না পেলে চীনে বিদ্রোহ সফল হতো কিনা বলা যায় না। একবার নয়, সুন দশবার চেষ্টা করেছিলেন শেষ আঘাত হেনে 'রিপাবলিক' ঘোষণা করতে এবং এই দশবারই তিনি ব্যর্থকাম হন।

১৯১১। সেপ্টেম্বর মাস। সুন ইয়াৎ সেন তখন অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় আমেরিকা সফর করছেন। একদিন সংবাদপত্রের একটি শিরোনামার প্রতি আচম্বিতে তাঁর দৃষ্টিনিবদ্ধ হলো—'বিপ্লবীরা উচাং শহর দখল করেছে।' ঐসঙ্গে তিনি আরো জানতে পারলেন যে, তাঁর একজন বিশেষ সমর্থক চিয়াং কাইশেক বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছেন এবং তিনি সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লব পরিচালনা করছেন। দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে বিদ্রোহের আগুন জলে ওঠে। একশত দিনের মধ্যে বিপ্লব সফল হয় ও মাঞ্চুবংশের পতন ঘটে। আমেরিকায় থাকতেই সুন সংবাদ পেলেন যে চীনে নূতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তিনিই তার প্রথম সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। ১৯১২ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। অতঃপর নানকিনে যে ন্যাশনাল কনভেনশন হয়, সেইখানে ডাক্তার সান ইয়াৎ সেন প্রথম সভাপতিরূপে শপথ গ্রহণ করেন। ১২ই ফেব্রুআরি রাজবংশের পক্ষ থেকে সিংহাসন ত্যাগের ঘোষণা প্রচারিত হলো এবং ঐদিন থেকেই চীনদেশে রাজতন্ত্রী সরকারের পরিবর্তে প্রজতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু সুন ইয়াৎ সেনের ভাগ্যে বিধাতা সুখ লেখেননি। নূতন প্রজাতন্ত্রের বনিয়াদ ছিল খুবই শিথিল। প্রকৃত প্রজাতন্ত্রী মনোভাব তখনো পর্যন্ত সমগ্র জাতির মধ্যে জাগ্রত হয়নি—তা সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র মুষ্টিমেয় ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে যারা ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আর ছিল ব্যবসায়ীদের মধ্যে—এরাই ছিল চীনের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ। বিপ্লবের সাফল্যের পিছনে ছিল মাঞ্চু-বিরোধী তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দল, যথা—বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের নিয়ে গঠিত কুয়োমিনটাং যাঁরা বামপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন; এঁদের লক্ষ্য ছিল অস্পষ্ট

সমাজতন্ত্রবাদের দিকে। দ্বিতীয় দলটি 'উদারনৈতিক' বা 'লিবারেল' বলে পরিচিত ছিল ; এই দলের লক্ষ্য ছিল আমেরিকান ধাঁচের গণতন্ত্র, আর তৃতীয় দলটি 'ন্যাশনালিষ্ট' বা জাতীয়তাবাদী দল নামে পরিচিত ছিল ; এঁদের লক্ষ্য ছিল মাঞ্চুদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করা। তবে এই তিনটি দলই সুন ইয়াৎ সেনের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই এই তিনটি দলের মধ্যে আস্তে হয় ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করার পরই সুন উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর রাষ্ট্রপতিত্বের অধীনে সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা একরকম অসম্ভব। অবশ্য শাসক হিসাবে তাঁর তেমন দক্ষতাও ছিল না। তিনি বুঝলেন যে, এই নবজাত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে এমন একজন সভাপতি দরকার যাঁকে সবাই চেনে ও বিশ্বাস করে। তিনি উদারনৈতিক দলের নেতা ও বিখ্যাত-সমাজ-সংস্কারক ইউয়ান সিকাইয়ের সপক্ষে পদত্যাগ করলেন।

শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর ইউয়ান হয়ে উঠলেন একজন পুরোদস্তুর ডিক্টেটর, ডেমোক্র্যাট নন। এর পরবর্তী অধ্যায় হলো ১৯১৩ সনের নানকিন বিদ্রোহ। এক বছর পরে সুন ও ইউয়ান উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করলেন এবং নানকিনে একটি যুদ্ধে পরাজয়ের পর সুন ইয়াৎ সেন জাপানে এসে পলাতক-জীবন যাপন করতে থাকেন। তাঁর জীবনের চাকা আবার ঘুরে গেল। অকৃতকার্যতা থেকে সাফল্যলাভ এবং আবার অকৃতকার্যতা—এইভাবেই দুঃখময় একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো এই দেশপ্রেমিকের জীবনে। ১৯১৫ সালে ইউয়ান সিকাই নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং এর অল্পকাল পরই তাঁর মৃত্যু হয়। অতঃপর চীনের যে ইতিহাস, সে ইতিহাস হলো রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের ইতিহাস। চীন যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই ফিরে গেল।

সুন ইয়াৎ সেন তাঁর জীবনের অবশিষ্ট দশ বৎসরকাল জাতির হৃত স্বাধীনতা অর্জনে প্রয়াসী হন। তিনি চিরআশাবাদী, চিরসংগ্রামী। তাই চীনের শেষ দশ বছর তিনি এই মহৎ কর্মেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সমান উৎসাহের সঙ্গে। জীবনের প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল চীনদেশে সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য কাজ করে, ১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ পিকিং-এ ডাক্তার ওয়েলিংটন কু-র আবাসে উনষাট বছর বয়সে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে চীনের প্রিয় নেতা সুন ইয়াৎ সেনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর মুখে শেষবারের মতো শোনা গিয়েছিল চীনের জনগণের স্বাধীনতা ও ঐক্যের কথা।

রোমাঁ রোলাঁ

(১৮৬৬-১৯৪৫)

ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁর মধ্যে আমরা একটি বহুমুখী প্রতিভার সমন্বিত রূপ দেখতে পাই। একালে য়ুরোপের স্বল্পসংখ্যক যে কয়জন চিন্তানায়ক বিশ্ব-মানবের সমস্যা সমাধানের কথা বৃহত্তর আধ্যাত্মিক পটভূমি থেকে বিচার করেছেন ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রচার করেছেন রোলাঁ তাঁদের অন্যতম। আরো একটি বিশেষ পরিচয় আছে তাঁর। এই শতকে যেসব পাশ্চাত্য মনীষী ভারতবর্ষের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত করেছেন ও ভারত-সংস্কৃতির সশ্রদ্ধ ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন রোলাঁ তাঁদের অগ্রপথিক। ম্যাক্সমুলারের পর তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভারতব্যাখ্যাতা। একই ব্যক্তিসত্তার মধ্যে শিল্প, নাট্যশাস্ত্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, কাব্য প্রতিভা ও দর্শন শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি সত্যিই প্রকৃতির একটি অপূর্ব রচনা। আবার রোলাঁর প্রতিভা-বলয়ের মধ্যে সঙ্গীত এক বিপুল স্থান জুড়ে রয়েছে। তাঁর জীবনে সঙ্গীতকলা এক গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে।

মধ্য ফ্রান্সের ক্লেমেসিঁতে রোলাঁর জন্ম হয় ১৮৬৬ সালের ২৯শে জানুআরি। ফরাসী সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পের ঐতিহ্যমণ্ডিত এক বিদগ্ধ মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। প্যারিস ও রোমে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। রোলাঁর জীবনে তাঁর মায়ের অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই বিদুষী মহিলা খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন আর গান জানতেন। মায়ের প্রভাবে অতি অল্প বয়সেই তিনি উচ্চাঙ্গ ফরাসী সংগীত আয়ত্ত করেন। তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই রোলাঁ পিয়ানোবাদন অভ্যাস করেছিলেন। একজন ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন—ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য তিনি মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে 'সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালের য়ুরোপীয় সংগীত শাস্ত্রের ইতিহাস' রচনা করেছিলেন। পাঠ্যজীবন সাঙ্গ করে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসঞ্চয়নের জন্য রোলাঁ ইতালী ভ্রমণে যান। রোমে এক রুচিমতী বর্ষিয়সী জার্মান মহিলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটল। এঁরই সংস্পর্শে এসে রোলাঁ জার্মান সংগীত ও সাংস্কৃতির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলেন। অতঃপর রোলাঁকে আমরা দেখতে পাই সোরবর্ণের সংগীত-শাস্ত্রের ইতিহাসের একজন বিদগ্ধ অধ্যাপকরূপে।

যৌবনকালেই রোলাঁর মনে এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল যে, তিনি কোন পথ বেছে নেবেন—সংগীতশিল্পীর, না সাহিত্যিকের। তাঁর মানসজীবনে বহু ও বিচিত্র দ্বন্দ্বের মধ্যে এটাও ছিল একটি লক্ষণীয় দ্বন্দ্ব। আজন্ম সংগীতপ্রেমী রোলাঁর অন্তর ছিল সংগীতরসে পরিস্নাত। উপন্যাস, নাটক ও বিবিধ চিন্তাশীল প্রবন্ধ

রচনায় আত্মনিয়োগ করলেও, তিনি যে বিপুল প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, তা ঔপন্যাসিক হিসাবে যতখানি না হোক তার চেয়ে বেশি বোধ হয় একজন সংগীত বিজ্ঞানী, সংগীতচিন্তক, সংগীতিকদের জীবনীকার, সংগীত সমালোচক ও সংগীত সাহিত্যিকরূপে। যেদিন তিনি জার্মানীর বিপ্লবী সুরকার বিটোফেনের জীবনচরিত ('বিটোফেন দি ক্রিয়েটর') য়ুরোপের বিদগ্ধ সমাজকে উপহার দিলেন, সেইদিনই তাঁর খ্যাতির আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংগ্রামী বিটোফেন থেকে সংগ্রামী রোল্যাঁ পেয়েছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ পথের প্রত্যক্ষ নির্দেশ। পঞ্চদশ শতকের বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্রকর মিথায়েল এঞ্জেলোর একটি জীবনচরিতও লিখেছিলেন। সংগীত সম্পর্কে অজস্র গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখে তিনি সংগীত সমালোচক হিসাবে যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন, সমসাময়িক ফরাসী সাহিত্যে তার তুলনা নেই।

দীর্ঘকাল যাবৎ সংগীতের আলোচনা ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকার পর রোল্যাঁ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'জ্যাঁ ক্রিস্তফ' রচনা করেন। 'জ্যাঁ ক্রিস্তফ'-এর রচনাকাল-১৯০৪-এ শুরু, আর গ্রন্থ শেষ হয় ১৯১২ সনে। দশ খণ্ডে প্রকাশিত এই বিরাট উপন্যাসই তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। ফ্রান্স ও জার্মানীর পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যাটি সমাধানের জন্য এই উপন্যাসের নায়করূপে রোল্যাঁ উপস্থাপিত করেছেন এক জার্মান সুরকারকে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত সার্থক হতে পারেনি। তথাপি এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, একজন প্রতিভাবান সংগীতশিল্পীর মানস বিকাশের ইতিহাস হিসাবে 'জ্যাঁ ক্রিস্তফ' এই শতাব্দীর একটি অসামান্য উপন্যাস এবং কোনো কোনো সমালোচকের মতে এটি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনার জন্যই রোল্যাঁ ১৯১৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই উপন্যাসে তিনি সংগীত-বিষয়ক বহু বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন যা বিশ্বের সংগীত-প্রেমিকদের কাছে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর জীবনব্যাপী সাংগীতিক চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি ছত্রে। পাঠকচিত্তে এর আবেদন এই জন্যই।

কিন্তু যেজন্য তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি তা ঔপন্যাসিক হিসাবে নয়, সংগীত-সমালোচক হিসাবেও নয়; তা হলো এই যুগের সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতি তাঁর আন্তরিক ঘৃণাবোধ। জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে বিরোধ তিনি মানবতা ও মৈত্রীর পরিপন্থী বলেই মনে করতেন এবং সেই কারণেই তিনি যুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকেই আসে যুদ্ধ যা সাম্রাজ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সেদিন ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ আর য়ুরোপে রোম্যাঁ রোল্যাঁ—এই শতাব্দীতে এই দুইজন মনীষী ছিলেন এই আদর্শে স্থির বিশ্বাসী। য়ুরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধল। রোল্যাঁ ও তাঁর মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী বন্ধুরা যখন এই প্রলয়ঙ্কর ঘটনা নিরোধ করতে পারলেন না, তখন তিনি কিন্তু হতাশায় হাল ছেড়ে দেননি। সহস্র বিপদের ঝুঁকি মাথায়

নিয়েও তিনি যুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত প্রচার কার্য চালিয়েছেন। সংঘবদ্ধ বর্বরতার বিরুদ্ধে তিনি একাকীই সংগ্রাম চালিয়েছেন। তাঁকে এজন্য শীঘ্রই দেশ ছেড়ে সুইজারল্যাণ্ড নির্বাসিত হতে হয়েছিল। এই সময়েই তিনি 'র‍্যাবাউট দি ওয়ার' নামে একটি নাতিদীর্ঘ পুস্তক রচনা করে য়ুরোপের বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানালেন যুদ্ধের বিরোধিতা করতে। অল্প লোকেই তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল ; তবে এই ব্যাপারে দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেল ও বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সমর্থন তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর রোলাঁ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের স্বাক্ষরযুক্ত যে বিখ্যাত ইস্তাহারটি প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রনাথ তাতে স্বাক্ষর প্রদান করেছিলেন সানন্দে। এই ইস্তাহারটি বিশ্বমানবিকতার ইতিহাসে রোলাঁর এইটি শ্রেষ্ঠ দলিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে য়ুরোপে ফ্যাসিবাদ যখন তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, তখনও রোলাঁ নীরব ছিলেন না। য়ুরোপে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ের পর থেকেই তিনি এর ধ্বংসের জন্য সর্বদেশের মানুষকে আহ্বান জানান। তাঁর এই সময়কার চিন্তা-ভাবনা লিপিবদ্ধ আছে 'শিল্পীর নবজন্ম' (I will not Rest') নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে। ১৯৩৪ সনে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি ফ্যাসিবাদের চরম অত্যাচারকে যে ভাষায় পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেন, তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রোলাঁর বলিষ্ঠ লেখনী সেদিনের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত য়ুরোপে বুদ্ধিজীবীদের মনে যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তা য়ুরোপের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এইবার ভারতপ্রেমিক রোঁমা রোলাঁর কথা। ম্যাক্সমুলারের সময় থেকে আজ পর্যন্ত স্বল্পসংখ্যক যে কয়েকজন য়ুরোপীয় মনীষী ভারতের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রোমাঁ রোলাঁর একটি স্থান আছে। তাই ভারত-ব্যাখ্যাতা এই ফরাসী মনীষীকে আমাদের ভালো করে জানা দরকার। প্রথম জীবনে তিনি যেমন বিঠোফেন, মাইকেল এঞ্জেলো ও মিখায়েল তলস্টয়ের জীবনচরিত রচনা করেছিলেন, তেমনি পরবর্তীকালে তিনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও গান্ধীর জীবনচরিত রচনা করে তাঁর অশেষ ভারতপ্রীতির পরিচয় রেখে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পেরেছিলেন এবং এই দুই ভারত-সন্তানের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের ফলেই ভারত সম্পর্কে তাঁর মনে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মধ্যস্থলে বসে যাঁরা বৃহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে বীণাবাদন করেছিলেন, মহামতি রোলাঁ তাঁদের অন্যতম। জ্ঞান ও অনুভূতির মাধ্যমে তিনি ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতিকে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মতোই রোলাঁ ভারতীয় সাংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যস্থলে অবগাহন করে সেই আনন্দরাজ্যে মিলে মিশে এক হয়ে যেতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর আত্মিক সম্পর্ক ভারত তথা বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসে একটি তাৎপর্যমূলক অধ্যায়। ১৯২৯ সনে প্যারিসে যদিও কবির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তার অনেক আগেই দুই মনীষীর মধ্যে পত্র বিনিময় হয়েছিল। ১৯২৬ সনে রোলাঁর জীবনের ষাট বৎসর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে কবি-বিরচিত রোলাঁ প্রশস্তির এই কয়টি পঙক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য—প্রাণশক্তিকে পরিহার করাতে এই যন্ত্রবদ্ধ জড়শক্তির দোহাই দিয়া আজিকার দিনে ভয়াবহ অত্যাচার ও অবিচার করা সহজসাধ্য হইয়াছে,—কারণ জড়শক্তি অন্ধ সকল বিচার-বিবেচনাকে পদদলিত করিয়া আপন উদ্দেশ্য-সাধনে দ্বিধাহীন নির্মম গতিতে অগ্রসর হয়। যে ধর্ম প্রেম ও করুণায় কমনীয় সেই ধর্মের নামে কী কদর্য রক্তলোলুপ ধর্মতন্ত্র গড়িয়া উঠে আমরা তাহা দেখিয়াছি।' রোলাঁর চক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'পাশ্চাত্যভূখণ্ডে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রদূত' হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

শুধু আধ্যাত্মিক মহিমাই যে ভারতবর্ষের দিকে রোলাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা নয়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হাত থেকে সুদীর্ঘকালব্যাপী ভারতবাসীর মুক্তি আন্দোলন তাঁর সংবেদনশীল চিন্তায় এমন এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ভারতের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি নিজের বলেই মনে করতেন। পৃথিবীর যেখানেই তিনি স্বাধীনতার বার্তা শুনেছেন, সেখানেই রোলাঁ পাঠিয়ে দিয়েছেন অভিনন্দনবাণী। সাম্রাজ্যবাদীকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। তাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, নাৎসিজম্ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখা সেদিন সমগ্র য়ুরোপে এনে দিয়াছিল তুমুল আলোড়ন। গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে সেই সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে রোলাঁ ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের কাছে জুগিয়েছেন আশা, আশ্বাস ও প্রেরণার বাণী। সেদিন একান্তভাবে তিনি সত্যিই ভারতবাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এজন্য পাশ্চাত্যের কাছে, বিশেষ করে নিজের দেশ ফ্রান্সের কাছেই রোলাঁকে কম নিন্দাভোগ করতে হয়নি। ভারতবাসী মাত্রেই শুধু এই কারণে এই মানুষটির কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।

মনীষী রোমাঁ রোলাঁর একটিমাত্র পরিচয়ই আছে—তিনি বিশ্ব-মানবতাবাদী, শান্তিবাদী ও অহিংসাবাদী। তলস্টয়ের মন্ত্রশিষ্য রোলাঁ বিশ্বমানবকল্যাণের বেদীমূলে তাঁর ভাস্বর জীবন, তাঁর দেদীপ্যমান প্রতিভা সবই উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর যুদ্ধবিরোধী সংগ্রামশীল জীবন বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের মনে দিয়েছে আশার অমোঘ বাণী। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বপ্রেমের পতাকা ঊর্ধ্বে উড্ডীন রাখার জন্য, স্বীয় আদর্শের জন্য, তাঁকে যে লাঞ্ছনাময় একক জীবন যাপন করতে হয়েছে ইতিহাসে তার তুলনা দুর্লভ। রোলাঁর কণ্ঠ আজ নীরব, কিন্তু তাঁর অগ্নিগর্ভ বাণী যুগে যুগে বিপ্লবের যোদ্ধাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকবে। তেমনি ধ্বনিত হতে থাকবে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত শান্তির ললিত বাণী।

মেরি কুরী

(১৮৬৭-১৯৩৪)

যাঁর যুগান্তকারী আবিষ্ক্রিয়া বিংশশতকের মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করেছে, বিজ্ঞানের সেই তপঃসাধিকার নাম মেরি কুরী বা মাদাম কুরী। তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে আরেকজন বিজ্ঞান-সাধকের নাম। তিনি তাঁরই স্বামী পিরি কুরী। এই কৃতবিদ্য দম্পতির জীবনব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলেই আবিষ্কৃত হয়েছিল বা রেডিয়াম যা মানুষের দৃষ্টিপথে আজ এনে দিয়েছে এক নূতন জগতকে। আধি ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এক অপরিমেয় শক্তিশালী অস্ত্র এঁরা পৃথিবীর মানুষের হাতে তুলে দিয়ে যে অমরত্ব অর্জন করেছেন তা দুর্লভ।

১৮৫৯ সনের ১৫ই নভেম্বর প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন পিরি কুরী। এই কুরী পরিবারটি ছিলেন পোটেসট্যান্ট য্যালসেসিয়ান এবং বিজ্ঞান চর্চায় প্রগতিশীল। তাঁর পিতা ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ও যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে কয়েকখানি গ্রন্থের প্রণেতা। প্যারিসের ন্যাচারাল হিস্ট্রির মিউজিয়মের তিনি একজন গবেষকও ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র, জ্যাকুস ও পিয়ারে, বিজ্ঞানে দু'জনেই কৃতবিদ্য ছিলেন, তবে তার দ্বিতীয় পুত্র পিয়ারে সম্পর্কেই পিতা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পোষণ করতেন। তাকে কোনো স্কুলে না দিয়ে, পিতা স্বয়ং তার শৈশবশিক্ষার তত্ত্বাবধান করেন। সতেরো বছর বয়সে পিরি কুরী বিজ্ঞানে স্নাতক হন এবং আঠার বছর বয়সে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রীলাভ করেন এবং সোরবর্ণের ল্যাবোরেটরীতে সহকারী গবেষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার কৃতিত্ব ও সফলতা দেখে সোরবর্ণের অনেক বর্ষীয়ান অধ্যাপক চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর প্রতিভার দানে বিজ্ঞান যে সমৃদ্ধ হবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণীও অনেকে সেদিন করেছিলেন। এইখানেই গবেষণাকার্যে নিযুক্ত থাকার সময়ে পিয়ারে কুরী যে বিদুষী পোলিশ তরুণীর সংস্পর্শে আসেন এবং অবশেষে যাঁকে বিবাহ করেন, তাঁরই নাম মারিয়া স্লোদোভস্কা (Marya-Sklodovska)। পরবর্তীকালে ইনিই মাদাম কুরী—এই নামে পরিচিত হন।

১৮৬৭, 'নভেম্বর, পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশতে মারিয়ার জন্ম হয়। মারিয়ার পিতা ছিলেন ওয়ারশ উচ্চ বিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক আর মা ছিলেন একজন প্রতিভাশালিনী পিয়ানোবাদিকা এবং একটি বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা। মারিয়া ছিলেন তাঁদের সর্বকনিষ্ঠ ও সবচেয়ে আদরের সন্তান। তখন পোল্যাণ্ড জার-শাসিত রাশিয়ার একটি অংশ ছিল।

মেরির ছাত্রজীবন খুব দেদীপ্যমান ছিল। বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন আদর্শ

ছাত্রী। গোপনে গোপনে তখন থেকেই তাঁর মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব ফুটে উঠেছিল। স্কুলে পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি লাভ করেছিলেন বহু পুরস্কার ও পদক।

১৮৯৩। মেরির বয়স তখন ছাব্বিশ বছর। তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন এবং কয়েক মাস পরে গণিতেও এম. এ. ডিগ্রী লাভ করলেন। গণিতে তাঁর স্থান ছিল দ্বিতীয়। সোরবর্ণের তিনিই প্রথম মহিলা ছাত্রী যিনি এই রকম কৃতিত্বের সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রীলাভ করেন। এই কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি ছয়শত রুবলের একটি স্কলারশিপ লাভ করলেন। সেই কৃচ্ছ্রসাধনার দিনে এ যেন তাঁর কাছে এক বিরাট সম্পদ বলে গণ্য হয়েছিল। যখন এইভাবে তিনি তাঁর লক্ষ্য সাধনে নিমগ্ন ছিলেন এবং যখন তাঁর জীবনের ত্রিসীমানার মধ্যে রোমান্সের লেশমাত্র ছিল না, সেই সময়েই তাঁর সঙ্গে পিরি কুরীর সাক্ষাৎ হয়। পিরি কুরী তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতিমান লেকচারার। যখন বিবাহের প্রস্তাব এলো, মেরি এই বলে তা প্রত্যাখান করেছিলেন না তিনি কখনই একজন ফরাসীকে বিয়ে করবেন না, কারণ তা করলে তাঁকে চিরদিনের মতো তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং তাঁর জন্মভূমিকে পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু এই বিদুষী তরুণীর প্রতিভা, সৌন্দর্য ও তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্যে অধ্যাপক ক্যুরী এমনই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর ভাবী-পত্নীর মত পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে উভয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন মেরির বয়স আটাশ আর পিরি কুরীর বয়স ছত্রিশ বছর।

তাঁদের এই মিলন অত্যন্ত সুখের হয়েছিল। এ যেন বিধাতা পুরুষেরই নির্বন্ধ ছিল তাঁরা দু'জনেই ছিলেন এক আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং বিজ্ঞানের গবেষণায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। দু'বছর পরে তাঁদের প্রথম সন্তান, আইরিন, ভূমিষ্ঠ হয়। আইরিন শুধু তাঁর মায়ের রূপলাবণ্যের অধিকারিণী ছিলেন না, উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি তাঁর পিতা-মাতার বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও লাভ করেছিলেন এবং উত্তরকালে তিনিও তাঁর মায়ের মতো নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। যে বছরে কুরী-দম্পতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ঐ ১৮৯৫ সালটি বিজ্ঞান জগতে স্মরণীয় হয়ে আছে রঞ্জন রশ্মি বা X-ray আবিষ্কারের জন্য। এরপর রন্‌জেনের আবিষ্কারকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন হেনরি বেকেরল। তিনি এক নূতন অদৃশ্য রশ্মির সন্ধান পেয়েছিলেন। বেকেরলের এই আবিষ্কার কুরী দম্পতীকে যারপর নাই উত্তেজিত করল। পিরি তখন তাঁর অন্যান্য গবেষণার বিষয় পরিত্যাগ করে মেরির কাজে সহযোগিতা করতে উদ্যত হলেন।

গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে কুরী-দম্পতী যাবতীয় অবিমিশ্র রাসায়নিক পদার্থ এবং যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ একের পর এক পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ইউরেনিয়ামই একমাত্র পদার্থ নয় যার রশ্মি বিকীরণ করার ক্ষমতা আছে।

এমন ক্ষমতা থোরিয়ামের আছে এবং আরো অনেক পদার্থেরই আছে। আলেয়াসদৃশ এই বিকীরণের রহস্যভেদ করা ভিন্ন তখন তাঁদের অন্য কোনো চিন্তাই ছিল না। পরিশ্রমসাধ্য এই কাজ করতে গিলে মেরির স্বাস্থ্যের উপরে তখন বেশ চাপ পড়েছিল। ধাপে ধাপে তিনি অগ্রসর হতে থাকেন। শেষের ধাপটি ছিল বিরাট। ইলরেনিয়াম ও থোরিয়ামের আবিষ্কৃত হলো রশ্মি বিকীরণকারী আরো একটি শক্তিশালী যৌগিক পদার্থ। স্বীয় জন্মভূমির নামানুসারে মাদাম কুরী তার নাম রাখলেন পোলোনিয়াম। প্রাচীনকালে পোল্যাণ্ডের নাম ছিল পোলোনিয়া। ঠিক একজন দিন মজুরের মতো পরিশ্রম করে, ঘরকন্নার কাজ করে, শিশুকন্যার (তখন তাঁর প্রথমা কন্যা আইরিনের জন্ম হয়েছে) পরিচর্যা করে, তিনি তাঁর গবেষণার কাজ চালাতেন। এইভাবে পোলোনিয়াম আবিষ্কারের ছয় মাস পরেই একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে তাঁরা ইতিপূর্বে অপরিজ্ঞাত রশ্মিবিকীরণকারী আর একটি নূতন পদার্থের কথা ঘোষণা করলেন ; বললেন, 'Various reasons lead us to believe that new radioactive substance contains a new element to which we propose to give the name radium.' এই ঘোষণার দেড় মাস পরে, বিংশ শতকের সূচনায় (১৯০২) বিজ্ঞানের এই তপঃসাধিকা পৃথিবীর মানুষের হাতে তুলে দিলেন এককণা অর্থাৎ one decigram বিশুদ্ধ রেডিয়াম। এর তেজস্ক্রিয়ার ক্ষমতা ইউরেনিয়ামের চেয়ে শত লক্ষ গুণ বেশি ছিল। আবিষ্কারের জগতে এত বড়ো আবিষ্কার আর কখনো হয়নি।

রেডিয়াম আবিষ্কারের গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে অবধি ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ এই পাঁচ বৎসরকালের মধ্যে কুরী-দম্পতী ত্রিশটির অধিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯০২ সনে ফ্রান্সের বিজ্ঞান আকাদেমি তাঁদের বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার দিলেন ; প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় মেরিকে বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি দ্বারা সম্মানিত করলেন আর ১৯০৩ সনে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার হেনরী বেকেরেল ও কুরী-দম্পতির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। অশেষ সংগ্রাম ও সাধনার পর তাঁরা যেন গোলকুণ্ডার হীরকখানি আবিষ্কার করলেন, কারণ এক গ্রাম রেডিয়ামের দাম হলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার। ইচ্ছা করলে তাঁরা তাঁদের এই আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট নিয়ে বিত্তবান হতে পারতেন। কিন্তু তারা ছিলেন যথার্থ বিজ্ঞান-সাধক। 'Radium belongs to no person but to world'—এই কথা যখন তাঁরা ঘোষণা করলেন তখন পৃথিবীর বিজ্ঞানীসমাজ তাঁহার মহত্ত্ব দেখে যারপর নাই বিস্ময়বোধ করেছিলেন। মেরি কুরীর মহত্ত্ব ছিল আরো বেশি। ফরাসী সরকার যখন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানে (Legion of Honour) তাঁকে ভূষিত করতে চাইলেন তখন তিনি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

তবে সেই সঙ্গে তিনি সরকারকে একটি অনুরোধ জানালেন—'আমার একটি ভালো সুসজ্জিত ল্যাবরেটরির বড় প্রয়োজন।' রেডিয়াম আবিষ্কার ও নোবেল

পুরস্কার লাভের পর থেকেই অপরিচয়ের অন্ধকার ভেদ করে কুরী-দম্পতী এখন জগদ্বিখ্যাত হলেন। একজন ধনাঢ্য ফরাসী মহিলা তাঁদের কাজের জন্ত একটি মূল্যবান ল্যাবরেটরি নির্মাণ করিয়ে দেবেন বললেন। পিরি তখন সোরবর্ণের পদার্থবিত্তার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছেন এবং গবেষণার জন্ত তাঁকে এখন পূর্ণ সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো।

নোবেল প্রাইজলাভের অল্পকাল পরে, ১৯০৬ সনের ১৯শে এপ্রিল, তিনি তাঁর প্রকাশকের কাছে যাবার পথে রাস্তা পার হবার সময় অন্তমনস্কতাবশত ট্রামগাড়ী চাপা পড়ে মারা যান। স্বামীর এই শোচনীয় মৃত্যুর পর মাদাম কুরী তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছিলেন: 'Pierre is sleeping his last sleep, it is the end of everything, everything, everything,. তখন মাদাম কুরীর বয়স মাত্র চল্লিশ বছর যখন তাঁর জীবনে এই মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটেছিল। তারপর তিনি বেঁচেছিলেন দীর্ঘকাল—প্রায় আটাশ বছর। বিজ্ঞানের সাধিকা তিনি, অন্তরে আহিতাগ্নির মতো স্বামীর স্মৃতি চিরজাগ্রত রেখে তিনি বিজ্ঞানের গবেষণাতেই তাঁর জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর এবং পিরি কুরীর সম্মানে য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে এবং তাঁর জন্মভূমি ওয়ারশোতে রেডিয়াম ইনষ্টিট্যুট স্থাপিত হয়। প্যারিস বিশ্ববিত্তালয় তাঁকে তাঁর স্বামীর শূন্যস্থানে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা নিযুক্ত করেছিলেন—তিনিই ছিলেন এই বিশ্ববিত্তালয়ের প্রথম মহিলা অধ্যাপিকা। সেই থেকে অধ্যাপনা ও গবেষণা এই দুই কাজে আত্মনিয়োগ করে মাদাম কুরী প্রমাণ করেছিলেন যে 'Alone she was at least as great a scientist as her husband'. এই সময়ে আরো কয়েকটি মূল্যবান আবিষ্কারের জন্ত ১৯১১ সালে তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৪, ৪ঠা জুলাই, একটি স্যানাটোরিয়ামে স্বল্পকাল রোগভোগের পর এই বিশ্রুতকীর্তি বিজ্ঞান সাধিকার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

(১৮৬৯-১৯৪৮)

'My life is my message'—'আমার জীবনই আমার বাণী।' আত্মিক শক্তির দ্বারা রাজনীতিকে মণ্ডিত করে এবং সেই শক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদীর পশু-শক্তিকে পরাস্ত করে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন যাঁর জীবনের অতুলনীয় অবদান সেই কটিবাস পরিহিত, কৃশতনু মানুষটির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল এই কথা।

আজীবন সত্য ও অহিংসার পূজারী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর সমুদ্রতীরবর্তী একটি ছোট্ট শহর পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 'গান্ধী' কথাটির অর্থ 'বেনিয়া', কিন্তু গান্ধী-পরিবার বেশ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করতেন—সেই স্বাচ্ছন্দ্য ছিল বিলাসিতার কাছাকাছি।

গান্ধীজির আত্মচরিত (My Experiments with Truth) পাঠে জানা যায় যে, এক গোঁড়া ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর মা ছিলেন এক নিষ্ঠাবতী ও ধর্মপ্রাণা মহিলা এবং পূজা-অর্চনায় তাঁর ছিল অখণ্ড মনোযোগ। তাঁর শৈশব-জীবন সম্পর্কে গান্ধীজি লিখেছেন—'সাত বছর বয়স পর্যন্ত আমি পোরবন্দরে কাটিয়েছি; এইখানেই আমার লেখাপড়া শুরু হয়েছিল স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে, অঙ্ক আমার কাছে ভীতিপ্রদ বিষয় ছিল আর গুণ শিখেছিলাম অতি কষ্টে। তারপর আমাদের পরিবার পোরবন্দর পরিত্যাগ করে রাজকোটে চলে আসে। পিতৃদেব তখন এখানকার দরবারে দেওয়ান ছিলেন।'

তেরো বছর বয়সে গান্ধীর বিবাহ হয়। তাঁর জীবনসঙ্গিনীর নাম ছিল কস্তুরবা। স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী তিনি হয়েছিলেন। বিবাহের পর এক বছর পড়াশুনা বন্ধ ছিল। তারপর রাজকোটের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে আবার তিনি ভর্তি হন। যথাসময়ে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, ভাবনগরে শ্যামলদাস কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু সেখানকার জীবনের সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে পুনরায় পোরবন্দরে ফিরে আসেন। তখন তাঁদের পরিবারের একজন শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে গান্ধী বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে যান। ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বোম্বাই থেকে বিলাত যাত্রা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল উনিশ বছর।

বিলাতে তিনি সাদাসিধা ছাত্রজীবন যাপন করতেন। লাতিন ও ফরাসী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে তিনি ইংরেজী ও মার্কিন সাহিত্য পাঠ করতেন। আইন শাস্ত্রের সঙ্গে পদার্থবিদ্যাও অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রায় চার বছর বাদে, লণ্ডনে তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয় এবং ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। রাজকোটে তিনি আরম্ভ করেন আইনব্যবসায়, কিন্তু আশানুযায়ী

কৃতকার্যতা লাভ করতে পারলেন না। ঠিক সেই সময়ে পোরবন্দরের একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ এলো দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে তাদের একটি মোকদ্দমা পরিচালনা করবার জন্য। সেখানে তাঁদের একটি শাখা অফিস ছিল। মামলাটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সেই মামলাটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

১৮৯৩, এপ্রিল মাস। গান্ধীজির জীবনে একটি স্মরণীয় তারিখ। এক বছরের জন্য তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে তাঁর অবস্থানকাল ছিল বিশ বছরের বেশি। তাঁর জীবনে এই সুদীর্ঘ বিশ বছর ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। গান্ধীজি স্বয়ং তাঁর আত্মচরিতে দক্ষিণ আফ্রিকা জীবনের কাহিনী অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই কাহিনী পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, নাটালে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি অপমানজনক ঘটনার ফলে গান্ধীজির মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল রাজনৈতিক চেতনা। নাটালে এসে দেখলেন, এখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের কী ঘৃণার চক্ষেই না শ্বেতাঙ্গরা দেখে থাকেন; ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে ভারতীয়দের প্রতিপদে অপমানের সম্মুখীন হতে হয়—সে অপমান ছিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক দুই রকমই। নাটালে পৌঁছবার পরের দিন গান্ধী ডারবান গেলেন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলার শুনানীতে যোগদান করতে। তিনি কোট-প্যান্ট পরিহিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর মাথায় ছিল পাগড়ি। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর পাগড়ি খুলতে তাঁকে হুকুম করলেন। গান্ধী অপমানিত বোধ করে আদালত পরিত্যাগ করে চলে এলেন। কয়েকদিন বাদে প্রিটোরিয়া যাবার জন্য তিনি ট্রেনে উঠেছেন। অতি অপমানজনক ও বিপদসংকুল এই রেল ভ্রমণের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সামাজিক অবস্থা কী শোচনীয়। যদিও তিনি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন তথাপি কৃষ্ণাঙ্গ বলে তাঁকে জোর করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজরা গান্ধীকে 'কুলি' ব্যারিস্টার বলে অভিহিত করত।

যে মামলাটি নিয়ে তিনি এসেছিলেন, প্রিটোরিয়াতে সেটি কয়েকমাস ধরে চলতে থাকে। অবশেষে গান্ধী ব্যক্তিগত প্রয়াসে সুদীর্ঘ মামলাটি আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য তিনি ডারবান এলেন। এই সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে তিনি জানতে পারলেন যে, নাটাল সরকার ভারতীয়দের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছেন। এজন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মনে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে গান্ধী এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে ভারতে আসা স্থগিত রাখেন ও সাময়িক ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে যান।

সেখানে 'কালা আইনের' বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্যমণ্ডিত সত্যাগ্রহ সংগ্রাম তাঁকে ভারতবাসীর কাছে, বিশ্বের কাছে সেদিন বিশেষ ভাবেই পরিচিত করে তুলেছিল।

এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে আট মাসকাল কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

১৯১৫। সত্যাগ্রহের বিজয়তিলক ললাটে ধারণ করে, গান্ধীজি ভারতবর্ষে ফিরলেন একটি লক্ষ্য নিয়ে—'ব্রিটিশের অধীনতা পাশ থেকে তাঁর জন্মভূমিকে মুক্ত করা।' প্রথম একটি বছর তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত হলেন। তখন থেকেই পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর ওপর নিপতিত হয়। এদেশে তাঁর সত্যাগ্রহের প্রথম পরীক্ষা হয় বিহারের চম্পারণে। এখানে নীলচাষীদের ওপর অত্যাচার হত। এদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গান্ধীজি চম্পারণে এলেন। জমিদার ও কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও গান্ধী এখানে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ সংগ্রাম পরিচালনা করে জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

১৯১৯। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো। এই যুদ্ধে ভারতবাসী ধনবল ও জনবল দিয়ে শাসকজাতিকে সাহায্য করেছিল, স্বয়ং গান্ধীজি সৈন্যসংগ্রহের কাজে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু এর বিনিময়ে ভারতবাসীকে উপহার দেওয়া হলো রৌলট আইন। লোকে এর নাম দিল কালাকানুন। এই আইনের প্রতিবাদে সারা ভারতে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ ঘোষণার নির্দেশ দিলেন গান্ধী। হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে এই আইনের প্রতিবাদ করেছিল ৬ই এপ্রিল। বহু শহরে নিরস্ত্র জনতার ওপর পুলিশ ও মিলিটারি নির্বিচারে গুলি চালাল। পাঞ্জাবের অমৃতসর ও লাহোরেই সরকারী অত্যাচার চরমে উঠেছিল। ১৩ই এপ্রিল (বৈশাখের প্রথম দিনে) অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত প্রায় কুড়ি হাজার নিরস্ত্র জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালাবার হুকুম দিলেন জেনারেল ডায়ার। হতাহত হয় হাজার হাজার লোক। সমগ্র পাঞ্জাবে সেদিন সামরিক আইন জারি করা হয়েছিল।

এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশেই ১৯১৯ সালের বড়দিনে অমৃতসরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসেছিল। এই কংগ্রেসই ছিল প্রথম গান্ধী কংগ্রেস, অর্থাৎ এইসময় থেকে স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বই ছিল অবিসম্বাদিত। ১৯২১। এই বছরেই মহাত্মা গান্ধী আরম্ভ করেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। সেদিন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে যখন তাঁর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সেদিন গান্ধী দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—'যদি আমার আহ্বানে তোমরা সাড়া দাও, আমি প্রতিজ্ঞা করছি এক বছরের মধ্যেই তোমরা স্বরাজ লাভ করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠল আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ। এই মানুষটির আহ্বানে সকলে এসে সমবেত হলো কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার তলে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ঘোষিত হলো এক পরাধীন জাতির অহিংস সংগ্রাম। গান্ধীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে ছাত্রদল, আদালত বর্জন করেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবিগণ। বিলাতি বস্ত্রের স্থান নিল খদ্দর; চরকার গানে দেশ ভরে ওঠে। ইংরেজের

জেলখানা ভরে যায় রাজবন্দীতে। নেতারাও কারারুদ্ধ হলেন। গান্ধীজি চলে গেলেন সবরমতী জেলে ছয় বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করতে।

১৯২১ থেকে ১৯৪২—এই একুশ বছর গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে তাঁর নির্ভীক নেতৃত্ব দিয়ে জয়যুক্ত করে তুলেছিলেন। ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল তখন ব্রিটিশ রাজশক্তি আবার ভারতবাসীর সহযোগিতা চাইল। গান্ধীজি বললেন—'সহযোগিতা করতে রাজী আছি একটিমাত্র শর্তে—যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।' শাসকজাতি এতবড় উপনিবেশ বা সাম্রাজ্য হাতছাড়া করতে সম্মত হয় না। বিলাত থেকে এলো ক্রীপস দৌত্য গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে। সেই আলোচনা নিষ্ফল হয়। তখন সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে, মুক্তিকামী ভারতবাসীকে গান্ধীজি একটি পথের নির্দেশ দিলেন—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। আর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে বললেন—'ভারত ছাড়ো'। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন বসল বোম্বাইতে। একটি প্রস্তাবে বলা হলো, ভারতের দাবী মেনে না নিলে আবার নতুন করে শুরু হবে আইন অমান্য আন্দোলন। কিন্তু আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার আগেই রাত্রির অন্ধকারে গান্ধীজি প্রমুখ কংগ্রেসের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন ও তাঁদের সকলকে অজ্ঞাত স্থানে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়।

১৯৪৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘোষিত হলো। ১৫ই জুন কংগ্রেস নেতারা কারামুক্ত হলেন। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সিমলায় এক সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন। যুদ্ধশেষে বিলাতে তখন নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে শ্রমিক-দলের নেতৃত্বে। অবশেষে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার শেষে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সম্মত হয়। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় তারিখ। ঐদিন মধ্যরাত্রে ভারতবর্ষ তার ঈপ্সিত স্বাধীনতা লাভ করে। দিল্লীর লাল কেল্লায় ঐদিন মধ্যরাত্রে উঠল স্বাধীন ভারতের অশোকচক্র-লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা। পৃথিবীর মানচিত্রে জেগে উঠল নতুন ভারত—স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারত। স্বাধীনতা লাভের পর মহাত্মা গান্ধীজি জীবিত ছিলেন মাত্র পাঁচ মাস। ১৯৪৮সনে ৩০শে জানুআরি দিল্লীতে সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় যাওয়ার সময় এক আততায়ীর গুলিতে এই মহামানবের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। মুহূর্ত মধ্যে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এই দুঃসংবাদ—শোকের ছায়ায় আচ্ছন্ন হয় ভারত। সেদিন শোকার্ত জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বলেছিলেন—'আমাদের জীবন থেকে আলো নিভে গেছে, এখন চর্বত্র অন্ধকার বিরাজ করছে।'

নিকোলাই লেনিন

(১৮৭০-১৯২৪)

স্ফুলিঙ্গকে যিনি দাবানলে পরিণত করেছিলেন, পৃথিবীর আধুনিক কালের ইতিহাসে তিনিই লেনিন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ তাঁরই কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়েছিল। মহান অক্টোবর বিপ্লবের জনক তিনি। রুশ বিপ্লবের এই প্রাণপুরুষ আজ সশরীরে জীবিত নেই বটে, কিন্তু শোষিত, বঞ্চিত ও সর্বহারা মানুষের মধ্যে তি.ন আজ বেশি করে বেঁচে আছেন। লেনিনের জন্মকালে তাঁর স্বদেশের অবস্থা সকল দিক দিয়েই ছিল শোচনীয়। ১৮৭০, ১০ই এপ্রিল তারিখে ভল্‌গা নদীর তীরে সিম্বার্স্ক নামে ছোট্ট একটি শহরে তাঁর জন্ম হয়। একদা এই সিম্বার্স্ক ছিল বিপ্লবের পীঠস্থান। জন্মকালে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ। তাঁর পিতা ইলিয়া নিকোলোভিচ্ উলিয়ানভ ছিলেন একজন স্কুল মাষ্টার। পরে তিনি শিক্ষাবিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। মা মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা ছিলেন এক ধনী চিকিৎসকের কন্যা এবং তিনি তাঁর পিতার কিছু সম্পত্তিরও অধিকারিণী হয়েছিলেন। সেই সম্পত্তির আয় আর স্বামীর উপার্জন, এই দুইয়ে মিলিয়ে উলিয়ানভ পরিবারের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। ভাই-বোন মিলে তাঁরা ছিলেন ছয়জন এবং লেনিন ছিলেন তাঁর পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। শিক্ষা-দীক্ষায় অত্যন্ত সংস্কৃতিবান ছিল এই উলিয়ানভ পরিবারটি এবং তাঁদের প্রতিবেশীদের চেয়ে তাঁদের যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হতো। বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল ছিল এই পরিবারের প্রত্যেকটি বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান। এ ছাড়া শৈশবকাল থেকেই তাঁরা ভাইবোন সকলেই দেশকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন। দেশকে ভালোবাসা জারের রাশিয়ায় সবচেয়ে বড়ো অপরাধ বলে গণ্য হতো। সিম্বার্স্কের উচ্চ বিদ্যালয়ে লেনিনের লেখাপড়া শুরু হয়েছিল। এইখানে তিনি তাঁর অন্যতম সহপাঠিরূপে পেয়েছিলেন কেরেনস্কি নামে সমধর্মী এক ছাত্রকে। লেনিনের বয়স যখন ষোল বছর তখন উলিয়ানভ পরিবারে প্রথম বিপর্যয় দেখা দিল তাঁর পিতার মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে। দ্বিতীয় বিপর্যয় দেখা দিল ঠিক তার এক বছর পরেই তাঁর অগ্রজ, সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র আলেকজান্দারের ফাঁসীকে উপলক্ষ্য করে। ছাত্ররা একটি বিপ্লবগোষ্ঠী গঠন করেছিল। এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল আলেকজান্দার। উলিয়ানভ পরিবারে, বিশেষ করে লেনিনের জীবনে এই দ্বিতীয় বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। লেনিন বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন এবং সেই থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় তাঁর জীবনের গতিপথ।

এই ঘটনার পর থেকেই সমগ্র উলিয়ানভ পরিবারের উপর জারের পুলিশের বিষদৃষ্টি নিপতিত হলো। লেনিন কিন্তু দমলেন না এতটুকু, তিনি আরো গভীর-

ভাবে তাঁর পড়াশুনায় মনোনিবেশ করলেন এবং স্বর্ণপদক পেয়ে স্কুল থেকে স্নাতক হলেন। সিম্বার্স্ক ত্যাগ করে তাঁরা চলে এলেন কাজানে এবং লেনিন আইন পড়বার জন্য কাজানের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হলেন। কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একটা সামান্য অজুহাতে অন্যান্য আটত্রিশ জন ছাত্রের সঙ্গে তাঁকে বহিষ্কৃত করে দিলেন। এই ঘটনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি একাগ্রচিত্তে আইন অধ্যয়ন করতে থাকেন. এমনি ছিল তাঁর অদম্য মনোবল। তিন বছর পরে লেনিন অনুমতি পেলেন আইন-পরীক্ষা দেবার। পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন তিনি আইন পাশ করে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর বয়স একুশ বছর।

সেণ্ট পিটার্সবার্গেই লেনিন ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করলেন। যদিও তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতা এই ব্যবসায়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, তথাপি তাঁর জীবন-বিধাতা তাঁর জন্য বিপ্লবের পথই নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। মনে মনে তিনি গ্রহণ করেছেন দেশসেবার ব্রত। তখন তিনি কার্ল মার্কসের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং যে উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে তিনি আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, সেই উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে তিনি এখন একাগ্রচিত্তে মার্কসীয় দর্শন পড়তে লাগলেন। তখন দেশে ধীরে ধীরে একটি দল গড়ে উঠেছে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারী জারের রাজত্বের অবসান ঘটানো। লেনিন এসে এই দলে যোগদান করলেন এবং এই সময় থেকেই তিনি 'নিকোলাই লেনিন' এই নামটি গ্রহণ করেন।

১৮৯৫। লেনিনের বয়স তখন পঁচিশ বছর এবং এই বয়সেই তিনি দেশের অন্যতম অগ্রগণ্য বিপ্লবীরূপে পরিচিত হয়েছেন। জর্জ প্লেখানভের নাম তিনি শুনলেন; তাঁকে তখন বলা হতো রাশিয়ান সমাজতন্ত্রবাদের জনক। প্লেকানভের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য লেনিন রাশিয়ার বাইরে গেলেন এবং কিছুকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে গঠন করলেন 'ইউনিয়ন ফর দি লিবারেশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস' নামে একটি সমিতি। রাশিয়াতে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার সেই ছিল প্রথম প্রয়াস। এই সমিতির পক্ষ থেকে তিনি একটি সংবাদপত্রও প্রকাশ করতে থাকেন। এই কাজ করতে গিয়ে কয়েক মাসের মধ্যে লেনিন ধৃত হলেন। পুলিশের খাতায় তাঁর নাম আগে থেকেই উঠেছিল। তখন সবে তিনি ওকালতি ব্যবসায় শুরু করেছেন যখন 'বিপজ্জনক ব্যক্তি' বলে লেনিন ধৃত হলেন। ঐ সময়ে তিনি একটি পুস্তিকায় লিখেছিলেন—'রাশিয়ার শ্রমিকরা একচ্ছত্র শাসন উৎখাত করবে এবং তারাই রাশিয়ার সর্বহারাদের সাম্যবাদী বিপ্লবের পথে পরিচালনা করবে। এ শুধু তাঁর কথার কথা ছিল না—ছিল ভবিষ্যদ্বাণী। সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত হলেন লেনিন। এখানে এসে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা যেন অনেকখানি পরিণতি লাভ করল। অর্থনৈতিক চিন্তাও। এই নির্বাসনকালেই তিনি তাঁর কাজকর্মে সহায়তা করবার জন্য যে বিশ্বস্ত সঙ্গিনীকে পেয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল নাদেজদা কোনস্টানটিনোভ

ক্রুপস্কায়া। সেন্ট পিটার্সবার্গে বৈপ্লবিক কর্মে লিপ্ত থাকার সময়েই এঁর সঙ্গে লেনিনের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। ক্রুপস্কায়াও নির্বাসিতা হয়েছিলেন সাইবেরিয়াতে ঐ একই অপরাধে। তিনিই এখন লেনিনের মর্মসহচরী ও একান্ত সচিবের মতো হয়ে উঠলেন। সেই থেকে এই বিদুষী নারী তার রাজনৈতিক রচনায় সহযোগিতা করতে থাকেন। অবশেষে এই নারীই জীবনসঙ্গিনীরূপে লেনিনের জীবনে স্থায়ী আসন লাভ করেন। সাইবেরিয়াতে নির্বাসনদণ্ড ভোগের সময় লেনিন 'The Development of Capitalism in Russia' নামে যে বইখানি রচনা করেন পরবর্তিকালে রাশিয়াতে কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' ('Capital') গ্রন্থের পরেই সেটি সাম্যবাদের নূতন বাইবেলরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

১৯০০। ফেব্রুআরি মাস। লেনিনের নির্বাসন দণ্ডের মেয়াদ শেষ হলো। কিন্তু মুক্তিলাভের পরেও তিন চার বছর তাঁর উপর খুব কড়া নজর রাখা হয়েছিল যাতে কোনো আন্দোলনে তিনি যোগ দিতে না পারেন। পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্য তখন থেকেই তিনি লেনিন নামে চলাফেরা করতে থাকেন। অবশেষে পুলিশের জ্বালায় তাঁকে দেশ ছাড়তে হলো। জার্মানির মিউনিক শহরে এসে তিনি আশ্রয় নিলেন। রাশিয়ার আরো অনেক বিপ্লবী কর্মীকেও সেদিন দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। এখানে তাঁরা দলবদ্ধ হলেন এবং নিজেদের বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালাবার জন্য তাঁরা Iskra (ইংরেজী নাম 'The Spark) নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। পত্রিকা সম্পাদনের ভার নিলেন লেনিন এবং পত্রিকার লক্ষ্য হিসাবে তিনি এই বিখ্যাত ঘোষণাটি করেছিলেন—From the spark will come the flame.' আগুনের ফুলকির মতো তাঁর কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই পত্রিকা-সম্পাদনার কাজে তাঁর স্ত্রী ক্রুপস্কায়া স্বামীকে যথেষ্ট সহায়তা করতেন। স্বামীর সঙ্গে তিনিও দেশত্যাগ করে মিউনিকে চলে এসেছিলেন। এখানে তাঁরা নিতান্ত দরিদ্রের মতোই জীবন যাপন করতেন এবং দিবারাত্র তাঁরা তাঁদের অভিষ্ট সাধনের কথা চিন্তা করতেন। হাজার হাজার কপি 'ইসক্রা' অন্ধকার পথ দিয়ে রাশিয়াতে আসত এবং কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারিত হতো। লেনিন তখন ত্রিশের কোঠায় পৌছেছেন ও রাশিয়ার বিপ্লবীদলের নেতা হিসাবে গণ্য হয়েছেন। কিছুকাল পরে জার্মান সরকার লেনিনকে তাঁদের দেশে আশ্রয় দেওয়া আর নিরাপদ মনে করলেন না এবং তাঁর উপর বহিষ্করণের আদেশ প্রযুক্ত হলো। তাঁর জীবনের অবশিষ্ট সতের বৎসরকাল কেটেছিল এক দেশ থেকে অন্য দেশে দেশান্তরী হয়ে। কিন্তু তাঁর চিন্তার বিরাম ছিল না, কর্মেরও বিরাম ছিল না। তাঁর সম্পাদিত 'ইসক্রা' সমান ভাবেই আগুনের ফুলকি ছড়াতে থাকে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি মাত্র একবার স্বল্পকালের জন্য স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন। এই সময়ে তিনি পত্রিকা-সম্পাদনা ব্যতীত একের পর এক বহু পুস্তিকা রচনা করেছিলেন এবং তাঁর সুচিন্তিত ভাবধারাই যে অলক্ষ্যে বিপ্লবের রচনা করে

দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই পুস্তিকাগুলির মাধ্যমেই তিনি সেদিন মার্কসীয় চিন্তার একটা সহজ ও সাবলীল ব্যাখ্যা করেছিলেন।

১৯০৫। রাশিয়াতে অশান্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তখন যিনি জার তাঁর নাম দ্বিতীয় নিকোলাস। অত্যন্ত হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন তিনি; প্রজাদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র অনুকম্পা ছিল না। ৯ই জানুআরি, ১৯০৫, আধুনিক রাশিয়ার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় তারিখ। ঐদিন কয়েকশত দরিদ্র প্রজা নিজেদেয় দুঃখ দুর্দশার কথা নিবেদন করবার জন্য জারের প্রসাদের সম্মুখে সমবেত হয়েছিল। দুঃখ নিবারণ তো দূরের কথা, তাদের আবেদন শোনার আগেই সম্রাট সৈন্যদের আদেশ দিলেন গুলি চালাতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে দুইশত নিরপরাধ লোক নিহত হলো। এই ব্যাপারে রাশিয়ার প্রজাদের কাছে জারের মর্যাদা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হলো। এই সময়ে লেনিন দেশে ফিরে এসে দেখলেন যে দেশের লোক জেগে উঠেছে। লেনিন বুঝলেন, এই সুযোগ, এবার সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে। গোপনে গোপনে তারই আয়োজন চলল। অবশেষে একদিন মস্কোর কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে এলো। তারপর চাষী ও মজুর অস্ত্র সংগ্রহ করে সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। লেনিন আশ্রয় নিলেন ফিনল্যাণ্ডে। ফিনল্যাণ্ড থেকে জার্মানী, জার্মানী থেকে জেনিভা—এইভাবে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে তাঁর সাত বছর কেটে গেল।

১৯১৪। য়ুরোপে বাধল মহাযুদ্ধ। জারের হুকুমে রাশিয়া ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধ নামল। আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদের উপর যেন এইটি প্রবল আঘাত পড়ল। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদীরা জারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থন জানাল—প্লেকানভ এই চেয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক বিপ্লব প্রয়াস সফল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে লেনিন তখন তাঁর স্বদেশের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তখন জারের সৈন্যদলে অসন্তোষ দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। রাশিয়ায় অবস্থা ও বিশ্ব-পরিস্থিতি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে লেনিন বুঝলেন যে এইবার বিপ্লবের দিন সত্যিই সমাগত হয়েছে। তখন তিনি তাঁর স্বদেশস্থ কর্মীদের যথাযথ নির্দেশ প্রদান করলেন। অতঃপর ইতিহাসের তরঙ্গ দ্রুতবেগে বইতে থাকে রাশিয়াতে। সে-কাহিনী আজ সুপরিচিত ১৯১৭ সনের অক্টোবর মাসে রোমানফ বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়াতে এলো এক নব যুগ—বলশেভিকদল পূর্ণ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবীর বুকে প্রথম সর্বহারা ও শোষিত জনসাধারণের সরকার স্থাপন করলেন। বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার পর লেনিন মাত্র সাত বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। **'Power to the Soviets, land to the peasants, bread to the hungry', and peace to the people.'**—ইতিহাসের বুকে এই নব চেতনার বাণী রেখে মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে অকস্মাৎ সন্ন্যাসরোগে লেনিনের মৃত্যু হয় ১৯২৪ সনের ২১শে জানুআরি। ঐ সাত বছরের মধ্যেই তিনি তাঁর স্বদেশকে একটি নূতন শাসন-ব্যবস্থা উপহার দিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বারট্রাণ্ড রাসেল

(১৮৭২-১৯২০)

ত্রিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর বুদ্ধিজীবী মানুষের মনের উপর এমন ব্যাপক আর স্থায়ী প্রভাব আর কোনো মনীষী বিস্তার করতে পারেন নি যেমনটি পেরেছেন বারট্রাণ্ড রাসেল। একাধারে তিনি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। যেমন সুগভীর তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, তেমনি অনুপম তাঁর লিখনভঙ্গী। আধুনিক সমাজ-জীবনের তিনি একজন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সমালোচক, বর্তমান বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিন্তানায়ক।

ইংলণ্ডের এক সম্রান্ত ও অভিজাত পরিবারে বারট্রাণ্ড রাসেল ১৮৭২ সালের ১৮ই মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁব পিতামহ লর্ড রাসেল দু'বার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁব পিতাও ছিলেন একজন রাজনীতি-সচেতন মানুষ। পিতা ও পিতামহের প্রভাব রাসেলের জীবনে গভীরভাবেই মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতেই জার্মান গভর্নেস ও ইংরেজ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে তাঁর পড়াশুনা চলে। তখন থেকেই গণিতশাস্ত্রের প্রতি বালকের আকর্ষণ দেখে তাঁর শিক্ষকগণ চমৎকৃত হন। পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত পিতামহের বিশাল গ্রন্থাগারে বালক রাসেল অবাধে বিচরণ করতেন আর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন নানা রকমের গ্রন্থ। অধ্যয়নস্পৃহা তাঁর আজীবন প্রবল ছিল।

আঠারো বছর বয়সে তিনি প্রবিষ্ট হলেন কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে। সেই বয়সেই তিনি ইংরেজী ভিন্ন ইতালিয়ান ও ফরাসী ভাষায় রীতিমত পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। যথাসময়ে কেমব্রিজ থেকে স্নাতক হয়ে রাসেল এলেন প্যারিসে ব্রিটিশ দূতাবাসের একজন অবৈতনিক সহকারী রূপে। যুবক রাসেল যথাশীঘ্র প্যারিস থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন লণ্ডনে। এখানে এলিস স্মিথ নাম্নী এক কিশোরীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর।

বিয়ের পর রাসেল সপরিবারে সানেবক্স-এ বসবাস করতে থাকেন। যদিও তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী, কিন্তু তখন আগ্রহ নিবদ্ধ হয়েছে দুটি বিষয়ে—দর্শন ও গণিত। উত্তরকালে বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে গণিতে ব্যুৎপন্ন কেশরীরূপে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। দর্শন ও গণিত চর্চার সঙ্গে তিনি আরো দুটি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন—স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকার বিষয়ক আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রবাদ। তিনি ও তাঁর পত্নী দু'জনেই ফেবিয়ান সোসাইটির সভ্য হলেন। কম্যুনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। মার্কসের চিরাগত মূল্যবোধ ও নীতিবোধের প্রতি অবজ্ঞা এবং ধর্মকে প্রাধান্য না দেওয়া ও মোহমুক্ত দৃষ্টিতে জীবনকে

দেখবার প্রয়াস—রাসেলের বিশেষ ভাল লেগেছিল। মানুষের যাবতীয় উৎকর্ষ ও উন্নতির মূলে বিজ্ঞান—এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে শুরু হয় রাসেলের জীবন।

ত্রিশ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই রাসেল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মোটামুটি স্থির করে ফেলেছিলেন। প্রথম পদক্ষেপ, স্বেচ্ছায় নিজেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা। যে সম্পত্তি নিজে অর্জন করেন নি, সে সম্পত্তি ভোগ করবার অধিকার তাঁর নেই। সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিলেন কয়েকটি মানবকল্যাণব্রতী সংস্থার নামে। একমাত্র অবলম্বন রইল লেখার আয় এবং অধ্যাপনার বেতন। দ্বিতীয় পদক্ষেপ যুদ্ধবিরোধী মনোভাব। বুয়র যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন রাসেল ছিলেন সরকারের সমর্থক। কিছুদিন পরে যেই জানতে পারলেন তাঁর নিজের গভর্ণমেণ্টের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিবরণ, সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুদ্ধবিরোধী হয়ে উঠলেন। স্বদেশের দুষ্কৃতিকে দেশপ্রেমের ধাপ্পা দিয়ে সমর্থন তিনি আর কখনো করেন নি। এখানে তিনি ছিলেন বার্নার্ড শ'র সগোত্র।

চব্বিশ বছর বয়সে রাসেলের যে বইটি প্রকাশিত হয় সেটির নাম 'A Study of German Social Democracy' রাজনীতি সংক্রান্ত বই। তারপর বেরুল জ্যামিতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ ও লেনিনের দর্শন সম্পর্কিত একখানি বই। এই সময় তিনি একটি গবেষণাপত্রও রচনা করেন। তাঁর এই গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল গণিত ও ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করা। রাসেলের বয়স যখন আটত্রিশ বছর তখন তিনি হোয়াইটহেডের সহযোগিতায় তাঁর 'Principia Mathematica' নামক বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থের রচনা শেষ করেন। তিন খণ্ডে প্রকাশিত বিপুলায়তন এই বইখানি বোধ হয় পৃথিবীতে বিশজনের অধিক লোক সম্পূর্ণ পাঠ করেন নি। তথাপি এটি একটি ক্লাসিকরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। একাদিক্রমে সাত বৎসর পরিশ্রম করার ফলে বইটি রচিত হয়। উপাদান-উপকরণ সংগ্রহে লেগেছিল দু'বছর আর রচনা করতে পাঁচ বছর। এই বইটির জন্যই রাসেল নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

১৯১০ সালে যখন তাঁর 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থ রচনা শেষ হয় তখন তিনি উদার-নৈতিক দলের একজন প্রার্থী হিসাবে হাউস অব কমন্স-এ আসবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটদাতাগণ যখন জানতে পারলেন যে, প্রার্থী একজন পুরোদস্তুর অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic) এবং তাঁকে গীর্জাতে কখনো দেখা যায় না, তখন তাঁরা রাসেলকে ভোট দিতে নিবৃত্ত হলেন। 'ঈশ্বর বা পরলোক মানে না এমন লোককে পার্লামেণ্টে পাঠিয়ে লাভ কি ?'—এই কথা বলেছিলেন একজন ভোটদাতা। এরপর থেকেই রাসেল হয়ে উঠলেন একজন সমাজবাদী। রাজনীতি বা দর্শনের কোন কোন বিষয়ে রাসেলের এই আপাত মত-পরিবর্তন অনেকের কাছে কঠিন সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

১৯১৪ সালে বাধল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রাসেল ছিলেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে। তাঁর যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিবাদমূলক প্রচার কার্য বিপুল ব্যবধান রচনা করল

রাসেল ও তাঁর নিজের শ্রেণীর লোকদের মধ্যে। ফলে তাঁর স্থান হল স্বল্পসংখ্যক সেই বুদ্ধিজীবীদের দলে যাঁদের মধ্যে ছিলেন ওয়েব দম্পতি, বার্নার্ড শ, ট্রিভেলিয়ান ও হারবার্ট স্যামুয়েল প্রভৃতি। শান্তিবাদী রাসেলকে সেদিন তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে কম লাঞ্ছিত হতে হয়নি। এই যুদ্ধ তাঁর মানসলোকে নিয়ে এলো তুমুল পরিবর্তন। হয়ে উঠলেন তিনি একজন বহু বিতর্কিত এবং কিছুটা কুখ্যাত জননেতা। যুদ্ধবিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত থাকার ফলে রাসেলের ভাগ্যে জেল ও জরিমানা দুই-ই ঘটেছিল। এমন কি শান্তিবাদী প্রচারকার্যের দরুণ কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ট্রিনটি কলেজের অধ্যাপনার কর্ম থেকেও বিচ্যুত হয়েছিলেন তিনি। পরে অবশ্য তিনি এখানে পুনরায় ঐ কর্মের জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৯১৭ সালের শেষভাগে ব্রিকসটনের জেলে তিনি ছয়মাস অতিবাহিত করেন। রাসেলের এই কারাদণ্ড সেদিন লণ্ডনের বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। জেলে বসে তিনি তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর প্রধান ঘটনা রুশ-বিপ্লব। রাসেল এই ঘটনায় বিশেষ উত্তেজিত বোধ করেন। ১৯২০, গ্রীষ্মকাল। সোভিয়েত ইউনিয়ন রাসেলকে নিমন্ত্রণ করলেন একজন বেসরকারী শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে। সেখানে গিয়ে তিনি সমাজবাদ সম্পর্কে লেনিনের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আলোচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। রাশিয়া পরিদর্শনের পর এলেন তিনি চীনদেশে। এখানে তিনি সুন ইয়াৎসেনের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন। এই দুটি দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'The Practice and Theory of Bolshevism' ও 'The Problem of China' নামক গ্রন্থ দুটিতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ডে শান্তির পক্ষে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে রাসেলের মতো সক্রিয় ভূমিকা আর কেউ গ্রহণ করেননি এবং এরই জন্যই সারা য়ুরোপে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল সেদিন। তাঁর লেখনী ও রসনা দুই-ই নিয়োজিত হয়েছিল এই কাজে এবং তা বিচলিত করেছিল সরকারকে। তাঁর যুদ্ধবিরোধী পুস্তিকা সৈন্য সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি করবে এবং সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভাঙবে—এই ছিল সরকারের আশঙ্কা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তিকালে যুদ্ধ সম্বন্ধে রাসেলের মতামত নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের তিনি বিরোধিতা করেছেন, অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ করেছেন সমর্থন। এর কারণ কি?

রাসেলের বিশ্বাস ছিল হিটলারের ফ্যাসিজম মানবসভ্যতার ঘোর শত্রু। সুতরাং হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থনযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষ,—মানব-সভ্যতার স্বপক্ষে সংগ্রাম নয়। তাঁর এই যুক্তির মধ্যে ফাঁক থাকতেও পারে। কিন্তু রাসেলের বিশ্বাস ছিল অকৃত্রিম। উদারপন্থী রাসেল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে হয়ে উঠলেন সমাজবাদী। কারণ তিনি উপলব্ধি করলেন পুঁজিপতিরাই যুদ্ধ লাগাবার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্য তাঁর সমাজবাদের মূল আদর্শ ছিল না। তাহলেও রাশিয়ার সমাজবাদ

সম্বন্ধে তাঁর ছিল উচ্চ আশা। বলতেন এই হতাশাময় পৃথিবীতে লেনিন একটি উজ্জ্বল বিন্দু।

অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ রাসেল। তিনি যা লিখতেন বা বলতেন তা বিশ্বাস করতেন একান্তরূপে এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করতেন।

রাসেলের জীবনের শেষ কুড়ি বছর ছিল সবচেয়ে কর্মময়। অষ্টআশী বছর বয়সে তিনি একটা বড় আন্দোলন—Campaign for nuclear disarmament—গড়ে তুলেছিলেন পৃথিবীতে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী বন্ধ করার জন্য। তারপর পরমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করবার পক্ষে লণ্ডনে সত্যাগ্রহ শুরু করেন। তিনিই এই সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। এজন্য রাসেল-দম্পতির দু'মাস জেল হয়েছিল। এ ছাড়া, পৃথিবীর যেখানেই কোন সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে অমনি রাসেল তার কারণ অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেছেন এবং যে-পথ ন্যায়ের দিকে সকল প্রকারে তাকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেন নি। দ্বিধা করেন নি অন্যায়কারীকে ধিক্কার দিতে—সে রাষ্ট্র সাম্যবাদী হোক বা পুঁজিবাদী হোক। সকলেই জানেন ভিয়েৎনাম রাসেলের শেষ জীবনের অনেকটাই অধিকার করেছিল। তাঁর 'ওয়ার ক্রাইমস্ ইন ভিয়েৎনাম' বইটি রাসেলকে আর একবার আমেরিকা ও তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলির কাছে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কারা প্রাচীরের অন্তরালে বন্দী বহু নেতাদের মুক্ত করার দায়িত্ব রাসেল তাঁর নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

সমগ্র পৃথিবী ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। তাঁর সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি নিগ্রো, নাগা, চীনা, ইহুদী, আফ্রিকান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছিল তাঁর সক্রিয় সমর্থন। ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি ছিলেন তিনি। মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত ছিল বারট্রাণ্ড রাসেলের সমগ্র জীবন। দেশের ও বিদেশের সরকারের বিরাগভাজন হতে তাঁর কোন দ্বিধাই ছিল না। শতবর্ষের প্রান্তে পৌঁছেও সংগ্রামের শক্তি তিনি পেতেন কোথা থেকে? মানবতার শত্রুদের প্রতি ঘৃণাই তাঁকে শক্তি যোগাত। 'প্রতিবাদই জীবন, মেনে নেওয়া মৃত্যু'—এই বিশ্বাসে স্থির ছিলেন তিনি আজীবন। এমন অনবদ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ বিংশ শতকের পৃথিবীতে তিনিই প্রথম এবং শেষ। আবার তাঁর মতো এমন অকৃত্রিম মানববন্ধুও বোধ হয় এই শেষ। রাসেলের সমাজচিন্তার সাক্ষর আছে তাঁর 'দি কনকোয়েষ্ট অব হ্যাপিনেস' নামক গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠায়। বর্তমান সভ্যজগতের এ এক নতুন সংহিতা। এই বিশ্বজীবনপ্রবাহের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের ঐক্যানুভূতির মধ্যেই আছে মানবমুক্তির পথের সন্ধান। রাসেলের জীবন ও চিন্তা এই পথেরই একটি আলোকিত মশাল। এমন মানুষের মৃত্যু নেই। য়ুরোপের এই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ও মানবদরদী বন্ধুকে পৃথিবীর মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

উইনস্টন চার্চিল

(১৮৭৪-১৯২৫)

১৮৭৪, ৩০ নভেম্বর। ব্লেনহেম প্রাসাদে লর্ড র‍্যানডলফ চার্চিলের তৃতীয় পুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন উইনস্টন চার্চিল। চার্চিলের মা, জেনি জেরোম ছিলেন আমেরিকার মেয়ে; তিনি শুধু সুন্দরী ছিলেন না, সম্পত্তিশালিনীও ছিলেন।

চার্চিলের বয়স তখনো দু'বছর হয়নি যখন তাঁর ঠাকুরদা আয়ার্ল্যাণ্ডের ভাইসরয়ের পদে নিযুক্ত হলেন। পরবর্তী কয়েক বছর উইনস্টন ডাবলিনে অতিবাহিত করেন। সাত বছর বয়সের সময়ে তাঁকে য়্যাসকটের নিকটবর্তী স্কুলে প্রেরণ করা হয়; এখান থেকে তাঁকে ইটনের জন্য তৈরি করা হয়। দু'বছর তিনি য়্যাসকটে থাকার পর তাঁর পিতামাতা ছেলেকে ব্রাইটনে পাঠিয়ে দিলেন। ব্রাইটনে তাঁকে যে স্কুলটিতে ভর্তি করে দেওয়া হয় সেটি দু'জন প্রখ্যাত মহিলা শিক্ষিকা পরিচালনা করতেন। তিন বছর ব্রাইটনে থাকার পর উইনস্টন হ্যারোতে প্রেরিত হলেন। কিন্তু কি ব্রাইটন, কি হ্যারো—কোথাও উইনস্টন ছাত্র হিসাবে তেমন কৃতিত্বের পরিচয় রাখতে পারেন নি। অবশেষে সতেরো বছর বয়সে তাঁকে স্যাণ্ডহার্স্টে ভর্তি করে দেওয়া হলো। সৈনিকের প্রতিভা নিয়ে তাঁর জন্ম, তাই চার্চিলের আনন্দের সীমা ছিল না যখন তিনি জানতে পারলেন যে তাঁকে স্যাণ্ডহার্স্টে ভর্তি করে দেওয়া হবে। এইখানে এসেই তাঁর ধরণ-ধারণ বদলে গেল। তিনি যেন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত পড়াশুনাতে তিনি মনে ঢেলে দিলেন—সমস্ত মনোযোগ দিয়ে যে তিনটি বিষয় তিনি স্যাণ্ডহার্স্টে শিক্ষা করেছিলেন সেটি হলো মানচিত্র অঙ্কন, দুর্গ-নির্মাণ ও সামরিক আইন।

কুড়ি বছর বয়সে স্যাণ্ডহার্স্ট-এর পাঠ শেষ করে তিনি কুইনস কমিশন লাভ করলেন। তখন চার্চিলের বাবা জীবিত ছিলেন না। সৈন্যবিভাগে একজন Cavalry Officer হিসাবেই শুরু হয়েছিল চার্চিলের কর্মজীবন। ছেলেবেলা থেকেই ঘোড়ায় চড়তে তাঁর খুব ভাল লাগত, তাই স্যাণ্ডহার্স্টে তিনি ক্যাভালরি সম্পর্কেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বিশেষভাবে।

১৮৯৬। চার্চিলের বয়স তখন বাইশ বছর। তাঁর রেজিমেন্ট এলো ভারতবর্ষে, বাঙ্গালোরে। তবে এখানে কাজের বিশেষ চাপ ছিল না। সকালে কুচকাওয়াজ, মধ্যাহ্নে নিদ্রা, বিকাল পাঁচটায় পোলো খেলা। চার্চিল দিবানিদ্রা আদৌ পছন্দ করতেন না। বাঙ্গালোরে এসেই তিনি ইংল্যাণ্ডে তাঁর মায়ের কাছে চিঠি লিখে বই পাঠাতে বললেন। আগে তাঁর প্রিয় পাঠ্য ছিল র‍্যাডভেঞ্চারের বই। এখন থেকে তিনি যত্নের সঙ্গে পড়তে লাগলেন প্লেটোর

Republic, মেকলের *History of England* ও গিবনের *Decline and fall of the Roman Empire* এবং এই ধরণের আরো অনেক বই। এমনি করেই চার্চিল তাঁর ভাবীকালের নেতৃত্বের বনিয়াদ তৈরি করেছিলেন।

বছর খানেক বাদে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠানদের সঙ্গে ভারত সরকারের যুদ্ধ বাধলো। পাঠানদের অভ্যুত্থান দমন করবার জন্য যে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল তাতে যোগদান করার ইচ্ছা চার্চিল জানালেন তাঁর উপরওয়ালা কর্ণেলকে। তিনি তখন সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হলো। এই অভিযানে তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা ছিল মিশরে। সুদানকে দরবেশদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য যে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয় তাতে তিনি ল্যান্সার দলের লেফটেনাণ্ট ছিলেন, সেই সঙ্গে তাঁকে সংবাদদাতার কাজও করতে হতো। সুদান যুদ্ধে সৈনিক ও লেখক হিসাবে চার্চিলের মর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। এই যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা তাঁর The river War বইটির উচ্চ প্রশংসা করলেন। সমালোচকগণ আর পাঠকদের কাছে এটি এমন সমাদর লাভ করেছিল যে প্রকাশিত হওয়ার মাত্র কয়েকমাস পরেই এই দামী বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হয়েছিল। চব্বিশ বছর বয়সে চার্চিল ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং সৈনিক-সাংবাদিক তখন দ্বিতীয়বারের জন্য রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে গেলেন তিনি 'মর্নিং পোষ্ট' পত্রিকার যুদ্ধ সংবাদদাতা হিসাবে। এইখানে তিনি যুদ্ধবন্দী হিসাবে ধৃত হন এবং পরে কৌশলে পলায়ন করেন। রণক্ষেত্র থেকে তিনি যে সব সংবাদ প্রেরণ করতেন সেগুলি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হতো। বুয়র যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, তিনি ওল্ডহামে ফিরে এসে আবার রাজনীতিতে যোগদান করলেন। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি সৈনিকবৃত্তি ও রাজনীতি করতেন। এবার নির্বাচনে তাঁর জয়লাভ হলো। পার্লামেণ্টে প্রবেশ করার আগে তিনি প্রথমে ইংলণ্ডে, এবং পরে আমেরিকা ভ্রমণ করেন ও সর্বত্র বক্তৃতা প্রদান করে প্রচুর অর্থলাভ করলেন। উইনস্টনের সৌভাগ্য-রবি তখন ঊর্ধ্বদিকে। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি হাউস অব কমন্স-এ তাঁর আসন গ্রহণ করেন।

১৯০৬। ইংল্যাণ্ডে সাধারণ নির্বাচন হলো। উদারনৈতিক দল তাদের বিরোধীদের পরাজিত করে জয়ী হলেন। চার্চিল এই দলের প্রার্থী হিসাবে বিপুল ভোট পেয়েছিলেন। নতুন মন্ত্রিসভায় এইবার তাঁর স্থান হলো—উপনিবেশগুলির আণ্ডার-সেক্রেটারি পদে তিনি নিযুক্ত হলেন। এর কিছুকাল বাদে মন্ত্রিসভায় তাঁর পদোন্নতি হলো—তিনি বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি হলেন। পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। এইবার তিনি সংসারজীবনে প্রবেশ করলেন; ১৯০৮ সালের শরৎকালে সুন্দরী ক্লিমেনটাইন হোজিয়ারের সঙ্গে তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি স্বরাষ্ট্র সচিবের (Home Secretary)

পদে নিযুক্ত হলেন। এক বছর বাদে তিনি আরো উচ্চপদে নিযুক্ত হলেন—নৌবাহিনীর প্রধান কর্তা (First Lord of the Admirality)।

১৯১৪। এই বছরেই জার্মানীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ বাধল এবং অল্পদিনের মধ্যে এই যুদ্ধ পরিণত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। এই যুদ্ধের প্রারম্ভে চার্চিল ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। নৌবাহিনীর প্রথম লর্ড থাকাকালীন তিনি কি স্থলবাহিনী কি নৌবাহিনী সর্বত্র একটি অদম্য উৎসাহের সঞ্চার করেছিলেন; নব নব যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কারে প্রেরণা জাগিয়েছিলেন; এমন কি জার্মানদের জেপলিনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি আকাশ যুদ্ধের গুরুত্বের প্রতি মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁর সমরিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছিল ট্যাঙ্কের প্রবর্তনে। লয়েড জর্জ তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি চার্চিলকে যুদ্ধাস্ত্রের মন্ত্রী (Minister of Munitions) করলেন এবং যুদ্ধবিরতির পর তিনি ইংলণ্ডের যুদ্ধমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলেন। ছয় বছর বাদে ১৯২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংরক্ষণশীল দল পুনরায় ক্ষমতাসীন হলেন। চার্চিল তখন দুর্বল উদারনৈতিক দল বর্জন করে, টরিদের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য মেলালেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী স্ট্যানলি বলডুইন তাঁকে চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেকারের পদে নিযুক্ত করলেন। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর ক্রমাগত দল পরিবর্তনে চার্চিলের বিরোধীরা তাঁর কঠোর সমালোচনা করতেন। ১৯২৯ সালে শ্রমিক দল, উদারনৈতিক দলের সমর্থনে জয়লাভ করলো এবং একটি শর্তে বলডুইন তাঁর মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি লাভ করেছিলেন—চার্চিলকে নতুন মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবে না। তখন তাঁর বয়স ছিল পঞ্চান্ন যখন উইনস্টন চার্চিল তাঁর প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা থেকে চ্যুত হন। এই সময় তিনি বহু রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত একটি বিপুলায়তন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। চারখণ্ডে সমাপ্ত সেই বিখ্যাত বইটির নাম The World Cricis বা, 'বিশ্ব সঙ্কট'। এই বইটি তাঁকে লেখক হিসাবে শুধু খ্যাতি এনে দেয়নি, প্রচুর অর্থও এনে দিয়েছিল।

এইভাবে দশ বছর কাটিয়ে তিনি আবার পার্লামেণ্টে ফিরে এলেন। ১৯৩৯। য়ুরোপ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। জার্মানিতে হিটলারের অভ্যুদয় তখন আর একটি বিশ্ব যুদ্ধের আশংকা ঘনিয়ে এসেছিল। এই সময়ে প্রকাশিত হয় হিটলারের বিখ্যাত বই 'Mein Kampf' বা 'আমার জীবন' বইটি পাঠ করে চার্চিল বুঝেছিলেন যে আর একটি বিধ্বংসী যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে এবং হাউস অব কমন্স-এ দাঁড়িয়ে তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে এই যুদ্ধবাজ ও পররাজ্যগ্রাসী মানুষটি সম্পর্কে সাবধান হতে বলেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পাঁচ বছর আগে থেকেই তিনি সম্পর্কে যেসব সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন সে সব যখন সত্যে পরিণত হলো তখন চার্চিলের দূরদর্শিতা তাঁকে ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে আবার জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তিনিই এই সময়ে

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানি যেভাবে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হতে চলেছে তাতে করে নিকট ভবিষ্যতে বিমান আক্রমণে লণ্ডন ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলডুইন সেকথা গ্রাহ্য করলেন না; এমনকি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারের পর্যন্ত হিটলারকে তোয়াজ করতে ব্যস্ত ছিলেন।

জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই য়ুরোপে শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং অনতিকালের মধ্যে সেই যুদ্ধ প্রলয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হলো। সকলের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হলো চার্চিলের ওপর। প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের অনুরোধে পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক উইনস্টন চার্চিল নৌবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নৌবিভাগ উল্লসিত হয়ে তাঁকে স্বাগত জানাল। আবার তিনি 'ফার্স্ট লর্ড অব দি এ্যাডমিরালিটি'র পদে সগৌরবে অধিষ্ঠিত হলেন। তারপর যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস পরে জনমতের চাপে চেম্বারলেন যখন পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তখন সম্রাট চার্চিলকে আহ্বান করলেন মন্ত্রিসভা গঠন করতে। ১৯৪০, ১০ মে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চার্চিল তাঁর প্রথম বক্তৃতায় ইংলণ্ডের জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'I have nothing to offer but toil, tears and sweet'. বস্তুত যুদ্ধের কয়েকটা বছর চার্চিল যৌবনসুলভ উদ্যম সহকারে যেভাবে তাঁর স্বজাতিকে বিজয়ের পথে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন তা সকল দিক দিয়েই ছিল অতুলনীয়। 'We shall never surrender'—যেদিন ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাঁর কণ্ঠে এই উদ্দীপনাময়ী বাণী শুনেছিল সেদিন থেকে চার্চিল তাদের কাছে বিগ্রহস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর যুদ্ধকালীন বক্তৃতাগুলি ভাবে ও ভাষায় ছিল অতুলনীয়।

যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভ হলো। দু'মাস পরেই ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন এলো। নির্বাচনে তিনি পরাজিত হলেন। জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়ে চার্চিল রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন। এই অবসর সময়েই তিনি পৃথিবীর মানুষকে উপহার দিয়েছিলেন পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস। ১৯৫১। এবারকার সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়িয়ে চার্চিল জয়লাভ করলেন ও দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হলেন। উনআশী বছর বয়সে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন—এই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভ এবং এরপরেই তিনি লাভ করেন দুর্লভ নোবেল পুরস্কার। এর পরও তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন এবং একানব্বই বছর বয়সে নির্বাপিত হয় তাঁর জীবনদীপ—যে জীবন ছিল কৃতিত্বে সমুজ্জল, কর্মশক্তিতে অতুলনীয়।

আলবার্ট স্বাইৎজার

একজন অরণ্যবাসী দার্শনিক—এই অদ্ভুত নামে পরিচিত যে মহাপুরুষ আপন প্রতিভা ও মহত্বের আলোয় এ যুগের পৃথিবীর মানুষের চলার পথ আলোকিত করে গেছেন সেই আলবার্ট স্বাইৎজার জার্মানিতে জন্মেছিলেন ১৮৭৫ সনের ১৪ই জানুআরি। তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের অনেকেই ছিলেন ধর্মযাজক ও সংগীতজ্ঞ। তাঁর পিতামহ ছিলেন একজন বিশিষ্ট পিয়ানোবাদক ও স্কুল-শিক্ষক; তাঁর অন্য তিন ভ্রাতাও অনুরূপ বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। মাতামহ ছিলেন একজন ধর্মযাজক এবং তিনি ছিলেন একটি খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক দলের নেতা। আলবার্ট ছিলেন তাঁর পিতামাতার পঞ্চম এবং সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। শৈশব থেকেই তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পাঁচ বছর বয়সে একটিমাত্র আঙুল চালিয়ে তিনি পিয়ানো থেকে সুর তুলতে পারতেন; সাত বছর বয়সে অর্গান বাজিয়ে তিনি গানে সুর দিতে পারতেন, আর নয় বছর বয়সে তাঁকে আমরা দেখতে পাই গ্রুনসবাকের একটি গীর্জায় পিয়ানোবাদকের কাজ করতে। একাধিক বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং তখন থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। আঠারো বছর বয়সে তিনি স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন এবং এইখানে তিনি সংগীত ও ধর্মতত্বে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন। তখন থেকেই খ্রীষ্টের মহিমান্বিত জীবন তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। বাইশ বছর বয়সে তিনি এলেন প্যারিসে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। যথাসময়ে ঐ বিষয়ে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন।

চব্বিশ বছর বয়সেই আলবার্ট তিনটি বিষয়ে ডক্টর উপাধি পেয়েছিলেন—সংগীত, ধর্মতত্ব ও দর্শন। চব্বিশ থেকে ত্রিশ; এই ছয় বৎসরকালে তিনি সংগীত, দর্শন ও ধর্মতত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। স্বীয় মাতৃভাষা ভিন্ন, ইংরেজী, ফরাসী হিব্রু ও লাতিন—এই চারিটি ভাষা ঐ বয়সেই আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। ঠিক এই সময়েই তাঁর মনের দিক্-পরিবর্তন ঘটে। অর্থ উপার্জন নয়, মানুষের সেবা। তারপর এই সংকল্প যখন তাঁর মনের মধ্যে দানা বাঁধল তখন সেই মানবপ্রেমিক ১৯০৫ থেকে ১৯১২—এই আট বৎসর কালের মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করে 'ডক্টর অব মেডিসিন' উপাধি লাভ করলেন। ১৯১২ সনটি আলবার্টের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে এই কারণে যে, ঐ বছরে তাঁর জীবনে জীবন-সঙ্গিনী হয়ে এলেন এক বিদুষী তরুণী। তিনি ছিলেন স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিখ্যাত ঐতিহাসিকের কন্যা। স্বামীর অনুরোধে তিনি শুশ্রূষাবিদ্যা (Nursing) শিক্ষা করেন।

অর্গান-বিশারদ ও দার্শনিক আলবার্ট এইবার চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করবেন, এইটাই ছিল সকলের ধারণা। 'আমি ব্রতী হব, মানুষের সেবায়'—ঘোষণা করলেন তিনি। তাঁর এই ঘোষণায় সবাই বিস্মিত হয়। 'কার সেবা' ?—জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর এক বন্ধু। উত্তরে তিনি বললেন, 'সবচেয়ে অনাদৃত যে জাতি আমি তাদেরই সেবা করব।' 'কোথায় সেই জাতি ?'—জিজ্ঞাসা করলেন একজন। 'আফ্রিকায় এই নিগ্রোদের সঙ্গে সংস্কৃতি ও সভ্যতাগর্বী য়ুরোপ অমানুষিক ব্যবহার করে এসেছে আবহমানকাল। সকলের হয়ে আমি করব এর প্রায়শ্চিত্ত। আমি খ্রীস্টান মিশনরী হয়ে যাব তাদের কাছে।'—বললেন তিনি। তাঁর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা সবাইকে বিস্মিত করল।

মানুষ সব দেশেই নানা আদর্শ গড়ে যুগে যুগে—বিশেষত কৈশোরে ও যৌবনে। কিন্তু সংকল্প ও ব্রত গ্রহণ এক জিনিস নয়। আমরা এই মানুষটির জীবনে দেখতে পাই যে, ডাক্তারি পাশ করে, নানা শহরে পিয়ানো বাজিয়ে বক্তৃতা দিয়ে যা উপার্জন করলেন তাই-ই সম্বল করে শ্বাইৎজার চললেন আফ্রিকার জঙ্গলে, সঙ্গে চললেন তাঁর পত্নী হেলেন ব্রেসলাউ। সেখানে ল্যাম্বারেনের উপনিবেশটিকেই তাঁরা তাঁদের কর্মের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করলেন। যাওয়ার আগে বন্ধুদের বললেন—'যাজক ও শিক্ষকের কাজ অনেক দিন করেছি, অনেক বাক্যব্যয় করেছি, এইবার শুরু হবে আমার জীবনের প্রকৃত কাজ। আমি শুধু প্রেমের ধর্ম প্রচার করতে আফ্রিকায় যাচ্ছি না, আমি মিশনরীর ভূমিকা নিয়ে সেখানে যাচ্ছি না—আমি যাচ্ছি একজন চিকিৎসক হয়ে। যা এতকাল প্রচার করে এসেছি, এইবার হাতে-কলমে তাই-ই প্রয়োগ করব।' ল্যাম্বারেনের উপনিবেশটি ছিল ফরাসী অধিকৃত। তাই এখানে আসার এক বছর পরেই যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধল, তখন ফরাসী উপনিবেশে জার্মান জাতির লোক বলে শ্বাইৎজার দম্পতিকে শত্রু হিসাবে গণ্য করা হয়। তাঁরা দু'জনেই তখন অন্তরীণাবদ্ধ হলেন। তাঁর 'Out of my Life and Thought' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—'শ্বেতাঙ্গরা অন্য শ্বেতাঙ্গদের বন্দী করে নিগ্রো সৈন্যদের অধীনে রেখে দিয়েছে—নিগ্রোদের কাছে এই জিনিসটা ছিল দুর্বোধ্য। বন্দী হওয়ার দু'দিন পরে তিনি 'Philosophy of Civilisation' নামক তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন।

এইভাবে বন্দী-জীবনের ষোল মাস যখন অতিক্রান্ত হলো তখন সেখান থেকে প্রায় একশত মাইল দূরে অবস্থিত এক মিশনরীর পীড়িতা স্ত্রীকে দেখবার জন্য তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়। একটি দুর্গম নদী অতিক্রম করে সেখানে যেতে হবে। একটি বড় নৌকার ডেকের ওপর তিনি বসে আছেন আর মনের মধ্যে নানা বিষয়ের চিন্তা করছেন—চিন্তা করছেন আর একটি পেন্সিল দিয়ে খস্ খস্ করে পাতার পর পাতা লিখছেন। সেসব রচনা অসংলগ্ন বাক্যের সমষ্টি। এইভাবে তিন দিন জলপথে কেটে গেল। নৌকা থেকে নেমে শ্বাপদসংকুল অরণ্যপথ দিয়ে গন্তব্যস্থানে চলেছেন তিনি। অরণ্যের বৃক্ষ শীর্ষে তখন অস্তগামী সূর্যের আভা এসে পড়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে শ্বাইৎজার লিখেছেন—'There flashed upon my mind, unforeseen and unthought, the phrase Reverence for Life.' সেই তাঁর মানস-উদ্ভাসনের মুহূর্তে তাঁর মানসপটে চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে রইল ঐ সুন্দর কথাটি—'জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা।'

আফ্রিকায় ফরাসী অধিকৃত ঐ উপনিবেশটিকে কেন তিনি তাঁর কেন্দ্ররূপে নির্বাচিত করেছিলেন? কারণ সমগ্র আফ্রিকার মধ্যে এইটাই ছিল দুর্গমতম স্থান। দুর্গম এবং প্রাচীন আর সবচেয়ে বিপজ্জনক। একটি চিকিৎসকও সেখানে ছিল না। শ্বাইৎজার নিজেই বলেছেন যে, ১৯১৩ সনে তিনি যখন ল্যাম্বারেনে উপনীত হলেন তখন সেখানকার পরিবেশ ছিল নিতান্ত প্রতিকূল। সেই অঞ্চলের বাসযোগ্য ভূমির প্রতিটি ইঞ্চি সেই বিশাল অরণ্যের বুক চিরে তৈরী করতে হয়েছিল। সেই অরণ্যের প্রধান অধিবাসী ছিল অজগর আর গরিলা; সেখানকার নদীতে অজস্র হিংস্র কুমীর। সেই দুর্গম ও শ্বাপদসংকুল অরণ্যের মধ্যে তিনি গড়ে তুললেন একটি হাসপাতাল। কালক্রমে এইটিই পৃথিবীর একটি বিখ্যাত হাসপাতালরূপে গণ্য হয়েছিল এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এরই জন্য তাঁকে পরে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। কী দুঃসাধ্য সংগ্রামই না তাঁকে সেদিন করতে হয়েছিল সেই অচিন্তনীয় প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে। সে-সব কথা তিনি অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন On the Edge of the Primeval Forest ও More from the Primeval Forest নামক এই দু'খানি গ্রন্থের মধ্যে। এ বই দুটি পড়ে আমরা জানতে পারি যে, যাদের সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করলেন তাদের সন্দেহ ও বিমুখতাও তাঁকে এতটুকু দমাতে পারেনি। জানতে পারি যে, মানুষই পারে দেবতা হতে—সর্বমানবিক লোভ ও ভয় জয় করে নিষ্কাম কর্মব্রতী হতে, আর সে এমন দুর্ভাগ্যদের সেবায় যারা তাঁকে অন্ততঃ প্রথম দিকে বহু দিন ধরে অবিশ্বাস করেই এসেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে (ঐ সময়টা তাঁকে য়ুরোপে ফরাসী নিয়ন্ত্রিত বন্দীশিবিরে থাকতে হয়েছিল) শ্বাইৎজার যখন দ্বিতীয়বার ল্যাম্বারেনে যান তখন এক নিগ্রো বালিকা তাঁর ছায়া মাড়াতেও চাইত না। তাঁকে বলত human leopard! সন্ধ্যাবেলায় একজনকে তিনি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরের দিন সকালে ঐ লোকটি মারা যায়। এর থেকে ঐ বালিকাটির মনে ডাক্তার শ্বাইৎজার সম্পর্কে ঐ রকম ধারণা জন্মেছিল। এসব কথা তিনি তাঁর বইতে লিখে গেছেন। আজ যখন আমরা চিন্তা করি যে এহেন পরিবেশে এই মানবপ্রেমিককে কাজ করতে হয়েছে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তখন আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর এই মহান্ ব্রতে তাঁকে সর্বক্ষণ প্রেরণা দিয়েছে ঐ আদর্শবাণী—Reverence for Life যা তাঁর মানসপটে একদিন উদ্ভাসিত হয়েছিল। মানবসেবার জন্য তিনি এমন পরিবেশ বেছে নিয়েছিলেন যে পরিবেশে খুব কম মানুষই স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিতে পারে, এমন লোকদের মধ্যে তিনি তাঁর

সেবাব্রতের আসন বিছিয়েছেন যারা হিংস্র নরখাদক, যারা তাঁকে অবিশ্বাস করত। অবশ্য অনেক বছর তাদের মধ্যে থাকার পরে তারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, তাদের আপনজন বলে গ্রহণ করেছিল। প্রথমে যাঁকে তারা মনুষ্যবেশী ব্যাঘ্র বলেই মনে করত, তাঁকে শেষে মনুষ্যবেশী দেবদূত (human angel) বলে বিশ্বাস করত। তাঁর আফ্রিকা-জীবনের কাহিনী যা তিনি দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

'আমার হাসপাতালে সব আর্তেরই স্থান আছে। তাদের যদি আমি বাঁচাতে নাও পারি অন্ততঃ একটু স্নেহও তো পাবে তারা আমার কাছ থেকে—মৃত্যুর যন্ত্রণা একটুও তো কমবে তাদের?'—স্বাইৎজারের এই কথা কয়টির মধ্যেই আভাসিত হয়েছে সেই সেবাব্রতীর মানস। আজ যখন আমরা চিন্তা করি যে, য়ুরোপের সর্বাদৃত ও প্রতিভাধর এক শিল্পী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক দার্শনিক নাম যশ অর্থ সবকিছু উপেক্ষা করে আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যে সেবাব্রতের পতাকা ওড়ালেন সকল রকম শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করে, তখন তাঁর মহত্বে আমরা সহজেই অভিভূত হয়ে যাই। তাঁর মহত্ব আরো প্রকাশ পেল যখন ১৯৫৩ সনে নোবেল পুরস্কারের প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ তিনি হাসপাতালে দিয়ে দিলেন। এই হাসপাতালটি পরিচালনার জন্য যখনই অর্থের অনটন হতো তখনই স্বাইৎজার মাঝে মাঝে ফিরে যেতেন য়ুরোপে নিগ্রোদের জন্য কনসার্ট দিয়ে টাকা তুলতে। এক এক সময়ে দারুণ পরিশ্রম করতে হতো এজন্যে—বিশেষত বৃদ্ধ বয়সে। কিন্তু অসামান্য ছিল তাঁর শ্রমশক্তি। সারাদিন খাটতেন, সন্ধ্যায় সময় পেলে তাঁর একমাত্র চিত্তবিনোদনের উপায় ছিল পিয়ানো বাজানো। আর সময় পেলে নানা দার্শনিক বা ধর্মীয় বা সাংগীতিক গ্রন্থ রচনা করা। দুর্গতদের সেবা ও ধর্মীয়-দার্শনিক-সাংগীতিক গবেষণা—এই দুই বিপরীত সাধনা সমান ভাবে করা—প্রতিভার বরপুত্রদের মধ্যেও ক'জন পারে এমন দুরূহ সমন্বয় করতে? তাঁর মৃত্যুর পর একটি পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছিল—'Dr. Schweitzer is truly another St. Francis of Assisi.' অপর একটি পত্রিকায় বলা হয়েছিল—'The twentieth century's matchless human being' স্বাইৎজার সম্পর্কে এই দুটি মন্তব্যই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। 'Man belongs to man, Man is entitled to man.'—এই বাণীর সাধক আলবার্ট স্বাইৎজার নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর একজন অতুলনীয় ব্যক্তি। অতুলনীয় এবং সহস্রের জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেন এমন একজন অনুসরণযোগ্য মহাপ্রাণ মানুষ ছিলেন তিনি। যীশু খ্রীষ্টের এত বড়ো উত্তরসাধক আমাদের কালে আর দেখা যায়নি।

টমাস ম্যান

(১৮৭৫-১৯৫৫)

১৮৭৫, জুন ৬। জার্মানির একটি পুরাতন শহরে, লিউবেকের ফ্রী সিটিতে টমাস ম্যান জন্মগ্রহণ করেন ; নামকরণের সময় ছেলের নাম রাখা হয়েছিল পল টমাস ম্যান এবং স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম যে রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে লেখক হিসাবে তাঁর নাম ছাপা হয় পল টমাস। ঐ শহরে ম্যান পরিবার কয়েক পুরুষ ধরে সম্ভ্রান্ত এবং বিখ্যাত পরিবার হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। বড়ো হলে টমাসকে স্কুলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু স্কুল তাঁর ভালো লাগেনি ; বরং তিনি বাড়িতে তাঁর দাদার খেলনা থিয়েটার থেকে ও যেসব বই পাঠ করতেন তার থেকে প্রচুর শিক্ষা লাভ করতেন ও আনন্দ পেতেন। হানস্ ক্রিশ্চিয়ান এ্যাণ্ডার্সন ও হোমারের গল্পগুলি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। যখন তাঁর বয়স পনর বছর হলো তখন তাঁর বাবা মারা গেলেন। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পরিবারে সৌভাগ্যলক্ষ্মী যেন অন্তর্হিত হলো এবং তাঁরা দেউলিয়া হয়ে গেলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে মা চলে এলেন মিউনিকে। টমাস কিন্তু লিউবেকেই রয়ে গেলেন তাঁর অগ্রজের সঙ্গে, তাঁর লেখাপড়া শেষ করার জন্য। তাঁর ছাত্রজীবনেই শুরু হয় কাব্যচর্চা। উনিশ বছর বয়সে ম্যান এলেন মিউনিকে মায়ের কাছে।

মিউনিকে এসে একটা ইনসিওরেন্স (জীবনবীমা) অফিসে চাকরি পেলেন তিনি। চাকরি যে তিনি বেশি দিন করবেন না, টমাস সেটা মনে মনেই জানতেন। হিসাবপত্র রাখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লুকিয়ে উপন্যাস রচনা করতে থাকেন। প্রথম গল্পটি মনোনীত হলো, প্রকাশিত হলো ও প্রশংসিত হলো। এক বছরের মধ্যেই ঘৃণ্য কেরানি জীবনের অবসান ঘটলো। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হলেন, সেখানে তিনি দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্য নিয়ে পড়তে লাগলেন।

ইতিমধ্যে দাদার উৎসাহে, টমাস একটি বিপুলায়তন গ্রন্থ রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং ১৮৯৮ যখন তিনি জার্মানিতে ফিরে এলেন তখন সঙ্গে করে নিয়ে এলেন স্তূপীকৃত পাণ্ডুলিপি—তাঁর বিশ্ববিখ্যাত Buddenbrooks উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। এই শতাব্দীর সূচনায় প্রকাশিত হলো 'বাডেনব্রুকস্' উপন্যাসের পর পর দুইটি খণ্ড। প্রকাশক কল্পনাও করতে পারেননি যে, বিপুলায়তন এই উপন্যাস বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করবে। এক বছরের মধ্যেই এক খণ্ডের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হলো, এবং ম্যান একজন বিস্ময়কর লেখক হিসাবে সমাদৃত হলেন। প্রত্যেকটি উন্নত ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং জার্মানির প্রত্যেক গৃহস্থের ড্রয়িংরুমে বাইবেলের পাশেই থাকত একখানি করে 'বাডেনব্রুকস্'। ১৯৩৫ সালের মধ্যে বইটির জার্মান সংস্করণ দশ লক্ষেরও অধিক বিক্রী হয়েছিল।

১৯২৯ সালে ম্যান এই উপন্যাসটির জন্যই নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ম্যানের বয়স তখন চুয়ান্ন বছর।

'ব্যাডেনব্রুকস' উপন্যাসটির আখ্যানভাগ একটি পরিবারের অধঃপতন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিন পুরুষের একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে টমাস ম্যান যেন কল্পনায় তাঁর স্বজাতির উত্থান পতন প্রত্যক্ষ করে তাদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন; দেখিয়েছেন একদিকে তাদের ক্রমাগত আর্থিক ক্ষতি, অন্যদিকে তাদের সাংস্কৃতিক লাভ। বর্ণনার ভঙ্গিটি স্বাভাবিক, কিন্তু কাহিনীর অন্তর্নিহিত বিষয়টি হলো দার্শনিক। তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র (যেটিকে ম্যানেরই প্রতিরূপ বলা চলে) টোনিও ক্রোগারের চরিত্রটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে দুইটি পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়েছিল—সাধারণ নাগরিকের পৃথিবী আর শিল্পীর নিজস্ব একটি পৃথিবী। এই দুটোর কোনটার সঙ্গেই সে খাপ খাওয়াতে পারেনি, এবং এর ফলে তার দুঃখ-ভোগের যেন শেষ ছিল না।

ত্রিশ বছর বয়সে ম্যান পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন কাতিয়া প্রিংশেন নাম্নী এক বিদুষী তরুণীর সঙ্গে; ইনি জনৈক বিখ্যাত গাণিতিক ও শিল্পসংগ্রাহকের কন্যা ছিলেন। ঔপন্যাসিকের জীবনে পরবর্তী আটাশ বছরকালই ছিল সর্বোত্তম—সুখ, শান্তি, আরাম, সবই তিনি যেমন ভোগ করেছিলেন, তেমনি খ্যাতিও বর্ষিত হয়েছিল অজস্রভাবে তাঁর মস্তকে এবং ঐশ্বর্যবান হয়েছিলেন। আবার এই সময়টাই ছিল শিল্পী ম্যানের অপর্যাপ্ত-সৃষ্টির সময়। মিউনিকে বিরাট বাড়ি ভিন্ন, আইজার নদীর তীরে একটি কুটীর এবং মেমেল্যাণ্ডের অন্তর্গত নিডেনহ্যামে একটি গ্রীষ্মাবাস তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন। ছয়টি পুত্রকন্যার জনক হয়েছিলেন—তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। তিনটি ছেলের মধ্যে একটি—ক্লাউস—তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে লেখক হয়েছিলেন এবং একটি কন্যা—এরিকা—অভিনেত্রী হয়েছিলেন ও কবি অডেনকে বিবাহ করেছিলেন। বিয়ের অল্পকাল পরেই ম্যান 'রয়্যাল হাইনেস' নামে হাল্কা ধরনের একটি নাতিদীর্ঘ কৌতুক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তারপর এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এর পনর বছর পরে প্রকাশিত হলো টমাস ম্যানের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—Death in Venice নামক উপন্যাস। তাঁর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর। এ্যাসেনবেক (Aschenback) এই উপন্যাসের নায়ক। উপন্যাসটিতে 'প্লট' বা আখ্যান বলে কিছুই নেই, নেই কোন সজীবতা (action)। তবে আছে কি? আছে যা দুর্লভ, যা সুন্দর তারই অস্বাভাবিক স্তুতি। অভিজাত, সৌন্দর্য-প্রিয় গুস্টভ ভন এ্যাসেনবেককে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের গল্পাংশ রচিত হয়েছে। একটি তরুণ পোলিশ বালকের প্রতি এ্যাসেনবেকের বাধ্যতামূলক আসক্তি হলো এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর অপ্রাপ্য, বালকটি ছিল নায়কের কাছে তারই মূর্তবিগ্রহ। তাদের দু'জনের মধ্যে কোন বাক্য বিনিময় হতো না। শহরে তখন প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। তথাপি যে তরুণ এখন তার চোখের মণি হয়ে উঠেছে, যাকে দেখে তার মনে হয়েছে সৌন্দর্যের সার, তাকে

দেখতে না পাওয়ার বেদনাটাই ছিল তার কাছে বড়ো, তাই প্লেগ আক্রান্ত শহর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া অপেক্ষা সে ঐখানে অবস্থান করে মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয় বলে মনে করেছিল। একেই বলে আসক্তি। এমন একটি পরিবেশ ঔপন্যাসিক সৃষ্টি করেছেন এই উপন্যাসে যার মধ্যে উত্তেজনা রূপান্তরিত হয়েছে আতঙ্কে। এমন একটি সৌন্দর্যের স্তুতি রচিত হয়েছে এই কাহিনীতে যা যুগপৎ পাঠকের মনে জাগায় প্রেরণা ও ভীতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ম্যান বিশেষ কোন উপন্যাস রচনা করেন নি, তবে তাঁর লেখনী একেবারে অলস ছিল না। Reflection of an Unpolitical Man বইটি তাঁর এই সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর যা কিছু ধ্যান-ধারণা, ম্যান বলেছেন, সবই নৈতিক ও দার্শনিক, রাজনৈতিক অথবা সমাজনৈতিক নয়। রুচি এবং ঐতিহ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে টমাস ম্যানকে একজন উৎকট স্বদেশ-প্রেমিক ও পুরোদস্তুর জার্মান বলেই প্রতীয়মান হবে। কিন্তু কয়েক বছর বাদে যখন তিনি আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তখন তাঁর মানসিকতায় একটা পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। এখন তাঁর মনে হলো যে, এতকাল তিনি যেসব মতবাদ পোষণ করে এসেছেন সেসব ভ্রান্ত। আরো মনে হলো, যে সংস্কৃতি শুধু রাজনীতি-বিরোধী বা প্রগতি বিরোধী তার সঙ্গে তাঁর কোন সখ্যতা থাকতে পারে না।

এইভাবে ম্যানের জীবনে যখন আত্মসমীক্ষার পর্ব চলছিল তখন তিনি লিখলেন The Magic Mountain নামে একটি নতুন উপন্যাস। সমালোচকদের মতে 'বাডেনব্রুকস' ছিল সমকালীন খাঁটি জার্মান নভেল আর 'দি ম্যাজিক মাউণ্টেন' হলো খাঁটি য়ুরোপীয় নভেল। এই তাঁর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং প্রকাশিত হওয়া মাত্র এটি পাঠকমহলে বিপুল সমাদর লাভ করেছিল আর তেমনি বিপুল সাড়াও জাগিয়েছিল। ম্যান নিজেই বলেছেন যে, ১৯১২ সালে তিনি এই উপন্যাসের আইডিয়াটি পেয়েছিলেন যখন তিন সপ্তাহের জন্য তিনি একটি স্যানাটোরিয়াম বা স্বাস্থ্যনিবাস পরিদর্শনে এসেছিলেন। এখানে তখন ফুসফুস রোগে আক্রান্ত তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা চলছিল। প্রকৃতপক্ষে একটি রুগ্ন সভ্যতার এক বিরাট কাহিনী এই উপন্যাস। যাঁরাই বইটি মন দিয়ে পাঠ করবেন তাঁরাই লক্ষ্য করবেন যে এর মধ্যে আছে দুটি স্তর—বাস্তব এবং প্রতীক। প্রতীকধর্মী এই উপন্যাসটি সম্পর্কে ইংলণ্ডের একজন সাহিত্য সমালোচকের এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য—'On the symbolic level 'The Magic Mountain' is a critical fable, a probing of nationalism and liberalism a juxtaposition of comedy and tragedy in which all the characters tend to become allegorical figures' 'A man lives not only his personal life as an individual, but also consciously or unconsciously, the life of his epoch and his contemporaries.' একটি মানুষ তার ব্যক্তিজীবনে যতখানি সত্য, তার যুগের জীবন ও তার সমসাময়িকদের জীবনেও সে ঠিক ততখানি সত্য—

য়ুরোপের কথাসাহিত্যে এইটি ছিল সেদিন নতুন সুর। বিংশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীর এক নিপুণ আলেখ্য 'ম্যাজিক মাউণ্টেন'। কল্পনার এ এক অসাধারণ এবং অতুলনীয় সৃষ্টি।

হিটলারের জার্মানিতে টমাস ম্যানের স্থান হয়নি। নাৎসীবাদের তিনি ছিলেন একজন নির্মম সমালোচক—হিটলারের ন্যাশনাল সোস্যালিজমের জঘন্য স্বরূপ ম্যানের লেখনীতে যখন উদঘাটিত হতে থাকে তখন তিনি শুধু জার্মান নাগরিকত্ব থেকেই বঞ্চিত হন নি, তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং প্রকাশ্য রাজপথে তাঁর বইগুলির বহ্ন্যুৎসব পর্যন্ত হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে তিনি চলে এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে; এখানে কিছুকাল তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়াতে একটি নিজস্ব বাসভবন নির্মাণ করে, ১৯৪৪ সালে টমাস ম্যান আমেরিকার একজন নাগরিক হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। এই সময়ে ফ্যাসী বিরোধীর ভূমিকায় তিনি সক্রিয়ভাবেই অংশ গ্রহণ করেন এবং এই সময়ের লেখা তাঁর The Coming of Democracy গ্রন্থ মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ম্যান যেসব বক্তব্য রেখেছিলেন তা পাঠ করে, আইনস্টাইনের মতো মানুষ উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের বিশালতম সৃষ্টি, চারখণ্ডে সমাপ্ত, 'যোশেফ' উপন্যাস সম্পূর্ণ করেন। ষোলটি বছর লেগেছিল এই 'যোশেফ' উপন্যাস রচনা করতে। চারটি খণ্ডের নাম যথাক্রমে—Joseph and His Brothers, Young Joseph, Joseph in Egypt এবং Joseph, the Provider; শেষোক্ত খণ্ডটি আমেরিকায় রচিত হয় ১৯৪৩ সালে। বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীর ধারা অনুসরণ করলেও, ম্যান তাঁর এই উপন্যাসটিকে আধুনিকতার রূপেই সজ্জিত করেছেন। তিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি রচনা করলেন Doctor Fallstus—একটি অনবদ্য উপন্যাস যার মধ্যে ঝঙ্কৃত হয়েছে নৈরাশ্যের মধ্যে আশার সুর, আত্মবিশ্বাসের অজেয় বাণী। আশী বছর বয়সেও টমাস ম্যানের লেখনী নিরস্ত হয়নি; তাঁর এই বয়সের রচনা The Black Swan পাঠকদের বিস্মিত করেছিল, যদিও এই উপন্যাসের শিল্পকর্ম খুব উচ্চাঙ্গের ছিল না। যুদ্ধোত্তর কালের দ্বিধা-বিভক্ত জার্মানিকে একত্র করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ঐ বয়সে এলেন সুইজারল্যাণ্ডে। জুরিখে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত জমে যাওয়ার ফলে, ১২ অগস্ট, ১৯৫৫ সালে এই প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। টমাস ম্যান ছিলেন একজন জীবনবাদী লেখক; বর্তমানকে বাস্তবতায় উজ্জীবিত করাই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য।

আনন্দ কেণ্টিস কুমারস্বামী
(১৮৭৭-১৯৪৭)

সিংহলে জন্ম হলেও, আনন্দ কুমারস্বামী মনে-প্রাণে ছিলেন ভারতীয়। ভারতীয় শিল্প যখন অন্ধকারের অন্তরালে বিশ্ববাসী কর্তৃক উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত ছিল তখন এর পুনর্ব্যাখ্যান ও পুনরুদ্ধারের কাজে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষকে বিশ্বের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে স্থাপন করেছিলেন। এই বিশ্ব-বিশ্রুত শিল্প-শাস্ত্রীর কাছে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা নেই। রূপকথার মতোই কুমারস্বামীর জীবনকথা। তাঁর জীবনের লক্ষ্যই ছিল ভারতবর্ষের ধর্ম ও শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে পৃথিবীর বিদগ্ধজনের কাছে সত্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটন আর সত্য ব্যাখ্যান করা। এই কাজে তাঁর তুল্য যোগ্যতা সেদিন আর কারো ছিল না। পাশ্চাত্যের নিকট তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম সাংস্কৃতিক দূত।

১৮৭৭' ২২ আগস্ট। প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য-নিকেতন, রমণীয় সিংহল-দ্বীপের এক সম্রান্ত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন তামিল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষণজন্মা কুমারস্বামী। পিতামাতার তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান। পিতা স্যর মুটু কুমারস্বামী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে একজন কৃতবিদ্য ব্যবহারজীবী হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তখনকার ইংলণ্ডের বিদগ্ধ সমাজেও তিনি সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য। এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম যিনি ব্যারিস্টাররূপে ইংলণ্ডে প্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, আবার ভিক্টোরিয়ার সময়ে তিনিই ছিলেন প্রথম এশীয় যিনি দুর্লভ 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁকে আধুনিক সিংহলের অন্যতম নির্মাতাও বলা হয় এবং সিংহলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর একটি গৌরবজনক ভূমিকা ছিল। লণ্ডনে অবস্থানকালে কেন্টের এক বিশিষ্ট পরিবারের বিদুষী ও প্রিয়দর্শিনী কন্যা এলিজাবেথ ক্লে বিবির সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে স্যর মুটুই ছিলেন ভারত-সংস্কৃতির একজন বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা। পিতার এই প্রতিভা পুত্র আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণভাবেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। আনন্দের বয়স যখন দুই কি আড়াই বছর তখন স্যর মুটুর মৃত্যু হয়। তখন শিশুপুত্রকে মানুষ করার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন লেডি কুমারস্বামী। স্বামীর মৃত্যুর পর লেডি কুমারস্বামী ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করে, স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করতে থাকেন। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে পুত্র যাতে মানুষ হয় সেজন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি, অর্থব্যয়েও কার্পণ্য করেননি। ১৯৩৮ সালে ৮৮ বছর বয়সে লেডি কুমারস্বামী যখন প্রয়াত হলেন তখন তাঁর পুত্র অদ্বিতীয় শিল্পশাস্ত্রী হিসাবে বিশ্বজোড়া খ্যাতিলাভ করেছেন। শৈশবে পিতাকে হারিয়ে, তাঁর স্নেহময়ী মায়ের মধ্যে তিনি যেন পিতা ও মাতা

দু'জনকেই পেয়েছিলেন, এমনি কর্তব্যপরায়ণা ও দায়িত্ববোধসম্পন্না মহিলা ছিলেন আনন্দ-জননী। ইংলণ্ডে বসবাস করলেও সিংহলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি কোন দিন। গ্লাউসেসটারসায়ারে স্টোনহাউসে অবস্থিত ওয়াইক্লিফ কলেজে শিক্ষা-লাভের পর, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হলেন তরুণ আনন্দ। এ্যাপোলোসদৃশ সুন্দর চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, মার্জিত কথাবার্তা, মর্যাদাব্যঞ্জক আচরণ—সহজেই তিনি কলেজের সহপাঠী ও অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। অধ্যাপকরা তাঁর প্রতিভার প্রশংসা করলেন এবং এই ছাত্রটি যে ভবিষ্যতে যশস্বী হবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী তাঁদের কেউ কেউ করেছিলেন। ছাত্রজীবনেই আনন্দ বিজ্ঞানের প্রতি, বিশেষ করে ভূতত্ত্ব ও খনিবিজ্ঞান (Geology and Mineralogy)—এই দুটি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাইশ বছর বয়সে তিনি লণ্ডনের জিওলজিক্যাল সোসাইটির ত্রৈমাসিক পত্রিকায় সিংহলের পাহাড়-পর্বত ও গ্রাফাইট সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে, বিজ্ঞানীমহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যথাসময়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে তরুণ কুমারস্বামী দীর্ঘকাল বাদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সিংহলের খনি ও ভূতত্ত্ববিভাগের প্রথম অধিকর্তা নিযুক্ত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। কয়েক বছর পরে সিংহলের ভূতত্ত্ব-সম্পর্কে তাঁর মৌলিক কার্যের জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়-তাঁকে 'ডক্টরেট ইন সায়ান্স' (D.Sc) উপাধিতে ভূষিত করেন।

সিংহলে থাকতেই তিনি পাশ্চাত্য শিল্প-সভ্যতার বিধ্বংসী প্রভাব অনুভব করেছিলেন এবং এর ফলে স্বদেশের চারু ও কারুশিল্প, স্বদেশের জাতীয় সংহতি সবকিছু বিনষ্ট হতে বসেছিল। তাঁর যেন চোখ খুলে গেল। সরকারী কাজে সিংহলের পাহাড়-পর্বত ও অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে তিনি এইখানকার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে যেন এক অকল্পিত রূপলোকের সন্ধান পেলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার দাবদাহ থেকে স্বদেশের শিল্প ও সংস্কৃতি কেমন করে রক্ষা পাবে—এইসব চিন্তা করতে করতে তাঁর মনোজগতে জাগল এক নতুন অনুভূতি। এইভাবে কেটে গেল পাঁচ বছর। ভূতাত্ত্বিক ক্রমে হয়ে ওঠেন শিল্পকলারসিক। তারপর এই শতাব্দীর সূচনাকালে, ১৯০৬ কি ১৯০৭ সালে আনন্দ কুমারস্বামী সরকারী কর্মে ইস্তফা প্রদান করে চলে এলেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত শিল্পতীর্থ ভারতবর্ষে। সিংহল ভারতেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ, সিংহলের শিল্পচেতনার উৎস ভারতবর্ষ, এই সিদ্ধান্তে তাঁর ছিল অটল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের-বশবর্তী হয়ে, তীর্থযাত্রীর মন ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনি এলেন ভারতবর্ষে। শুরু হয় তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়। ভারতের লুপ্ত এবং অপ-ব্যাখ্যাত শিল্পমহিমা উপলব্ধি করবার জন্য প্রায় এক দশককাল ধরে তিনি সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি আর অন্তরে নিবিড় অনুভূতি নিয়ে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের স্থানগুলি পর্যটন করতে থাকেন। এই সময়েই তিনি জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ও বিদগ্ধ ঠাকুর পরিবারের রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তখন থেকেই কবির সঙ্গে

তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রপ্রতিভার তিনি বিশেষ অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন।

ভারতের শিল্পতীর্থ পর্যটন ও পরিক্রমা যখন শেষ হলো, তখন তাঁর মূল্যবান সংগ্রহগুলি নিয়ে বারাণসীধামে (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষের দুটি জায়গা কুমারস্বামীর খুব ভালো লেগেছিল; তার একটি হলো কলকাতা, অপরটি কাশী) একটি মিউজিয়াম স্থাপন করে তাঁর আরব্ধ কাজে আত্মনিয়োগ করবেন—এই ছিল কুমারস্বামীর অন্তরের অভিলাষ। কিন্তু কি তৎকালীন বিদেশী সরকার, কি এই দেশের সঙ্গতিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি, কেউই তাঁর এই মহৎ কাজে সহায়তা করতে, এমন কি মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন করতে এগিয়ে আসেন নি। অতঃপর ১৯১৭ সালে তিনি আমেরিকা চলে যান সেখানকার পৃথিবী-বিখ্যাত বোস্টন মিউজিয়ম অব ফাইন আর্টস-এর রিসার্চ-ফেলো নিযুক্ত হয়ে। তাঁর সংগৃহীত শিল্পদ্রব্যগুলি বোস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ ক্রয় করেন কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে। ভারতের পক্ষে এটা যে কত বড়ো ক্ষতি ছিল তা বলবার কথা নয়। উত্তরকালে এই মিউজিয়মের প্রাচ্য বিভাগটির (পারস্য, আরব, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান ও ইন্দোনেশিয়া) তিনি 'কীপার' (Keeper) বা তত্ত্বাবধায়ক দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানিত পদ লাভ করেছিলেন। তাঁরই প্রতিভা ও যত্নে এই মিউজিয়মের প্রাচ্য বিভাগটি একটি প্রকৃত শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয় ও সমগ্র পৃথিবীর শিল্পানুরাগীদের আকৃষ্ট করে। তিনিই হয়ে উঠেছিলেন বোস্টন মিউজিয়মের যেন প্রাণপুরুষ এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই সেদিন ওদেশে এক নবীন গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়েছিল যাঁরা ভারত-শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মিউজিয়মের বুলেটিনে ভারতশিল্প বিষয়ে তাঁর অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

যে ত্রিশ বৎসরকাল তিনি বোস্টন মিউজিয়মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে একদিকে তাঁর লেখনী চলেছে অক্লান্ত ভাবে, অন্যদিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে অজস্র বক্তৃতা করেছেন। এই বক্তৃতাগুলিও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে তাঁর খ্যাতিকে বহুদেশে প্রসারিত করে দিয়েছিল। তাঁর রচিত শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো তিনটি—(i) Introduction to Indian Art, (ii) Dance of Siva, (iii) History of Indian and Indonesian Art. শেষোক্ত গ্রন্থটিতে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেখে বিস্মিত হতে হয়। ভারতশিল্প সম্পর্কে তাঁর গবেষণালব্ধ ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্তগুলির অধিকাংশই পরবর্তিকালের গবেষকদের দ্বারা অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলেই স্বীকৃত হয়েছে।

বোস্টন মিউজিয়মের কাজ থেকে অবসর নেবার পর ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করল, তখন তাঁর মূল্যবান গ্রন্থাগারটিসহ কুমারস্বামী-দম্পতি এই দেশেই ফিরে হিমালয়ের পাদদেশে কোন এক নিভৃত স্থানে জীবনের শেষ দিনগুলি যাপন করবেন—এই ইচ্ছা কুমারস্বামী প্রকাশ করেছিলেন। উত্তরপ্রদেশের আলমোড়াতে তাঁর

বাসের জন্য একটি স্থানও সরকারী ভাবে ঠিক করা হয়, কিন্তু ভারতে তিনি আর ফিরে এলেন না। তার পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বোস্টনের সন্নিকটস্থ তাঁর নিজস্ব বাসভবনে কুমারস্বামীর মৃত্যু হয়। তাঁর জীবনব্যাপী ধ্যানের মধ্যে ফুটে উঠেছিল ভারতশিল্পের মর্মকথা, ভারতের ধর্ম ও দর্শনের নিগূঢ় পরিচয়। যখন তাঁর মুখে আমরা শুনি—'যদি ভারতবর্ষের শিল্প ও সংস্কৃতির মহিমা ও মর্ম বুঝতে চাও, তবে যাও অজন্তা, ইলোরা ও মহাবলীপুরে, অথবা একবার পরিদর্শন করে এসো নালন্দা, রাজগৃহ অথবা কোণারকের ধ্বংসাবশেষগুলি। তাহলে তোমাদের দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ভারতের অতীত তার সকল মহিমা, সকল সৌন্দর্য নিয়ে, কাশী ও হরিদ্বারের গঙ্গার স্রোতোধারার সংগীতমধুর কলতানের মধ্যে শুনতে পাবে বিগতকালের কণ্ঠস্বর।...যুগ-যুগান্তের ভারত মরেনি; অজন্তা-ইলোরার ভাস্কর্য ও চিত্রাবলীতে, মীনাক্ষীমাদুরা-পুরী-ভুবনেশ্বরের মন্দিরের শিল্পকর্মে, এবং তাঞ্জোরের নটরাজ মূর্তির নৃত্যছন্দের মধ্যে বেঁচে আছে সেই প্রাচীন ভারত তার সৃষ্টির শেষ কথা বলার জন্য'—তখন আমাদের চিন্তা ও চেতনায় আনন্দ কুমারস্বামীর যে মূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য ও ভক্তির সঙ্গে প্রণম্য। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো, ময়ূর-পুচ্ছধারী ভারতীয়দের উদ্দেশে তিনি বাণী দিলেন—'Be yourself' এই বাণী আজো তার মূল্য হারায়নি। ছোট্ট কথা, কিন্তু কী গভীর অর্থবহ!

এই বাণীর উদ্গাতাকে বিস্মৃত হওয়া কঠিন। বিস্মৃত হওয়া কঠিন নটরাজ মূর্তির যথার্থ ব্যাখ্যাতাকে যিনি তাঁর সকল অস্তিত্বের মধ্যে ভারতশিল্পের ধ্রুপদী পরিচয় পেয়েছিলেন, নীরব পাষাণে ও প্রস্তরে, গুহাচিত্রে, রাজপুত চিত্রকলার ভাবমণ্ডিত অপূর্ব বর্ণসুষমার মধ্যে সমাহিত ছিল যে রূপ, যে তত্ত্ব, যে রহস্য, তাকেই যিনি অনুধাবন করেছিলেন অন্তর দিয়ে, বিচার-বুদ্ধি দিয়ে, সেই কুমার-স্বামীর ধ্যানের ভারতকে, যখন আমাদের জ্ঞানের মধ্যে পাব তখনি আমরা এই শিল্পবেত্তা মানুষটির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারব। বিবেকানন্দ ভারতকে স্থাপন করলেন 'বিশ্বধর্ম মহাসভায়, রবীন্দ্রনাথ তাকে বসালেন সগৌরবে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে, আর বিশ্বের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে ভারতের সম্মানিত আসন নির্ধারণ করলেন ভারতবন্ধু আনন্দ কুমারস্বামী।

ইসাডোরা ডানকান

(১৮৭৮ ১৯২৮)

সমুদ্রতীরবর্তী স্থান স্যানফ্রানসিসকো শহরে ১৮৭৮ সালের ২৭ মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত নর্তকী ইসাডোরা ডানকান। সাগর তরঙ্গের ছন্দ থেকেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের প্রথম সংকেত পেয়েছিলেন তিনি। এ কথা ইসাডোরা নিজেই বলেছেন তাঁর 'My Life' নামক চাঞ্চল্যকর ও আত্মসচেতন আত্মচরিতে। তাঁর বাবা ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক তাঁর মা ছিলেন ভক্তিপরায়ণা আইরিশ ক্যাথলিক। ইসাডোরার মা তাঁর চারটি পুত্র-কন্যাকে নিজেই মানুষ করেছিলেন এবং প্রথম জীবনে যন্ত্র-সংগীত যতটুকু শিখেছিলেন তারই সাহায্যে তিনি তাঁর চারটি ছেলেমেয়েদের পিয়ানো বাজাতে শিখিয়েছিলেন, শিখিয়েছিলেন তাদের কবিতা আবৃত্তি করতে। আর কিছু সাহিত্য শিক্ষা দেওয়ার প্রবণতা ইসাডোরার জীবনে শৈশবকাল থেকেই যেন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল নাচবার অদম্য প্রবণতা। যখন তাঁর বয়স ছয় বছর তখন তিনি পাড়া থেকে ছোট ছোট ছয়টি ছেলেমেয়ে সংগ্রহ করে বাড়িতে একটি নাচের স্কুল খুলেছিলেন।

মেয়েকে নৃত্যপটিয়সী করে তুলবার জন্য মিসেস ডানকানের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। যখন তাঁর বয়স সতেরো বছর তখন মিসেস ডানকান মেয়েকে নিয়ে এলেন শিকাগোতে। ইচ্ছা ছিল মেয়ের একক নৃত্যের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন। এই ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশ্য প্রদর্শনী। সাফল্যমণ্ডিত একটি সপ্তাহের পর, অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর নাচ দেখাতে চাইলেন না। শিকাগোতে ইসাডোরা মিরোস্কি নামে এক পোলিশ চিত্রশিল্পীর প্রেমে পড়লেন। এক বিদেশী শিল্পীর প্রতি ইসাডোরাকে আকৃষ্ট হতে দেখে, মিসেস ডানকান কন্যাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন নিউইয়র্ক শহরে। শিকাগো পরিত্যাগ করে যাওয়ার আগে রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত প্রযোজক অগাস্টিন ডালির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল। স্বনামধন্য এই প্রযোজকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় ইসাডোরা তাঁকে বলেছিলেন—'আমি নাচ আবিষ্কার করেছি—আবিষ্কার করেছি সেই শিল্প যা দু'হাজার বছর হলো হারিয়ে গেছে। আমাদের সমগ্র যুগকে এক বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করবে এমন একটি আইডিয়া আপনার কাছে রাখছি।'

দেখতে দেখতে বিশের কোঠায় পৌঁছলেন ইসাডোরা। নবযৌবনা ইসাডোরাকে দেখতে যেন আরো সুন্দর, আরো সতেজ, তবে অসাধারণ কিছু নয়। তাঁর সৌন্দর্য ছিল মুখের সুডোল গঠনে, দুই চোখে। হাজার হাজার আমেরিকান মেয়েদের থেকে তাঁর ছিল একটা আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য।

লণ্ডনে এসে ডানকানরা তাঁদের অধিকাংশ সময় ব্রিটিশ মিউজিয়মে অতিবাহিত করতেন। এখানকার বিরাট গ্রন্থাগারটি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। লণ্ডনে এসে অনেক স্বনামধন্য লোকের সঙ্গে ইসাডোরা পরিচিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইংলণ্ডের যুবরাজ ও বিখ্যাত অভিনেত্রী এলেন টেরি। এখানে তখন ফ্র্যা.ক বেনসনস্ শেক্সপীয়ার কোম্পানী নামে একটি থিয়েটারের দল ছিল, শুধু শেক্সপীয়ারের নাটক অভিনীত হতো এই থিয়েটারে। ইসাডোরা এই থিয়েটারগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত হলেন। কিন্তু তাঁকে Midsummer Nights Dream নাটকে যখন প্রথম পরী ভিন্ন অন্য কোন ভূমিকা দেওয়া হলো না, তখন ইংলণ্ডকে বিদায় জানিয়ে তাঁরা চলে গেলেন প্যারিসে। তখন তাঁর বয়স বাইশ। কলা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান প্যারিসে এসে তিনি যেন অন্য ইসাডোরা হয়ে গেলেন। তিনি এইসময়ে গ্রীক চিত্রকলা ও ভাস্কর্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি তখনকার বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রদাঁর (Rodin) নির্মিত ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি আর জাপানী নর্তকী সাদা ইয়াকোর বিয়োগান্ত নৃত্য দেখেও তিনি যারপর নাই চমকিত হয়েছিলেন। এই সময়েই ইসাডোরা ঘোষণা করেছিলেন, 'নৃত্যকলার উৎস সন্ধানে আমি এখন ব্যস্ত আছি। আমি সেই নাটক আবিষ্কার করতে চাই যা হবে দেহভঙ্গিমার ভেতর দিয়ে মানবাত্মার স্বর্গীয় অভিব্যক্তি।'

নাচ সম্বন্ধে ইসাডোরার মতবাদ যতই বিতর্কিত হোক না কেন, তাঁর জীবিত-কালে পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পী, চিত্রকর, গায়ক, সুরকার, অভিনেতা একবাক্যে তাঁর প্রতিভাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। রদাঁর মতো ভাস্কর ইসাডোরার নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—'Isadora has attained sculpture and emotion effortlessly......She has properly unified Life and the Dance.' বাস্তবিক জীবন ও নৃত্যকে সাবলীল দেহভঙ্গিমার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা কম প্রতিভার পরিচায়ক নয়। নাচের ভেতর দিয়ে জীবনকে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি তাঁর কুমারীত্বকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। ইসাডোরার জীবনে প্রেমিকের সীমা-সংখ্যা ছিল না বললেই হয়।

অতঃপর আমরা দেখতে পাই প্যারিস ত্যাগ করে ডানকানরা গেলেন পূর্ব-য়ুরোপে—বার্লিন, ভিয়েনা ও বুডাপেস্টে। সর্বত্রই তাঁর আড়ম্বরহীন নৃত্য সকলের চিত্ত জয় করলো। সজ্জাবিহীন মঞ্চে অতি সাধারণ ভাবে সজ্জিতা ইসাডোরার নৃত্যভঙ্গিমার মধ্যে এমন একটি স্বর্গীয় জিনিস থাকত যা ছিল রীতিমত চিত্তস্পর্শী। বুডাপেস্টে এসে তিনি একটি নতুন ধরনের নৃত্য উদ্ভাবন করলেন—নাম দিলেন 'The Blue Danube' এবং এইখানে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর প্রথম প্রেমিককে। কিন্তু তাঁর জীবনের এই নতুন রোমিও যখন তাঁর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করলেন তখন ইসাডোরা আবার তাঁর শিল্পকে নতুন করে আঁকড়ে ধরলেন এবং শিল্পজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরে এলেন তিনি জার্মানিতে। বার্লিন অপেরা হাউসে প্রথম রজনীতে একটি ছোট্ট লাল টিউনিক পরিধান করে ইসাডোরা যখন দর্শকদের

অভিবাদন করে শুরু করলেন তাঁর 'Dance of the Revolution', তখন দর্শকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে কেবল বলতে থাকে 'encore, encore', অর্থাৎ 'আবার, আবার'। মিউনিকে যখন এলেন তখন সেখানকার ছাত্ররা গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে, শহরের রাজপথ দিয়ে বিশ্বের সেরা নর্তকীকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ইসাডোরার বয়স যখন ছাব্বিশ বছর তখন তিনি তাঁর মা এবং ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে এলেন গ্রীসে। সেই তাঁর প্রথম আগমন শিল্প ও সভ্যতার পীঠস্থানে। এখানে পার্থেননের বিশাল ধ্বংসাবশেষ দেখে ইসাডোরা যারপর নাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। ডানকানরা চিরকালের জন্য গ্রীসেই অবস্থান করতে চাইলেন। গ্রীসের মৃত্তিকায় পদার্পণ করেই ইসাডোরার মনে হয়েছিল তিনি যেন তাঁর স্বদেশে এসেছেন। এইবার বার্লিনে এসে ইসাডোরা তাঁর জীবনের একটি স্বপ্নকে চরিতার্থ করেছিলেন; সহোদরা এলিজাবেথের সহযোগিতায় তিনি স্থাপন করলেন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান—দি ইসাডোরা ডানকান স্কুল।

সাতাশ বছর বয়সে ইসাডোরার জীবনে এলেন অভিনেত্রী এলেন টেরির ছেলে গর্ডন ক্রেগ। ক্রেগ ছিলেন চিত্রকর ও রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট ডিজাইনার। গর্ডনের রূপমুগ্ধা ইসাডোরার মনে হয়েছিল তিনি এবং গর্ডন বিভিন্ন নন—তাঁরা দু'জনে যেন একই সত্তা, একই আত্মার দুটি স্বতন্ত্র বিকাশ। তাঁদের প্রণয়মধুর জীবন কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ছিল। ইসাডোরা নিজেই বলেছেন—'আমাদের ভালবাসা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি'। প্রেমহীন জীবন যখন তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল তখন ইসাডোরা চলে এলেন রাশিয়াতে। এখানে প্রায় এক বৎসরকাল অতিবাহিত করেন ও তাঁর নৃত্য রাশিয়ার নর-নারীদের জীবনে রীতিমতো আলোড়ন নিয়ে এসেছিল।

আবার নিউ ইয়র্কে। জার্মান সুরকার সুবার্ট ও বীঠোফেনের সুর-সংগীত তখন ইসাডোরার নৃত্যের ছন্দে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল অপরূপ সুষমা নিয়ে। বীঠো-ফেনের বিখ্যাত সুরসৃষ্টি Seventh symphony তাঁর নৃত্যে অপরূপ রূপ পেয়েছিল। বত্রিশ বছর বয়সে তিনি আবার এলেন ফ্রান্সে। এবার তাঁর জীবনে এলেন একজন প্যারিস গায়ক—লক্ষপতি লোহেনগ্রিন। তাঁর নিজস্ব স্টীমারে চড়ে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে ইতালি, মিশর প্রভৃতি দেশ ঘুরে, তাঁরা এলেন ভার্সাইতে। সেখান থেকে আবার নিউ ইয়র্ক। লোহেনগ্রিন তখন 'ববাহের প্রস্তাব দিলেন। ইসাডোরা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বিবাহবন্ধন তাঁর মতো স্বাধীনচেতা শিল্পীর পক্ষে নয়। কেন? এর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন—'I shunned marriage because I refuse to be dependent on any man.' তাঁর ভিতরের স্বাধীন সত্তা কোনদিনই তাঁকে গতানুগতিক জীবন যাপন করতে দেয়নি। শিল্পের বেদীমূলে এই নর্তকীর আত্মসমর্পণ ছিল সম্পূর্ণ এবং স্বাভাবিক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ইসাডোরা আবার তাঁর পূর্ব জীবনে ফিরে এলেন। দেখা দিল নতুন সমস্যা, নতুন আঘাত। তাঁর সাধের স্কুল প্রথমে হাসপাতালে পরিণত হয়ে গেল—রক্তাক্ত ক্ষত ও মৃত্যুর নিকেতন। পরে সেটা হলো একটি

কারখানা—বিষাক্ত গ্যাস তৈরির কারখানা। নাচের একটি আকাদেমি প্রতিষ্ঠা করা তাঁর অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল—সেই স্বপ্ন তখনো তিনি পোষণ করতেন, এবং ১৯২১ সালে, সোভিয়েত সরকারের নিমন্ত্রণে ইসাডোরা রাশিয়া গিয়ে মস্কোতে একটি নাচের স্কুল খুলেছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি বিবাহ করলেন সাতাশ বছর বয়সের অর্ধ-উন্মাদ রাশিয়ান কবি সার্জ-এসেনিনকে। ইনি পরে আত্মহত্যা করে তাঁকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন।

১৯২৭। স্থান—প্যারিস। উনপঞ্চাশ বছর বয়সে ইসাডোরা দর্শকদের উপহার দিলেন তাঁর অলৌকিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—তঁর সর্বোত্তম কনসার্ট। গায়ে একটি টকটকে লাল রঙের উত্তরীয় (scarf) চাপিয়ে তিনি যখন রঙ্গমঞ্চে তাঁর গুণমুগ্ধ দর্শকদের অভিবাদন করলেন তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে, এই উত্তরীয়টি হবে তাঁর প্রাণনাশের কারণ। এর ঠিক দু'মাস পরের ঘটনা। সেদিন তারিখ ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর। সেই লাল স্কার্ফটি গায়ে দিয়ে হুডখোলা স্পোর্টিং গাড়িটি চড়ে সকালবেলায় বেড়াতে বেরুলেন ইসাডোরা। পিছনের সীটে বসেছেন তিনি, সামনের সীটে চালক। গাড়িতে তৃতীয় জন আর কেউ ছিল না। স্কার্ফটির একটি প্রান্ত কখন যে তাঁর পিঠ থেকে নেমে গাড়ির একটি চাকার সঙ্গে ঠেকে গিয়েছিল তিনি তা ভ্রূক্ষেপই করেন নি। গাড়ি যেইমাত্র চলতে আরম্ভ করেছে অমনি চাকায় স্কার্ফের খুঁটটি লেগে তাঁর গলাটি নিঃশব্দে মুচড়ে গেল। তেমনি নিঃশব্দে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হলো ইসাডোরা ডানকানের। তাঁর এই শোচনীয় মৃত্যু তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধদের ভারাক্রান্ত করে তুললো। এমন শোচনীয় মৃত্যুর কথা কেউ কখনো শুনেছে? ইসাডোরার মৃত্যুতে একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল—'She was the first to bring out in her dancing the meaning of music, first to dance the music and not dance to the music.' ইসাডোরা-প্রতিভার বিশ্লেষণ বোধ হয় এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না—সংগীতের তালে তিনি নৃত্য করতেন না, বরং তাঁর নৃত্যের মধ্যে সংগীতই যেন মূর্ত হয়ে উঠতো। ইসাডোরার তাই মৃত্যু নেই।

আলবার্ট আইনস্টাইন

(১৮৭৯-১৯৫৫)

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব—এই শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে মূল্যবান তত্ত্ব। অথচ ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রায় অগ্রসর হওয়ার জন্য সহায়ক উপকরণের মধ্যে ছিল একটি পেন্সিল আর ছোট একটি খাতা। কোনো বিরাট ল্যাবোরেটরি তাঁর প্রয়োজন হয়নি, মস্তিষ্ক ও মেধ-ই ছিল তাঁর গবেষণাগার। সেই গবেষণাগারের সাহায্যে দূরবীণ যন্ত্র দ্বারা যতদূর দেখতে পাওয়া যায়, তার চেয়েও অনেক দূর পর্যন্ত তিনি দেখতে পেতেন। অনুবীক্ষণ যন্ত্র কাছের জিনিসকে স্পষ্টতর করে তোলে। তার চেয়েও স্পষ্টভাবে তিনি যে কোনো জিনিস দেখতে পেতেন। দৃশ্য ও অদৃশ্য যেখানে গিয়ে মিলেছে আইনস্টাইন একাকী আপন মহিমায় সেখানে সেই মোহনায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তিনি এক জগৎ ..কে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে অন্য জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করে গিয়েছেন। তাই তাঁকে একাধারে একজন বিজ্ঞানী ও প্রাজ্ঞজন বলতে বাধে না।

দক্ষিণ জার্মানির উলম শহরে ১৪ই মার্চ, ১৮৭৯ তারিখে আইনস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন। এই আইনস্টাইন-পরিবার সঙ্গতি-সম্পন্ন ছিল। বাবা ছিলেন একজন ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর নিজস্ব একটি ব্যবসার প্রতিষ্ঠান ছিল এবং সেই সূত্রে তাঁর জন্মের এক বছর পরে এই পরিবারটি ইতালীর মিলান শহরে এসে বসবাস করতে থাকেন। তবে আলবার্টের যৌবনকালের বেশির ভাগ মিউনিকে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর বাবার ছিল একটি ইলেক্ট্রো কেমিক্যালের ছোট কারখানা। পিতা ও তাঁর এক অবিবাহিত খুল্লতাত এই দু'জনে মিলে কারখানাটি চালাতেন। তাঁর মায়ের প্রবণতা ছিল সংগীতে, বিশেষ করে বীঠোফেনের সংগীত। মায়ের এই সংগীত প্রবণতার ফলে বালক আইনস্টাইনকে ছয় বছর বয়সেই বেহালা শিখতে হয়েছিল। সেই থেকে বেহালা ছিল তাঁর সারা জীবনের সাথী—তাঁর চিত্ত-বিনোদনের উপকরণ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদকদের মধ্যে অন্যতমরূপে তিনি গণ্য হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি যে খুব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা নয়. তবে দর্শনশাস্ত্রের তিনি একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন, এবং চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি ক্যাণ্টের বই পড়ে শেষ করেছিলেন। পনর বছর বয়সেই তিনি ইউক্লিড, নিউটন ও স্পিনোজা পড়ে শেষ করেন। সতর বছর বয়সে তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডে একটি পলিটেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এখান থেকে দু'বারের চেষ্টায় তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হন। কিন্তু তরুণ আইনস্টাইন আকৃষ্ট হলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে, ব্যবসার জগতের লাভ-লোকসানের প্রতি

নয়। মানুষের আন্তর প্রেরণাই যে তার ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করে দেয়—এটি তাঁর জীবনে একটি পরীক্ষিত সত্য।

অতঃপর পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভের জন্য তিনি কৃতসংকল্প হলেন। তিনি যখন জুরিচের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তিনি ঐ শহরের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন, পরে আর একটি স্কুলে। বাইশ বছর বয়সে তিনি সুইস নাগরিকত্ব প্রাপ্ত করেন। স্নাতক হওয়ার পর ১৯০১ সনে তাঁরই পূর্ব পরিচিতা এক সহপাঠিনীকে তিনি বিবাহ করেন। এই তরুণীর নাম মিলেভা ম্যারেক এবং গণিতশাস্ত্রে এঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। বিয়ের পর আইনস্টাইন বার্ন শহরের একটি পেটেন্ট অফিসে চাকরি গ্রহণ করলেন। সেই বয়সে আইনস্টাইন অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ছিলেন, তাঁর স্বভাবের মধ্যে এমন একটি মিষ্টতা ছিল যা সকলকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করত। অতি সযত্নে ছাঁটা ঘন কৃষ্ণবর্ণের গুম্ফরাজি, মাথার উপর পরিচ্ছন্নভাবে বিন্যস্ত একরাশ কালো চুল—তাঁর আকৃতির মধ্যে এই দুটিই ছিল লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাধারণের মধ্যে তিনি যে একজন অ-সাধারণ, এটা শুধু বুঝতে পারা যেত তাঁর আয়ত চোখ দুটির দিকে তাকালে—সে চোখের দৃষ্টিতে ছিল যুগপৎ চিন্তার গভীরতা আর বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনে সদা চঞ্চল ব্যগ্রতা। তাঁর সমগ্র সত্তাই ছিল একটা অদৃশ্য শক্তির দ্যোতনায় বিমণ্ডিত, উৎসাহ উদ্দীপনায় আন্দোলিত। যে কোনো বিষয় তিনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারতেন।

১৯০৫। বার্লিনের একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ত্রিশ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। প্রবন্ধের বিষয়—'On the Electrodynamics of Moving Bodies'; লেখকের নাম—আলবার্ট আইনস্টাইন। প্রবন্ধের শিরোনামা দেখে এটাকে কোনো উৎসাহী ছাত্রের একটি গবেষণাপত্র বলে অনেকেরই মনে হয়েছিল কিন্তু এই প্রবন্ধটির মধ্যে বিজ্ঞান-জগতের যে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের বার্তা নিহিত ছিল—যে আবিষ্কারের ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠন ও জড়পদার্থের গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের এতদিনের ধারণা বদলিয়ে যাবে—পনর বছরের আগে তা কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি। ১৯২০ সনে "Relativity, The Special and General Theory" নামে আইনস্টাইনের প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হলো তখন সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানী ও গাণিতিকদের মধ্যে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হলো।

শুধু কি আলোড়ন? $E=mc^2$ এই ফরমুলাটি সেদিন যেন তাঁদের চ্যালেঞ্জ জানাল। আইনস্টাইন তাঁর উদ্ভাবিত সমগ্র তত্ত্বটিকে এই একটিমাত্র ফরমুলার মধ্যে বিধৃত করেছিলেন। আগেকার বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত ছিল যে জড়পদার্থকে সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না অর্থাৎ, "Matter can neither be created nor destroyed" আইনস্টাইন অঙ্ক কষে প্রমাণ করলেন ঠিক এর বিপরীত সিদ্ধান্ত। তিনি বললেন জড়পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, আর

শক্তিকে জড়পদার্থে। প্রকাশিত হলো পৃথিবীতে একটি নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব— যাকে বলা হয়েছে এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বিজ্ঞানী সমাজে তুমুল কৌতূহলের সৃষ্টি করল আইনস্টাইনের এই থিওরি। ব্রহ্মাণ্ড, স্থান, কাল ও মহাকর্ষ সম্পর্কে পরিবর্তিত হয় মানুষের এতকালের ধারণা। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বে 'গতি' (Motion) সম্পর্কে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীদের নির্ভর করতে হতো নিউটনের Laws of Motion-এর উপর যা তিনি দুশো বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন। দুশো বছর ধরে যা চলে আসছে, তা ঐ একটি ফরমুলায় উল্টে যাবে? অঙ্ক কষে তিনি এর যত প্রমাণই দিন না কেন, বিজ্ঞানীরা কিন্তু সহজে আইনস্টাইনের এই থিওরি মেনে নিতে পারলেন না। অঙ্কের প্রমাণই তো বড়ো প্রমাণ নয়, ল্যাবোরেটরিতে এর অভ্রান্ততা প্রমাণিত হওয়া দরকার। অমনি পৃথিবীর সকল দেশের বিজ্ঞানীরা তাঁদের ল্যাবোরেটরিতে, কোথাও বা মানমন্দিরে (Observatory) পরীক্ষা করতে থাকেন ঐ ফরমুলাটির সত্যতা যাচাই করতে। বিতর্কের ঝড় বয়ে যায় বিজ্ঞানী সমাজে। অবশেষে ল্যাবোরেটরির পরীক্ষায় আপেক্ষিক তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণিত হলো। ১৯২১ সালে তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো।

আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার চার বছর, পরে সেই পেটেণ্ট অফিসের করণিক আইনস্টাইনকে আমরা দেখতে পাই জুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে এবং এখানে কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর তিনি যোগদান করেন প্রাগ, বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবশেষে তিনি বার্লিনের জগদ্বিখ্যাত কাইজার বিইলহেলম ইনস্টিট্যুটের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন এবং এই সময়েই তিনি আর একটি দুর্লভ সম্মান লাভ করেন—তিনি প্রাসিয়ান য়্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর বয়স যখন চল্লিশ তখন আইনস্টাইন পৃথিবী ভ্রমণে বেরুলেন; ঐ সময়ে দীর্ঘকাল ধরে তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান ও প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশ পরিদর্শন করেছিলেন। সর্বত্র তিনি সানুরাগ অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন।

বিজ্ঞানের সাধক আইনস্টাইন কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেই নিরস্ত ছিলেন না। জীবনের অর্ধশতাব্দীকাল তিনি বিজ্ঞানের গবেষণায় অতন্দ্রভাবে নিযুক্ত ছিলেন। সারাজীবন তিনি স্থান ও কালের (Time and Space) রহস্য উদ্ঘাটনে অতিবাহিত করেছিলেন। সম্ভাব্য অকৃতকার্যতায় তিনি কোনোদিন বিচলিত হতেন না। মানুষের পক্ষে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন যে অসম্ভব একথা তিনি জানতেন এবং জানতেন বলেই না এই বিজ্ঞানসাধক বলতে পেরেছিলেন— "The most beautiful thing we can experience is the mysterious" 'রহস্যের অভিজ্ঞতাই বিজ্ঞানীর জীবনের সর্বোত্তম অভিজ্ঞতা।'

এইবার মানুষ আইনস্টাইনের কথা। ১৯৩৩ সনে জার্মানিতে যখন হিটলারের অভ্যুদয় হলো ও নাৎসীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো তখন আইনস্টাইন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তখন ইংলণ্ড ও

যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা দিতে বেরিয়েছিলেন। হিটলারের য়িহুদী বিদ্বেষের প্রচণ্ডতা জানা গেল যখন আইনস্টাইনের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় ও তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বাতিল করে দেওয়া হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁকে যে সম্মানিত জার্মান নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছিল তাও ফিরিয়ে নেওয়া হয়। বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর প্রতি এইরূপ বর্বরোচিত ব্যবহারে পৃথিবীর সকল সভ্যদেশই জার্মানি ও নাৎসী-নায়ক হিটলারের প্রতি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়েছিল। সেদিন ভাগ্যবিড়ম্বিত এই বিজ্ঞানীকে সকল রাষ্ট্রই সাদর আহ্বান জানিয়েছিল তাঁদের দেশে গিয়ে বসবাস করবার জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে প্রিন্সটনে অবস্থিত ইনষ্টিট্যুট অব অ্যাডভানসড্ স্টাডিজ নামক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে প্রধান অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করেন। ১৯৪০ সনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রতি আইনস্টাইন কোনো দিন আকৃষ্ট হননি; কিন্তু যেখানেই প্রবলের অত্যাচার দেখেছেন সেখানেই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। আসলে তিনি একজন শান্তিবাদী মানুষ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মর্তব্য:—'আমি শান্তিবাদী ঠিকই, কিন্তু যে কোনো মূল্যের পরিবর্তে নয়।' আইনস্টাইন দরিদ্রেরও বন্ধু ছিলেন। নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক অর্থ তিনি একটি অনাথ-আশ্রমে দান করেছিলেন। হিটলারী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তিনি কিছুমাত্র ভীত হননি। মানুষের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন এবং এর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি আছে তাঁর 'The World as I See It নামক বইতে। আন্তর্জাতীয়তা ও মানবিকতায় তিনি যে কতদূর বিশ্বাসী ছিলেন তা উক্ত বইখানি পড়লে জানা যায়। হিরোশিমা নাগাসাকিতে আনবিক শক্তির বিশ্ববিধ্বংসী রূপ দেখে পৃথিবীর রাষ্ট্র-প্রধানদের তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন—"আমি আশা করব যে, মানবসমাজের কল্যাণের জন্যই আনবিক শক্তি ব্যবহার করা হবে।" তিনি জানতেন যে, বিজ্ঞানীদের সাধ্য নেই যে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধিত করে, কোনো যান্ত্রিক উপায়েই এটা সম্ভব নয়। বিদায়ের বেলায় তাই তিনি বলে গিয়েছিলেন—"When we are clear in heart and mind—only then shall we find courage to surmount the fear which haunts the world." শান্তি ও সভ্যতার জন্য উৎসর্গীকৃত এই মনীষীর জীবনের এইটাই বোধ হয় সর্বোত্তম বাণী।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫, ছিয়াত্তর বছর বয়সে মানববন্ধু ও মানবতার উপাসক আইনস্টাইনের মৃত্যু হয়। সারা জীবন ধরে যে মানুষটির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, সুদূর নক্ষত্র লোকের দিকে, তিনি যে সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁর আশেপাশের মানুষকেও দেখতে চেষ্টা করেছেন, এইটাই তো আইনস্টাইনের চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব।

যোসেফ স্ট্যালিন

(১৮৭৯-১৯৫৩)

১৮৭৯ সালের ২১ ডিসেম্বর জর্জিয়ার গোরি নামক এক গ্রামে মাত্র দেড় রুবলের একটি অপরিসর ভাড়াটে বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভবিষ্যৎ রাশিয়ার দ্বিতীয় অধিনায়ক ও জেনারেলেসিমো যোশেফ স্ট্যালিন।[১] তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন ক্রীতদাস। তিনি ছিলেন তাঁর পিতা মাতার চতুর্থ সন্তান।

স্ট্যালিনের শৈশবজীবনে যে তিনটি বিষয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা হলো—প্রকৃতি, ঐতিহ্য ও তাঁর জন্মভূমির লোকগাথা। ছেলেকে 'মানুষ' করবার আগ্রহে স্ট্যালিনের মা তাকে নিকটবর্তী স্থান গোরিতে একটি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তখন তার বয়স নয় বছর। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত মোট পাঁচ বছর তিনি স্কুলে পড়েছিলেন। ঐ বয়সেই তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়ে তাঁর শিক্ষক ও সহপাঠিদের চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন। পড়াশুনায় যেমন, খেলাধুলাতেও তেমনি তিনি ছিলেন সহপাঠীদের অগ্রণী। শৈশবজীবনে স্কুলে পড়বার সময়ে শ্রেণীবিদ্বেষ ও শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন, তা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে করে তুলেছিল এক মহান বিপ্লবী। তিনি যে মেধাবী ছাত্র ছিলেন তার প্রমাণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করে স্ট্যালিন স্কলারসিপ লাভ করেছিলেন। স্কুলে পড়বার সময়ে তাঁর মধ্যে আর একটি শক্তির স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল। তিনি সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন।

স্কলারসিপ লাভ করার পর যোশেফকে তাঁর মা টিফলিস থিওজফিক্যাল সেমিনারিতে ভর্তি করে দিলেন। উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এখানে পড়েছিলেন। কিন্তু ধর্মভাবের লেশমাত্র তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়নি; বরং ঐ সময়টা তিনি গীর্জার বাইরে সিঁড়িতে বসে নিষিদ্ধ বই পড়তেন। শেষে তিনি সেমিনারি থেকে বিতাড়িত হন। এজন্য তাঁর মা ছেলের ওপর খুবই বিরক্ত হয়ে, যোসেফকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। পরিবার থেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যোসেফ নিজেকে ভরণ-পোষণ করবার জন্য টিফলিসের মানমন্দিরে একটা চাকরি নিলেন। তাঁর বয়স তখনো একুশ বছর হয়নি যখন তিনি একটি শ্রমিক বিক্ষোভে যোগদান করেন। কশাক সৈন্যগণ সেই বিক্ষোভ দমন করে। তখন তাঁকে গা ঢাকা দিতে হয়েছিল। বাইশ বছর বয়সে তিনি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির একজন কমিটি সদস্য নির্বাচিত হন। তখন থেকেই শুরু হয়েছিল

১. রুশ ভাষায় 'স্টালিন' কথাটির অর্থ 'Steel' বা ইস্পাত। ইস্পাতের মতোই তাঁর শরীর ছিল সুগঠিত। মাথাও ছিল ইস্পাতের তুল্য কঠিন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবন। সে-জীবন ছিল নিরবচ্ছিন্ন ও বিপৎসঙ্কুল সংগ্রামের জীবন। রাশিয়ার তৈলখনির অঞ্চল বাটুম। স্ট্যালিন বাটুমে এসে এখানকার শ্রমিকদের একটি ধর্মঘট পরিচালনা করেন। এজন্য তিনি ধৃত ও দণ্ডিত হন। জেলে থাকবার সময় লেনিন-সম্পাদিত Iskra (The Spark) কাগজ তিনি গভীর আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন। বাইরের কর্মীদের সাহায্যে তিনি এই পত্রিকা পেতেন। মার্কসীয় দর্শন ও লেনিন কর্তৃক তার ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে তিনি এই কাগজ পাঠ করেই ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে লেনিনের 'ইস্ক্রা' কাগজই স্ট্যালিনের রাজনৈতিক মানসের বনিয়াদ গঠন করেছিল। জেলে থাকতেই তিনি যখন জানতে পারলেন যে, দুটি রাজনৈতিক দল—চরমপন্থী বলশেভিক ও নরমপন্থী মেনশেভিক—দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে, তখন তিনি লেনিন ও অন্যান্য চরমপন্থীদের সঙ্গে হাত মেলালেন। বলশেভিক দলের নেতা লেনিনকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং উত্তরকালে তিনি তাঁর উত্তরসাধক হয়েছিলেন। পরবর্তী বারো বছরের মধ্যে স্ট্যালিন ছয়বার দণ্ডিত হয়ে সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত হয়েছিলেন। জারের আমলে রাশিয়ার চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও সাহিত্যিকদের সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে পাঠানো হতো। প্রত্যেকবারই স্ট্যালিন এখান থেকে পলায়ন করে, তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্ম চালাতেন।

স্ট্যালিনের রাজনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে এই সময়ে উল্লেখযোগ্য একটি দৃষ্টান্ত হলো 'প্রাভদা'; এটি পরে হয়ে উঠেছিল বলশেভিক দলের মুখপত্র। যখন তিনি এক জেল থেকে অন্য একটি জেলে স্থানান্তরিত হতেন তখন সেই বন্দী অবস্থায় তিনি এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। এ বড়ো কম কৃতিত্বের কথা নয়। ১৯১২ সালে এক সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে স্ট্যালিন আবার সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত হন। দু'বছর পরেই য়ুরোপে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের সংবাদ যখন রাশিয়াতে পৌঁছল তখন সেখানকার জনগণের মনে আশা জাগল যে, হয়ত এইবার জারের স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসনের অবসান হবে। তারপর ১৯১৭ সালে যখন সংঘটিত হলো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রুশ বিপ্লব তখন জনগণের সরকার দেশের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই সময়ে অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে স্ট্যালিন মুক্তিলাভ করেন। তাঁর বয়স তখন চল্লিশ বছর যখন স্ট্যালিন পেত্রোগাদে এসে ট্রটস্কি ও লেনিনের সঙ্গে মিলিত হন। লেনিন তখন জার্মানির ভেতর দিয়ে রাশিয়াতে এসে পৌঁছেছেন; ট্রটস্কি আমেরিকা থেকে। ট্রটস্কি ছিলেন লেনিনের খুব প্রিয়।

১৯২৪ সালে লেনিন মারা গেলেন। লেনিন মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উইলে লিখে গিয়েছিলেন, 'কমরেড স্ট্যালিন, পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হওয়ার পর থেকে প্রচুর ক্ষমতা করায়ত্ত করেছেন, কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, তিনি এই ক্ষমতা ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারবেন না। সহকর্মীদের সম্পর্কে তাঁর অশালীন

ব্যবহার দেখে মনে হয় তিনি এই পদের যোগ্য নন। আমি তাই প্রস্তাব করছি, সহকর্মীরা যেন স্ট্যালিনকে এই পদ থেকে অপসারিত করে অন্য কাউকে নির্বাচিত করেন। অন্যদিকে, কমরেড ট্রটস্কির অনেক গুণ, কমিটির মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তিনি যেহেতু অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসপরায়ণ মানুষ সেইজন্য তিনিও ঠিক এই দায়িত্বপূর্ণ পদের উপযুক্ত নন।'

লেনিনের মৃত্যুর পর পার্টি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ত্রিমূর্তি—স্ট্যালিন, জিনোভিয়েভ ও কামানেভ। ট্রটস্কি বাইরে রয়ে গেলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখা গেল যে, স্ট্যালিন দলের এক গোষ্ঠীকে অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লাগালেন ও ট্রটস্কির ক্ষমতা হ্রাস করতে থাকেন। রাজনৈতিক চাতুরির সঙ্গে স্ট্যালিনের মধ্যে দেখা গিয়েছিল নেতৃত্বসুলভ শক্তি এবং এই কারণেই কেউ তাঁর বিরোধিতা করতে সাহস পেত না। তিনি প্রকাশ্যে বললেন, ট্রটস্কি স্বাপ্নিক, তিনি সারা দুনিয়াতে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন, অথচ তিনি বুঝতে চান না যে, বর্তমান অবস্থায় আন্তর্জাতিক বিপ্লব অসম্ভব এবং সমস্ত বৈপ্লবিক প্রয়াস এখন একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রবাদের নির্মাণে নিয়োজিত হওয়া উচিত। সেই দেশ হলো রাশিয়া। ট্রটস্কি স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এলেন যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত গুণের জন্য নয়, নৈর্ব্যক্তিক পার্টি যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষমতা করায়ত্ত করেছেন। নেতৃত্বের এই অপ্রীতিকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি ছিল পার্টি থেকে, রাশিয়া থেকে ট্রটস্কির বিতাড়ন। স্ট্যালিনের বয়স তখন বাহান্ন বছর।

রাশিয়ার সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে ১৯৩০ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল ত্রাসের রাজত্ব। সংখ্যাতীত মানুষকে—লাল ফৌজের উচ্চপদস্থ অফিসার, ছোট ছোট ভূমধ্যকারী এবং স্ট্যালিনের সমালোচক—নির্বিচারে হত্যা করা হয় এবং আরো অনেক বেশীজনকে কারারুদ্ধ করা হয়। এমন কি যাঁরা একসময়ে লেনিনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদেরকেও নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। এইভাবে ক্রেমলিনে বসে ক্ষমতার লোভে নিরঙ্কুশ নেতৃত্বকে কায়েম করার জন্য যে অভাবনীয় হত্যাকাণ্ড স্ট্যালিন চালিয়েছিলেন তার জন্য তাঁকে কেউ কেউ চেঙ্গিস খানের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেউবা তুলনা করেছেন রাশিয়ার লৌহ মানব প্রথম নিকোলাসের সঙ্গে। নিষ্ঠুরতায় স্ট্যালিন এঁদেরও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এহেন নির্দয় ও নিষ্ঠুর মানুষটিকে বাইরে থেকে দেখে কিছুমাত্র বুঝবার উপায় ছিল না। অনতিদীর্ঘ মানুষটির গোলাকৃতি মুখ, কোমল প্রকৃতি ও চক্ষু দুটির মধ্যে একটি ভালো মানুষকেই যেন দেখা যেত। একটি সবল ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। উচ্চতায় তিনি পাঁচফুট ছ ইঞ্চি। অতি সুগঠিত শরীর। হাত দুটি ছিল শুধু বড়ো নয়, তাঁর মনের মতোই কঠিন। মুখের বৈশিষ্ট্য ছিল দুটি সুন্দর কালো চোখের মধ্যে, তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টির মধ্যে। পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর—সাধারণ সৈনিকের পোশাকে তিনি

সব সময়ে সজ্জিত থাকতেন। ধূমপান করতেন সস্তা দামের পাইপের সাহায্যে। ক্রেমলিনে সমাগত দর্শকদের অভিমত অনুযায়ী স্ট্যালিন ছিলেন স্নেহশীল ও কর্তব্যপরায়ণ পিতা এবং অত্যন্ত অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে তার সন্তানদের লালন-পালন করতেন। চার্চিল স্ট্যালিনের বাসকক্ষের আড়ম্বরহীনতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাঁর অতি বড়ো বিরোধীরাও স্বীকার করেছেন যে, অধিনায়ক স্ট্যালিন রাশিয়ার যথেষ্ট কল্যাণসাধন করেছেন। পীটার দি গ্রেটের সময় থেকে রাশিয়ার এমন রূপান্তর কখনো পরিলক্ষিত হয়নি যেমনটি হয়েছিল স্ট্যালিনের শাসন কালে। এই বিপুল উন্নতি যখন সাধিত হয় ঠিক সেই সময়ে (১৯৩৯) শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের শেষ অঙ্কে হিটলারের নাৎসী বাহিনীর আক্রমণে সোভিয়েত রাশিয়ার যে বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়েছিল তার তুলনা নেই। স্ট্যালিন যে কত বড়ো সুকৌশলী সেনাপতি তা বোঝা গেল যখন তিনি বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে নাৎসী বাহিনীকে রাশিয়ার ভূখণ্ডের বাইরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর সাহস, তাঁর রণনৈপুণ্য সোভিয়েত সৈন্যদের যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল সেদিন তা ইতিহাস হয়ে আছে। অতীতে রাশিয়া আক্রমণ করতে এসে নেপোলিয়নের যে পরিণতি ঘটেছিল, হিটলারের ঠিক সেই একই পরিণতি হয়েছিল। মিত্রশক্তির পক্ষে জয়লাভের পথ সেদিন রাশিয়ার অধিনায়কই প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তেহেরান, ইয়াল্টা ও পটাসডামে মিত্রশক্তির তিন প্রধানের (Big-Three) মধ্যে (মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও রাশিয়ার অধিনায়ক যোসেফ স্ট্যালিন) যেসব কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে স্ট্যালিনের ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবেই অনুভূত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক অবস্থার যে পট-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সেখানেও রাশিয়া কূটনীতির আসরে, রাষ্ট্রসংঘে (UNO) সর্বত্র গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল স্ট্যালিনের নেতৃত্বে। এরপর তিনি নয় বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তখনো পর্যন্ত তাঁর অধিনায়কত্ব অটুট ছিল। লেনিন যেমন স্বাধীন মতামত প্রকাশে বাধা দেওয়া দূরে থাক, বরং উৎসাহ দিতেন, স্ট্যালিন ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ছিলেন পরমত অসহিষ্ণু। চরম ক্ষমতা লাভ করেছিলেন তিনি এবং সেই ক্ষমতার রাজদণ্ড হাতে নিয়েই তিনি অধিনায়কত্বের মসনদে সমাসীন ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ত্রিশ বৎসরকাল তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করেছেন। ১৯৫৩, ৫ই মার্চ স্ট্যালিনের মৃত্যুতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স চুয়াত্তর বছর পুরো হয়নি। কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস যে, তাঁর মৃত্যুর পরে এক দশকের কম সময়ের মধ্যে সেই প্রবল প্রতাপশালী অধিনায়কের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপেই রাশিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে কাহিনী স্বতন্ত্র।

পাবলো পিকাসো

(১৮৮১-১৯২৩)

পিকাসোর জন্ম যে দেশের মাটিতে সে দেশের মাটি, বাতাস শিল্পের সুবাস বহন করে আসছে বহু বছর ধরে। আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে স্পেনের গুহাবাসী মানুষেরা গুহার গায়ে লাল ও হলুদ কিংবা নীল ও সবুজ রঙে যে সব জীবজন্তু ও মানুষ এঁকে গেছে তা থেকে তাদের শিল্পাঙ্কনের বিশেষ সজীবতা লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮১, অক্টোবর ২৫। স্পেনের কাতালান প্রদেশে মালাগা শহরে পিকাসোর জন্ম হয়। রুপোর চামচ-মুখে নিয়ে নয়, পিকাসো জন্মেছিলেন হাতে একটা পেন্সিল নিয়ে। পিতামাতা তাঁদের পুত্রের নামটি রেখেছিলেন এক হাত লম্বা—পাবলো নেপোমুসেনো ক্রিসপিনিয়ানো ডু লা সান্তিসিমা ত্রিনিদাদ রুইজ পিকাসো। তার সঙ্গীরা এই নামটা কেটে-ছেঁটে রেখেছিল পাবলো রুইজ। বড়ো হয়ে যখন তিনি ছবি আঁকতে শুরু করলেন তখন পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পদবী দুটো বজায় রেখে নামটি সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করলো—পি রুইজ পিকাসো। তারপর বিশ বছর বয়সে পিতৃকুলের পদবী বর্জন করে, শিল্পী স্বয়ং নিজের নামটি রাখলেন পাবলো পিকাসো। পিকাসো ছিল তাঁর মাতামহের পদবী। এই নামেই আজ তিনি পৃথিবী বিখ্যাত। আবার পাবলো পিকাসো নয়, শুধু 'পিকাসো' বললেই যথেষ্ট। কালের পটে নক্ষত্রের অক্ষরে লেখা এই নাম।

বড়ো হলে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। কিন্তু স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মে পড়াশুনা তাঁর একদম ভালো লাগল না। তখন পিকাসোকে তাঁর বাবা আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কৈশোরেই পিকাসোর প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল; শুধু স্ফুরণ হওয়া নয়, সেই বয়সেই তিনি একজন দক্ষ চিত্রকর বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে পিকাসোর আঁকা অনেক ছবি এখন পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত আর্ট গ্যালারিতে সযত্নে রাখা আছে। মাত্র দশ বছর বয়সেই তিনি শিখেছিলেন চিত্রের ভাষা। সেই সময় পিতার সহকারী শিল্পী হিসাবে তিনি কাজ করতেন। তাঁর বাবা ছিলেন একটি আর্ট স্কুলের শিক্ষক। পুত্রের প্রতিভা পিতাকে বিস্মিত করতো; তিনি মনে মনে ভাবতেন—এ বিধিদত্ত জিনিস। বড়ো হয়ে ছেলে যে একজন জগদ্বরেণ্য শিল্পী হবে, এ আশাও তিনি করেছিলেন। তাঁর কৈশোর বয়সের আঁকা ছবিগুলির মধ্যে মডেলিং-এরও আভাস পাওয়া যায়। সেই বয়সেই ছবি আঁকার কাজে পিকাসো যেন তাঁর মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন। কথিত আছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তিনি ছবির কথা বলতেন। পিকাসো পরিবার যখন বার্সেলোনাতে চলে এলো তখন তাঁর বাবা স্থানীয় চারুশিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই স্কুলেই ছাত্র হিসাবে প্রবেশ করেন

পিকাসো। ষোল বছর বয়সে মাদ্রিদ শহরে অনুষ্ঠিত এক চারুশিল্প প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করলেন এবং একটি পুরস্কার পেলেন পিকাসো। এটাই ছিল শিল্পীর জীবনে প্রথম সাফল্য, তাঁর প্রতিভার প্রথম স্বীকৃতি।

এক বছর মাদ্রিদে কাটিয়ে পিকাসো এলেন বার্সেলোনায়। এখানে নিজস্ব একটি স্টুডিও খুললেন তিনি। শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন, ঘুরে বেড়াতেন জাহাজঘাটায়, ক্যাবারাতে। যা দেখতেন তা-ই আঁকতেন—অলস নর-নারী, গীর্জার সন্ন্যাসিনী, বস্তির বিগত-যৌবনা বারাঙ্গনা, ডক-শ্রমিক, রাস্তার কুকুর, ফ্যাসান-পটিয়সী মহিলা—এদের নিয়ে তিনি ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন; পথচারী ক্লান্ত বৃদ্ধ, ছ্যাকরাগাড়ির উৎসাহী চালক এরাও তাঁর ছবির বিষয় হয়ে উঠেছিল—এদের নিয়ে তিনি অজস্র ছবি আঁকতেন তাঁর সজ্জাহীন স্টুডিওতে বসে।

১৯০১ থেকে ১৯১৪ এই সময়টা পিকাসোকে প্যারিসে কাটাতে হয়েছিল নানা অসুবিধার মধ্যে। তাঁর আঁকা এই সময়কার ছবিগুলিকে Blue Period-এর ছবি বলে ভাগ করা হয়। ব্লু পিরিয়ডের একটি নামকরা ছবি হলো, বিয়ারের গ্লাস-হাতে বন্ধু জায়মে সাবার্তের একটি প্রতিকৃতি। জানা গেছে, ব্লু পিরিয়ডের প্রায় সব ছবিই তিনি আঁকতেন রাত্রিতে। শিল্পীর জীবনে এর পরের অধ্যায় ছিল Pink Period—এখানকার আঁকা সব ছবিতেই শুধু গোলাপী রঙের খেলা। ১৯০৪ থেকে পিকাসো স্থায়িভাবে প্যারিসে বাস করতে থাকেন। কিছুকালের জন্য মাদ্রিদে এসে তিনি 'Young Art' নামে একটি পত্রিকা বের করেন; তিনিই ছিলেন এর সম্পাদক। তরুণ শিল্পীদের এটাই ছিল মুখপত্র। এইবার মাদ্রিদে তিনি একটি একক প্রদর্শনী দিলেন; ছবিগুলি সবই প্যাস্টেলে আঁকা। কিছু সংখ্যক ছবি বিক্রীও হয়েছিল। চিত্র-রসিকদের সপ্রশংস দৃষ্টিও আকর্ষণ করলেন।

ফিরে এলেন আবার প্যারিসে। এই সময়ে তিনি টুলো, রত্রে, ভ্যান গগ ও গোগাঁর চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নানা সূত্র থেকে নানা পদ্ধতি আয়ত্ত করে, এবং বিভিন্ন রীতিতে নিজেকে পারদর্শী করে তুলে, এইবার পিকাসো তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে অগ্রসর হলেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই তাঁর প্রসিদ্ধ ছবিগুলি আঁকা হয়। সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে শুধু নীল রঙ, সেটাই তাঁর শিল্পী-জীবনের ব্লু পিরিয়ড ছিল; এরই মাধ্যমে শিল্পী ফুটিয়ে তোলেন করুণ বিষণ্ণতা। ছবিগুলি অসহায় নর-নারীর আলেখ্য মাত্র নয়—সেগুলি যেন তাদেরই পৃথিবীর প্রতীক, বিষণ্ণতার দ্যোতক। মানুষের প্রতি প্রেম—তাই ছিল পিকাসো-প্রতিভার উৎস।

সার্কাস দেখতে খুব ভালোবাসতেন পিকাসো। অসাধারণ ছিল তাঁর সার্কাস-প্রীতি এবং এর থেকেই তাঁর শিল্পাঙ্কন রীতি একটা নতুন মোড় নিয়েছিল। পিকাসোর 'সার্কাস ক্লাউন' ছবিটি যেন বিষণ্ণতার একটি প্রতিমূর্তি। এটি আজো শিল্প-জগতের বিস্ময় হয়ে আছে। এই বিষণ্ণতার ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য শিল্পী নীলের বদলে ব্যবহার করেছেন গোলাপী রঙ। তখন থেকেই শুরু হয় পিঙ্ক

পিরিয়ড। এইভাবে রঙ ব্যবহারের পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছিল পিকাসো-রীতির দিক্-পরিবর্তন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ বছর। যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন শিল্পী। সেই বয়সেই একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শিল্পী হিসাবে চিত্রকলারসিকদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন তিনি।

১৯৩৭। স্পেনে চলছে গৃহযুদ্ধ। ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কোর বোমারু বিমান যেদিন (২৬ এপ্রিল ১৯৩৭) স্পেনের ছোট্ট শহর গোয়েনিকা ধ্বংস করে দিল, সেদিন শিল্পী যারপর নাই ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। পিকাসোর ক্রোধ, ঘৃণা, আতঙ্ক প্রকাশ পেল সত্তরটি ড্রয়িং-এর পর বিরাট ত্রিকোণাকৃতি মাস্টারপিস 'গোয়েনকাতে' (১১ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া আর লম্বায় ২৫ ফুট ৮ ইঞ্চি)। ১৯৩৭ সালে শিল্পীর খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। মাদ্রিদের আর্ট মিউজিয়মের তিনি তখন সর্বময় কর্তা। সরকারী খেতাবও লাভ করেছেন। তথাপি গৃহযুদ্ধ যখন চরমে পৌঁছল তখন আমরা পিকাসোকে দেখি ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে তুলি ধরতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন ঘনীভূত হয়ে এলো, শিল্পী তখন পুরে দস্তুর কমিউনিষ্ট হয়েছেন ও কমিউনিষ্ট দলের সদস্যপদও লাভ করেছেন।

শিল্পীর রীতিনীতি পরিবর্তনের শেষ নেই। পিকাসোর পরিবর্তনশীলতার মূলে ছিল অসীম আত্মজিজ্ঞাসা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরেক পিকাসোর জন্ম হলো আর তার সঙ্গে সৃষ্টি হয় এক নতুন শিল্প-রীতির। এক নিজস্ব পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন তিনি আর্টের জগতে। তার নাম 'পিকাসোইজম্' (Picassoism)। ত্রিমাত্রিক বা Three dimension এলো তাঁর ছবিতে। শিল্পের জগতে দেখা দিল আলোড়ন, বিতর্কের ঝড়। কেউ বললেন, অদ্ভুত, কেউ বললেন দূর ছাই, পাগলামি। কিন্তু ছবিগুলোর নতুনত্ব সবাইকে বিস্মিত করল। সেই থেকে পিকাসো হয়ে রইলেন সকলের কাছে একটি পরম বিস্ময় আর কৌতূহল। পিকাসোর নামের সঙ্গে জোয়ার বইল অর্থের। তাঁর আঁকা ছবি ঘরে রাখা একটা ফ্যাসন হয়ে দাঁড়াল। ধনীরা লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে তাঁর আঁকা একখানা ছবি তাঁদের ড্রইংরুমে টাঙাতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। পিকাসোর ছবি বিক্রী করে বড়লোক হলেন কত দালাল আর আর্ট গ্যালারির মালিক। শিল্পীরও অর্থাগম হতে থাকে।

১৯৫০। শিল্পীর বয়স তখন সত্তর। এক নতুন পরীক্ষা শুরু করলেন— মৃৎপাত্রের ওপর চিত্রাঙ্কন। কিউবিজমের স্রষ্টা পিকাসো কেবলমাত্র কিউবিজমেই ডুবে থাকেন নি। জ্যামিতিক রেখার সঙ্গে এক নতুন পদ্ধতির সম্মেলনে তাঁর অনেক ছবি হয়ত দেখতে অদ্ভুত। তাই নিয়ে বহু রসিকতা প্রচলিত আছে দেশ-বিদেশে। কথিত আছে, তাঁর স্টুডিওতে পিকাসো যখন কাজ করতে বসতেন তখন তাঁকে দেখে মনে হতো যেন সাক্ষাৎ দেবতা। একাগ্র মনে কাজ করে চলেছেন, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই। তথাপি নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি

ছিলেন চির অতৃপ্ত। তিনি বলতেন, 'একজন সত্যিকারের শিল্পী কখনোই তৃপ্ত হতে পারে না। শিল্পীর জীবনে শেষ বলে কিছু নেই।'

পিকাসোকে ফ্রান্স সবচেয়ে বড়ো সম্মান দিয়েছিল ১৯৫৫ সালে। প্যারিসের ল্যুভ্র মিউজিয়ামে কোনো শিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনী হওয়া তাঁর ভাগ্যের কথা। এইখানে তিন মাস ধরে চলেছিল পিকাসোর একক প্রদর্শিনী। সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। অগণিত দর্শকের ভীড় মিউজিয়মের ভিতরে ও বাইরে। পিকাসো-প্রদর্শিনী নিয়ে প্যারিসের সংবাদপত্রগুলি তখন মুখরিত। পাবলো পিকাসো যতখানি আর্টিস্ট, ঠিক ততখানি তিনি ছিলেন একজন কঠোর পরিশ্রমী ও নিরলস কর্মী। তার নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন দেড় হাজার ক্যানভাসে, দশ হাজার লিথো প্রিন্টে, বই-এর জন্য আঁকা চৌত্রিশ হাজার ছোট-বড় ছবিতে আর তিনশো ভাস্কর্য ও সিরামিকের কাজে। একজন শিল্পীর জীবনে এত অজস্র শিল্পসৃষ্টি খুব সহজ কাজ নয়। নব্বুই বছর বয়স পর্যন্ত তিনি তুলি চালিয়েছেন। ছবি আঁকা ছাড়া ভাস্কর্য শিল্পেও তিনি দেখিয়েছেন অপূর্ব দক্ষতা। শিল্পী পিকাসোকে নিয়ে যত কৌতূহল, তার চেয়েও বেশি কৌতূহল মানুষ পিকাসোকে নিয়ে। য়ুরোপে আজ পর্যন্ত যত চিত্রকর জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে তাঁকে নিয়ে; তাঁকে নিয়ে বই লেখা হয়েছে বিস্তর। শিল্পী পিকাসো আর ব্যক্তি পিকাসো যদিও একই লোক তা সত্ত্বেও দেশ-বিদেশের লেখক, সাংবাদিক ও সমালোচকগণ হাজার-হাজার প্রবন্ধ ও পুস্তকে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। জীবিত কালে তিনি যে পরিমাণ অর্থ ও সম্মান লাভ করেছিলেন তার এক শতাংশও পান নি অনেক বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর।

১৯৭৩, ৮ এপ্রিল। ফ্রান্সের মুগ্যা শহরে, এক শান্ত সন্ধ্যায় বিশ শতকের চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠতম কবি পাবলো পিকাসোর দীর্ঘজীবনের অবসান হলো। মানব সভ্যতার আকাশে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিভে গেল। জীবনের প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সৃষ্টি করে গেছেন, প্রমাণ করে গেছেন যে শিল্প একটা জীবন্ত ধারা। প্রচলিত শিল্পরীতিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে, তিনি সৃষ্টি করেছেন শিল্পের এক নতুন ভাষা যা বুঝতে গেলে বুদ্ধির দরকার হবেই। মানুষ এবং শিল্পী হিসাবে তিনি সমগ্র মানবজাতির—বলা যায়, সমগ্র প্রগতিশীল মানবসমাজের আপনজন। পিকাসো একজন প্রকৃত মহৎ শিল্পী। তিনি সর্বদেশের, সর্বকালের।

কামাল পাশা

(১৮৮১-১৯৩৮)

তুরস্কের মুক্তিপ্রদাতা ও নব্যতুরস্কের স্রষ্টা মুস্তাফা কামাল পাশা বিংশ শতকের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তি। রক্তনদীর ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে তুরস্কের অধিনায়ক হয়েছিলেন তিনি। কামালকে তাঁর স্বদেশবাসী 'আতাতুর্ক' অর্থাৎ তুর্কিজাতির পিতা উপাধি দিয়েছিল। পিতা যেমন তাঁর পুত্রকে লালন-পালন ও রক্ষণা-বেক্ষণ করেন, কামাল তেমনি তাঁর স্বদেশবাসীকে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। রক্ষা করেছেন বললে অতি অল্পই বলা হবে, তিনি সমস্ত জাতিকে নূতন করে গড়ে তুলেছিলেন। আজ জগৎসভায় তুরস্কের যে গৌরবময় স্থান হয়েছে, তা হয়েছে কেবল কামালের জন্য। কামালের জীবনের প্রেক্ষাপটে আছে তাঁর স্বদেশের যে ইতিহাস, আধুনিক তুরস্কের স্রষ্টার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করতে হলে সেই ইতিহাস, একটু জানতে হয়।

মধ্যযুগে ইসলামের দ্বিতীয় বিজয়-অভিযান শুরু হয় তুর্কিদের নেতৃত্বে। পারস্যের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে আরম্ভ করে অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত অবধি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তুর্কিদের অধীনে আসে। গ্রীকদের হাত থেকে তারা কন্‌স্তান্তিনোপল ছিনিয়ে নিলো পঞ্চাশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। মিশর অধিকার করে তুর্কি-সুলতান গ্রহণ করলেন খলিফা উপাধি। খলিফা কথাটির অর্থ ধর্মগুরু। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত তুর্কি সুলতানেরা ছিলেন মহাপরাক্রমশালী। কালক্রমে তাঁরা নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের ফলে আলস্য আর বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং ইতিহাসের স্বাভাবিক বিধান অনুসারে তখন থেকেই তাঁদের শক্তিও হ্রাস পে'' থাকে। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশগুলি যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য—সব দিক দিয়ে প্রাগ্রসর হয়েছে, তখন তুরস্ক সকলের পিছনে পড়েছিল।. তুরস্কের সুলতান য়ুরোপের কাছে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে দাঁড়ালেন। এই অবস্থা পরবর্তিকালে "The Sick man of Europe"—এই অভিধায় পরিণত হয়। দেশের এই দারুণ দুরবস্থার দিনেই কামাল পাশার জন্ম।

তুরস্কের শাসনব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা সবই ছিল মধ্যযুগের উপযোগী। সুলতান ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাঁর উপর কথা বলার সাধ্য কারো ছিল না। দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে উন্নতিসাধন এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রজাদের মধ্যে একতা-স্থাপনের জন্য বিশ শতকের গোড়ায় তুর' একটা আন্দোলন হয়। আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন তুরস্কের সেনাবিভাগের কয়েকজন যুবক। কামাল পাশা ছিলেন এই তরুণ-তুর্কিদলের একজন উৎসাহী সভ্য। তুরস্কের গৃহবিবাদের সুযোগ নিল য়ুরোপের একাধিক রাষ্ট্র—কেউ একা, আবার কেউ কেউ মিলিত হয়ে

আক্রমণ করল সেই হতভাগ্য দেশটিকে। ঠিক সেই সময় ঐ মহাদেশে প্রথম যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। একদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও পরে আমেরিকা, অন্যদিকে জার্মানি ও অষ্ট্রিয়া। তুরস্ক যোগদান করল জার্মানির সঙ্গে। জার্মানির পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে দুর্বল তুর্কি-সাম্রাজ্য পদে পদে ইংরেজদের কাছ থেকে আঘাত পেতে থাকে। শুধু আঘাত পাওয়া নয়, ভীষণভাবে লাঞ্ছিতও হতে লাগল। শক্তিশালী ইংরেজ যুদ্ধের গোড়াতেই দখল করল মিশর। তারপর সুচতুর ইংরেজ ইরাক, প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার আরব প্রজাদের তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচনা দেয়। অতঃপর ইংরেজের নৌসৈন্যবাহিনী কনস্তান্তিনোপল দখল করার আয়োজন করে। সে যুদ্ধে তুরস্ক যদি পরাজিত হতো তাহলে তাকে য়ুরোপ থেকে চিরকালের মতো চলে আসতে হতো। মরণপণ সংগ্রাম করল তুর্কিরা এবং তখনকার মতো ইংরেজদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধে তুর্কিদলের নেতা ছিলেন মুস্তাফা কামাল পাশা।

স্যালোনিকার এক দরিদ্র চাষীর ঘরে কামালের জন্ম। যে পরিবারে তাঁর জন্ম তাঁদের পূর্বপুরুষ ম্যাসিডনের উচ্চভূমির অধিবাসী ছিলেন। পূর্ব য়ুরোপের একাধিক প্রখ্যাত বিপ্লবীর জন্মস্থান এই অখ্যাত দেশ। স্যালোনিকার সেই চাষীর কুটীরে, আলি রেজা ও তাঁর স্ত্রী জুবেদিয়ার একমাত্র পুত্রসন্তানরূপে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছিল, তার মধ্যে যে বিপ্লবের শোণিতধারা অন্তঃসলিলার মতো প্রবাহিত ছিল, তা বলা বাহুল্য। কামালের জীবনে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তাঁর মায়ের প্রভাব ছিল অসীম। গৃহে অথবা বাইরে, যে কোনো রকম শাসন-বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, এই ছিল কামালের শৈশবজীবনের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এবং উত্তরকালে এই মনোভাব তাঁর মধ্যে স্থায়ী হয়ে উঠেছিল—এটাই যেন ছিল তাঁর জীবনের নিশ্বাস-প্রশ্বাস। এই বিদ্রোহের ভাব তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর মায়ের কাছ থেকেই।

নয় বছর বয়সে কামাল পিতৃহীন হন। তখন এই দুর্বিনীত, অবাধ্য ছেলেকে নিয়ে মায়ের খুব সমস্যা হলো। কিছুকাল তাঁর এক খুল্লতাতের গৃহে মেষপালকের জীবন অতিবাহিত করার পর, কামাল তাঁর এক পিতৃবন্ধুকে ধরে স্যালোনিকার সামরিক স্কুলে ভর্তি হন। সতেরো বছর বয়সে তিনি মোনাস্তিরের উচ্চতর সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এখানে দু'বছর অধ্যয়ন করার পর তিনি একজন সাব-লেফটেনেন্ট হিসাবে গণ্য হন। তখন তিনি কনস্তান্তিনোপলের ইম্পিরিয়াল স্টাফ কলেজে ভর্তি হলেন। তখন ওটোমান সাম্রাজ্যের অন্তিম দশা ঘনিয়ে এসেছে। সেই বয়সে তিনি রুশো, ভলটেয়ারের রচনা পড়ে শেষ করেছেন; হবস ও জন স্টুয়ার্টের পলিটিকাল ইকনমির সঙ্গেও কিছুটা পরিচিত হয়েছেন। এসব বই তখন সুলতানের তুরস্কে নিষিদ্ধ ছিল। সেইসঙ্গে তরুণ কামাল আরো দুটি বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন, বিতর্ক আর বাগ্মিতায় তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।

সামরিক কলেজ থেকে যথাসময়ে কামাল স্নাতক হয়ে বেরুলেন। তাঁর

তখনকার আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে তাঁর সতীর্থগণ মনে করতেন—এই মানুষটি যেন জন্ম-বিদ্রোহী। মনে হতো তাঁর যেন নিজস্ব চিন্তা আছে আর আছে নিজের ভবিষ্যৎ নিজের মতো করে গড়ে তোলার দুর্লভ ক্ষমতা। তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিলো জলন্ত স্বদেশ প্রেম। স্টাফ কলেজে বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত সমিতি ছিল, এর নাম 'ওয়াতন'। কামাল এই দলের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হলেন। সুলতান এই দলের সভ্যদের কার্যকলাপের উপর কড়া দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন—বিশেষ করে ক্যাপ্টেন কামাল পাশার উপর। অবশেষে একদিন কয়েকজন তরুণ বিপ্লবীসহ কামাল ধৃত হন ও তুরস্কের কুখ্যাত লাল কেল্লা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অল্পকাল মধ্যেই সুলতান তাঁর ভ্রম বুঝতে পারলেন: এইসব কৃতবিদ্য ও উচ্চতর সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের উপরই তো তাঁর ভবিষ্যৎ সেনাবাহিনী নির্ভর করছে। তিনি অবিলম্বে তাদের সকলকে মুক্ত করে দিলেন এবং সকলকেই সুদূর দামাস্কাসে একটি সৈন্যদলের অফিসার করে পাঠিয়ে দিলেন। দামাস্কাসে উপস্থিত হয়েই কামাল নিষিদ্ধ গুপ্তসমিতির একটি শাখাস্থাপনে তৎপর হলেন। তখন থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বহুবিধ সংগ্রাম, নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা (এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল আনোয়ার পাশার সঙ্গে, কূটনৈতিক সংঘর্ষ ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে কামাল পাশা ধীরে ধীরে তাঁর জীবনের লক্ষ্যসাধনে অগ্রসর হতে থাকেন। যুদ্ধ এনে দিল সেই-সুযোগ। যুদ্ধের পর থেকে তুরস্কের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হতে থাকে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ইতালী ও আমেরিকা—এই মিলিত শক্তির কাছে তুরস্কের পরাজয় কামালকে মর্মাহত করল বটে, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। ইংরেজের রণতরী তখন কনস্তান্তিনোপলের মুখোমুখি সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। মিত্রপক্ষের সৈন্যদলে দেশ ভরে গেছে। যুব-তুর্কিদলের নেতারাও পলাতক। চার বছর একাদিক্রমে যুদ্ধ করে তুর্কিরা ক্লান্ত। সুলতান ওয়াহিদ-উদ্দীন ইংরেজদের কাছে সন্ধি প্রার্থনা করলেন।

এমন অবস্থায় কামাল কনস্তান্তিনোপলে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। ইংরেজরা যেমন তাঁকে সন্দেহ করতো, সুলতানও তেমনি তাঁকে পছন্দ করতেন না। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের পদ নিয়ে চলে এলেন পূর্ব আনাতোলিয়ায়। এখানে ভিতরে ভিতরে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও প্রতিরোধ করবার জন্য নূতন সেনাদল গঠন করতে থাকেন। কিন্তু সেই সময় গ্রীকদের অতর্কিত আক্রমণ ঘটল আনাতোলিয়ার বন্দর স্মার্ণাতে। এই স্মার্ণা আক্রমণের পিছনে ছিল মিত্রশক্তির চক্রান্ত। সাম্রাজ্যবাদীর এই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য স্মার্ণাতে কামাল যে যুদ্ধ করেছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু সন্ধির বৈঠকেই তিনি জয়ী হতে চাইলেন। এই বৈঠক হয় কনস্তান্তিনোপলে। কী কী শর্তে তুরস্ক মিত্রশক্তির সঙ্গে সন্ধি করবে এই ছিল বৈঠকে আলোচনার বিষয়। কনস্তান্তিনোপলে পার্লামেন্ট বসেছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কামাল পাশার দলের লোক। কামালের নির্দেশে তারা এককালে তুরস্কের স্বাধীনতা

অক্ষুণ্ণ রাখার দাবী করলেন। ইংরেজ সে দাবা অগ্রাহ্য করল। শুধু তাই নয়; তার রাজধানী কনস্তান্তিনোপল অধিকার করল এবং কামালপন্থী প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার করে নির্বাসন দণ্ড দিল। দেশনেতাদের মধ্যে তখন অনেকে পালিয়ে গেলেন আনকোরায়। সেইখানে জাতীয় মহাসমিতি (National Council) গঠন করে তাঁরা গণতন্ত্র ঘোষণা করলেন। কামাল হলেন সেই গণতন্ত্রের নেতা। গণতন্ত্রী তুরস্কের নবীন নেতা ঘোষণা করলেন—'আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদের অবসান হলো; এখন থেকে আমরা প্রজাতন্ত্র তুরস্কের অধিবাসী।'

১৯২৩ সনে কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে স্থায়ীভাবে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই হলেন তার নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রাধিনায়ক। প্রেসিডেন্ট হয়েই তিনি খলিফার পদটি সর্বাগ্রে তুলে দিয়ে সংস্কারের ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর নিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে ছয় বৎসরকালের মধ্যে তুরস্কের চেহারা বদলে গেল। বহুবিধ কুসংস্কার ও প্রাচীন ধর্মীয় প্রথার অবসান ঘটিয়ে কামাল বলিষ্ঠ হাতে সত্যিই এক নূতন তুরস্ক—তাঁর চিরজীবনের স্বপ্নের তুরস্ক গড়ে তুললেন। পোশাকে পরিচ্ছদে, সামাজিক ব্যবস্থায়, শিক্ষাদীক্ষায় চারদিক থেকে তুরস্কে যেন নূতন জীবনের প্লাবন এলো। আপন সীমানার মধ্যে তুরস্ক যাতে শক্তিশালী য়ুরোপীয় রাজ্যগুলির মতো নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে পারে, তার জন্য সবরকম চেষ্টা তিনি করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর কামাল ঘোষণা করেছিলেন—"I will lead my people by the hand along the road until their feet are sure and they know the way. Then they may choose for themselves and rule themselves. Then my work will he done." কামাল তাঁর জীবিতকালেই তাঁর এই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছিলেন। জলন্ত দেশপ্রেম আর সাম্রাজ্য-বিরোধী মনোভাব—তাঁর স্বজাতির জন্য এই দুইটি মহান উত্তরাধিকার রেখে, ১৯৩৮ সনে, মাত্র সাতান্ন বৎসর বয়সে এই বীরপুরুষ লোকান্তর গমন করেন।

ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট

(১৮৮২-১৯৪৫)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিত্রশক্তির যে তিন-প্রধান হিটলারের দম্ভকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি এনেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে অন্যতম এবং বিশিষ্টতম।

বিশিষ্টতম এইজন্য বলছি যে, সেই সংকটের সময়ে ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিলেন এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে ভারতের দাবী মেনে নিয়ে অবিলম্বে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য বলিষ্ঠ অনুরোধও করেছিলেন। সেদিনের পৃথিবীতে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে শুনতেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, এটা সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল কোনদিনই চাইতেন না—একথা রুজভেল্ট জানতেন এবং সেইজন্য ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে তিনি চার্চিলের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

'There is nothing I love so much as a good fight'.

তাঁর এই উক্তিটির মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে রুজভেল্ট-মানস। আমেরিকার ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি চার-চারবার প্রেসিডেন্টের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। একটি আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট। তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে তিনি যুগপৎ সম্পূজিত ও ঘৃণিত এবং আত্মসমর্পিত যোদ্ধা হিসাবে যেমন প্রশংসিত, তেমনি অত্যাচারী শাসক হিসাবে নিন্দিত হয়েছেন। এই শতাব্দীর তীব্রতম মন্দা আর বিধ্বংসী যুদ্ধ—এই দুটি ঘটনা যিনি তাঁর জীবৎকালে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই রুজভেল্ট পৃথিবীর মানুষকে শিখিয়ে গেছেন—'The only thing we have to fear is fear itself'. হিটলারী বিভীষিকার যুগে মানুষকে নিঃশঙ্কচিত্ত করে দিয়েছিল তাঁর এই একটিমাত্র কথা। জানুআরি ৩০, ১৮৮২। দ্বিতীয় জেমস রুজভেল্ট ও তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী সারা ডেলানোর একমাত্র পুত্ররূপে, নিউ ইয়র্ক শহরে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আমেরিকার ৩১তম প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই তারিখে। তাঁর পিতৃকুল ও মাতুল বংশ দুইই ছিল আমেরিকার মাটি থেকে উদ্ভূত। রুজভেল্টরা একটি পরিবার মাত্র ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন যেন একটি dynasty বা বংশ। তাঁরা প্রধানত ব্যবসায়ী ছিলেন। এই বংশের অন্যতম পূর্বপুরুষ আইজ্যাক রুজভেল্ট ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিনের পিতামহের পিতামহ। তিনি ছিলেন একজন ধনী ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, সেনেটর এবং মার্কিন বিপ্লবের একজন সৈনিক। তাঁর পৌত্র, প্রথম

জেমস রুজভেল্ট হাডসন নদীর ধারে হাইড পার্কে বিশাল ভূখণ্ড-সমন্বিত একটি জমিদারি ক্রয় করে সেখানে বসতিস্থাপন করেছিলেন। তাঁর মামারাও বেশ সঙ্গতি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর মা, সারা ডেলানো যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতী ছিলেন। তিনি শ্রেণী-সচেতন মহিলা ছিলেন; তাঁর ছিল প্রখর মর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস। বালক ফ্রাঙ্কলিন অনাড়ম্বর বিলাসিতার মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সাধ ছিল যে, বড়ো হয়ে তিনি একজন নাবিক হবেন। তাঁর বয়স পনর বছর পূর্ণ হবার আগে তিনি দশবার য়ুরোপ গিয়েছিলেন এবং ঐসময়ে জার্মান ভাষা শিখেছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি গ্রোটন স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলটি মাত্র কয়েক বছর আগে স্থাপিত হয়েছিল। এখানে বড়লোকদের ছেলেরা পড়তো। এই স্কুলে তিনি লাতিন, গ্রীক, ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী—এই কয়টি ক্লাসিকাল ও আধুনিক ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। স্কুলের পড়া শেষ হলে তাঁর পিতা ছেলেকে হার্ভার্ড কলেজে ভর্তি করেছিলেন। যে চার বৎসরকাল তিনি হার্ভার্ডের ছাত্র ছিলেন সেই সময়ে য়্যানা ইলিনরের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ১৯০৫ সালে এঁরা পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন ফ্রাঙ্কলিনের বয়স ছিল তেইশ বছর আর ইলিনরের বয়স ছিল একুশ বছর। বিবাহ কালে তিনি ছিলেন আইনের ছাত্র। ইলিনর তাঁর আদর্শ জীবনসঙ্গিনী হতে পেরেছিলেন। দু'বছর বাদে তিনি শুরু করেন আইন ব্যবসায়। পিতার মৃত্যুর পরে তাঁকে হাইড পার্কে তাঁদের পারিবারিক জমিদারির ভার গ্রহণ করতে হয়। তিনি ক্রমে ক্রমে রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। নিউ ইয়র্ক রাজ্য সেনেটের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মনোনয়ন লাভ করলেন সহজেই। এর একটা কারণ এই ছিল যে, রুজভেল্টের নাম শুধু যে সম্মানিত ছিল তা নয়; জনপ্রিয়ও ছিল। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন একজন ডেমোক্রাট। নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। অতঃপর আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে তিনি চলে এলেন য়্যালবানিতে। অতি-মাত্রায় সংরক্ষণশীল বিধানসভায় রাজ্য প্রতিনিধি হিসাবে রুজভেল্ট উদারনৈতিক মনোভাব দেখিয়েছিলেন। প্রগতিমূলক প্রস্তাবগুলি তিনি সমর্থন করতেন। যুক্তরাষ্ট্র মার্কিনে তখন মেয়েদের ভোটাধিকার ছিল না। রুজভেল্ট এই বিষয়টির একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন। অন্যতম সেনেটর উইড্রো উইলসনও ছিলেন একজন প্রগতিবাদী; তাই তাঁকে সমর্থন করা রুজভেল্টের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ১৯১২ সালের নির্বাচনে উইলসন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন এবং তিনি রুজভেল্টকে নৌবিভাগের সহকারী সচিবের পদে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বছর। এর অল্পকাল পরেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রেসিডেন্ট উইলসন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই সময়ে নৌবিভাগের সকল দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল রুজভেল্টের ওপর। সেই দায়িত্ব পালনে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিলেন। এই সময়ে (১৯১৮) তিনি একবার য়ুরোপে গিয়ে সেখানকার রণাঙ্গন স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন।

যুদ্ধশেষ হলো। জেনিভাতে যুদ্ধবিরতি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন। যুদ্ধবিধ্বস্ত য়ুরোপে শান্তি স্থাপনের জন্য তাঁর প্রয়াস আমেরিকার ভাবমূর্তিকে বিশ্বের সামনে সেদিন তুলে ধরেছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রুজভেল্ট কিছুকাল রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। তারপর ১৯২৮ সালে তিনি নিউ ইয়র্কের গভর্নর নিযুক্ত হলেন। চার বছর গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর, ১৯৩২ সালের নির্বাচনে তিনি প্রেসিডেন্টের পদের জন্য তাঁর দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর। মার্কিন জনগণের জন্য সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ নতুন ভবিষ্যৎ গঠনের প্রতিশ্রুতি ছিল তাঁর নির্বাচনী ইস্তাহারে। সেদিন রুজভেল্টের কণ্ঠে এই উদ্দীপনাময়ী কথা শুনে আমেরিকার তরুণচিত্তে যে উৎসাহ, উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তা এককথায় ছিল অভূতপূর্ব। এই উৎসাহব্যঞ্জক বাণী আর তার সঙ্গে রুজভেল্টের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁর জয়লাভের পথ অনেকখানি সুগম করে দিয়েছিল। বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই রুজভেল্ট একে একে বহুবিধ reform প্রবর্তন করেন। দেশের তৎকালীন ব্যাপক মন্দার অবস্থা বিবেচনা করে, তিনি দুটি নতুন কর (tax)—অতিরিক্ত লাভ ও ডিভিডেণ্ড ট্যাক্স প্রবর্তন করেন; সরকারী বেতন হ্রাস করে দেন, পেন্সনের হার কমিয়ে দেন, ব্যাঙ্কগুলি জাতীয়করণের জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ করেন এবং ডলারের মূল্য হ্রাস করে দেন। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য তিনি ওয়াশিংটনে একদল অর্থনীতি বিশারদ, বিজ্ঞানী, লেখক ও শিক্ষকদের তাঁর চতুপার্শ্বে সমবেত করেছিলেন ও তাঁদেরই পরামর্শ সহায়তায় তিনি দেশের প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিলেন। এছাড়া, জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্টের নিয়মিত বেতার ভাষণ জনসাধারণকে খুবই উৎসাহিত করত।

আমেরিকার জনসাধারণ নতুন প্রেসিডেন্টের নতুন কার্যসূচীর মধ্যে যেন মানবিকবোধের অভিব্যক্তি দেখতে পেলো। এই পরিবেশে ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে রুজভেল্ট দ্বিতীয়বার বিপুল ভোটাধিক্যে প্রেসিডেন্টের পদে নির্বাচিত হলেন। আমেরিকার নির্বাচন ইতিহাসে ১৯৩৬ সালের নির্বাচন রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল; ৫৩১টি ভোটের মধ্যে রুজভেল্ট পেয়েছিলেন ৫২৩টি। জনসাধারণ তাঁকে বিপুল-ভাবে সমর্থন করল কিন্তু তাঁর সমালোচকগণ আগের মতোই রইলেন তাঁর বিরোধী। এইসময়ে য়ুরোপে হিটলারের অভ্যুদয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় পৃথিবীর মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। তারপর ১৯৩৯ সালে সত্যসত্যই যখন সেই যুদ্ধ বাধল তখন ১৯৪০ সালের নির্বাচনে রুজভেল্ট তৃতীয়বারের জন্য প্রার্থী হলেন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে গেল। পৃথিবীর এই সঙ্কটকালে রুজভেল্ট প্রত্যয়ের সুরে বলেছিলেন: 'The issue of this war is the basic issue between those who put their faith in the people and those who put their faith in dictators.'

পরবর্তী ইতিহাস সুপরিচিত। তেহারানে চার্চিল ও স্ট্যালিনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়ার সময় রুজভেল্টই বলেছিলেন : 'We must smash Germany by an invasion of the west coast of Europe.' তাঁরই নেতৃত্বে এই যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যে সামরিক আঁতাত (Alliance) গঠিত হয়েছিল তা ছিল পৃথিবীতে অভূতপূর্ব এবং এই আঁতাতের ফলেই হিটলারের ডিক্টেটারি দম্ভ ভূলুণ্ঠিত হয় এবং জার্মানির শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তখন পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে রুজভেল্টের ওপর ; লক্ষ মানুষের কণ্ঠে তাঁর জয়ধ্বনি আর মার্কিন-জনসাধারণের কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন দেবতা। এই পরিবেশে ১৯৪৪ সালে চতুর্থবারের জন্য রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন ; এইবারকার নির্বাচনে তিনি ৪৩২টি ভোট পেয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স বাষট্টি বছর। কিন্তু বার্ধক্যের দরুণ মনে হতো তাঁর বয়স বুঝি সত্তর। যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য তিনি ইয়াল্টাতে আবার চার্চিল ও স্ট্যালিনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ভবিষ্যতের জাতিসংঘের (UNO) প্রাথমিক পরিকল্পনা এইখানেই রচিত হয়েছিল।

১৯৪৫, ১২ এপ্রিল। সেইদিন অপরাহ্ণে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে সচকিত করে তারে ও বেতারে ঘোষিত হয় সংবাদ—প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট আর বেঁচে নেই। সেই সংবাদে সমস্ত আমেরিকা যেন মূর্ছাহত হয়ে গিয়েছিল। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে মানুষটি কিরকম জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র দীপ্যমান ছিল। পৃথিবীর মানুষকে তিনি উপহার দিয়ে গেছেন চতুর্বিধ স্বাধীনতার সূত্র (credo of Four Freedoms): (i) Freedom of speech and expression ; (ii) Freedom of every person to worship God in his own way ; (iii) Freedom from want ; এবং (iv) Freedom from fear. রুজভেল্ট আশা করতেন, দূর ভবিষ্যতে নয়, আমাদের কালেই, তাঁর এই চতুর্বিধ স্বাধীনতার স্বপ্ন সার্থক হবে।

জেমস জয়েস
(১৮৮২-১৯৪১)

কথা সাহিত্যে জেমস জয়েস একটি নব দিগন্ত রচনা করেছিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের কোলে জন্মগ্রহণ করে যে কয়জন য়ুরোপের সাহিত্য জগতে তাঁদের স্ব স্ব প্রতিভার বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে জর্জ বার্নার্ড 'শ, জর্জ রাসেল, উইলিয়াম বাটলার য়েটস্ ও জেমস জয়েস—এই চারটি নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। একজন নাট্যকার, দুইজন কবি ও চতুর্থ জন ঔপন্যাসিক। এঁদের মধ্যে দু'জন নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী। ফেব্রুয়ারি ২, ১৮৮২। ডাবলিনের এক শহরতলীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জয়েস। তাঁর নামকরণ করা হয় জেমস অগস্টাইন অ্যালয়সিয়স জয়েস। উত্তরকালে এই নামটিকে সংক্ষিপ্ত করে তিনি লিখতেন জেমস জয়েস। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার প্রথম সন্তান। তাঁর মা ছিলেন সংগীতে পারদর্শিনী। ষোল-সতেরটি পুত্র-কন্যার মধ্যে বড় ছেলেটি সম্পর্কে তাঁর পিতা খুব গর্ব পোষণ করতেন। ছয় বছর বয়সে তাঁকে একটি জেসুইট স্কুলে পাঠানো হয়। এখানে তিন বছর পড়েছিলেন। নয় বছর বয়সে পিতার মুখে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বদেশপ্রেমিক পার্নেলের প্রশংসা শুনে, পুত্রও একটি কবিতা লেখেন ঐ স্বদেশপ্রেমিকের ওপর। পিতা সেটি মুদ্রিত করে ডাবলিনে বিতরণ করেন। এগার বছর বয়সে তাঁকে আর একটি জেসুইট বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়; এটির নাম বেলভেডিয়ার কলেজ। এখানে তিনি পড়েছিলেন চার বছর। তাঁর রচনার জন্য বহু পারিতোষিক লাভ করেছিলেন। একটি রচনার নাম ছিল: 'My Favourite Hero'—প্রধান শিক্ষক এটির খুব প্রশংসা করেছিলেন। ইউলিসিস ছিলেন সেই নায়ক।

ষোল থেকে কুড়ি—এই চার বছর জয়েস ইউনিভারসিটি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ধর্মপ্রাণ ছাত্র ছিলেন; সম্ভবত সেই কারণে তিনি জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেন। অত্যন্ত অধ্যয়নশীল ছাত্র ছিলেন জয়েস; বিদেশী সাহিত্য গভীরভাবে পাঠ করার ফলে তাঁর ইচ্ছা ও আগ্রহের পরিবর্তন ঘটেছিল। বিশ বছর বয়সেই কেবলমাত্র ল্যাতিন নয়, ইংরেজির মতো সহজেই ফরাসী ও ইতালিয় ভাষাও তিনি পড়তে ও বুঝতে পারতেন। ইবসেনের রচনা মূল ভাষায় পড়বার জন্য তিনি নরওয়েজিয়ান ভাষা পর্যন্ত শিখেছিলেন। আঠার বছর বয়সে তিনি 'ইবসেনের নতুন নাটক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি বিখ্যাত Fortnightly Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর জেমস ইবসেনকে একটি পত্র লিখেছিলেন। সত্যের প্রতি নরওয়ের নাট্যকারের একনিষ্ঠ অনুরাগের প্রশংসা ছিল সেই চিঠিতে।

বিশ বছর বয়সে স্নাতক হয়ে জয়েস ডাবলিন পরিত্যাগ করে এলেন প্যারিসে। প্যারিসে যখন তিনি এলেন তখন জয়েসের সম্বলের মধ্যে ছিল একখানা পরিচয়পত্র, কয়েকটি কবিতা ও দুই পাউণ্ড। এখানকার কোন একটি কলেজে ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর, কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, সমস্ত ফি আগাম দিতে হবে তখন জয়েস সেই সংকল্প পরিত্যাগ করেন। লেখার কাজ বন্ধ, কারণ লিখে কিছু রোজগার হয় এমন কিছু তখন তাঁর লেখনী থেকে আসছিল না। তখন তিনি পেশাদার গাইয়ে হবার কথা চিন্তা করলেন; উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তাঁর মায়ের সুকণ্ঠের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু অর্থের অভাবে গানের স্কুলে যেতে পারলেন না। গান শিখতে না পারলে গায়ক হবেন কি করে? এইভাবে প্যারিসে ছয় মাস অতিবাহিত হলো। এমন সময় বাড়ি ফিরে যাওয়ার তাগিদ এলো। কারণ তাঁর মা তখন মৃত্যু শয্যায়। রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা ছেলের গীর্জাবিমুখ স্বভাব তাঁর কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল।

জয়েসের জীবনে তাঁর একবিংশতিতম বয়সটি ছিল নানা রকম ঘটনায় পূর্ণ। ১৯০৩ সালের বসন্তকালে ডালকিতে ক্লিফটন স্কুলে জয়েস শিক্ষকের একটা কাজ পেলেন। এখানে শিক্ষকতার অবসরে তিনি আরো কয়েকটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করলেন। কিছু কাল বাদে ডালকিতে তাঁর সঙ্গে একদিন তরুণী নোরা বার্ণাকেলের সাক্ষাৎ হয় এবং ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে তাঁরা দুজনে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের অব্যবহিত পরেই তাঁরা দুজনে সুইটজারল্যাণ্ডে চলে যান। এখানে তাঁর একটি চাকরি পাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু প্রতিশ্রুত কাজটি না পেয়ে তিনি ট্রাইস্ট-এ চলে গেলেন। এখানে বার্লিজ স্কুলে তিনি ভাষা শিক্ষকের (Teacher of Languages) একটি চাকরি পেলেন।

পরবর্তী পঁচিশ বছর জয়েসের ইতিহাস হলো নির্বাসন ও দুঃখভোগের ইতিহাস, গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সংগ্রামের ইতিহাস, ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তির শত্রুতা এবং নৈরাশ্যের ইতিহাস। তাঁর বয়স যখন তেইশ বছর তখন তিনি কয়েকটি ছোট গল্প লিখে শেষ করেছেন এবং সেগুলি প্রকাশক কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। ছাপাও হয়েছিল, কিন্তু অশ্লীল বলে প্রকাশক বাজারে সে বই দিতে সম্মত হলেন না। ১৯১৪ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হয় তাঁর Dubliners নামক একটি গল্পের বই। 'ডাবলিনার্স' যুগসন্ধিক্ষণের বই। প্রকাশিত হওয়ার পর লণ্ডনের পাঠক মহলে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সংকলনটির অন্তর্গত 'The Dead' গল্পটি যেমন চিত্তস্পর্শী তেমনি উত্তেজক; এই গল্পটিতেই দেখা যায় যে কঠিন বাস্তববাদী লেখক প্রতীকবাদী লেখকে রূপান্তরিত হয়েছেন। এই নতুন স্থানে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ পোষণ নিয়ে জয়েসকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্কুলে শিক্ষকতা করে বেতন পেতেন আশী পাউণ্ড। তাই দিয়ে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্বাহ হতো। এই পরিবেশেই রচিত হয়েছিল A Portrait of the Artist as a Young Man. এই উপন্যাসটি জয়েসের জীবনের প্রথম কুড়ি বছরের অকপট আত্মচরিত।

এইবার আমরা জয়েস-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান 'ইউলিসিস' (Ulysses) সম্পর্কে আলোচনা করব। এই যুগান্তকারী উপন্যাসকে পাঠক ও সমালোচকগণ একবাক্যে জেমস জয়েসের মহত্তম সাহিত্যকীর্তি বলে অভিনন্দিত করেছেন। বইয়ের জগতে 'ইউলিসিস' সত্যিই প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। য়ুরোপের কোথাও যখন এর প্রকাশক পাওয়া গেল না তখন আমেরিকার এক দুঃসাহসী প্রকাশক বইটি প্রকাশ করতে সম্মত হন। বহু অর্থব্যয়ে বিপুলায়তন এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়া মাত্র অশ্লীলতার দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ পুস্তক বলে ঘোষিত হয়। তখন প্রকাশক নিউ ইয়র্কের জেলা কোর্টে সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ১৯৩৩, ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি উলসের ঐতিহাসিক রায় বেরুলো: 'Reading Ulysses in its entirely, did not tend to excite sexual impulses or lustful thoughts. The book is a sincere and serious attempt to devise a new literary method for the observation and description of mankind. It is a very powerful commentary on the inner lives of men and women. The charge of obscenity does not stand, and Ulysses may, therefore be admitted into the United States.'

অতঃপর সাহিত্য জগতে শুরু হয় ইউলিসিসের জয়যাত্রা। অতলান্তিকের এপার-ওপার জয়েসের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিকের জীবনে সে এক স্মরণীয় ঘটনা। বইটির প্রথম সংস্করণ বিক্রী হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার কপি। রাহুমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও 'ইউলিসিস' তথা এর লেখকের ভাগ্যে নিন্দা ও বিদ্রূপ সমানভাবেই বর্ষিত হয়েছিল। নানা জন নানা মত প্রকাশ করলেন; কেউ বললেন, বইটি দুর্বোধ্য, কেউ বললেন, আজগুবি। অন্যদিকে যাঁরা প্রকৃত সাহিত্য-বোদ্ধা তাঁরা 'ইউলিসিস' সম্পর্কে উচ্চ অভিমত প্রকাশ করলেন। মোট কথা, বিংশ শতকের এক বিস্ময়কর সাহিত্য সৃষ্টি হিসাবে অভিনন্দিত হলেও, একথা মিথ্যা নয় যে 'ইউলিসিস' সত্যিই একটি কঠিন উপন্যাস। সহজে বুঝবার মতো বই এ নয়। বিপুলায়তন এই উপন্যাসের কাহিনীর স্থাপত্য, এর মৌলিক শিল্পকর্ম, এর চরিত্র-চিত্রণ এমনই জটিল ও দুর্বোধ্য যে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা-সম্বলিত এই উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে পাঁচখানি ভাষ্য রচিত হয়েছিল। য়ুরোপের কথা-সাহিত্যে এটাও ছিল অভূতপূর্ব। এর পরিকল্পনা, এর বাঁধুনি, এর সুশৃঙ্খল লজিক, এর শব্দ বিন্যাস, সবকিছু মিলিয়ে, এজরা পাউণ্ডের মতে, 'Ulysses is unquestionably the most complex, the most confusing, and the most learned novel in all literatare.' রবীন্দ্রনাথও জয়েসের এই উপন্যাসটি পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—'কথা-সাহিত্যে এ এক আশ্চর্য, দুর্লভ সৃষ্টি।'

ইউলিসিসকে নিয়ে সারা পৃথিবীর পাঠক সমাজে যখন আলোড়ন চলছিল

তখন এর লেখকের বয়স ছিল বাহান্ন এবং তিনি তখন দৃষ্টিহীন হবার উপক্রম হয়েছেন। নির্বাসিত জেমস জয়েসের জীবনে স্থিরবিন্দু ছিল না; এদেশ থেকে ওদেশ—এই ছিল তাঁর বিধিলিপি। এক হিসাবে জন্মভূমি তিনি কোন দিন পরিত্যাগ করেন নি—আয়ার্ল্যাণ্ড ছিল সর্বক্ষণ তাঁর মনের মধ্যে এবং তাঁর সমস্ত উপন্যাসের পটভূমি হলো তাঁর স্বদেশ। তাঁর জীবনটাই ছিল এক বিড়ম্বিত ভ্রাম্যমানের জীবন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে পাঠিয়ে দিল সুইটজারল্যাণ্ড; সেখানে জুরিখে একটি নিজস্ব আস্তানা নির্মাণ করেন। তারপর শান্তি স্থাপিত হলে তিনি সপরিবারে চলে এলেন প্যারিসে। ভেবেছিলেন এখানে তাঁর জীবন শান্তিময় হয়ে উঠবে। কিন্তু অসুস্থতা, অর্থাভাব এবং পারিবারিক সমস্যায় তিনি ক্রমাগত উৎপীড়িত হতে থাকেন। বই থেকে আয়ের পরিমাণ সামান্যই ছিল; বন্ধু-বান্ধব ও নাম-হীন অনুরাগীদের কাছ থেকে পেতেন অর্থসাহায্য। অধিকাংশ অর্থ কন্যা লুসিয়ার চিকিৎসার জন্য খরচ হয়ে যেত। স্নায়ুর অসুখের জন্য মেয়েটিকে একটি স্বাস্থ্যাবাসে রাখতে হয়েছিল।

১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আবার তাঁকে ছিন্নমূল হতে হলো। জার্মান সৈন্য ফ্রান্স অধিকার করল; জয়েস আবার সুইটজারল্যাণ্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। মেয়েকে কিন্তু স্বাস্থ্যাবাসে রেখে আসতে হয়েছিল। পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন সঙ্গে করে কিছুই আনতে পারেননি। আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তিনি চলে গেলেন জুরিখে। দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান দৃষ্টিহীনতা, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন—এই দুঃসহ পরিবেশেই রচিত হয় তাঁর বিতর্কিত উপন্যাস Finnegans Wake এবং এই উপন্যাস পাঠ করে সবাই জানতে পারল জয়েসের ভাষাজ্ঞান কত ব্যাপক, কত গভীর। 'ইউলিসিস' ছিল একটি দিনের কাহিনী, আর 'ফিনিগানস' একটি রাতের কাহিনী, স্বপ্নালোকের কাহিনী। বারোটি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে এই উপন্যাসে আর এর মধ্যে আছে এক হাজার দ্ব্যর্থবাক্য বা শ্লেষ (pun)। শেক্সপীয়রের পর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্লেষ লেখক (punster) হিসাবে জয়েসের স্বীকৃতি ছিল অবিসম্বাদিত। সতেরো বছর ধরে তিনি এই বইটি লিখেছিলেন।

উনষাট বছর বয়সে জয়েসের দুঃখ দুর্দশা আরো বর্ধিত হলো। 'ফিনিগানস' থেকে অর্থাগম বিশেষ কিছু হলো না। ভবিষ্যতে কি হবে এই আশঙ্কায় তিনি বিব্রত হলেন, তেমনি মেয়ের জন্যও তাঁর দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। শরীর ও মন দুই-ই ভেঙে পড়ল। আন্ত্রিক ক্ষত (duodenel ulcer) ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন তিনি; অস্ত্রোপচার হলো, দু'বার রক্ত দেওয়া হলো; কিন্তু তিনি রোগমুক্ত হতে পারলেন না। ১৯৪১, জানুআরি ১৩, জুরিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন জেমস জয়েস। একজন যুগন্ধর সাহিত্যিক হিসাবেই বিশ্বসাহিত্যে জেমস জয়েস চিরকাল অধিষ্ঠিত থাকবেন, এবিষয়ে বিন্দুমাত্র বিতর্ক বা সন্দেহের অবকাশ নেই।

ফ্রানজ কাফকা

(১৮৮৩-১৯২৪)

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাহাতে ১৮৮৩ সালের ৩ জুলাই কাফকা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জীবনের শুরু থেকেই তিনি ছিলেন একটি নিঃসঙ্গ আত্মা। অত্যাচারিত ও প্রায়ই অবদমিত একটি জাতির কোলে তাঁর জন্ম। অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের মধ্যে চেকেরা ছিল একটি ঘৃণিত সংখ্যালঘিষ্ঠ, আর যেহেতু কাফকা ছিলেন একজন ইহুদী, সেজন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন ঘৃণিত সংখ্যালঘিষ্ঠ। তাঁর পরিবেশের সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ-খাওয়াতে পারতেন না বলে তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধ যেন আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর মা, জুলি লোই ছিলেন একজন খামখেয়ালি ও অত্যন্ত স্পর্শকাতর মহিলা। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন বিদ্বান ও স্বাপ্নিক। শৈশবে কাফকা নিজেকে তাঁর মাতুল বংশের সগোত্র মনে করতেন। তাঁর বাবা, হার্মান কাফকা ফ্যান্সি জিনিসের পাইকারী ব্যবসায়ে খুবই সাফল্য লাভ করেছিলেন। পরিবারের তিনিই ছিলেন সর্বময় কর্তা—তাঁরই প্রভুত্ব মেনে সবাইকে চলতে হতো।

কাফকা ছিলেন পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান; দুটি ভাই খুব শৈশবেই মারা যায়, এবং তিনটি ছোট বোনের থেকে সংসারে তিনি নিজেকে পৃথক মনে করতেন। জার্মান প্রাইমারি ও উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ হলে, তিনি প্রাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন; এখানে তিনি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। একটি বিতর্কসভায় যোগদান করে, তরুণ লেখকদের পরীক্ষামূলক লেখা সমর্থন করেন। একুশ বছর বয়সে পদার্পণ করার আগেই কাফকা উপলব্ধি করলেন যে, মাতুল বংশের ধারানুসারে স্বপ্নলোকে বাস করলে জীবনে তিনি কিছুই করিতে পারবেন না। তাই তিনি বাস্তব জগতে নেমে এসে জীবিকা অর্জনের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে তাঁর ব্যবসায়ে যোগদান করে. কিন্তু সেদিকে কাফকার কোন আগ্রহ বা আকর্ষণই ছিল না। সাহিত্য থেকে তিনি আইন অধ্যায়নের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং যথা সময়ে 'ডক্টর' অব ল' ডিগ্রী লাভ করলেন। তখন তাঁর বয়স তেইশ বছর। আইন পাশ করলেন বটে, কিন্তু প্র্যাকটিস করলেন না। তার পরিবর্তে তিনি প্রথমে একটি ইনসিওরেন্স অফিসে কেরানির চাকরি নিলেন, এবং পরে অষ্ট্রিয়া সরকারের ওয়ার্কমেন্স কমপেনসেশন ডিভিসনে একটি ভালো চাকরি সংগ্রহ করেন। এই চাকরিতে তাঁর অবকাশ ছিল প্রচুর এবং সেই অবকাশ তিনি সাহিত্য রচনার কাজে নিয়োগ করতেন। তাঁর এই সময়কার লেখাগুলি প্রধানত ছিল আত্মচরিতমূলক ও মানসিক প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি স্বরূপ।

উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি বার্লিনের এক তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তাঁর এই আসক্তি এমন তীব্র ছিল যে তিনি কখনো অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতেন, কখনো বা হয়ে উঠতেন আতঙ্কিত। দু'বছর কেটে গেল এইভাবে; তারপর কাফকা তরুণীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাব করার অব্যবহিত পরে তাঁরা পরস্পরের বাগদত্ত হন। তিনমাস পরে এটা তিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর এই আকস্মিক ও অপ্রীতিকর সিদ্ধান্তের জন্ত তিনি নানা রকম অজুহাত প্রদর্শন করেছিলেন। স্বাস্থ্য তাঁর এমনিতেই ক্ষীণ ছিল এবং ঐ বয়সে তাঁর যক্ষার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে তাঁর যে আশঙ্কা ছিল সেটা প্রকৃতপক্ষে ছিল মানসিক, শারীরিক নয়। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একটি প্রবন্ধ সংকলন এবং কয়েকটি ছোট গল্প; গল্পগুলির মধ্যে 'The Stoker' গল্পটি পুরস্কার পেয়েছিল এবং এই গল্পটিই হলো তাঁর America শীর্ষক কাল্পনিক গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়। কিন্তু তাঁর কোন প্রধান রচনাই সম্পূর্ণভাবে লেখা হয়নি এবং একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কয়েকজন ভিন্ন লেখক কাফকা সকলের কাছে অজ্ঞাত ছিলেন বললেই হয়। তাঁর অকালমৃত্যুর কয়েক বছর পরে য়ুরোপের সাহিত্য সংসারে কাফকার প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর তিনখানি অসম্পূর্ণ উপন্যাস কাফকার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ও অনূদিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল। এ সময়ে তিনি তাঁর ছোট বোনের কাছে কিছুকাল বাস করেছিলেন। স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং মনে হলো তিনি ধীরে ধীরে ব্যাধিমুক্ত হচ্ছেন। তখন তিনি যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে The Trial ও The castle উপন্যাস দুটি লিখতে থাকেন। কিন্তু তাঁর কাশিটা আরো দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠলো; ফলে জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলি কাফকাকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যাবাসে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। রোগশয্যায় শায়িত কাফকার মানসিক অবস্থার অতি মর্মস্পর্শী বর্ণনা আছে তাঁর দিনলিপিতে।

চল্লিশ বছর বয়সে ফুসফুস রোগাক্রান্ত রুগীদের জন্ত ভিয়েনার ভাইনার ভাল্ড স্যানাটোরিয়ামে কাফকা স্থানান্তরিত হলেন। একটি খোলা মোটর গাড়িতে করে তাঁকে এখানে আনা হয়েছিল এবং পথিমধ্যে হঠাৎ ঝটিকাবৃষ্টিতে তাঁর সর্বাঙ্গ ভীষণভাবে ভিজে যায় সেই অবস্থায় শীতে কাঁপতে কাঁপতে তিনি যখন স্বাস্থ্যনিবাসে এসে পৌছলেন তখন তাঁর বাক্‌শক্তি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বাস্থ্যনিবাসে তখন স্থানাভাব ছিল; তাই বাইরের বারান্দায় একটি ওয়ার্ডে সাময়িকভাবে তাঁকে রাখার ব্যবস্থা হয়। অবশেষে নিকটবর্তী অন্ত একটি স্বাস্থ্যনিবাসে তাঁকে আনা হয়। এইখানেই ১৯২৪ সালের ৩ জুন কাফকার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। এইবার কাফকার সৃষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। জাতিতে চেক হলেও তাঁর বইগুলি জার্মান ভাষায় লিখিত। তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত হয়েছিল সাতখানি। লেখকের মৃত্যুর পরে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বহুল পঠিত উপন্যাস 'দি ট্রায়াল।' তাঁর বইগুলি নৈরাশ্যের কাহিনী, একটি সুনিশ্চিত

আশ্রয়ের জন্ত প্রাণপণ অনুসন্ধানের কাহিনী, যদিও কাফকা জানতেন যে, পৃথিবীতে এ বস্তু সুলভ নয়। এই দ্বিবিধ বিষয় হলো উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় বক্তব্য। উপন্যাসের নায়ক একজন সাধারণ মানুষ, একটি ব্যাঙ্কে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত। হঠাৎ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, যদিও সে কোন অপরাধ করেনি বা কোন আইন ভঙ্গ করেনি। তার অভিযোগকারীদের সে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি এমন কি তার বিরুদ্ধে যে কি অভিযোগ তা সে জানে না। অনিচ্ছার সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ম সে একটি উকিলকে নিযুক্ত করে।

উপন্যাসটি রচিত হওয়ার ত্রিশ বছর পরে ফ্রান্সের দুই প্রখ্যাত ও বিদগ্ধ ঔপন্যাসিক আঁন্দ্রে জিদ এবং জঁা-লুই ব্যারো'ন্ট এর নাট্যরূপ প্রদান করেন, আর জার্মানিতে গটফ্রেড ভন আইনের একে অপেরায় রূপান্তারিত করেন। এই উপন্যাস আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যে এর লেখককে এনে দিয়েছিল অসামান্ত খ্যাতি। একটি প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং অনেকেই এই উপন্যাসটিকে অবলম্বন করে কাফকার জীবন-দৃষ্টি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। মানব জীবনের কয়েকটি মৌলিক সমস্তার কথা কাফকা উপন্যাসের নায়কের জটিল অভিজ্ঞতারাজির মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। 'দি ট্রায়াল' উপন্যাসের কাহিনীর প্রধান বিষয় হলো নৈরাশ্তবোধ। এই বিষয়টিকেই কাফকা তাঁর পরবর্তী উপন্যাসে (The castle 1926) প্রসারিত করেছেন। কাফকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যাক্স ব্রড বলেছেন : 'Not since the Book of Job has man's spirit left any record comparable in bitterness with Kafka's The Trial or The Castle. Justice presented under the image of a machine planned with an inhuman refinement of cruelty." কাফকার ব্যাখ্যাতগণ তাঁর কাহিনীগুলি সম্পর্কে সাধারণত দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে থাকেন। এক দলের বিবেচনায় Kafka's work is a tragic expression of life which depicts the world as a hopeless wasteland' এর সমর্থন আছে নৈরাশ্তপীড়িত এই ঔপন্যাসিকের নিজের একটি উক্তির মধ্যে। কাফকা নিজেই বলছেন যে, তাঁর যুগের নেতিবাচক উপাদানগুলিই তাঁর রচনারমধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তাইতো তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন : সাফল্যমণ্ডিত জীবনের জন্ত যে সব গুণের দরকার আমার মধ্যে তার একটিও নেই ; আমার যা আছে তা হলো মানুষের দুর্বলতার অংশগ্রহণের ক্ষমতা। আমার সময়ের যা কিছু নেতিবাচক আমি সেগুলি গ্রহণ করেছি। ইতিবাচক কিছুই আমার ভাগ্যে জোটেনি, একটা অসীম শূন্যতার মধ্যে আমি জীবনের অমাবস্তাকেই দেখেছি। তাঁর পূর্ণিমা কখনো আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।' কাকিগার্ডের জীবনচেতনার সঙ্গে কাফকার জীবনচেতনায় পার্থক্য এইখানেই।

মোটকথা, বর্তমান সভ্য সমাজের (যে সমাজে মানুষের জীবন সেইসব বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা তার কাছে দুর্বোধ্য) যথার্থরূপ কাফকার রচনায় উদ্ঘাটিত

হয়েছে, যেমন একদা হয়েছিল ডস্টয়ভস্কির রচনায়। বিংশ শতকের সাহিত্য সংসারে ফ্রানজ কাফকা একটি বড়ো রকমের প্রহেলিকা। সাহিত্যে যাঁরা অস্তিত্ববাদ বা অস্পষ্টতাবাদের প্রবক্তা তাঁদের অনেকেই কাফকাকে তাঁদের মতবাদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন। তিনি একই সঙ্গে ডস্টয়ভস্কির উত্তরসাধক, কার্কিগার্ডের শিষ্য ও সাত্রের অগ্রগামী। তবে কাফকামানস যথার্থভাবে বুঝতে হলে, তাঁর উপন্যাসগুলি ব্যতীত, তাঁর দিনলিপিকেই আমাদের অবলম্বন করতে হবে। ১৯২২ সালের ২৪ জানুআরির দিনলিপিতে কাফকা লিখেছেন 'My life is a hesitation before birth'—এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তিনি কেন সংকোচ বোধ করেছিলেন, তা ঠিকমতো বুঝতে হলে কাফকার চিন্তার সঙ্গে পাঠকদের একাগ্রতা বোধ করতে হবে নতুবা এই নিঃসঙ্গ লেখক এবং তাঁর রচনা দুইই আমাদের কাছে একটি প্রহেলিকা রয়ে যাবে।

কাফকা সম্পর্কে আর একটি কথা বলার আছে। সাহিত্য সংসারে বোধ করি তিনিই একমাত্র লেখক যিনি নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে নিষ্ঠুর ছিলেন। তাই আমরা তাঁর মধ্যে আত্মবিলোপ প্রবণতা লক্ষ্য করি। তিনি একান্তভাবেই আত্মপ্রচার-বিমুখ ছিলেন। তাঁর জীবিতকালে তাঁর যেসব রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সে সব অতি কষ্টে এবং বন্ধুজনের সনির্বন্ধ অনুরোধের ফলে সম্ভব হয়েছিল। নিজের রচনা প্রকাশ করতে তাঁর অনিচ্ছার মূলে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলি অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা। লিখতে তিনি আনন্দ পেতেন এবং নির্বাচিত গোষ্ঠীর সামনে সেই রচনা পাঠ করে শোনাতে তিনি আনন্দ পেতেন। তাঁর রচনাভঙ্গী ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সুন্দর এবং নাটকীয়। তাঁর রচনা পাঠ করে সত্যান্বেষীরা উপকৃত হবে, এমন ধারণা তিনি পোষণ করতেন না। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যাক্স ব্রডকে একটি চিঠিতে তিনি এই অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছিলেন: 'প্রিয় ম্যাক্স. আমার শেষ অনুরোধ, যা কিছু আমি পেছনে রেখে গেলাম (অর্থাৎ আমার বুক কেস, ড্রয়ার-ভর্তি টুকরো টাকরা রচনা, পাণ্ডুলিপি, সে সব যেন পুড়িয়ে দেওয়া হয়।' আর একটি পত্রে অনুরোধ করছেন এই বলে: 'প্রিয় ম্যাক্স, বোধ হয় এবার আমি বাঁচব না। অপ্রকাশিত যেসব রচনা রইল সেগুলি যেন আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।' প্রতিভার এক বিচিত্র রূপ আমরা কথা সাহিত্যে বোধ হয় এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম।

ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স

(১৮৮৫-১৯৩০)

জীবনধর্মী এই ঔপন্যাসিক ১৮৮৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ইস্টউড নামক একটি কয়লাখনির শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নামেই শহর, আসলে এটি ছিল একটা ময়লা, ক্ষুদ্র গ্রাম। এটি ডার্বিশায়ার ও নটিংহামশায়ারের মধ্যবর্তী সীমান্তে অবস্থিত ছিল। ভাইবোন মিলে তাঁরা ছিলেন পাঁচজন—তিন ভাই আর দুই বোন: জর্জ আর্থার, উইলিয়াম আর্নেস্ট ও ডেভিড হার্বার্ট; বোন দুটির নাম: এমিলি ও লেটিস এগডা। তাঁর পিতামাতার বিবাহের দশম বার্ষিকীতে লরেন্স এই পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন ইস্টউডের সংকীর্ণ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে একটি সামান্য পাকা বাড়িতে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন নিরক্ষর দিনমজুর, সারাজীবন তিনি কয়লাখনিতে কাজ করেছেন। নিজের নামটা পর্যন্ত সই করতে পারতেন না। অন্যদিকে তাঁর মা যিনি বিয়ের আগে শিক্ষিকার কাজ করতেন, ছিলেন শান্ত, ধৈর্যশীলা ও ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা। মদ্যপ ও নৃশংস প্রকৃতির মানুষ হলেও তাঁর বাবার অনেক গুণ ছিল—তিনি যেমন নৃত্যকুশল তেমনি সংগীতকুশল ছিলেন; কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর। সাহস ছিল অদম্য, হাস্যপরিহাসেও কম ছিলেন না। এক কথায়, প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটি জীবন্ত মানুষ। কিন্তু লরেন্সের জীবনে তাঁর মায়ের প্রভাবটাই ছিল বেশি।

ক্ষীণ স্বাস্থ্য নিয়েই লরেন্স জন্মেছিলেন; জন্মাবধি তিনি দুর্বল ছিলেন এবং ছেলেবেলায় একবার নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এর থেকে তিনি কোন দিনই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতে পারেননি। ছেলেবেলাতেই তাঁর মধ্যে স্নায়ুরোগ দেখা গিয়েছিল আর সেই সঙ্গে কষ্টদায়ক কাশি; এই কাশি তাঁর চিরজীবনের সঙ্গী ছিল। তাঁর বয়স যখন দু'বছর তখন লরেন্স-পরিবার ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে, শহরের উত্তর প্রান্তে উঠে আসেন। খনির মালিকরা তখন এই অঞ্চলে শ্রমিকদের বাসের জন্য কতকগুলি বাড়ি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল নানা উপাদানে মিশ্রিত—বিচিত্র বর্ণের ঝোপ-ঝাড়, নানা প্রকার লতা, ছোট্ট একটি নদী, নদীর ধারে শস্য পিষবার একটি কল। পাঁচ বছর এখানে বাস করার পর, লরেন্স-পরিবার উঠে এলো তিন নম্বর ওয়াকার স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। বাড়িটি পাহাড়ের উপর। লরেন্সের জন্মভূমির মনোরম দৃশ্য এই পর্বতের নীচে প্রসারিত ছিল। লরেন্স নিজেই বলেছেন: 'আমার দু'বছর থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত আমি এখানে বাস করেছিলাম। পৃথিবীর যে কোন স্থানের দৃশ্য অপেক্ষা আমি এখানকার দৃশ্য ভাল করে জানি।' তাঁর Sons and Lovers উপন্যাসে এই স্থানটির একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে।

স্থানীয় বোর্ড স্কুলে কিছুকাল পড়ার পর সেখান থেকে একটি ছাত্রবৃত্তি লাভ করে, লরেন্স নটিংহাম উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ছাত্র হিসাবে তিনি ভালই ছিলেন। ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ ছিল বছরে পনের পাউণ্ড। ইস্টউড থেকে নটিংহাম পর্যন্ত গাড়ি করে যাওয়া-আসার খরচ এই টাকাতে কুলোত না, মধ্যাহ্ন আহার তো দূরের কথা। একমাত্র তাঁর স্নেহময়ী মায়ের চেষ্টা ও যত্নেই লরেন্স এই স্কুলে তিন বছর পড়তে পেরেছিলেন। সতেরো বছর বয়সে ছাত্রজীবনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল লরেন্সের শিক্ষক জীবন। চার বছর শিক্ষানবিশ-শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছিলেন জন্মস্থান ইস্টউডের একটি বিদ্যালয়ে। তিনি অবশ্য তাঁর পড়াশুনা চালিয়ে যেতে থাকেন; এই সময় তিনি ফরাসী ভাষা ও উদ্ভিদবিজ্ঞান অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেছিলেন। তেইশ বছর বয়সে দক্ষিণ লণ্ডনের ক্রয়ডনে ডেভিডশন রোড স্কুলে তিনি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক নিযুক্ত হন। লরেন্সের বয়স তখনো কুড়ি বছর হয়নি যখন তিনি লেখনীর মাধ্যমে তাঁর অন্তর জগতের সংঘর্ষকে প্রকাশ করে তুলবার সংকল্প করেন। কবিতা দিয়ে শুরু হয় তাঁর সাহিত্য কর্ম। তাঁর প্রথম উপন্যাসটি কিন্তু আরম্ভ হয়েছিল কুড়ি বছর বয়সেই।

চার বছর শ্রমসাধ্য প্রয়াসের ফলে সমাপ্ত The White Peacock উপন্যাসটি হলো লরেন্সের আত্ম-উদ্‌ঘাটনের প্রথম প্রয়াস। তাঁর জন্মভূমির পরিবেশে রচিত, স্থূল কবিত্বপূর্ণ এবং করুণ ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত সম্বলিত এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হলো লেখকের অন্তরের ধূমায়িত বেদনা আর এটাই ছিল তাঁর পরবর্তী সকল উপন্যাসের ভূমিকা যার মধ্যে অভিব্যক্ত হতো গোপন নিগূঢ় প্রেম আর চরম পরাজয়।

১৮৫৭ সালটি ঔপন্যাসিকের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। তখন লরেন্সের বয়স আটাশ বছর। ইতালিতে একটি মনোরম হ্রদের ওপরে বাস করেন। এইখানেই তিনি তাঁর তৃতীয় উপন্যাসটির রচনা শেষ করেন। Sons and Lover, প্রকৃতপক্ষে, আত্মচরিত—এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় অভিব্যক্ত হয়েছে বেদনাময় ক্ষত-বিক্ষত একটি হৃদয়ের যন্ত্রণা। উপন্যাস বর্ণিত কনিষ্ঠ পুত্রটির জীবনের একদিকে তার মা, আর অন্যদিকে তার প্রণয়িনী, যে তার আত্মার জন্য যেমনি, তেমনি তার প্রেমাস্পদের মায়ের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত। পুত্রকে লক্ষ্য করে তীব্র সংগ্রাম চলে মা ও তরুণীর মধ্যে। শেষ পর্যন্ত মায়েরই জয়লাভ হয়। পুত্র তখন তার আত্মাকে তার মায়ের হাতে সমর্পণ করে ও প্রেমিকাকে পরিত্যাগ করে। ঠিক এই সময়ে তার মায়ের মৃত্যু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শূন্যতায় ভরে যায় তাঁর জীবন। এখানে উল্লেখ্য যে, বইটি প্রকাশিত হলে পরে সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই উপন্যাসের বক্তব্য ভুল বুঝেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাস The White Peacock ছিল ছন্দোময় গদ্যের অপূর্ব প্রকাশ এবং এটি পাঠ করে সমালোচকগণ একবাক্যে বলেছিলেন যে, পঁচিশ বছর বয়স্ক একজন ঔপন্যাসিকের পক্ষে এমন শক্তি

দুর্লভ। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পূর্বে তাঁর হাতে এই উপন্যাসটির একটি কপি দিতে তিনি পেরেছিলেন। লরেন্সের বাবা যখন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এটি লিখে সে কত পেয়েছে, তখন তার উত্তরে তরুণ ঔপন্যাসিক বলেছিলেন : পঞ্চাশ পাউণ্ড। লরেন্স আমাদের জানিয়েছেন যে, এই উত্তর শুনে তাঁর বাবা—কয়লা-খনির সেই হতভাগ্য দিন মজুর—স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

ঊনত্রিশ বছর বয়সে তাঁর ছোট গল্পের প্রথম সংকলন প্রকাশিত হলো The Prussian Officer এই নামে। ১৯১৫তে প্রকাশিত হলো The Rainbow, লরেন্সের চতুর্থ উপন্যাস। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠার সূচনা Sons and Lovers প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তখন থেকে ১৯৩০ সালের বসন্তকালে তাঁর শেষ অসুস্থতার সময় পর্যন্ত লরেন্স শুধু লেখার কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লেখাই যেন তাঁর একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছিল। লরেন্সের অন্তরঙ্গ জীবন তাঁর এই সময়কার রচনাগুলির মধ্যেই পাওয়া যাবে। তখন থেকে ভ্রমণ, দারিদ্র্য আর শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে থেকেও তাঁর অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং সর্বক্ষণ তিনি বাস করতেন মনোজগতে, তাঁর চিন্তার রাজ্যে। তিনি অনুভব করতেন যে, বুদ্ধির চেয়ে বড় ছিল তাঁর Instinct বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আরো অনুভব করতেন যে, অবচেতন মনেই সেই আলোর সৃষ্টি হয় যার সাহায্যে অচল, নিশ্ছিদ্র ও দুর্ভেদ্য অন্ধকার থেকে মানুষের রুগ্ন মনকে রক্ষা করা যায়। তাঁর লেখক জীবনের এই পর্বেই লরেন্স এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন : 'My great religion is a belief in the blood, the flesh, as being wiser then the intellect. We can go wrong in our minds But what our blood feels and believes and says, is always true.' বিশ্বসাহিত্যে এমন গভীর প্রজ্ঞার বাণী আর কোন লেখকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি।

লরেন্সের স্বাভাবিক প্রকৃতি তাঁর বুদ্ধির চেয়ে উন্নত হলেও, তাঁর ধ্যান-ধারনা ব্যক্তিগত বিপদ থেকে তাঁকে প্রকাণ্ড বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। 'দি রেনবো' উপন্যাস আইনের চক্ষে অশ্লীল বলে বিবেচিত হয়েছিল। উপন্যাসটির প্রচার আইনত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আদালতে দাঁড়িয়ে প্রকাশককে সভয়ে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, তিনি পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখেন নি, এবং তিনি নিজেই এর অশ্লীলতায় আঁৎকে উঠেছিলেন। প্রথম সংস্করণ বাজার থেকে তুলে নেওয়া হলো। বিদগ্ধ পাঠকগণ কিন্তু এই উপন্যাসের বিপুল রূপকল্প, ঐন্দ্রজালিক আবেদন, এবং প্রতীকধর্মী বাগ্‌বিন্যাস আবিষ্কার করে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছিল। এমন কি এর নিন্দাকারীগণও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, যদিও উপন্যাসটি অশ্লীল তথাপি এটি প্রবল জীবনশক্তিতে পরিপূর্ণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আবার নতুন করে বিপদ বহন করে নিয়ে এলো ঔপন্যাসিকের জীবনে। যেহেতু তাঁর সকল রচনার মধ্যে মানুষের জন্ম বৃহত্তর জীবনের সম্ভাবনার কথা থাকত, তাই যুদ্ধের নামে এইরকম 'সঙ্ঘবদ্ধ গণহত্যা' দেখে লরেন্স যারপরনাই

বিচলিত বোধ করেছিলেন। মৃত্যুর পথে মানবজাতির এই রকম উন্মত্তভাবে ছুটে চলায় বিরক্তও বোধ করেন। পত্নী ফ্রেডাকে নিয়ে তিনি দক্ষিণ ইংলণ্ডের একটি ছোট শহরে চলে যান। তখন যুদ্ধের সময়। জার্মানি শত্রু, এবং লরেন্সের সঙ্গে জার্মান স্ত্রী। তাই স্থানীয় লোক তাঁদের গুপ্তচর মনে করেছিল। অবশেষে দম্পতি বিতাড়িত হন। তাঁরা লণ্ডনে চলে এলেন। পরবর্তী দুটি বছর তাঁরা কোথাও স্থির হয়ে বসবাস করতে পারেন নি—বিভিন্ন স্থানে তাঁদের যাযাবর জীবন যাপন করতে হয়েছে।

১৯১৯ সালের শরৎকালে লরেন্স তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ইংলণ্ড ত্যাগ করে কন্টিনেন্ট ভ্রমণে বেরুলেন। লেখার কাজে তিনি বিরত ছিলেন না। তবে আগের তুলনায় তাঁর সেই সময়কার রচনায় উৎকর্ষ তেমন ছিল না। প্রকাশকরা তাঁর বই প্রকাশ করতে আর ঝুঁকি নিতে চাইল না। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হলো Women in love ; এই উপন্যাসকে তিনি 'দি রেনবো'-র উপসংহার বলে অভিহিত করেছেন। ১৯২৫ সালে তিনি এলেন মেক্সিকো শহরে, এইখানেই তিনি প্রচণ্ডভাবে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলেন। যদিও তাঁর বয়স তখন চল্লিশ হয়নি। তথাপি লরেন্স বুঝেছিলেন যে তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। ঔপন্যাসিক লরেন্স তখন থেকে নিজেকে এক নতুন জীবনদর্শনের—যে জীবনদর্শন রুশোর কল্পনায় একদিন জেগেছিল—প্রবক্তা ও নেতারূপে মনে করতে থাকেন। মেক্সিকোতে অবস্থান কালে তিনি লিখলেন Plumed Serpent ও Mornings in Mexico নামে দুটি বই। তাঁর জীবনের শেষ আট বছরের সাহিত্যকৃতি অপর্যাপ্ততায় চিহ্নিত ছিল। প্রথমটি ছিল উপন্যাস, দ্বিতীয়টি ভ্রমণ কাহিনী।

লরেন্সের সাহিত্যকর্মের শেষ পর্যায়ের বইগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো Lady Chatterley's Lover ; এই উপন্যাসটি তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রকাশিত হওয়া মাত্র তুমুল বিতর্ক ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল য়ুরোপের সাহিত্য জগতে যার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন বিতর্কের ঝড় উঠেছিল যে, লরেন্সকে তাঁর সাহিত্যকর্মের সমর্থনে Pornography and Obscenity এবং A Propose Lady Chatterley's Lover নামে দুটি বই লিখতে হয়েছিল। 'লেডি চ্যাটার্লি' উপন্যাসটির তিনটি খসড়া ঔপন্যাসিক লিখেছেন। তৃতীয় খসড়াটি সম্পূর্ণভাবে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৩০, মার্চ মাসের প্রথম দিনটি ফ্রান্সের একটি প্রধান শহরে লরেন্সের জীবন দীপ নির্বাপিত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর শয্যাপার্শ্বে মাত্র দুটি প্রাণী উপস্থিত ছিলেন—স্ত্রী ফ্রেডা ও একমাত্র কন্যা বারবারা। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য কবিতাটির নাম : 'The Ship of Death' ; কবিতাটির শেষের তিনটি লাইন এই : 'Oh build your ship of dea . Oh build it ! / for you will need it. / For the voyage of oblivion awaits you'. লরেন্সের উপযুক্ত কথা।

এজরা পাউণ্ড

(১৮৮৫-১৯২২)

আমেরিকার উপনিবেশ নিউ ইংল্যাণ্ড। এইখানে ১৮৮৫ সালের ৩০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেছিলেন এজরা পাউণ্ড। কাব্য সংসারে 'এজরা পাউণ্ড' শুধু একটি নাম নয়—একটি যুগ। জন্মস্থানের নাম—হেলি, ইডাহো। তাঁর মা ছিলেন কবি লংফেলোর দূরসম্পর্কের আত্মীয়া, বাবা একজন সরকারি চাকুরে। শৈশবেই পাউণ্ডকে নিয়ে আসা হয় পেনসিলভানিয়াতে। এখানেই শুরু হয় তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা। স্কুলের পাঠ সমাপনান্তে পনেরো বছর বয়সে তিনি পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। অধ্যয়ন স্পৃহা ছিল প্রবল। পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত অনেক অনেক বিষয় অধ্যয়ন করতেন। বিশেষ করে তুলনামূলক সাহিত্য। ষোল বছর বয়সে তিনি এখানে একজন 'বিশেষ ছাত্র' হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন। আঠার বছর বয়সে তিনি নিউ ইয়র্কের হ্যামিল্টন কলেজে ভর্তি হন ও কুড়ি বছর বয়সে স্নাতক হন এবং এক বছর বাদে সর্বোচ্চ পরীক্ষা দিয়ে লাভ করলেন এম এ. ডিগ্রী। অতঃপর স্পেনে গিয়ে ওখানকার বিখ্যাত নাট্যকার লোপ দ্য ভেগা র ওপর গবেষণা করে ডক্টরেট হন। এই সময়ে তিনি স্প্যানিস ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। পরবর্তিকালে তিনি লাতিন, গ্রীক, চীনা প্রভৃতি আরো সাতটি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ১৯০৭ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে একটি কলেজে অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু চারমাস পরে ছাত্রদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করার জন্য বরখাস্ত হন। তখন থেকেই স্বদেশবাসীর ওপর পাউণ্ডের মনে বিরাগভাগ জাগ্রত হয়, এই বিরূপতা তিনি আজীবন পোষণ করেছেন।

দেশত্যাগী হলেন পাউণ্ড। মাত্র আশী পাউণ্ড সংগ্রহ করে তিনি এলেন য়ুরোপে। মিতব্যয়ী মানুষ ছিলেন তিনি, তাই জীবিকানির্বাহের জন্য তাঁর সামান্যই ব্যয় হতো। ইতালিতে এলেন। এইখানে তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন, A Lume Spente, ভেনিস থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে। ছোট্ট বই। তিনি ছিলেন বহুপাঠী। এই পাঠাভ্যাসের একটা বর্ণাঢ্য প্রতিফলন ছিল এই কবিতাগুলি। কয়েক মাস পরে পাউণ্ড লণ্ডনে এসে বসবাস করতে থাকেন। এখানে এসে তিনি ইংলণ্ডের সবচেয়ে প্রাগ্রসর তরুণ লেখক-গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত হলেন, গ্রহণ করলেন সেই গোষ্ঠীর বিবিধ সাহিত্যকর্মের নেতৃত্ব। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি Peassonae ও Exnetations নামে আরো দুটি কবিতার বই প্রকাশ করেন। সাতাশের কোঠায় উপনীত হওয়ার আগেই তাঁর প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ছিল পাঁচ। ঊনত্রিশ বছর বয়সে ডরোথি সেক্সপিয়ার নাম্নী এক বিদুষী তরুণীকে বিবাহ করেন। এঁর গর্ভে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল।

পাউণ্ডের জীবনে ঘটনা বা event বলতে বিশেষ কিছু নেই। কবিতা ও উদীয়মান কবিদের নিয়েই ছিল তাঁর জীবন। যৌবনকালেই তাঁর আকৃতি হয়ে উঠেছিল অনেকটা ইহুদী ধর্মযাজকদের মতো রক্তবর্ণ শ্মশ্রু-গুম্ফ পরিশোভিত মুখ, আর অন্তর্ভেদী দু'টি চোখ, উন্নত নাসিকা, মাথায় অপর্যাপ্ত কেশদাম—সবকিছু মিলিয়ে তিনি ছিলেন আকর্ষণীয়। চেহারার মধ্যে যেমন, কথার মধ্যেও তেমনি মনীষাদীপ্ত একটি ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতি স্বকীয় বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল এবং অপ্রতিরোধ্য ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্য জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। নবযুগের কবি-ধর্মের তিনিই ছিলেন প্রধান ও বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিল যুগোপযোগী কবি-ধর্মের অনুশীলন, এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ওয়াল্ট হুইটম্যানের উত্তরসূরি। সাহিত্য ও শিল্পে যে নতুন ভাব, নতুন শৈলীর অভিব্যক্তি তখন আসন্ন হয়ে উঠেছিল তাকেই তিনি তাঁর অনুরাগীদের কাছে প্রচার করতেন। এজন্য তাঁর লেখনী ও রচনা দুই-ই সমান তালে চলত। ইংলণ্ডের কাব্যজগতে উদীয়মান তরুণ কবিদের তিনি তখন আচার্য হয়ে উঠেছিলেন। শিষ্যদের সম্পর্কে তাঁর আচরণ কঠিন ছিল বটে, কিন্তু destructive ছিল না। প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবিদের লেখা তিনি সযত্নে পাঠ করতেন এবং প্রয়োজন মত সংশোধন করে দিতেন। 'তোমাদের কবিতা গতানুগতিক হবে কেন? তার মধ্যে ব্যক্ত হবে নতুন যুগের নতুন কাব্য-চেতনা।' বলতেন তিনি প্রত্যয়ের ভঙ্গিতে।

পাউণ্ড-শিষ্যদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫)। এলিয়ট তাঁর The Waste land কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এজরা পাউণ্ডকে পড়তে দিয়েছিলেন। সেই পাণ্ডুলিপি পাঠ করে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তার আয়তন দেখে তরুণ কবিকে বলেছিলেন: 'If you can cut it to half its length, it will be an extraordinary poem, I am sure' লেখাটিকে কেটে ছোট করে দেওয়ার জন্য এলিয়টই পাউণ্ডকে অনুরোধ করেছিলেন। দি 'ওয়েষ্টল্যাণ্ড' পাউণ্ডের হাতে নবকলেবর ধারণ করেছিল; কৃতজ্ঞ এলিয়ট বইটি পাউণ্ডকে উৎসর্গ করেছিলেন। পাউণ্ড সমসাময়িক কবিদের সম্পর্কে শুধু মৌখিক সহানুভূতি দেখাতেন না, তাদের কাব্যসাধনার সাফল্যও কামনা করতেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি য়েটসও, এলিয়টের মতো, পাউণ্ডের কাছে ঋণী ছিলেন। এইভাবে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইংলণ্ডের কাব্যজগতে পাউণ্ড হয়ে উঠেছিলেন তরুণ কবিদের বহু অর্চিত ও নেতৃস্থানীয় কবি। কারণ তাঁর কণ্ঠে তাঁরা শুনেছিলেন এক নতুন সুর, তাঁর কাব্যচিন্তার মধ্যে পেয়েছিলেন নতুন জীবন বোধের ইঙ্গিত।

১৯২৪। ফ্রান্স ত্যাগ করে, পাউণ্ড এলেন ইতালিতে। এখানে তিনি ইতালিয়ান রিভিয়েরার অন্তর্গত র‍্যাপালো নামক সূর্যালোকিত একটি প্রত্যন্ত প্রদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। দীর্ঘ পনেরো বছর বাদে, ১৯৩৯ সালে এইস্থান পরিত্যাগ করে, স্বল্পকালের জন্য তিনি আমেরিকাতে এসেছিলেন। এই সময়ে

তিনি প্রকাশ্যে ফ্যাসীবাদের প্রশংসা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট জেফার্স-এর সঙ্গে ইতালির ডিক্টেটর মুসোলিনীর তুলনা করার জন্ম তিক্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এজন্য পাউণ্ডের অনুরাগী ও সমর্থকগণ খুব বিব্রত বোধ করেন, অনেকে বিরক্তও হন। তখন তাঁকে কেন্দ্র করে কঠিন সমালোচনার ঝড় বইতে থাকে। পাউণ্ড ইতালিতে ফিরে এলেন। তখন থেকে প্রকাশ্যে ফ্যাসিবাদের প্রচারে তিনি সক্রিয় হয়ে উঠলেন। ১৯৪১। জানুআরি। বেতারে শোনা গেল কবি এজরা পাউণ্ডের কণ্ঠস্বর। রোমের রেডিও থেকে তিনি নিয়মিতভাবে ফ্যাসিবাদ প্রচার করতে থাকেন। নিঃসন্দেহে এটা ছিল একটা অভাবনীয় ব্যাপার। তাঁর স্বদেশবাসীরা আরও বিস্মিত হয়েছিল যখন তারা জানতে পারল যে, রোম থেকে বেতারে তিনি আমেরিকা ও আমেরিকার শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত তীব্র ভাষণ দিয়ে চলেছেন। তিনি বেতারে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিন্দা করলেন, গণতন্ত্রকে আক্রমণ করলেন ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেন। এছাড়া সপ্তাহে দুবার করে তিনি বেতার মারফত শত্রুদের সাহায্য করতেন, উপদেশ দিতেন এবং জন্মভূমির বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্টদের উত্তেজিত করতেন। কবি এজরা পাউণ্ডের এই রূপান্তর তাঁর অনুরাগীদের কাছে ছিল রীতিমত অচিন্ত্যনীয়। তাঁর স্বদেশবাসীদের চক্ষে তিনি বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী বলে সাব্যস্ত হলেন। ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি পাউণ্ড গ্রেপ্তার হলেন; তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ নিয়ে আসা হলো। তাঁকে ওয়াশিংটনে নিয়ে আসা হলো। যদি তাঁর বিচার হতো, তাহলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত ছিল। কিন্তু চারজন মনস্তত্ত্ববিদ্ চিকিৎসক যখন তাঁকে পরীক্ষা করে অব্যবস্থিতচিত্ত বলে অভিমত প্রকাশ করলেন তখন (১৯৪৬, ১৪ ফেব্রুয়ারি) আদালত তাঁকে উন্মাদ বলে সাব্যস্ত করলেন এবং তাঁকে সেন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিন বছর পরে কবির বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। ১৯৪৯ সালটি তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। পাউণ্ডের বয়স তখন তেষট্টি বছর। কবি তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য প্রথম পুরস্কার লাভ করলেন—বোলিন জেন প্রাইজ। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এক হাজার ডলার। তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ Pisan Cantos এর জন্য তিনি এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে পাউণ্ডকে এই পুরস্কার প্রদান সেদিন ক্রুদ্ধ বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল।

বারো বছর পরে সেন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল থেকে তিনি ছাড়া পেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি ভেনিসে অবস্থান করেন এবং সেইখানেই ১৯৭২ সালে ৩ নভেম্বর প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে পাউণ্ডের বয়স হয়েছিল সাতাশী। তাঁর মৃত্যুতে য়ুরোপের সাহিত্য-জগতে যেন একটি বর্ণাঢ্য যুগের অবসান হয়েছিল।

তাঁর জীবিতকালে পাউণ্ড ছিলেন যেমন একটি প্রাণবন্ত ও বিতর্কিত মানুষ,

তেমনি তিনি ছিলেন এই শতাব্দীর একটি দেদীপ্যমান মূর্তি। এলিয়ট পাউণ্ড-প্রশস্তি রচনা করেছেন এই বলে: 'Ezra Pound is the most important poet in our language.' এলিয়টের এই উক্তি আদৌ অত্যুক্তি ছিল না। পাউণ্ডের কবি-খ্যাতি প্রকৃতপক্ষে 'ক্যান্টোজ' কাব্যটির জন্য। 'ক্যান্টোজ' তাঁর শ্রেষ্ঠ কবি-কীর্তি—magnum opus। এই বিশাল কাব্য রচনায় তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর অতিবাহিত হয়েছিল। কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত এই কাব্যের বক্তব্য কি? একবার কবিকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এর উত্তরে পাউণ্ড বলেছিলেন: 'This is an epic about everything and nothing.' মনের সঙ্গে মনের কথাবার্তা, দীর্ঘ একটানা আলাপ। 'ক্যান্টোজ' নানা স্তরের কাব্য। জটিল নয়, কিন্তু দুর্বোধ্য। কবি স্বয়ং এই কাব্যের নায়ক। হোমারের 'ওডেসি', দান্তের 'কমেডিয়া' আর মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট'—এই কাব্যগুলির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, পাউণ্ডের 'ক্যান্টোজ' এদের থেকে স্বতন্ত্র—বক্তব্যে, বর্ণনায় এবং আয়তনে। বরং এক হিসাবে 'ক্যান্টোজ' হলো পাউণ্ডের নিজের জীবন-সঙ্গীত, অর্থাৎ হুইটম্যানের Song of Myself যেন এক নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে দেখা দিয়েছে এই অসমাপ্ত কাব্যে। পাউণ্ডের ইচ্ছা ছিল একশোটি পরিচ্ছেদে কাব্যটি শেষ হবে। কিন্তু তা হতে পারেনি। এজরা পাউণ্ডের কাব্যে আধুনিকতা আছে কি নেই, এ প্রশ্ন অবান্তর; বরং এই কথাই বলা যায় যে, তিনি যে কাব্যলোক সৃষ্টি করেছেন, যে কাব্যবাণী নির্মাণ করেছেন তা পৃথিবীর মানুষকে সুনিশ্চিত-ভাবেই এক নতুন ভাবরাজ্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই।

টি. এস. এলিয়ট

বিগত অর্ধ শতাব্দীর কাব্য ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ টি. এস. এলিয়ট। কবিত্ব ও দার্শনিকতার সমাবেশে সার্থক তাঁর প্রতিভা। ইংলণ্ডের কাব্য-জগতের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল বুদ্ধিদীপ্ত এই প্রতিভার স্পর্শে। আমেরিকার নিউ ইংলণ্ডের এক পিউরিটান পরিবারে ১৮৮৮ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন টমাস স্টার্ণস এলিয়ট। তাঁর পিতামহ ছিলেন একজন ধর্মযাজক এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। এলিয়ট তাঁর পিতামাতার ছয়টি সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। শিক্ষায়, চরিত্রে, সামাজিক মর্যাদায়—সকল দিক দিয়েই এলিয়ট-পরিবার ছিল খুব উন্নত এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন। মা ছিলেন বিদুষী ও কবি; সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। মায়ের কবিত্বশক্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁরই প্রতিভাবান্ কনিষ্ঠ পুত্র।

১৯০৯ সনে এলিয়ট হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনের ছাত্র হিসাবে স্নাতক হলেন এবং পরের বছর স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্যারিসের সোরবোর্নে প্রবিষ্ট হন। সেখানে কিছুকাল অধ্যয়নের পর তিনি অক্সফোর্ডের মার্টন কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রজীবনেই এলিয়ট ইংরাজী ছাড়া, প্রাচীন গ্রীক, লাতিন, ফরাসী ও জর্মন ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন এবং য়ুরোপের চিরায়ত সাহিত্য সম্পূর্ণরূপেই অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় সংস্কৃতভাষাও বাদ যায়নি। ছাত্রজীবনে বহু খ্যাতনামা অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসেন। ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তাঁর শিক্ষক-জীবন। কিন্তু শিক্ষকতার প্রতি ছিল এলিয়টের প্রবল বিতৃষ্ণা। চার বছর পরে তিনি একটি সম্পূর্ণ নূতন পেশা গ্রহণ করলেন—লয়েড্স ব্যাঙ্কে চাকরি। ভবিষ্যতের কবি হলেন ব্যাঙ্কের একজন লেজার-কীপার। এই চাকরি তিনি করেছিলেন একাদিক্রমে আট বছর। এই সময়েই তাঁর জীবনসঙ্গিনী হয়ে তাঁর জীবনে প্রবেশ করেন নর্তকী ভিভিয়েন হেগ। ভিভিয়েন ছিলেন এক বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রকরের কন্যা। এলিয়টের বয়স তখন সাতাশ বছর। দাম্পত্য-জীবনে তিনি সত্যিই সুখী হয়েছিলেন।

তাঁর কর্মজীবনের শুরুতেই এলিয়ট সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। অবসর সময়ে তিনি 'Egoist' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সেই একই সময়ে তিনি 'এথেনিয়াম' ও 'টাইমস্ লিটারারি সাপ্লিমেন্ট'—এই দুখানি পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভবিষ্যতে যিনি সাহিত্যজগতে একজন বিদগ্ধ সমালোচক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন, সেই সমালোচক এলিয়টের জীবন এইভাবেই আরম্ভ হয়েছিল। কবিতা অবশ্য তিনি

এর আগে থেকেই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ব্যাঙ্কে চাকরি করেন, কিন্তু সাহিত্যই এলিয়টকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। একটা আলোড়ন জাগে মনের মধ্যে—চাকরি না সাহিত্যকর্ম? ক্রমে তাঁর দুই-একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল, এবং কবি হিসাবে কিছু খ্যাতিও তিনি লাভ করলেন। লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক প্রতিষ্ঠান 'ফবার য়্যাণ্ড ফেবার' থেকেই তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। একজন অখ্যাত ও অজ্ঞাতনামা কবির কবিতা, পাঠক-সমাজে যে এমন সমাদর লাভ করবে, প্রকাশকগণ সেটা প্রত্যাশা করেন নি। হাজারে হাজারে বিক্রী হল এলিয়টের কবিতার বই। তখন ঐ পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান থেকে এলিয়টের কাছে অনুরোধ এল যে, তিনি যদি একজন 'রিডার' হিসাবে যোগ দেন, তাহলে তাঁরা তাঁকে মাসিক আড়াইশত পাউণ্ড করে বেতন দিতে সম্মত আছেন। এলিয়ট ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দিয়ে 'ফেবার য়্যাণ্ড ফেবারে' যোগ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে স্বীয় কার্যদক্ষতা ও প্রতিভার বলে এলিয়ট এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ডিরেক্টর পদ লাভ করেছিলেন।

ফেবার কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফল শুধু এলিয়টের জীবনে নয়, সমগ্রভাবে ইংলণ্ডের কাব্যজগতেও ফলপ্রসূ হয়েছিল। যে তরুণ এবং আধুনিক কবিগোষ্ঠী তখন ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের কাব্যসংসারে প্রবেশ করছিলেন, তাঁদের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন ফেবারের অন্যতম ডিরেক্টররূপে স্বয়ং এলিয়ট। এইসব তরুণ কবির রচনা তাঁরই পরামর্শক্রমে এখান থেকে প্রকাশিত হতে থাকে এবং তা প্রকাশিত হত খুব মর্যাদার সঙ্গে। কাব্যের ক্ষেত্রে যেমন এলিয়টের কাব্যচিন্তা যুগান্তর এনে দিয়েছিল, কাব্যগ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন। বিশ শতকের য়ুরোপের কাব্যজগতে এলিয়টের নিরঙ্কুশ নেতৃত্বের পিছনে ছিল দুটি জিনিস—তাঁর নিজস্ব প্রতিভা আর ফেবার কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ। ১৯২৭ সনে এলিয়ট ব্রিটিশ নাগরিক অধিকার লাভ করলেন। তখন থেকে ইংলণ্ডই হল তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি।

এলিয়টের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি। এযুগের নব্যকাব্যের প্রধান পুরোহিত ছিলেন তিনি। পৃথিবীর সকল আধুনিক কবির উপর তিনি এক অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কাব্যেও এক সম্পূর্ণ নূতন রীতির তিনি প্রধান প্রবক্তা। মোহমুক্ত দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের দিকে তাকিয়ে, জগৎ ও জীবনের যে ক্লপদী ব্যাখ্যা তিনি করেছেন অলঙ্কারবর্জিত ভাষায়, তাই ই এযুগের কাব্যচিন্তায় এনে দিয়েছিল এক অভাবনীয় যুগান্তর। যুদ্ধোত্তর যুগের অবসাদ, সংশয় ও ক্লেদাক্ত জীবন-যন্ত্রণা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কাব্যের মুকুরে। নূতন চিন্তাধারাকে রূপায়িত করার জন্ত তিনি নূতন বাগ্-ভঙ্গিমা ও গঠন শৈলীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কাব্য-ভাবনার মতো এলিয়টের কাব্য-ভাষাও তাঁর পূর্বসূরীদের রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং মৌলিক।

এই বিদগ্ধ কবির কাব্যচিন্তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তিনি এক সম্পূর্ণ নূতন কাব্যাদর্শ প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছেন। মানুষের অন্তঃসারশূন্যতা, জীবনের শুষ্কতা ও ভঙ্গুরতার আর্তনাদ তাঁর কাব্যে যেমন ধ্বনিত হয়েছে, এলিয়ট-পূর্ব আর কোন কবির মধ্যে তা পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর স্বাতন্ত্র্য এইখানেই। দিক্‌ভ্রান্ত মানুষ আজ পুরাতন বিশ্বাসগুলি হারিয়ে ফেলেছে, অথচ আঁচার মতো নূতন কোন আদর্শের সন্ধানও সে পাচ্ছে না। এযুগের সভ্যতা তাই এলিয়টের দৃষ্টিতে স্তূপীকৃত ভগ্নমূর্তি ('Broken images') ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' এলিয়টের শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম বলে স্বীকৃত হয়েছে। এই কাব্যের আঙ্গিকের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে এলিয়টের জীবনদর্শন এবং নৈতিক জীবনের শুদ্ধতার উপর গভীর বিশ্বাস। এলিয়টের কবিমানস এই কাব্যে এক সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, সমস্ত আদর্শবাদমূলক আশা-ভরসার মূলোচ্ছেদ, পথ-সন্ধানে বিভ্রান্তি, চূড়ান্ত অবসাদ—সমসাময়িক য়ুরোপের এই সব বিভিন্ন ভাবক্লৈব্য এলিয়টের এই কাব্যে চরম অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এজরা পাউণ্ডের নামে উৎসর্গীকৃত এই কাব্যটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর এক চমৎকার মানস-দর্পণ।

এরপর ১৯২৫ সনে প্রকাশিত 'The Hollow Men' কাব্যে আধুনিক যুগের মূল্যবোধহীন মানুষের শূন্যতাবোধের অবস্থা বর্ণনা করলেন এলিয়ট। এখানে সুর আরো উচ্চ পর্দায় উঠে, বিশ্লেষণ আরো তীক্ষ্ণ। এক হিসেবে 'দি হলো মেন' তাঁর 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কাব্যেরই পরিপূরক অথবা উপসংহারও বলা যেতে পারে। একটা শতাব্দীর অস্থির মুহূর্ত যেন বিধোষিত হয়েছে এই কাব্যখানির ছত্রে ছত্রে। তাঁর এই কাব্যে কবি যে পৃথিবীর প্রতি তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন সেই পৃথিবী যেন নিঃশেষিত, ক্লান্ত—"সেই পৃথিবীর আকার আছে কিন্তু গঠন নেই, ছায়া আছে রঙ নেই, এর গতি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, এর ভঙ্গী আছে কিন্তু আবেগ নেই।" আর এই পৃথিবীতে যে সব মানুষ বাস করছে তারা কেমন? এলিয়টের দৃষ্টিতে: "They are empty, without vision; they lean together without thought; their dry voices whisper meaninglessly." এমন কি এই পৃথিবীতে মানুষ ভদ্রভাবে মরতেও জানে না, বাঁচা তো দূরের কথা।

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে এলিয়ট যেন আরো গভীরতার মধ্যে তন্ময় হয়ে গেলেন। এইবার একটা বিশিষ্ট দিক-পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল তাঁর কবিচেতনায়। এইবার এলিয়ট লিখলেন সেই মহান্ কবিতা 'Four Quartrets' যা পাঠ করে মনে হয় কবি যেন এক নূতন আলোর সন্ধান পেয়েছেন; উচ্চতম, গভীরতম আধ্যাত্মিক চেতনা স্পর্শ করেছে তাঁর কবিমনকে। বাস্তবের পূজারী উদ্বুদ্ধ হয়েছেন উচ্চতর দার্শনিক চেতনায়। এই অন্তঃসারশূন্য সভ্যতার জরবিকার থেকে মানুষের মুক্তির পথ কবি অনুসন্ধান করেছেন বাইবেলের বাণী আর উপনিষদের সঞ্জীবনী মন্ত্রের মধ্যে। এই কাব্যেই কবিতার শিল্পরূপ আর রসবস্তু—এই দুইটিকে অতিক্রম

করে ফুটে উঠেছে এক মহিমান্বিত জীবন-জিজ্ঞাসা। কবি এলিয়ট এখানে একজন প্রাজ্ঞ দার্শনিক।

কবি হিসাবে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ হলেও সমালোচক ও নাট্যকার হিসাবে এলিয়ট কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি। তাঁর মঞ্চসফল কাব্য নাট্যগুলির মধ্যে Murder in the Cathedral, The Cocktail Party, Statesman, Family Reunion ও Confidential Clerk সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে রসিকজনের কাছে। মধ্যযুগের মিষ্ট্রি প্লের অনুসরণে রচিত 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' অনেকের বিবেচনায় এলিয়টের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য। এই প্রসঙ্গে জনৈক খ্যাতনামা সমালোচকের একটি উক্তি স্মর্তব্য। তিনি লিখেছেন: "Murder in the Cathedral is a landmark in modern drama. The impact of its revivalism has been strongly felt. It has proved that verse can give to drama a meaning and feeling which prose can never give." ধর্মীয় শহীদ ক্যান্টারবেরির টমাস বেকেটের কাহিনী নিয়ে রচিত এই কাব্যনাট্যে এলিয়ট প্রলোভনের মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

সমালোচকরূপেও এলিয়টের প্রতিভা ইংরেজী সাহিত্যে এক অভিনব রীতির প্রবর্তন করেছে। সমালোচক এলিয়টের পরিচয় আছে তাঁর 'Selected Essays' 'On Poetry and Poets', 'Poetry and Drama,' 'The Sacred Wood' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির মধ্যে। এলিয়টের কবি-সত্তা থেকে সমালোচক এলিয়টকে পৃথক করে ভাবা উচিত নয়, কারণ তাঁর সমালোচনাগুলির মধ্যেই তাঁর কবিমানসের ক্রম-পরিণতির ধারাটা সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্য রচনার পদ্ধতি থেকে তাঁর সমালোচনার পদ্ধতিও আলাদা নয়—একটির মধ্যে আছে অপরটির মূল্যায়ন। তাঁর মতে কবিতায় কবির ব্যক্তিত্ব বা আবেগ প্রকাশিত হয় না—হয় শুধু শাশ্বত সত্য। এলিয়টের জীবনের অর্ধশতাব্দীকালের কাব্য-সাধনা এই সত্যের সন্ধানে ও অনুশীলনেই সার্থক হয়েছে। ১৯৪৮ সনে তিনি যখন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তখন বিশ্বের বিদগ্ধ রসিকজন তঁকে একজন "Trail-blazing pioneer of modern poetry'—এই বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। বলাবাহুল্য, এলিয়ট সর্বতোভাবেই এই অভিনন্দনের যোগ্য ছিলেন।

ইউজিন ও'নীল

(১৮৮৮-১৯৫৩)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ইউজিন ও'নীল। ১৮৮৮, ১৬ অক্টোবর, নিউ ইয়র্ক শহরের চারতলায় একটি পারিবারিক হোটেলের পিছন দিকের একটি ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্পূর্ণ নাম ইউজিন গ্লাডস্টোন ও'নীল। তিনি ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার তৃতীয় পুত্র। বাবা জেমস ও'নীল ছিলেন একজন প্রথিতযশা অভিনেতা— নিউইয়র্ক থিয়েটারে 'ম্যাটিনি আইডল', 'দি কাউন্ট অব্ মন্টিক্রিস্টো' নাটকের তিনিই শাশ্বত নায়ক। মায়ের নাম ছিল এলা কুইনলান ও'নীল। জেমসের ছিল নিজস্ব একটি ভ্রাম্যমান থিয়েটারের দল; তাঁর জন্মের পর প্রথম সাতটি বছর বাবার দলের সঙ্গে বালক ও'নীল অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। এই সময়টা তাঁর বিশেষ কোন লেখাপড়া হয়নি। তারপর আট বছর বয়সে তাকে একটা রোমান ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুলে দেওয়া হয় এবং তখন থেকে তাঁর প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয়। এই বোর্ডিং স্কুলে পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়। তারপর তেরো বছর বয়সে তাকে কনেকটিকটে স্ট্যামফোর্ড এর বেটস একাডেমিতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এটাও ছিল আবাসিক স্কুল। দীর্ঘকাল তাঁকে পিতামাতার সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল, এমনকি ছুটির দিনগুলিও তাকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হতো। আঠারো বছর বয়সে তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হলেন। এখানে তিনি এক বছরের কিছু কম সময় অতিবাহিত করেন।

ছাত্রজীবন শেষ হলো। শুরু হয় ভ্রাম্যমাণের জীবন। হোনডুরাসে সোনার সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লেন এবং সেখানে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরলেন। কিন্তু ঘুরে বেড়ানই সার হলো সোনা মিলল না। আক্রান্ত হলেন জ্বরে। ফিরে এলেন আমেরিকায়। ফিরে এসে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন ক্যাথলীন জেনকিনস নাম্নী এক তরুণীর সঙ্গে। এঁর গর্ভে ও'নীলের যে প্রথম পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল, তার নাম রাখা হয়েছিল ইউজিন, জুনিয়র। এই সময় তাঁর বাবার থিয়েটারে সহকারী স্টেজ ম্যানেজারের কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু কি গার্হস্থ্যজীবন, কি থিয়েটারের রুটিন বাঁধা কাজ—দুয়ের কোনটাতেই তিনি যেন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেন না। তখন একটি মালবাহী জাহাজে এক সাধারণ নাবিকের চাকরি নিয়ে ও'নীল এলেন বুয়েনস এয়ার্স। শুরু হয় নাবিকের জীবন; এক বছর ধরে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আফ্রিকার মধ্যে যাওয়া আসা করলেন, এবং অবশেষে নিউ ইয়র্ক এবং তারপর নিউ ওরলিয়ানস। তাঁর বাবা তখন সেখানে অভিনয় করছিলেন। এইখানে ও'নীলকে আমরা অভিনেতা হিসাবে দেখতে পাই। কিন্তু

তাঁর অভিনেতার জীবন চার মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি। এলেন উত্তর আমেরিকায় এখানে তিনি 'নিউ লণ্ডন টেলিগ্রাফ' কাগজে রিপোর্টার এর কাজ নিলেন। কিন্তু সংবাদ সংগ্রহের কাজটা তাঁর তেমন মনঃপুত হলো না। এই সময়ে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দিতেই চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করালেন। পরীক্ষায় দেখা গেল শরীরে ক্ষয় রোগ দেখা দিতে শুরু করেছে। তখন তাঁকে কনেকটিকটের একটা স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দীর্ঘ পাঁচ মাস তাঁকে স্বাস্থ্যনিবাসে থাকতে হয়েছিল। যখন তিনি স্বাস্থ্যনিবাস থেকে ছাড়া পেলেন, অমনি নাটক রচনায় মনোনিবেশ করতে থাকেন। এগারটি একাঙ্ক ও দুটি বড় নাটক লিখলেন। নিজের রচনা সম্বন্ধে ও'নীল খুবই সচেতন ছিলেন, তাই তাঁর উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় নি যে, যেসব নাটক তিনি লিখেছেন সেগুলির অধিকাংশই শুধু অভিনয়ের অনুপযোগী নয়, প্রকাশ করাও যোগ্য নয়। ছয়টি একাঙ্কিকা বাদে বাকী নাটকগুলির পাণ্ডুলিপি তিনি পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেললেন।

ও'নীলের বয়স তখন ছাব্বিশ বছর। পুত্রের নাট্যপ্রতিভা আছে এবং উপযুক্ত শিক্ষা পেলে তার উৎকর্ষ সাধিত হবেই—এই বিশ্বাসেই জেমস ও'নীল ছেলেকে হার্ভার্ডে একটি নাটকের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন ও এক বছরের বেতন ভার বহন করতে সম্মত হলেন।

১৯১৬। ব্যাগভর্তি পাণ্ডুলিপি নিয়ে, ও'নীল এলেন প্রভিন্সটাউনে। এইখানকার একটি নতুন থিয়েটারে তাঁর প্রথম নাটকের অভিনয় হলো। নাটকটির নাম : Bound East for Cardiff, সবাই প্রশংসা করল নাটকের। নতুন নাট্যগোষ্ঠীর এই প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হওয়াতে তাঁরা নিউ ইয়র্কের গ্রীনউইচ গ্রামে তাঁদের মঞ্চ স্থাপন করলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তাঁরা প্রভিন্সটাউন প্লেয়ার্স নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ১৯১৭ থেকে ১৯২০—এই তিন বছরের মধ্যে এই নাট্যগোষ্ঠী ও'নীলের ছয়খানি একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ করেছিলেন। ১৯২০ সালে তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক, Beyond the Horizon, মঞ্চস্থ হয় এবং একশত রাত্রি এর অভিনয় চলেছিল পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। এই নাটকের জন্য নাট্যকার লাভ করেন মার্কিন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, পুলিটজার প্রাইজ।

নাটক রচনায় চিরাচরিত রীতি ভেঙে, পাদ প্রদীপের আলোর সামনে তিনি তাঁর অন্তরের আবেগপ্রবণতাকে তুলে ধরতেন। সুদীর্ঘ সংলাপের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধি বিধান লঙ্ঘন করে, The Emperor Jones নাটকে ও'নীল কেবল মাত্র একক উক্তি বা monologue ব্যবহার করেছেন এবং এর দ্বারা পরিপূর্ণ নাট্যরস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। ও'নীল তাঁর Strange Intertude নাটকে মানুষের আন্তরচিন্তার একটা নূতন দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত করেছেন। পুরাতন ও জীর্ণ বলে থিয়েটারে এতকাল যে স্বগত উক্তি পরিত্যক্ত হয়েছিল তার মাধ্যমে মানুষের শক্তি কীভাবে অভিব্যক্ত হতে পারে, নাট্যকার সেটাই যেন সন্দেহাতীত

ভাবে দেখিয়েছেন তাঁর এই বিপুলায়তন নাটকের প্রতিটি দৃশ্যে। এই নাটকেই আমরা সর্বপ্রথম পেলাম দুই প্রকার সংলাপ এক, সাধারণ সংলাপ; দ্বিতীয় অবচেতন মনের সংলাপ। একই মানুষের মনের চিন্তা একই সময়ে যে দুই খাতে প্রবাহিত হতে পারে 'ইন্টারলুড' নাটকে ও'নীল তা ই আমাদের দেখালেন। এই রীতি তাঁর প্রতিভার এক আশ্চর্য, মৌলিক সৃষ্টি।

এরপরেই উল্লেখ্য Mourning Becomes Electra নাটক। আরো নতুন আঙ্গিকের রীতি প্রবর্তন করলেন ও'নীল। পুরাতন নাটকগুলিতে 'বিরাম' বা 'after time' বলে একটা জিনিস ছিল। এই নাটকে এই রীতি বর্জিত হয়েছে। পাঁচঘণ্টার এই নাটকের বিরামহীন অভিনয় দেখে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার নাট্য সমালোচক ব্রুকস য়্যাটকিনসন উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

তাঁর নাটকগুলির আকৃতিতে যেমন দ্রুত পরিবর্তন এসেছে, ঠিক তেমনি দ্রুত পরিবর্তন এসেছিল ও'নীলের জীবনে। নানা ধরনের কাজ করেছেন, তিনি, নানা স্থানে বসবাসের চেষ্টা করেছেন তিনি, কিন্তু কোন একটি স্থানে দীর্ঘকাল বাস করা তাঁর জীবনে সম্ভব হয়নি। নিউ ইংল্যাণ্ড, বারমুডা, ফ্রান্স, স্যানফ্রান্সিসকোর উপসাগর থেকে দূরে অবস্থিত তাও হাউস, নিউইয়র্ক, কেপকড প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তিনি বাস করেছেন, কিন্তু কোথাও স্থিরভূমি লাভ করতে পারেন নি।

১৯৩৩। ও'নীলের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ বছর। তাঁর প্রতিভা একটি নতুন বাঁক নিল। অনুরাগীদের তিনি বিস্মিত করলেন। Ah, Wilderness নামে তার নতুন নাটক দিয়ে। এটি কমেডি প্রধান একটি কৌতুক নাটক। মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে দর্শকগণ কর্তৃক নাটকটি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয় ও খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ পর্যন্ত তিনি যত নাটক লিখেছেন তার মধ্যে রূপায়িত হয়েছে আজকের পৃথিবীর রুগ্নতা আর মানুষের বিফলতার বস্তুবাদী রহস্য। তিন শত রজনী এর অভিনয় চলেছিল। এর পরের নাটকখানি (All God's Got Wings) ছিল বিতর্কমূলক; পাছে জাতিগত দাঙ্গার সৃষ্টি হয় সেই আশঙ্কায় কোন থিয়েটারে এটি মঞ্চস্থ হতে পারেনি। এরপর ও'নীলের নাট্যচিন্তায় দিক্‌-পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়; সেই পরিবর্তন প্রতিবিম্বিত হলো Desire under the Elmes নাটকে; এই নাটকে বক্তব্য বিষয়: সমাজের নগ্ন দুর্নীতি।

১৯৩৬। নাট্যকারের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর ও'নীল নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। এই দুর্লভ সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল। তিনিই প্রথম মার্কিন নাট্যকার যিনি এই সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি যে মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন সেটি এখানে বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য: 'This highest of distinctions is all the none gratifying because I feel so deeply that it is not only my work which is being honoured but the work of all my colleagues in America that the Nobel Prize is a symbol of the American theatre.' একমাত্র

বার্নার্ডশ'র নাটক ব্যতীত সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই নাটকের অভিনয় হতো বেশি আর শেক্সপীয়র ও শ'য়ের পরেই ও'নীল ছিলেন তাঁর সময়ে বহুল পঠিত নাট্যকার। তাঁর নাটকাবলীর বিক্রীও ছিল পৃথিবীর সকল দেশে।

কিন্তু হঠাৎ তাঁর সৃষ্টির ধারা মন্দীভূত হয়ে যায়—সেই সঙ্গে শারীরিক অবনতিও দেখা দিতে থাকে। নাট্যকার বুঝলেন, তাঁর প্রতিভার পুঁজি নিঃশেষিত হয়েছে, রঙ্গমঞ্চ বা, নাট্যসাহিত্যে তাঁর নতুন কিছু দেবার নেই। সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার পঞ্চাশ বছর বয়সে দেহ ও মনে পীড়িত ও অসুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর পারিবারিক জীবন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। চার্লি চ্যাপলিনকে বিয়ে করার জন্য কন্যা উনাকে তিনি কোনদিনই ক্ষমা করতে পারেন নি। কনিষ্ঠ পুত্র ঘুমের ওষুধে অত্যধিক আসক্তির ফলে জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলি হাসপাতালে কাটাতে বাধ্য হয়। ১৯৫০ সালে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র (ইনি একজন শিক্ষক ও গ্রীকভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন) আত্মহত্যা করে। ক্রমে ও'নীলের স্বাস্থ্যের এমন অবনতি ঘটলো যে তিনি দেখতে একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে গেলেন ; কোটরগত চক্ষু দুটিতে সে উজ্জ্বলতা আর নেই। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে পেশীর অসুখের জন্য কলম ধরতে একেবারেই অপারগ হয়ে গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে মুখে মুখে বলে যান আত্মচরিতমূলক তাঁর সর্বশেষ নাটক 'Long Day's Journey in to Night' এবং নির্দেশ রেখে যান যে, তাঁর মৃত্যুর পর পঁচিশ বছর উত্তীর্ণ না হলে যেন এটি মঞ্চস্থ না হয়।

জীবনের শেষ দশটি বছর তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে অতিবাহিত করেছেন। সে এক দুঃসহ জীবন। ক্রমে সম্পূর্ণভাবে অশক্ত হয়ে পড়েন ও কঠিন নিউমোনিয়া হয়। সেই অবস্থায়, ১৯৫৩, ২৭ নভেম্বর, পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইউজিন ও'নীলের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে 'টাইমস' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—'ও'নীলের আগে আমেরিকাতে শুধু থিয়েটার ছিল, নাটক ছিল না, ও নীলের পর আমেরিকা সত্যিকারের নাটক পেয়েছে।' এই উক্তি আদৌ অত্যুক্তি নয়।

চার্লস চ্যাপলিন

(১৮৮৯-১৯২৭)

বিশ্বের অপ্রতিরথ কৌতুকাভিনেতা বা কমেডিয়ান চার্লস চ্যাপলিন। নির্বাক বা সবাক অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি যত লোককে হাসিয়েছেন, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত আর কোন মানুষ তা পারেনি। কটাক্ষে যাঁর কৌতুক, দৃষ্টিতে যাঁর করুণা ও বেদনামিশ্রিত নির্মল হাসি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশজনের তালিকায় যাঁর নাম, সেই মানুষটি আপন প্রতিভাবলে আধুনিক কালের একজন সার্বজনীন মানুষ বলে গণ্য হয়েছিলেন। জাতি ও শ্রেণীনির্বিশেষে যে ভালবাসা তিনি দর্শকদের কাছ থেকে পেয়েছেন তা তুলনাহীন বললেই হয়। অথচ এই মানুষটির শৈশবের অনেকগুলি বৎসর চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল।

'১৮৮৯, এপ্রিল ১৬, রাত্রির আটটার সময় লণ্ডনের এক অখ্যাত ও অনভিজাত পল্লীতে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম।' তাঁর আত্মচরিতের প্রথমেই এই কথা লিখেছেন চার্লি চ্যাপলিন। জন্মের পর নাম রাখা হয় চার্লস স্পেনসার চ্যাপলিন। তাঁর বাবা ছিলেন জাতিতে ফরাসী-ইহুদী আর মায়ের শরীরে ছিল আয়ার্ল্যাণ্ড ও স্পেনের রক্ত; তিনি ছিলেন সংগীত ও নৃত্য পটিয়সী। বাবারও পেশা ছিল সংগীত ও বাজনা। মা ও বাবা দু'জনেই সংযুক্ত ছিলেন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে। মায়ের নাম ছিল হানা—অপূর্ব সুন্দরী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্না। তাঁর পূর্বস্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর হানা চার্লির বাবাকে স্বামীত্বে বরণ করেন। তাঁর প্রথম স্বামীর ঔরসজাত তিনটি ছেলের মধ্যে চার বছরের তৃতীয় পুত্র সিডনীকে নিয়ে তিনি চলে এসেছিলেন। এই ঘটনার চার বছর পরে তাঁর গর্ভে চার্লির জন্ম হয়েছিল। শৈশবে চার্লি অনেকদিন পর্যন্ত সিডনীকে তাঁর সহোদর ভাই বলে জানতেন। স্বামী ছিলেন মদ্যপ, তাই হানাকে আর্থিক সংকটের ভেতর দিয়ে সংসার চালাতে হতো। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি ধৈর্যশীলা ছিলেন তিনি।

এগারো বছর বয়সে সিডনী জাহাজের চাকরি নিয়ে চলে যায়। চার্লি তখনও স্কুলে পড়ছে যখন তার মা মানসিক অসুখে আক্রান্ত হয়ে একটি হাসপাতালে ভর্তি হন। সংসারে বালক এখন একাকী, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। তার আশ্রয় হলো রাস্তা। সংবাদ বহন ও আরো নানা রকম কাজ করে প্রতিদিন কয়েক পেনি যা উপার্জন করতো তাই দিয়ে চলত তার গ্রাসাচ্ছাদন। কিছু টাকা জমিয়ে সিডনী ফিরে এসেই তার ভাইয়ের খোঁজ করতে থাকেন। তারপর দুজনে মিলে তাদের প্রতিভার সাহায্যে ভাগ্যের পরিবর্তন সাধনে প্রয়াসী হন। তখন চার্লির বয়স দশ বছর। সিডনী কনিষ্ঠের এজেন্ট হয়ে থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরে বেড়াতে থাকেন কোথাও যদি চার্লির একটা কাজ হয়। অবশেষে লণ্ডন হিপ্‌পোড্রোম থিয়েটারে তাঁর

একটা কাজ হলো। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি ইংলণ্ডের জনপ্রিয় বালক-অভিনেতারূপে গণ্য হয়েছিলেন।

তাঁর বয়স তখনো কুড়ি বছর হয়নি যখন একজন প্রথম শ্রেণীর কৌতুকাভিনেতা হিসাবে চার্লি যুক্তরাষ্ট্র মার্কিনে এসে উপনীত হলেন একটি ভ্রাম্যমাণ প্যান্টোমাইন গোষ্ঠীর সঙ্গে। ভাঁড়ের (Clown) অভিনয়ে তিনি ঐ বয়সেই বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন চব্বিশ বছর তখন চার্লির সাপ্তাহিক উপার্জন ছিল পঞ্চাশ ডলার। তারপর সপ্তাহে দেড়শত ডলারে তিনি কী স্টোন ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন। ১৯১৩ সালের শেষভাগে এই চুক্তি শেষ হওয়ার পর চার্লি ক্যালিফর্নিয়ার চলে গেলেন। ঠিক এইসময়ে আমেরিকার চলচ্চিত্র শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছিল—পরিবর্তনও হচ্ছিল দ্রুত। সেই পরিবেশেই চলচ্চিত্র শিল্পের পীঠস্থান হলিউডে প্রবেশ করেছিলেন চার্লি চ্যাপলিন নিজের ভাগ্যান্বেষণে। ইতিমধ্যে তাঁর অগ্রজ সিডনী কী স্টোন কোম্পানীতে কয়েকটি ছোট ছোট নির্বাক চিত্র তৈরি করেছেন; এই ছবিগুলির মধ্যে একটি তো সারা পৃথিবীতে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলো। অগ্রজের এই সাফল্য অনুজকে করলো অনুপ্রাণিত। 'I shall either stand or fall by devoting myself to this art of making movies.' এই সময়ে একদিন এই কথা তিনি বলেছিলেন তাঁর দাদাকে।

চার্লি চ্যাপলিন আমেরিকাতে আসার এক বছরের মধ্যে য়ুরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধল। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর। চলচ্চিত্র নির্মাণে দাদার সফলতা দেখে কনিষ্ঠ তাঁকে বলেন, 'এসো, আমরা দু'জনে মিলে একটা ফিল্ম কোঁম্পানী খুলি। একটা ক্যামেরা হলেই কাজ চলবে।' সিডনী বাঁধা মাইনের চাকরি ছাড়তে সম্মত হলেন না। আমেরিকার চলচ্চিত্র জগতে চার্লি যখন প্রবেশ করেছিলেন তখন হাসির ছবিই দর্শকরা বেশি পছন্দ করতো—দুই কি তিন রীলের ছোট ছোট ছবিই তোলা হতো। পূর্ণাঙ্গ ছবি তোলার যুগ এলো বিশ্বযুদ্ধের সময়। এর পেছনে ছিল য়ুরোপীয় চলচ্চিত্রের প্রভাব। কী স্টোন ফিল্ম কোম্পানীর নতুন কৌতুকাভিনেতা হিসাবে চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় সম্পর্কে কাগজে যখন লেখা হলো: 'Chaplin is an original and indisputable laugh-getter,' তখন ঐ প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রধান ম্যাক সেনেট তাঁকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে আরো অধিক বেতনে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

ম্যাক সেনেট চ্যাপলিনের মাইনে প্রতি সপ্তাহে দেড়শো ডলার থেকে চারশো ডলার বৃদ্ধি করে দিলেন। তখন এসানি নামে অপর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান এর দশগুণ অর্থাৎ সপ্তাহে এক হাজার আড়াইশো ডলার বেতনের লোভ দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে গেল। এই নতুন কোম্পানির সঙ্গে এক বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। আবার তাঁর দাম দশগুণ বেড়ে গেল। এইবার সকলের ওপর টেক্কা দিলেন মিউচুয়াল ফিল্ম কোম্পানি—সপ্তাহে দশ হাজার ডলার বেতন

আর বছরে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার বোনাস—এই চুক্তিতে চার্লি এঁদের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করলেন। চলচ্চিত্র জগতে তাঁকে নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি হলো এই প্রথম। এখানে উল্লেখ্য যে, এসানি চিত্র-কোম্পানিতে কাজ করার সময়ে চার্লি-প্রতিভার যথার্থ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

১৯১৬-১৭ সালের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পৃথিবীতে তাঁর ছবি যেমন দর্শকদের মনে হাসির তুফান জাগিয়েছিল, তেমনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিলেন তিনি। তারপর তাঁর জীবনে গৌরবময় অধ্যায় এলো সেইদিন যেদিন তিনি ফার্স্ট ন্যাশনাল চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন (১৯২০)—বেতন দশলক্ষ ডলার আর বোনাস পনর হাজার ডলার। এই প্রতিষ্ঠানের বিখ্যাত ছবি 'The kid' চিত্রজগতে অকল্পিত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল; চাঞ্চল্যের কারণ একা চার্লি নন, অপর একজন বালক অভিনেতা—জ্যাকি কুগান সে চার্লিরই আবিষ্কার ছিল। এই প্রতিষ্ঠানেই তিনি সর্বপ্রথম প্রযোজক হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন আর পেয়েছিলেন একটি নিজস্ব স্টুডিও। এছাড়া পেয়েছিলেন ব্যবসায়ের লভ্যাংশ। এখানে উল্লেখ্য যে, যে চার বছর (১৯১৪-১৮) চ্যাপলিন কী স্টোন ফিল্মসের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন তখন তিনি মোট পঞ্চাশখানি ছবিতে অভিনয় করেন, বেশির ভাগই ছিল এক কি দুই রীলের ছবি। মিউচুয়াল ফিল্মস প্রতিষ্ঠানে তিনি বারোখানা ছবিতে অভিনয় করেন। ফার্স্ট ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানে বারোখানি ছবিতে তিনি প্রযোজক, অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন। 'দি কিড' ছবিটি ছয় রীলের ছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯২৩—এই দশ বছর ছিল চ্যাপলিনের ফিল্ম জীবনের প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় ও সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক অধ্যায় শুরু হয় যখন (১৯২৩) তিনি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'দি ইউনাইটেড আর্টিস্টস ফিল্ম' গঠন করেন। তখন থেকে শুরু হয় চার্লি-প্রতিভার স্বর্ণযুগ।

চিত্রাভিনেত্রী মেরী পিকফোর্ড, ডি, ডাব্লু গ্রিফিথস, ডবলু এস হার্ট, ডাগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস ও চার্লি চ্যাপলিন—এঁদেরই সম্মিলিত ও যৌথ প্রয়াস ছিল ইউনাইটেড আর্টিস্টস কর্পোরেশন। পরে তাঁদের এই উদ্যমের সঙ্গে মিলিত হন প্রখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী ও চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী এডলফ জুকর। ১৯২৩ সালে ইউনাইটেড আর্টিস্টস্ স্থাপিত হওয়ার পর চার্লি প্রথম পূর্ণাঙ্গ চিত্রনির্মাণে অগ্রসর হলেন। ১৯২৩ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে তিনি সবশুদ্ধ নয়খানি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করেন এবং এই ছবিগুলিতে তিনিই ছিলেন একাধারে প্রযোজক কাহিনীকার, পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা। প্রত্যেকখানিই ছিল, চলচ্চিত্রের ভাষায় 'হিট্ পিকচার'; প্রথম চারখানি ছিল নির্বাক আর বাকীগুলি সবাক। 'দি গোল্ড রাশ', 'দি সার্কাস' এবং 'সিটি লাইটস'—চিত্রজগতে আলোড়ন নিয়ে এসেছিল। সবাক ছবিগুলির মধ্যে 'দি মডার্ণ টাইমস', 'দি গ্রেট ডিক্টেটর' আর 'লাইমলাইট' চার্লির প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান হিসাবে স্বীকৃত। জার্মানির স্বৈরাচারী অধিনায়ক হিটলারের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত 'দি গ্রেট ডিক্টেটর' ছবিটি সারা

পৃথিবীতে অভিনন্দন লাভ করেছিল। মাত্র চিত্তবিনোদনের জন্ত চ্যাপলিন ছবি করতেন না; তাঁর প্রত্যেকটি ছবির এমন একটা বক্তব্য থাকত যার আবেদন সর্বজনীন। সার্কাসে যারা চাকরি করে তাদের জীবনের ট্রাজেডি অতি মর্মস্পর্শী-ভাবে রূপায়িত হয়েছে 'দি সার্কাস' ছবিতে। তেমনি কলে কারখানার শ্রমিকদের জীবনের বাস্তব চিত্র 'দি মডার্ণ টাইমস'। অভিনেতার জীবনের অসহায়তাকে তিনি অনবদ্য ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'লাইমলাইট' চিত্রে।

দীর্ঘকাল আমেরিকাতে বাস করেও তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন নি; এইজন্ত ঐ দেশের সরকার যখন তাঁকে কম্যুনিষ্ট অপবাদ দেন, তখন চ্যাপলিন চিরকালের জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করে তাঁর জন্মভূমি ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। তাঁর পারিবারিক জীবন কিন্তু শান্তিপূর্ণ হয়নি; অনেক নারীকে ভালবেসেছেন, বিয়ে করেছেন তাদের কাউকে-কাউকে, আবার বিচ্ছেদ হয়েছে তাদের সঙ্গে। অবশেষে চতুর্থবার তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন নাট্যকার ইউজিন ও'নীলের অষ্টাদশী কন্তা উনা ও'নীলের সঙ্গে। এই বিবাহ হয় ১৯৪৩ সালের জুন মাসে। চার্লির বয়স তখন চুয়ান্ন বছর। তখন থেকেই তাঁর গার্হস্থ্য জীবনে সুখ-শান্তি দেখা দেয়। তিনি 'স্যার' (Knight) উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। পৃথিবীর বিদগ্ধ মানুষ তাঁকে একবাক্যে নিপীড়িত মানব-সমাজের কবি ('The poet of hard-pressed humanity') বলে অভিনন্দিত করেছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তিনি একটি অনন্তলব্ধ স্থান অধিকার করে আছেন। সেখান থেকে তিনি কোনদিনই বিচ্যুত হবেন না। তাঁর শিল্পী-জীবনের উপলব্ধ সত্য হলো, তাঁর নিজের কথায়, 'The sublimeir rare in any vocation or art.' বলা বাহুল্য, চ্যাপলিনের নিজস্ব সৃষ্টি সত্যিই Sublime—মহৎ, অতি মহৎ। ১৯৭৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর যখন সমস্ত খ্রীস্টান জগতে চলছিল বড়দিনের সমারোহ সেই দিনটিতেই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন লক্ষ চিত্তজয়ী চার্লি চ্যাপলিন।

এডলফ্ হিটলার

(১৮৮৯-১৯৪৫)

বিংশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নায়ক হিটলার। অশিক্ষিত অষ্ট্রিয়ান; ভিয়েনার বস্তীর একটি পরিত্যক্ত মানুষ, যিনি, দুর্যোগপূর্ণ কয়েক বৎসর পরে, বিধ্বস্ত জার্মানিকে একটি নির্মম, নিষ্ঠুর বিশ্বশক্তি রূপে তুলে ধরেছিলেন এবং সেই সঙ্গে রুগ্ন য়ুরোপকে প্রায় অপ্রতিবিধেয় বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিমজ্জিত করে দিয়েছিলেন। ১৮৮৯, ২০ এপ্রিল, জন্ম গ্রহণ করেন হিটলার অষ্ট্রিয়া-ব্যাভেরিয়ার মধ্যবর্তী সীমান্তে অবস্থিত ব্রাউনাউনামক একটি ছোট্ট শহরে। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার তৃতীয় পত্নীর তৃতীয় সন্তান। তাঁর বয়স যখন ছ'বছর তখন হিটলার গ্রামের স্কুলে ভর্তি হন। অষ্ট্রিয়ার আর পাঁচটি গ্রাম্য ছেলের মতোই ছিলেন তিনি। গতানুগতিক শিক্ষাই তিনি লাভ করেছিলেন। এগার বছর বয়সে তিনি লেখাপড়ায় ছেদ টেনে দিয়ে একজন 'পেণ্টার' (painter) হওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁর বাবা যখন বুঝতে পারলেন, ছেলে ছবি আঁকার কাজ শিখছে তখন ছেলের ওপর তাঁর রাগের সীমা-পরিসীমা ছিল না। এরপর লিনজের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিনি প্রবিষ্ট হন; পড়াশুনায় বিশেষ অমনোযোগী ছিলেন না বটে, তবে কথায় কথায় প্রতিবাদ করতেন। তিনি তাঁর খুশিমত পড়তেন। ফলে এখান থেকে কোন সার্টিফিকেট তিনি লাভ করতে পারেন নি। ১৯০৩। তাঁর বাবা মারা গেলেন। দু'বছর পরে হিটলার, তখন তাঁর বয়স ষোল বছর, চিরকালের মতো স্কুল ছেড়ে দিলেন।

মিউনিকের একটি বেসরকারী চারু শিল্প বিদ্যালয়ে তিনি প্রবিষ্ট হলেন; মাত্র কয়েক মাসে ছিলেন এখানে। তারপর আঠার বছর বয়সে তাঁর মায়ের সহায়তায় তিনি ভিয়েনার সরকারী চারুশিল্প বিদ্যালয়ে (Academy of Fine Arts) ভর্তি হওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন। এখানে তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। হিটলারের বয়স তখনো কুড়ি বছর পূর্ণ হয়নি যখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। ভিয়েনাতে এলেন ভাগ্যান্বেষী তরুণ হিটলার একটা কিছু হওয়ার সংকল্প বুকে নিয়ে। তখন কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল যে, এই আশাহত, ভাগ্যহত তরুণের বিস্ময়কর অভ্যুদয় ঘটবে জার্মানির রাজনীতিতে ত্রিশ বছরের মধ্যে এবং তাঁর দাপটে কেঁপে উঠবে য়ুরোপ, কেঁপে উঠবে সারা পৃথিবী। ভিয়েনাতে এসে হিটলার এটা-সেটা সামান্য কাজ করেন। সে সব কাজ ছিল বিচিত্র ধরনের; যেমন—রাস্তায় জমাট বাঁধা বরফের স্তূপে গাঁইতি চালিয়ে হয়ত কয়েক পেনি পেলেন, অথবা রেল স্টেশনে কারো স্যুটকেস বহন করে কয়েকটি পেনি, কার্পেট ঝাঁড় দিয়েও কিছু উপায় হতো, এমন কি রাজপথের মাতালদের কাছে ভিক্ষা

কিছু পেতেন। গলিতে ঘুমোতেন, পার্কের বেঞ্চিতে ঘুমোতেন। সঙ্গতি থাকলে কখনো সংসার পরিত্যক্ত ছন্নছাড়াদের সঙ্গে বাস করতেন। বিনিপয়সায় স্যুপ খাওয়ার জন্য লাইন দিতেন ; কখনো বা ভাগ্যক্রমে জুটতো এক টুকরো পাঁউরুটি ও একখানা সসেজ। তাঁর চেহারা আদৌ আকর্ষণীয় ছিল না।

এর থেকে অনেকে হয়তো অনুমান করতে পারেন যে, তাঁর এই দৈন্যদশা আর ঐ ধরনের সঙ্গীসাথী হিটলারকে সর্বহারাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলেছিল। পক্ষান্তরে ঐ শ্রেণীর প্রতি তাঁর ঘৃণার সীমা-পরিসীমা ছিল না। তিনি পরিচালিত হতেন একটা অযৌক্তিক ও সীমাহীন অবিশ্বাস দ্বারা। অবিশ্বাসের সঙ্গে ছিল নিষ্ঠুর মনোভাব। তাঁর এই অবিশ্বাস গিয়ে পড়েছিল শ্রমিকদের ওপর, বিশেষ করে ইহুদীদের ওপর। উদারনৈতিক, সোস্যাল ডেমোক্র্যাট কেউ বাদ যায়নি তাঁর নিষ্ঠুরতা আর অবিশ্বাসের মনোভাব থেকে। হিটলারের রক্তে ছিল প্রচণ্ড ইহুদী বিদ্বেষ এবং এর দ্বারাই তিনি উন্মত্তের মতো পরিচালিত হতেন। ইহুদী নিধন-যজ্ঞ তাঁর সময়কার জার্মানীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। হিটলার জার্মান জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে গণ্য করতেন। ইহুদীরা তাঁর স্বজাতির রক্ত কলুষিত করে দিয়েছে—এই রকম একটি অদ্ভুত ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি, ক্ষমতালাভের পর, জার্মানিতে ইহুদী-নিধন যজ্ঞের সূচনা করেন। পৃথিবীতে যারা সাম্যবাদ প্রচার করতো তাদের সবাইকে হিটলার ঘৃণা করতেন। মার্কস তিনি যথেষ্ট পড়েছিলেন এবং সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, যেহেতু মার্কস একজন ইহুদী ছিলেন, সেই জন্য ইহুদী মাত্রেই তাঁর চক্ষে কম্যুনিস্ট। তাঁর ইহুদীবিরোধী মনোভাব কেবলমাত্র ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পৃথিবীতে যাঁরা মানবতাবাদী, আন্তর্জাতিকতাবাদী, সংস্কারবাদী ও বুদ্ধিজীবি, তাঁদের সম্পর্কেও হিটলার আজীবন ঘৃণার ভাব পোষণ করে এসেছেন। অথচ তাঁর এই উন্মাদ চিন্তা-ভাবনার সমর্থনে হিটলার একটিও তথ্য উপস্থাপিত করতে পারেন নি।

অন্তরে এই প্রবল ইহুদী-বিদ্বেষ পোষণ করে, হিটলার-মানস ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, এবং তখন থেকেই তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধতে থাকে সকলের অগোচরে। একদিন ভিয়েনাতে শ্রমিকদের একটা প্যারেড দেখে হিটলারের মনে হয়েছিল যে, প্রচণ্ড শক্তির সামনে এরা অবনত হয় এবং জনসাধারণকে হাতে রাখতে হলে একমাত্র শক্তি দ্বারাই সেটা সম্ভব। এই মনোভাব নিয়েই একদা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছিল হিটলারের যাঁকে 'The greatest demagog of history' বলে চার্চিল অভিহিত করেছিলেন। চব্বিশ বছর বয়সে উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই তিনি খুব ভাল বক্তৃতা দিতে শিখেছিলেন—অশিক্ষিত জনসাধারণকে তিনি বক্তৃতা দ্বারা সহজেই তাতিয়ে মাতিয়ে তুলতে পারতেন। হিটলারের নেতৃত্বের সফলতার রহস্য ছিল এটাই চব্বিশ বছর বয়সে তিনি ভিয়েনা পরিত্যাগ করে মিউনিকে এলেন। ভিয়েনায় দেখেছিলেন ইহুদীদের প্রাধান্য, মিউনিকে দেখলেন তার বিপরীত চিত্র

এখানে খাঁটি জার্মান প্রাধান্য, খাঁটি নর্ডিক জাতির প্রাধান্য। সেই প্রাধান্যের পুনরুজ্জীবন ছিল হিটলারের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন চরিতার্থ করবার সুযোগ এলো তাঁর জীবনে ১৯১৪ সালে যখন য়ুরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। ব্যাভেরিয়ার সৈন্যবাহিনীতে তিনি যোগদান করলেন। সৈনিক হিসাবে তাঁর জীবন উল্লেখযোগ্য ছিল না। সৈন্যদলে তিনি ছিলেন একজন কর্পোরাল মাত্র। তাঁর কাজ ছিল চিঠিপত্র বহন করা। যুদ্ধে তিনি Iron Cross লাভ করেছিলেন। যুদ্ধে জার্মানির শোচনীয় পরাজয় তাঁর মনে রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলে ঘৃণা। যাঁরা ভার্সাই সন্ধিপত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাক্ষর প্রদান করেছিলেন, হিটলারের চক্ষে তাঁরা দেশের ও জাতির বিশ্বাসঘাতক বলে গণ্য হয়েছিলেন। জার্মানি তখন গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র। এটা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। তিনি তখন তথাকথিত জার্মান ন্যাশানাল সোসালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টিতে যোগদান করলেন। উত্তরকালে এই রাজনৈতিক দলটি নাৎসী' (Nazy) দল নামে অভিহিত হয়। এই দলের প্রতীক চিহ্ন ছিল 'স্বস্তিকা' বা, বাঁকানো ক্রশ।

হিটলারের নেতৃত্বে এই নাৎসীদল শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং তারা রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করেছিল। য়ুরোপের আর এক অংশে ইতালীতে তখন আর একজন শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি মুসোলিনী। রোম সাম্রাজ্যবাদের পুনরুজ্জীবন ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর রাজনৈতিক দলের নাম 'ফ্যাসিষ্ট'। মুসোলিনীর অভ্যুত্থান ও সাফল্য হিটলারের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং উত্তরকালে দুজনে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জার্মানির অর্থ-নৈতিক দুর্দশা চরমে উঠেছিল ; তার ওপর দেখা দিয়েছিল খাদ্যাভাব ও বেকার সমস্যা। সমস্ত দেশটা যেন দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। এই ভাবে জার্মানীর রাষ্ট্রীয় কাঠামো যখন ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছিল, তখন, দেশের সেই সংকটজনক পরিস্থিতিতেই জার্মানির রঙ্গমঞ্চে নাৎসী-নায়ক এডলফ হিটলারের অভ্যুদয় ঘটেছিল। ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর দলকে গৃহযুদ্ধে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে ব্যাভেরিয়ার রাজ্য অধিকারের প্রয়াস করেন ও ব্যর্থকাম হন। এই সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান সফল না হওয়ার দুটি কারণ ছিল, প্রথম, নাৎসীদল তখন সুগঠিত হয়ে ওঠেনি ; দ্বিতীয়, সময়টা উপযুক্ত ছিল না। হিটলার গ্রেপ্তার হলেন।

তখন থেকেই হিটলার এই নামটি জার্মানির জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। ফিরতে থাকে পৃথিবীর মানুষের মুখে মুখে। তাঁর বিচার তাঁর একটা রাজনৈতিক জয়লাভ হিসাবে গণ্য হল। জেলে বসেই তিনি 'মেন ক্যাম্প' (Main Kampf) রচনা করেছিলেন। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বইটি নাৎসীদলের বাইবেল স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। কারামুক্ত হওয়ার পর দলকে তিনি নতুন করে সংগঠিত করেন ও আরো শক্তিশালী করে তোলেন। পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে হিটলারের নেতৃত্ব তথা তাঁর ন্যাশনালিস্ট-সোস্যালিস্ট পার্টি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়। তিনি জার্মানির বড় বড় শিল্পপতিদের সমর্থন লাভ

করলেন। জনসাধারণের অসন্তোষকে তিনি কাজে লাগালেন। ক্ষমতালাভের পদ্ধতি তিনি পরিবর্তন করলেন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। এখন তিনি শিখেছেন যে, সশস্ত্র বিপ্লব অপেক্ষা আইনানুগভাবে ক্ষমতা লাভ করাই সুবিধাজনক অর্থাৎ নির্বাচনের ভেতর দিয়ে ক্ষমতালাভ। বক্তৃতা ও কৌশল দ্বারা তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করার চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয়েছিল : Nazis promise home to homeless, employment to the jobless···We appeal to the downtrodden to rise and declare their superiority with us.' এই কথাগুলি সেদিন মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল জার্মানির জনসাধারণের মনে।

১৯৩৩, ৩০ জানুআরি। হিটলার তথা জার্মানির জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর। য়ুরোপের ইতিহাসেও, এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসেও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জার্মানির সমরনায়ক, বৃদ্ধ মার্শাল হিণ্ডেনবার্গ তখন রাইখের প্রেসিডেন্ট। নির্বাচনে জয় লাভ করার পর নাৎসীদলের নেতা হিসাবে হিটলার তখন তাঁকে চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত করতে প্রেসিডেন্টকে বাধ্য করলেন। কথায় ও কাজে হিটলার জার্মানির অধিনায়ক হলেন। চ্যান্সেলার থেকে অধিনায়ক হতে তাঁর খুব বিলম্ব হলো না। ডিক্টেটর হিটলার জার্মানির বুক থেকে তখন বিরোধীদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। তাঁর দুই প্রধান সহকর্মী—গোয়েরিং ও গোয়েবলসের সহায়তায় তিনি এই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। চ্যান্সেলার হিটলারের তৃতীয় রাইখ দশ বৎসরকাল মাত্র স্থায়ী হয়েছিল।

হিটলার হলেন 'ফুয়েরার' (Fuehrer) এবং জার্মানির অধিনায়ক যখন একে একে পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি রাষ্ট্র গ্রাস করতে লাগলেন তখনই ইংলণ্ডের টনক নড়ে এবং অবশেষে ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এইযুদ্ধে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়াও জড়িয়ে পড়েছিল। এই যুদ্ধ চলেছিল প্রায় পাঁচ বছর। ১৯৪৫ সালে মিত্রশক্তির হাতে জার্মানির চূড়ান্ত পরাজয় ও ভূগর্ভস্থ একটি প্রকোষ্ঠে গ্যাসোলিনের অগ্নিশিখায় দগ্ধ হয়ে অধিনায়ক হিটলারের মৃত্যুতে অথবা আত্মহত্যায় সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। এই বোধ হয় ছিল সেই উন্মাদ, অব্যবস্থিতচিত্ত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির নর-দানবের নিয়তি—মানব সভ্যতার ইতিহাসে যিনি শোণিতাক্ষরে একটি কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করে গিয়েছেন। তথাপি আপন ক্ষমতার বলে তিনি পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন একজন world shaker হিসাবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শক্তির দম্ভে হিটলার ছিলেন নেপোলিয়ানের সগোত্র।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
(১৮৯৯-১৯৬১)

১৮৯৯। জুলাই ২১।

শিকাগোর শহরতলী ওকপার্ক, ইলিনয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মার্কিন কথাসাহিত্যের দিক্‌পাল লেখক এবং মার্কিন উপন্যাসে নতুন ধারার প্রবর্তক, আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন চিকিৎসক ও স্পোর্টসম্যান। ছেলের বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি তার হাতে একটি প্রমাণ-সাইজের বন্দুক তুলে দিয়েছিলেন এই আশায় যে বড়ো হয়ে ছেলে একজন স্পোর্টসম্যান হবে। তাঁর মা ছিলেন যন্ত্রসংগীতে পারদর্শিনী; এবং তাঁর আশা ছিল যে ছেলে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। কিন্তু পিতামাতার প্রত্যাশা ছেলের দ্বারা চরিতার্থ হয়নি। তাঁর লেখাপড়াটা হয়েছিল খাপছাড়া ভাবে এবং সেটা ছিল ক্ষণস্থায়ী। পনর বছর বয়সে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান, ফিরে এলেন ১৯১৭ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াশুনা সম্পূর্ণ করতে। তারপর চলে গেলেন কানসাস শহরে রিপোর্টার বা সংবাদদাতার চাকরি করতে। তাঁর বয়স তখনো আঠার বছর হয়নি যখন তিনি ফ্রান্সে চলে গিয়ে একটি এ্যাম্বুলেন্স ইউনিটে যোগদান করেন—এটি তখন একটি ইতালীয় পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে ছিল সংশ্লিষ্ট। বাড়ি ফিরে এলেন এবং ১৯২১ সালে তিনি হ্যাডলে রিচার্ডসনকে বিবাহ করেন। আবার তিনি সাংবাদিকতায় ব্রতী হলেন—এইবার টোরোন্টোতে। কিন্তু আবার তিনি যুদ্ধের গন্ধ পেলেন—এশিয়া মাইনর থেকে কামানের শব্দ ভেসে এলো বাতাসে। শান্তিপূর্ণ জীবন অসহ্য মনে হয়। তিনি ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা হয়ে চলে গেলেন নিকট প্রাচ্যে। রণাঙ্গন থেকে গ্রী '-তুরস্ক যুদ্ধের খবরতার যেসব ভয়াবহ বিবরণ তিনি পাঠাতেন তা সকলে সাগ্রহে পাঠ করত।

তখন সবে তাঁর কুড়ি বছর বয়স যখন তিনি প্যারিসে চলে এসে এক লেখক সংঘে যোগদান করলেন। এই সংঘের প্রধান সভ্যদের মধ্যে ছিলেন এজরা পাউণ্ড, শেরউড এ্যান্ডার্সন ও জাটরুড স্টেন—এঁরা সকলেই ছিলেন আমেরিকার উদীয়মান তরুণ লেখকদের—যাঁরা নতুন ধরনের সাহিত্য-কর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন—নেতৃস্থানীয় এবং উপদেষ্টা। এঁরা সকলেই মনে করতেন যে, আমেরিকাতে সাহিত্য চর্চা খুবই ব্যয় বহুল ও অসুবিধাজনক। তিনি এই তিনজনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, বিশেষ করে জাটরুড ও শেরউডের প্রতি। প্লট ছাড়া কি করে গল্প লিখতে হয়, সেই কায়দাটা তাঁকে শেখালেন এ্যাণ্ডার্সন আর জাটরুড শেখালেন কিভাবে অলংকরণ আর বর্ণনা বাহুল্য বর্জন করে গল্প লিখতে হয়। 'এমন ভাষায় লিখতে হবে যেখানে প্রত্যেকটি কথা হবে গতিময়। মন্তব্য সাহিত্য-পদবাচ্য

নয়'—এমনি ধরনের আরো কত রকমের উপদেশ তিনি পেয়েছিলেন এদের কাছে। সংবাদপত্রে রিপোর্টারের কাজ করে হেমিংওয়ে নানা ধরনের লিখন-কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন; এখন সেই লিখন পদ্ধতি সাহিত্য-কর্মে প্রয়োগ করে তিনি ভালো লেখক হওয়ার জন্য আন্তরিক প্রয়াস পেলেন। .

এই সময়ে হেমিংওয়ে দেখতে ছিলেন ছ'ফুট দীর্ঘ, সিংহের মতো মস্ত বড় মাথা, প্রশস্ত বুক, আর মজবুত গঠন—একেবারে একজন পুরোদস্তুর অ্যাথলেট। চব্বিশ বছর বয়সে সাংবাদিকতাকে বিদায় দিয়ে তিনি সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রকাশিত হলো তাঁর প্রথম বই Three Stories and Ten Poems; একজন অখ্যাত প্রকাশক সেটি ছাপিয়েছিলেন; মুদ্রিত হয় মাত্র পাঁচশো কপি। বছর খানেক পরে তাঁর দ্বিতীয় বই In Our Time প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন মৌলিক, শক্তিশালী অথচ অপরিণত লেখকের আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল। উপন্যাসের মত দেখতে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন। গল্পগুলি আত্মচরিতমূলক। হেমিংওয়ে-মানস তখন ধীরে ধীরে পরিণতির পথে এগিয়ে চলছিল। পরবর্তী উপন্যাস দুটির মধ্যে (The Torrents of Spring ও The Sun Also Rises). তার স্পষ্ট আভাস ছিল। চতুর্থ উপন্যাসটিতে প্রকৃতির হৃদয়হীনতা ও মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাময়িক নৃশংসতার যে চিত্তস্পর্শী চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন তাতেই হেমিংওয়ের জনপ্রিয়তা সূচিত হয়েছিল। সেই জনপ্রিয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রধানত দুটি কারণে তিনি আকস্মিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন—প্রথম, তাঁর জীবন দৃষ্টি; দ্বিতীয়, স্টাইল বা লিখনভঙ্গী। নৈরাশ্যপীড়িত এই আশাহত হাজার হাজার তরুণের জীবনের ছবি এক মর্মস্পর্শী ভাষায় হেমিংওয়ে তুলে ধরেছেন The Sun Also Rises উপন্যাসটিতে।

সাতাশ বছর বয়সেই হেমিংওয়ে এক নতুন ধরনের সাহিত্যের দিক্ নির্দেশ করেছিলেন; বিশ্বের কোন ঔপন্যাসিকের জীবনে এটা দেখা যায়নি। ১৯২৮ সালটি হেমিংওয়ের সাহিত্যজীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বছরে প্রকাশিত হয় তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত উপন্যাস: A Farewel to Arms; অনেকের বিবেচনায় এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' উপন্যাসের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে—যে অধ্যায়টিতে মস্কো থেকে পশ্চাদপর সৈন্যদের চিত্র আছে—'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস'-এর অনুরূপ একটি অধ্যায়ের মিল আছে। ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ের খ্যাতির অনেকখানি তাঁর এই উপন্যাসকে কেন্দ্র করেই বর্ধিত হয়েছিল এবং এই বইটি থেকে রয়্যালটি বাবদ তিনি কয়েক লক্ষ ডলার পেয়েছিলেন। যখন এটি সবাকচিত্রে রূপায়িত হয় তখন হলিউড থেকেও আরো প্রচুর অর্থ পেয়েছিলেন তিনি। তাই এই উপন্যাসটিকে তিনি তাঁর ভাগ্যের অন্যতম সোপান বলতেন। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর বিপুলায়তন উপন্যাস: For Whom the Bell Tolls; অনেক বিশিষ্ট

সমালোচকের মতে এইটিই হেমিংওয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম। পূর্বোল্লিখিত 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' আর এই 'ফর হুম্ দি বেল টোলস্'—এর মাঝখানে তিনি আরো চারখানা উপন্যাস লিখেছিলেন।

তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু থেকে হেমিংওয়ের মধ্যে আমরা একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করি; সেটি হলো তাঁর মৃত্যু-চেতনা। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর প্রায় সকল গল্প ও উপন্যাসে জীবন ও মৃত্যু চিন্তার যে টানা-পোড়েন তিনি বুনে এসেছেন, যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে তিনি একে প্রকাশ করে এসেছেন তার মধ্যে একটা তীব্রতা ছিল, কিন্তু 'ফর হুম দি বেল টোলস্' উপন্যাটিতে তিনি মৃত্যুকে আশ্চর্য নিরাসক্তভাবে দেখেছেন, একজন চিকিৎসক যেভাবে দেখে থাকেন ঠিক সেইভাবে। হেমিংওয়ের প্রকৃতির একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, সারাজীবন তিনি সেইসব কাজ ভালোবেসেছেন যার দ্বারা জীবন হয়ে ওঠে বিপৎসঙ্কুল, মৃত্যু আশাশূন্য আর মরে যাওয়া অর্থহীন। কিন্তু তাঁর চল্লিশোত্তর জীবনে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, এখন তিনি যেন উপলব্ধি করলেন যে, বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া—এই দুটোর মধ্যেই একটা উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

আট বছর পরে বেরুলো Across the River and into the Trees—হেমিংওয়ের বহু প্রত্যাশিত নতুন উপন্যাস। কিন্তু পাঠকগণ যারপরনাই নিরাশ হলেন এটি পাঠ করে। উপন্যাসটি শুধু যে গতানুগতিক তা নয়, লিখনভঙ্গির দিক দিয়েও দুর্বল ও পুনরুক্তি দোষে পরিপূর্ণ। যে শৈলীর জন্য তাঁর খ্যাতি, এই বইটিতে তা, পাঠকদের মনে হয়েছিল, যেন একেবারেই অনুপস্থিত; এমনকি বর্ণনার দিক দিয়েও তিনি পাঠকদের হতাশ করলেন। সামগ্রিকভাবে বিচার করে বলা যায়, এই নতুন উপন্যাসটিতে হেমিংওয়ে যেন নিজেকে নিয়ে হিউমার-বর্জিত একটি প্যারডি রচনা করেছেন, ঠিক যেমন পঁচিশ বছর আগে তিনি শেরউড এ্যাণ্ডার্সনকে অনুকরণ করে শুরু করেছিলেন তাঁর সাহিত্যজীবন। তাঁর প্রতিভা কি তবে ম্লান হয়ে এলো? তিনি কি ফুরিয়ে গেলেন? এই সংশয় জেগেছিল হেমিংওয়ের অনুরাগী পাঠকদের মনে।

চুয়ান্ন বছর বয়সে যে নতুন উপন্যাসটি (The Old Man and the Sea) বেরুলো, দেখা গেল তাতেও হেমিংওয়ে মৃত্যুর আসন্নতাকে বিষয়বস্তু করেছেন। ছোট নভেল। এই বইটিতে তাঁর প্রতিভার উদ্ভাসন দেখা গেল। ১৯৫৩ সালে তাঁর এই উপন্যাসটির জন্য হেমিংওয়ে যখন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার 'পুলিটজার প্রাইজ' লাভ করলেন তখন তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে কলগুঞ্জন শোনা গিয়েছিল যে, বিশ বছর আগে হেমিংওয়েকে এই পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। পরের বছরে (১৯৫৪) তিনি লাভ করলেন বিশ্বের সেরা সাহিত্য পুরস্কার—'নোবেল প্রাইজ'। The Old Man and the Sea উপন্যাসে তিনি লিখন-শৈলী নির্মাণে যে অসামান্য দক্ষতা (নোবেল কমিটির ভাষায় 'Style making mastership') প্রদর্শন করেন সেইজন্য তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৯৫৪, জানুয়ারি। সারা বিশ্বের সাহিত্য-সমাজকে সচকিত করে বেতারে ঘোষিত হয় হেমিংওয়ের মৃত্যু সংবাদ। একটি ছোট্ট প্লেনে চড়ে তিনি সস্ত্রীক আফ্রিকা ভ্রমণে গিয়েছিলেন। খবর এলো. যেখানে অরণ্য-সঙ্কুল নাইল অঞ্চলে প্লেনটি বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে হেমিংওয়ে-দম্পতির মৃত্যু হয়েছে। সংবাদপত্রগুলিতে এই বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ বেরুল, লেখা হলো শোক-সূচক সম্পাদকীয়। তাতে-বলা হলো—'বিপদকে যিনি বার বার আলিঙ্গন করেছেন, মরণকে যিনি বার বার বরণ করেছেন. বিমান-দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হেমিংওয়ের জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি'। সংবাদপত্রের প্রভাতী সংস্করণগুলি তখনো পর্যন্ত খবরের কাগজের স্টলে সজ্জিত রয়েছে, যখন সারা পৃথিবীকে চমকিত করে সংবাদ এলো যে, হেমিংওয়ে শুধু যে জীবিত আছেন তা নয়, দুইবার তিনি মৃত্যুর মুখে থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তাঁর বিমানটি বিধ্বংস হয়েছিল সত্যি, কিন্তু স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানটি থেকে বুকে হেঁটে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের দু'জনকে একটি মোটর লঞ্চে তুলে, উদ্ধারকারী অপর একটি বিমানে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও আগুন লেগে যায়। কিন্তু হেমিংওয়ে পেছনের দরজা কেটে বেরিয়ে আসেন এবং দু'জনেই মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন।

তাঁর জীবিতকালে হেমিংওয়ে যেমন জনপ্রিয় ও বহু-পঠিত ঔপন্যাসিক ছিলেন, তেমনি তিনি যা কিছু লিখেছেন তাই নিয়ে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠেছে। সমালোচকরা বলতেন যে, ভীরু ও দুর্বলচিত্ত মানুষরাই তাঁর উপন্যাসে, গল্পে স্থান পেয়েছে এবং তাঁর কোন উপন্যাসেই তিনি বলিষ্ঠ চরিত্রের নর-নারীর ছবি আঁকতে সক্ষম হন নি। একজন বিশিষ্ট সমালোচক তাঁর সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'Hemingway gave a particular and somehow fatal emphasis to the self as the necessary and product of literature. But a belief in the self as the essential form of literature of Hemingway, for whom the right words in the right order were theimmediate act that cut away the falsenese and inconseqguence of the world.'

হেমিংওয়ে বলতেন 'আত্মহনন হলো মরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।' তাঁর জীবন ও জীবনাচরণের সঙ্গতি রেখেই তিনি অবশেষে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন যা সর্বতোভাবেই ছিল প্রচণ্ড। ১৯৬১, জুলাই ২, তাঁর স্বগৃহে, মুখের মধ্যে একটি দো-নলা বন্দুক দিয়ে, অকম্পিত হাতে সেই বন্দুকের ট্রিগারটি টিপে বিশ্ববিশ্রুত 'পাপা' হেমিংওয়ে তাঁর জীবনের অবসান ঘটালেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ গল্পটি তিনি যে এইভাবে লিখে যাবেন, এটা তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুরাগীদের মধ্যে কেউই কোনদিন বোধ হয় কল্পনা করতে পারেনি।

জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি

(১৯১৭-১৯৬৩)

বোস্টনের শহরতলী ব্রুকলিন। যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার একটি বিখ্যাত শহর। এই শহরে, ১৯১৭ সালের ২৯ মে জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে এই দেশে এসে বসবাস করতে থাকেন এবং আলুর ব্যবসায়তে তিনি প্রচুর বিত্তবান হয়েছিলেন। পিতামহের সম্পদকে তাঁর পিতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে, কেনেডি পরিবারের ঐশ্বর্যকে জনশ্রুতিতে পরিণত করেছিলেন। তাঁর নয়টি পুত্র-কন্যার নামে তিনি এমন একটি ট্রাস্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করেন যার ফলে বয়োপ্রাপ্ত হলে প্রত্যেক ছেলে-মেয়েই দশ লক্ষ ডলার করে পেতে পারবে। কথিত আছে, পিতার উইলে এই রকম নির্দেশ ছিল যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যোসেফ কেনেডি উচ্চ শিক্ষা লাভের পর রাজনীতির চর্চা করবেন যাতে করে তিনি উত্তরকালে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। এই ভাবে তাঁর অন্যান্য ছেলে-মেয়েগুলি বড়ো হয়ে কি হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ তাঁর উইলে ছিল এবং সেই উইল অনুসারেই উক্ত ট্রাস্ট ফাণ্ড গঠিত হয়েছিল।

কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পর্কে পিতার এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যোশেফ কেনেডি অল্প বয়সেই মারা যান; দ্বিতীয় পুত্র জন তখন নৌ-বিভাগে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধ শেষ হলে পরে, জন কেনেডি রাজনীতিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার কথা বিশেষভাবেই বিবেচনা করতে থাকেন। তাঁদের পরিবারে এতকাল পর্যন্ত রাজনীতির চর্চা করেন নি, বা রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে কোনো অংশও গ্রহণ করেন নি, যদিও বিদ্বান ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবার হিসাবে কেনেডি পরিবার ইতিমধ্যেই বেশ খ্যাতিলাভ করেছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য পিতা যে অভিলাষ তাঁর মনের মধ্যে পোষণ করেছিলেন, তাঁর আর একটি পুত্র এইবার তাই পূর্ণ করতে কৃতসংকল্প হলেন।

রাজনীতিতে যোগদানের জন্য তরুণ কেনেডির যোগ্যতা অনেক দিক দিয়েই ছিল। ১৯৪৫ সালে একটি পুরাতন পৃষ্ঠবেদনার চিকিৎসার জন্য যখন তাঁকে দীর্ঘকাল হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল তখন তিনি একটি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেই বইটির নাম Profiles in Courage : যেসব রাজনীতিবিদ্ ও রাষ্ট্রনেতাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে হয় তাঁদেরই বিষয় নিয়ে রচিত। তখন কি তিনি জানতেন, ভবিষ্যতে আমেরিকার প্রেসিডেন্টরূপে একদিন তাঁকেও অনুরূপ সাহসের পরিচয় দিতে হবে? ছ'বছরের মধ্যেই তরুণ কেনেডি ম্যাসাচুটেস রাজ্যের সেনেটর নির্বাচিত হলেন। তাঁর নিজের উচ্চাভিলাস ও

তাঁর পারিবারিক অপরিমিত সম্পদ এবং সেই সঙ্গে তাঁর রোমান ক্যাথলিক মনোভাব—কেনেডির রাজনৈতিক জীবন গঠনের পক্ষে যেমন সহায়ক হয়েছিল তেমনি প্রতিবন্ধকেরও সৃষ্টি করেছিল। শীঘ্র বোঝা গেল সেনেটর কেনেডির একটি নিজস্ব চিন্তাধারা আছে। যদিও তিনি ডেমোক্রেটিক দলের সদস্য ছিলেন তথাপি দলের মধ্যেই তিনি উপদলীয় কোনো সংকীর্ণ মতবাদ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখান করতে পারতেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে গভীর চিন্তার পর তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন এবং এইজন্য কংগ্রেসে তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ বলে স্বীকৃত হলেন। বয়সে তরুণ হলেও, সেই বয়সেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা অনেক প্রবীণ ডেমোক্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯৫৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার সেনেটর নির্বাচিত হলেন। তারপর আরো দু'বার এবং প্রত্যেকবারই তিনি যে বিপুল সংখ্যক ভোট লাভ করতেন তার থেকে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হতো। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ব্যর্থ হন, কিন্তু তখন থেকেই তিনি আমেরিকার রাজনীতিতে নিজ নামের মুদ্রাঙ্কিত করতে সমর্থ হন। তখনো তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়নি যখন ডেমোক্রেটিক পার্টি কেনেডিকে ১৯৬০ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য যোগ্য প্রার্থী বলে বিবেচনা করলেন। ১৯৫৮ সালের নির্বাচনে যখন তিনি চতুর্থবার বিপুল ভোটাধিক্যে সেনেটর নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে পার্টির সদস্যদের মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না।

এইভাবেই সেদিন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার রাজনীতিতে জন ফিটজেরাল্ড কেনেডির মূর্তিটি ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ১৯৬০, জুলাই মাস। ডেমোক্রেটিক দল তাঁকে প্রেসিডেন্টের পদের জন্য ও টেক্সাসের প্রবীণ সেনেটর লিণ্ডন জনসনকে ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদের জন্য মনোনীত করলেন। লিণ্ডন প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, পরে অবশ্য তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। তাঁর এই মতপরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া শুধু সেনেটর জনসনের পক্ষে নয়, আমেরিকা তথা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। নির্বাচনী প্রচার কার্যে অবতীর্ণ হয়ে ভোটদাতাগণের উদ্দেশে কেনেডি বলেছিলেন: 'I urge you not to be complacent about the country's future as it was developing under the Republicans, not only at home, but also abroad'. ম্যাসাচুসেটসের সেই প্রখ্যাত সেনেটর কেনেডির নাম এইসময় সমগ্র আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

নির্বাচনে জয়লাভ করলেন কেনেডি, এটা প্রত্যাশিত ছিল। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি বেছে বেছে যোগ্যতম ব্যক্তিদের, বিশেষ করে সুপণ্ডিত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তাঁর মন্ত্রী-পরিষদ গঠন করেন। স্টিভেনসনের মতো পণ্ডিতকে পাঠালেন রাষ্ট্রসংঘে আমেরিকার প্রতিনিধি হিসাবে, ডীন রাস্ককে নিযুক্ত করলেন সেক্রেটারি অব স্টেটের দায়িত্বজনক পদে আর তাঁর অন্যতম

কৃতবিদ্য ভ্রাতা রবার্ট কেনেডিকে করলেন এ্যাটর্ণী-জেনারেল। তিনি যখন সেনেটর তখন প্রিয়দর্শনা, বিদুষী জ্যাকেলিনের সঙ্গে কেনেডি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন।

প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পর কেনেডি তাঁর স্বজাতি ও পৃথিবীর নর-নারীর উদ্দেশে প্রথম যে ভাষণটি দিয়েছিলেন সেটি সেদিন তারে-বেতারে প্রচারিত হয়ে পৃথিবীর সামনে আমেরিকার এক নতুন ভাব মূর্তিকে তুলে ধরেছিল। তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত হলো:

> 'Let the word go forth from this time and place, to friend and foe alike, that the torch has been passed to a new generation of Americans, born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or premit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed, and to which we are committed today at home and around the world......My fellow Americans, ask not what your country can do for you—ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freeddom of man.'

কেনেডি ছিলেন আমেরিকার সবচেয়ে তরুণ বয়স্ক প্রেসিডেন্ট এবং তাঁরই মধ্যে ঐ মহাদেশের জনসাধারণ নতুন এক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন তাঁকে আবিষ্কার করেছিল। তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে উৎসাহ, উদ্যম ও নিষ্ঠার এমন একটি আন্তরিক সুর ধ্বনিত হয়েছিল যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। নির্বাচিত তরুণ প্রেসিডেন্টের নীতি ও কার্যসূচী। তিনি বলেছিলেন: 'দেশকে পরিচালিত করার দায়িত্ব এখন চলে এসেছে নতুন যুগের একদল আমেরিকানদের হাতে।' নতুন চিন্তাধারা, বলিষ্ঠ কর্মপদ্ধতি আর তরুণবয়স্ক অথচ যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা—কেনেডির স্বল্পকালস্থায়ী শাসনকালকে এমন একটি ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছিল যার ফলে সকলেই আশা করেছিল যে, কেনেডি হয়ত দ্বিতীয়বারের জন্যও প্রেসিডেন্টের পদে নির্বাচিত হতে পারবেন ও একাদিক্রমে আট বৎসরকাল দেশ সেবা করবার সুযোগ পাবেন।

কিন্তু কেনেডি মাত্র দু'বছর দশ মাসকাল ঐ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে ঐ চৌত্রিশ মাসই ছিল সকলের বিবেচনায় 'momentus' বা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সময়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা দুটি, যথা—(i) Civil Rights Bill, আর (ii) Cuba; কিউবার ওপর থেকে অবরোধ সরিয়ে নেওয়ার ফলে একটি সম্ভাব্য আণবিক যুদ্ধের হাত থেকে সেদিন পৃথিবী রক্ষা পেয়েছিল। সিভিল রাইটস বিল বা নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত বিলটি পাশ হওয়ার পর আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে অগ্রগতি

দেখা দিল, বর্ণ বৈষম্যের অবসান ঘটলো। যেদিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি এই বিলের প্রস্তাব কংগ্রেসে উত্থাপন করেন সেদিন অনেকেই এর বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু আমেরিকার ইতিহাসে এইটাই ছিল একটি সবচেয়ে সুদূর-প্রসারী আইনের প্রস্তাব। এই আইন পাশ হওয়ার ফলেই আমেরিকার ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রত্যেকটি রাজ্যে নিগ্রো ছাত্ররা শেতাঙ্গ ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

বৈদেশিক ব্যাপারে কেনেডি সরকারের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা ছিল: 'Friendship for Progress'—অর্থাৎ 'অগ্রগতির জন্য মৈত্রী'। তবে কিউবার ব্যাপারেই তাঁকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর কার্যভার গ্রহণের প্রায় তিন সপ্তাহ আগে মার্কিন সরকার কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তারপর ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হয়েছিল এই খবর শুনে যে, ক্যাস্ট্রো-সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে কিউবার মাটিতে গোপনে আক্রমণাত্মক ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি তৈরী করতে দিয়েছেন। সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত যন্ত্রবিদ্‌দের দ্বারা পরিচালিত এইসব ঘাঁটি থেকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সবকটি বড়ো শহরের ওপরেই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ সহজ হতো। মার্কিন সরকার অবিলম্বে এই ঘাঁটিগুলি অপসারণের দাবী জানালেন এবং ঘোষণা করলেন যে, কিউবাতে সোভিয়েত জাহাজ-বোঝাই যে সব মালপত্র আসছে তার মধ্যে আক্রমণাত্মক সমর-সরঞ্জাম থাকলে সেগুলি সেখানে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। পরবর্তী ইতিহাস সুপরিচিত।

আন্তর্জাতীয়তার ক্ষেত্রে শান্তিবাদী প্রেসিডেন্ট কেনেডির আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস ছিল একটি আন্তর্জাতিক তদারকি ব্যবস্থার প্রস্তুতি। ভবিষ্যতে যাতে কোন প্রকার পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংঘটিত না হয় সেজন্য কেনেডি একটি চুক্তির পরিকল্পনা করেন। ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁর সদিচ্ছাপূর্ণ এই আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হয়।

প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বহুবার কেনেডির জীবন-নাশের চেষ্টা হয়। আমেরিকার নিগ্রোদের তিনি সমান মর্যাদা দান করেছিলেন—এইজন্য অনেকেই তাঁর অভ্যন্তরীন নীতির ওপর বিরূপ ছিলেন। এই বিরূপতার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ারূপেই ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর তারিখে টেক্সাস রাজ্যের ডালাস শহরে এক ঘাতকের গুলিতে প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হন। তাঁর এই অকালমৃত্যুতে একদিকে বহির্বিশ্বে শান্তি এবং অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ সামাজিক অগ্রগতি দুই-ই বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। কেনেডির হত্যাকাণ্ডে সেদিন সমগ্র পৃথিবী যেভাবে শোকার্ত হয়ে উঠেছিল এবং স্বতঃস্ফূর্ত সমবেদনা জ্ঞাপন করেছিল, সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার তুলনা বিরল বললেই হয়।

মার্টিন লুথার কিং

(১৯২৯ ১৯৬৮)

'Every man should have something he would die for. A man who won't die for something is not fit to live.' একদিন এই সুমহৎ বাণী যাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, যিনি মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের আদর্শের অনুসরণে নিগ্রোজাতির জীবনে এনে দিয়েছিলেন নবজীবনের জোয়ার এবং যিনি আমেরিকার বুক থেকে বর্ণবৈষম্যের অভিশাপ দূর করার জন্য জীবনাহুতি দিয়েছিলেন, তিনিই হলেন নতুন পৃথিবীর নিপীড়িত নিগ্রোজাতির হৃদয়ের 'রাজা' ডঃ মার্টিন লুথার কিং।

১৯২৯, ১৫ জানুআর। দক্ষিণ আমেরিকার মণ্টগোমেরি রাজ্যের আটলাণ্টা শহরের এক ধর্মপ্রাণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কিং। পিতা ও পিতামহ দু'জনেই ছিলেন ধর্মযাজক এবং দু'জনেই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সমতার দাবীর অগ্রণী প্রবক্তা। পিতামহ রেভারেণ্ড য্যালফ্রেড ড্যানিয়েল উইলিয়ামস স্থাপন করেছিলেন ন্যাশনাল এসোসিয়েসন ফর দি য্যাডভ্যান্সমেণ্ট অব কলার্ড পিপল্ (NAACP)। এই সমিতির মঞ্চ থেকেই প্রথম ঘোষিত হয়েছিল বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বাণী। উত্তরকালে সেই বাণীকে সারা পৃথিবীতে তুলে ধরেছিলেন তাঁরই প্রপৌত্র মার্টিন লুথার কিং এবং এক বিরাট অহিংস সংগ্রামের মাধ্যমে তাকে বাস্তবায়িত করে ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। কিং পরিবার শুধুমাত্র ধর্মযাজক ছিলেন না—তাঁরা ছিলেন মনে-প্রাণে তাঁদের স্বজাতির উন্নতিকামী।

শৈশবকাল থেকেই তিনি সবরকম হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করতেন এবং বয়োপ্রাপ্ত হলে অহিংসা তাঁর চারিত্রিক বশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্কুলে যদি কোন শ্বেতাঙ্গ ছাত্র তাঁকে কখনো আঘাত করত, তিনি ভুলেও প্রতি-আঘাত করতেন না। আমেরিকার নিগ্রোদের ইতিহাস পাঠ করলে আমরা জানতে পারি যে, সকল নিগ্রো মায়েদের ছেলে-মেয়েরা যখন তাদের মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করত—ওদের ছেলে-মেয়েরা কেন আমাদের সঙ্গে মেশে না, কেনই বা সাদা চামড়ার ছেলে-মেয়েরা আমাদের সঙ্গে খেলা ধূলা করে না, তখন আমরা অনুমান করতে পারি, তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, আমাদের চামড়ার রঙ যে কালো। ওরা আমাদের Nigger বলে। তাঁর শৈশবকাল থেকেই মার্টিন এই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্কুলে নিগ্রো ছেলে-মেয়েরা শ্বেতাঙ্গ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতে পারবে না, রাস্তায় একসঙ্গে তাদের হাঁটা নিষেধ—ওরা যদি এক দিক দিয়ে হাঁটে, তবে এদের হাঁটতে হবে অন্যদিক দিয়ে। সভ্যমানুষের সমাজে এমন বিসদৃশ ব্যবহার, এমন বৈষম্যমূলক আচরণ কি চিরকাল

চলবে? এর বিরুদ্ধে কি নিগ্রোদের কণ্ঠে কোনদিন প্রতিবাদ গর্জে উঠবে না? এই প্রশ্নই শৈশবাবধি হয়ে উঠেছিল মার্টিনের জপের মালা এবং উত্তরকালে তাঁর সকল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু।

'ছেলেবেলায় আমি', ডঃ কিং লিখেছেন, 'যখনই মা-কে জিজ্ঞাসা করতাম, মা, কেন এইভাবে আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজে বাস করতে হয়, তখনই তিনি বলতেন এই অবিচার, শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যমূলক এই আচরণ চিরস্থায়ী হবে না—একদিন এর প্রতিকার হবেই। আমি বিশ্বাস করতাম, হয়ত প্রতিকার হবে, কিন্তু কবে যে হবে তা আমি ভেবে পেতাম না।' তখন কে কল্পনা করতে পেরেছিল যে, আমেরিকার লক্ষ লক্ষ নিগ্রোদের জীবনকে জাতি-বিদ্বেষের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁকেই নেতৃত্ব দিতে হবে—দিতে হবে তাঁর জীবনাহুতি।

ছাত্র হিসাবে মার্টিন খুবই মেধাবী ছিল এবং ডবল প্রমোশন পেয়ে মাত্র পনর বছর বয়সে তিনি আটলান্টার মোরহাউজ কলেজে প্রবিষ্ট হন। তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল যে, মার্টিন পরিবারিক বৃত্তি অবলম্বন করার জন্য, অর্থাৎ ধর্মযাজকতা করার জন্য, নিজেকে তৈরি করবে; কিন্তু তাঁর অভিলাষ ছিল ডাক্তারী অথবা আইন অধ্যয়ন করা। কারণ ধর্মের প্রতি তেমন একটা আকর্ষণ তিনি বোধ করতেন না। তাই আমরা দেখতে পাই যে, কলেজে অধ্যয়ন কালেই মার্টিন সামাজিক দর্শনের বুদ্ধিগত ভিত্তির অন্বেষণ করতে থাকেন। এই সময়েই তিনি গভীর আগ্রহের সঙ্গে থোরোর Civil Disobedienee বইখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করেছিলেন। এই বই পাঠ করার পর তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, একমাত্র ধর্মযাজকতার কাঠামোতেই তিনি সামাজিক প্রতিবাদ সম্পর্কে তাঁর ক্রমবর্ধমান চিন্তা-ভাবনাকে রূপায়িত করতে পারেন।

এই সিদ্ধান্তের পর মার্টিন পেনিসিলভানিয়ার ক্রোজার থিওলজিকাল সেমিনারিতে ভর্তি হলেন। এখানে বর্ণবৈষম্য ছিল না; একশতটি ছাত্রের মধ্যে ছয়জন ছিল নিগ্রো ছাত্র।' শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার জন্য মার্টিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করতেন। ধর্মসংক্রান্ত বইগুলি অধ্যয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্লেটো, অ্যারিসটটল, রুশো, লকি ও হেগেলের বইগুলি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করতেন। 'সমাজ-দর্শন সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হলে এঁদের রচনার সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত হতে হবে—এই কথা তিনি বলতেন। এছাড়া, এই সময়েই মার্টিন আরেকজন মনীষীর রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি হলেন ভারতবর্ষের গান্ধী। কিং নিজেই বলেছেন—'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রথম পাঠ আমি পেয়েছিলাম বাইবেল ও খ্রীষ্টের উপদেশাবলী থেকে; কিন্তু সে ছিল তত্ত্বের দিক; নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পদ্ধতিটা আমি পেয়েছিলাম গান্ধীর কাছ থেকে।'

ক্রোজার সেমিনারিতে অধ্যয়নের ফলে তিনি বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের

সুযোগ লাভ করেছিলেন। যথাসময়ে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' (Ph.D.) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। মার্টিনের জীবনের বোস্টন অধ্যায় স্মরণীয় হয়ে আছে একটি বিশেষ ঘটনার জন্য। এইখানেই কোরেটা স্কট নাম্নী এক প্রিয়দর্শিনী ও বিদূষী তরুণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কোরেটা ছিলেন সঙ্গীতের ছাত্রী। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে তাঁরা দু'জনে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পনের মাস পরে মার্টিন তাঁর নব পরিণীতা বধূকে সঙ্গে নিয়ে মণ্টগোমেরিতে পৈতৃক ভবনে এলেন, এবং কিছুকাল বাদে এখানে ডেক্সটার এভিন্যু ব্যাপটিস্ট গীর্জায় যাজকতার (Pastor) কাজে যোগদান করলেন।

মার্টিন তাঁর জীবনে প্রধানত তিনটি ভূমিকায় সগৌরবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—চিকিৎসক, আইনজীবী ও প্রচারক। এছাড়া আরো একটি ভূমিকা তাঁর জীবন-বিধাতা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা। গীর্জায় ধর্মযাজকের কাজ যখন তিনি শুরু করেন, সেই সময়ে একটি ঘটনায় তাঁর জীবনে পরিবর্তন এসেছিল। ঘটনাটি সমগ্র নিগ্রোজাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। আমেরিকার ইতিহাসেও। গীর্জার চাকরি তখনো পুরো এক বছর হয়নি যখন এটি ঘটেছিল। ঘটনাটি ছিল রোজা পার্কস নাম্নী একটি নিগ্রো মহিলাকে কেন্দ্র করে। ১৯৫৫, ডিসেম্বরের প্রথম দিন। বৃহস্পতিবার। ঐ দিন মণ্টগোমেরিতে বাস ধর্মঘট শুরু হয়। বর্ণবৈষম্যের দরুণ এখানকার বাসগুলিতে শ্বেতাঙ্গ আরোহীদের জন্য সামনের আসন বিশেষভাবে সংরক্ষিত ছিল আর পিছনের দিকে কৃষ্ণাঙ্গদের বসবার জন্য স্বতন্ত্র স্থান ছিল।

একদিনের এই বাস ধর্মঘট আশাতীত ভাবেই সফল হয়েছিল। সেদিন নিগ্রোদের একজনও বাসে চড়েনি। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ধর্মঘটের দিন চব্বিশজন নিগ্রো ধর্মযাজক এই ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সেইসঙ্গে তাঁরা কয়েকটি দাবিও তুললেন, যথা—(১) বাসে যে আগে উঠবে সে সামনের আসনে বসবে; (২) নিগ্রোদের সঙ্গে শিষ্টাচার-সম্পন্ন ব্যবহার করতে হবে; এবং (৩) নিগ্রোঅধ্যুষিত এলাকাগুলির ভেতর দিয়ে যেসব বাস চলাচল করে সেগুলিতে নিগ্রো ড্রাইভার নিযুক্ত করতে হবে। তাঁদের দাবি ও প্রতিবাদকে জোরদার করবার জন্য নিগ্রো ধর্মযাজকগণ মণ্টগোমেরি ইমপ্রুভমেণ্ট এসোসিয়েসন নামে একটি উন্নয়ন সমিতি স্থাপন করলেন। ডঃ মার্টিন এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

তখন নিগ্রোদের সঙ্গে আপোষ করার কথা চিন্তা করতে থাকে মণ্টগোমেরির শ্বেতাঙ্গরা। এজন্য মণ্টগোমেরির মেয়রের নেতৃত্বে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের 'হোয়াইট সিটিজেনস কাউন্সিল' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। তখন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে নিগ্রোদের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে। আপোষের শর্তাবলী নিগ্রোদের কাছে সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হলো না। 'This is no real or meaningful settlement'.—এই কথা সেদিন বলেছিলেন ডঃ মার্টিন উন্নয়ন

সমিতির সভাপতি হিসাবে। তিনি নিগ্রোদের উস্কানি দিচ্ছেন, এই অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্বেতাঙ্গরা তাঁকে 'Nigger Preacher' বলে উপহাস করতে থাকে। তখন তাঁর মনের মধ্যে একটি ভগবৎ নির্দেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল— সত্যের জন্য দাঁড়াও, ন্যায়ের জন্য দাঁড়াও, ঈশ্বর তোমার দিকে আছেন।' এরপর থেকে ডঃ কিং আর কখনো ভয় বা নৈরাশ্যে কাতর হতেন না। এখানে উল্লেখ্য যে, মার্টিন লুথার কিং সম্পূর্ণ অহিংসভাবে তাঁর আন্দোলন পরিচালনা করে পৃথিবীর শান্তিকামী ব্যক্তিদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। নিগ্রোদের সর্ববিধ নাগরিক অধিকার দাবি করে তিনি যে অহিংস সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন সেজন্য তাঁকে শ্বেতাঙ্গদের হাতে অনেক লাঞ্ছনা ও উপহাস পেতে হয়েছিল। একবার তাঁর শয়ন- কক্ষে ডিনামাইট নিক্ষেপ করে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গদের ওপর কৃষ্ণাঙ্গরা জয়লাভ করল। বিনা রক্তপাতে এতবড় একটি অহিংস সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য একদিকে তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে মার্টিনের মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি সারা বিশ্বের বিমুগ্ধ দৃষ্টি তাঁর ওপর আকৃষ্ট হয়েছিল। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট কেনেডি পর্যন্ত মার্টিনের অহিংস সত্যাগ্রহের স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। নিগ্রোদের অনেক ন্যায্য দাবী তিনি মেনে নিয়েছিলেন। এই দাবিগুলির মধ্যে একটি ছিল নিগ্রোদের ভোটাধিকার। ১৯৬৪ সালটি মার্টিনের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে শান্তির জন্য দুর্লভ নোবেল পুরস্কার লাভের জন্য। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। সত্যি, ডঃ কিং মনে-প্রাণে ও কর্মে গান্ধীর উত্তরসাধক। পুরস্কারের সমস্ত অর্থ— চুয়ান্ন হাজার ডলার—তিনি আন্দোলনকে দান করেছিলেন।

নোবেল পুরস্কার লাভের পর তিনি মাত্র চার বৎসরকাল জীবিত ছিলেন এবং চার বছর ছিল অবিচ্ছিন্ন ফ্রীডম মার্চ (march)-এর বছর। হাজার হাজার নিগ্রো নর-নারী এই মার্চে যোগদান করেছিল। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমতার (Equality) দাবিতে অনুষ্ঠিত এই ফ্রীডম মার্চ সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিং-পরিচালিত এই ঐতিহাসিক ফ্রীডম মার্চ সত্যিই অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এই মার্চের সময় ১৯৬৮ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে এক আততায়ীর গুলিতে মার্টিন নিহত হন। মৃত্যুর সময় হাসপাতালে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত শেষ কথা ছিল: 'I just want to do God's will.' মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র উনচল্লিশ বছর। মৃত্যুর তিনমাস তেরো দিন আগে ক্রীসমাস উপলক্ষে আটলাণ্টার এবেনেজার গীর্জায় সমবেত নর-নারীর সামনে তিনি বড়দিনের যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তার উপসংহারে তিনি বলেছিলেন: 'I still have a dream that with faith in God we will be able to speed up the day when there will be peace on earth and goodwill toward men.' এই ছিল মার্টিন লুথার কিং-এর জীবনসত্য এবং জীবনসংগীত।

হেলেন কেলার
(১৮৮০-১৯৬৮)

তাঁর পৃথিবী ছিল শব্দহীন, আলোহীন। তাই বুঝি তাঁর আত্মার নিরন্তর নিঃশব্দ ক্রন্দন ছিলঃ 'আলো! আমাকে একটু আলো দাও, ঈশ্বর!'

যাঁর কথা বলছি তিনি হেলেন কেলার যাঁকে দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : I believe Miss Helen keller is the purest minded human being ever in existence' এ কবির অত্যুক্তি নয়। এই মূক-বধির-অন্ধ মার্কিন মহিলাটির মধ্যে কবি নিশ্চয়ই এমন কিছু অসাধারণত্ব দেখতে পেয়েছিলেন যেজন্য হেলেন কেলারের চারিত্র-মহিমা তিনি এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন। ঘৃণা-বিদ্বেষ-অশান্তি পরিপূর্ণ আমাদের এই পৃথিবীতে মাঝে মাঝে আমরা এমন দুই একটি মানবিক গুণসম্পন্না মহীয়সী নারীর সাক্ষাৎ পাই যাঁরা না এলে এই সমাজ সংসার অর্থহীন হতো। ইউরোপে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল আর আমেরিকায় ম্যাডাম হেলেন কেলার—এই দুজনের নাম পৃথিবী শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবে চিরকাল। প্রতিকূল ভাগ্য হেলেন কেলারের জীবনকে শৈশবেই নানাভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অসীম সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করে হেলেন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিশ্বের সমকালীন নারী সমাজে এইখানেই ছিল তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

বিচিত্র তাঁর জীবন কথা। তিনি নিজেই তাঁর অনেকখানি লিপিবদ্ধ করেছেন তার আত্মচরিতে—'The Story of my Life'। এর মধ্যে পাই তাঁর জীবনের প্রথম তেইশ বছরের কাহিনী। তাঁর জীবনের পটভূমিকায় আছেন য়্যানি সুলিভান —যাঁর সযত্ন শিক্ষার ফলে শব্দহীন অন্ধকার জগৎ থেকে হেলেন মুক্ত হতে পেরে-ছিলেন। য়্যানি সুলিভান ছিলেন তাঁর শিক্ষয়িত্রী—হেলেনের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবেই মিশে আছে তাঁরো জীবন। আত্মজীবনীতে হেলেন লিখেছেন : '১৮৮০ সালের ২৭ জুন উত্তর আমেরিকার টুসকুমরিয়া নামে ছোট্ট একটি শহরে আমি জন্মেছিলাম। আমার জীবনের আরম্ভ আর পাঁচজন শিশুর মতোনই হয়েছিল। পিতামাতার প্রথম সন্তান হিসাবে আমি একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশু হয়েই এই পৃথিবীতে এসেছিলাম। আমি এলাম, দেখলাম ও সকলের চিত্ত জয় করলাম যেমন আর পাঁচটি নবজাতক করে থাকে। জন্মের পর এক বছর সাত মাস কাল পর্যন্ত আমি এই পৃথিবীকে দেখেছি, এর শব্দ শুনেছি আর মুখরিত করেছি অর্ধস্ফুট কল কল ভাবে আমাদের সংসার। আমার মায়ের মুখে শুনেছি, আমি নাকি এক বছর বয়সেই হাঁটতে শিখেছিলাম।

তাঁর জীবনে দুর্দৈব কিভাবে এসেছিল সেই কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কুমারী কেলার লিখেছেন : আমার বয়স তখন সবে এক বছর সাত মাস পূর্ণ হয়েছে,

মায়ের মুখেই শুনেছি, এই সময়ে একদিন সকালে স্নানের ঘর থেকে আমাকে কোলে করে মা যখন বেরিয়ে আসছিলেন, তখন কাচের মতোন স্বচ্ছ মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রভাত সূর্যের আলো। সেই আলোতে প্রতিফলিত হয়েছিল বাগানের গাছের পাতাগুলির কম্পমান ছায়া। তাই ধরবার জন্য আমি আচমকা ঝাঁপ দিয়েছিলাম মায়ের কোল থেকে মেঝের ওপর। ছুটে ধরতে গিয়েছিলাম পাতাগুলি—কিন্তু সেগুলি যে পাতা নয়, ছায়া তা বুঝিনি। উত্তেজনাপূর্ণ সেই মুহূর্তটি মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কেঁদে উঠেছিলাম মায়ের কোলে উঠবার জন্য। শৈশবের এই সুখের দিনগুলি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি আমার জীবনে।'

অতঃপর কি ঘটেছিল? সেইচিত্তস্পর্শী কথা তাঁর আত্মজীবনীতে হেলেন কেলার লিখেছেন এইভাবে:

'তারপর ফেব্রুয়ারি মাসের রুক্ষতা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এলো সেই কালব্যাধি যার ফলে আমি হারালাম দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও কথা বলার শক্তি। আমার অবস্থাটা তখন দাঁড়ালো ঠিক একটি নবজাত শিশুর মতোন। চিকিৎসকরা এলেন। তাঁরা পরীক্ষা করলেন এবং বললেন পাকস্থলী ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যাহত হওয়ার ফলেই ঘটেছে এই বিপর্যয়। তাঁদের ধারণা হলো আমি হয়তো বাঁচব না। মায়ের কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময়ে যে প্রবল জ্বর এসেছিল, একদিন প্রত্যূষে দেখা গেল যে সেই জ্বর—যা রহস্যজনকভাবে হঠাৎ আক্রমন করেছিল—আর নেই। সেদিন আমাদের বাড়িতে কি আনন্দ। কিন্তু কেউ—চিকিৎসকগণ পর্যন্ত—বুঝতে পারেন নি, আমি জীবনে আর দেখতে পাব না, শুনতে পাবনা, কথা বলতে পারব না।'

হেলেন কেলারের জীবন থেকে তাঁর শিক্ষয়িত্রী অ্যানি ম্যানসফিল্ড সুলিভানের জীবনকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ভাগ্যহত বালিকার জীবনের প্রভাত বেলায় এই মহিলাটি যেন সূর্যের আলোর মতোন তাঁর কাছে এসেছিলেন। ক্রমশ জ্বর নিরাময় হলো এবং তখন যে নৈঃশব্দ আর অন্ধকার হেলেনের পরিবেশকে ঘিরে থাকত, বালিকা তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। রবিন পাখীর গানে মুখরিত একটি ক্ষণস্থায়ী বসন্ত, ফলে ও ফুলে সুন্দর একটি গ্রীষ্ম আর সোনার রঙে উদ্ভাসিত একটি শরৎ—এরই ক্ষীণ স্মৃতি সেই অন্ধ, মূক ও বধির সেই বালিকাকে আনন্দ দিত। জীবনের প্রথম উনিশটা মাসে দুই চোখ ভরে সে যা দেখেছে, সেই সবুজ মাঠ, আলোভরা আকাশ, গাছ, ফুল তার একটাও কিন্তু বালিকার স্মৃতি থেকে মুছে যায় না। এই সময়ে তার মায়ের নিবিড় যত্নের মধ্যে হেলেনের দিনগুলি কিভাবে অতিবাহিত হতো তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা আছে 'মাই লাইফ' গ্রন্থে।

দেখতে দেখতে হেলেনের বয়স পাঁচ বছর হলো। অল্প-স্বল্প জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে, বুঝতে পারেন নিজের অসহায় অবস্থা—বুঝতে পারেন সংসারের আর পাঁচটি মানুষ থেকে তিনি পৃথক। বছরের পর বছর যায়—বালিকার জীবনে নিঃশব্দ,

লক্ষ্যহীন, দিবাহীন জীবন যেন ক্রমে দুর্বিসহ হয়ে উঠতে থাকে আর সেই সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করবার আকাঙ্খা যেন তাঁর অন্তরে দুর্নিবার হয়ে ওঠে। একমাত্র কন্যার (মিসেস কেলারের একটি পুত্র সন্তান পরে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সেটি অকালে মারা যায়) দুর্ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবন পিতামাতাকে সর্বক্ষণ উৎকণ্ঠিত রাখত, তাঁর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাঁদের দুঃখের যেন সীমা-পরিসীমা ছিল না। অবশেষে তাঁরা বালটিমোরে একজন বিখ্যাত গুপ্তবিদ্যা বিশারদের (Occualtist) কাছে মেয়েকে নিয়ে গেলেন। তিনি অথচ কিছু করতে পারলেন না। হেলেনের বাবাকে তিনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন: 'একে লেখাপড়া শেখান।' ওয়াশিংটনের ডাক্তার আলেকজান্দার গ্রেহাম বেলও ক্যাপ্টেন কেলারকে ঠিক ঐ কথাই বলেছিলেন। ডাক্তার বেলের কাছে থেকেই তিনি বোস্টনের পার্কিনস্ ইনস্টাটিউসনের খবরটা পেয়েছিলেন। অন্ধদের জন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডাক্তার হো। এইখান থেকেই ক্যাপ্টেন কেলার তাঁর মেয়ের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন মিস স্যানি ম্যানসফিল্ড স্যালিভ্যান নাম্নী এক বিদুষী শিক্ষয়িত্রী। ইনিই ভাগ্য-বিড়ম্বিতা বালিকার জীবনে এসেছিলেন কল্যাণময়ীরূপে।

হেলেনের বয়স সাত বছর পূর্ণ হতে তখনো সাত মাস বাকী ছিল যখন ১৮৮৭ সালের মার্চ মাসে একদিন মিস্ স্যালিভ্যান দূরবর্তী আটলাণ্টা শহরে এসে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের এই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটির কথা হেলেন কেলারের আত্মজীবনীতে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে: তারিখটা ছিল ১৮৮৭ সালের মার্চ মাসের তিন তারিখ, সেদিন অপরাহ্ন বেলায় আমি বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। মায়ের ব্যস্ত সমস্ত ভাব থেকে আবছা অনুমান করলাম তিনি যেন কার আসার প্রতীক্ষা করছেন। আমি যেন শুনতে পেলাম কার পদক্ষেপের শব্দ। মা আসছেন মনে করে আনন্দে প্রসারিত করে দিলাম দুই হাত; কিন্তু আমার হাত দুটি সস্নেহে যিনি ধারন করলেন তিনিই যে আমার শিক্ষয়িত্রী মিস স্যালিভান, সেটা কিছুক্ষণ বাদেই বুঝেছিলাম। এঁরই শিক্ষার গুণে আমার জীবনে অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল—হঠাৎ ঘটেছিল আত্মার জাগরণ।'

মায়ের নিবিড় স্নেহ যেমন বালিকার জীবনকে ঘিরে থাকতো, তখন থেকে মিস স্যালিভানের স্নেহের আশ্রয়ে হেলেনের জীবন গড়ে উঠতে থাকে। তাঁরই সযত্ন শিক্ষার গুণে ষোল বছর বয়সে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন একটি বালিকা বিদ্যালয়ে। প্রতিদিন ছাত্রীর সঙ্গে স্যালিভান স্কুলে যেতেন, ছাত্রীকে পাশে নিয়ে ক্লাসে নিয়ে বসতেন। ক্লাসে যা পড়ানো হতো তিনি শুনতেন নিবিষ্ট চিত্তে। তারপর ছাত্রীর হাতে নিজের আঙুল দিয়ে তা লিখে দিতেন। এই কাজ যে কি ক্লান্তিজনক ছিল তা সহজে ধারণা করা যাবে না। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে দিনের পর দিন মাসের পর মাস তিনি এই ভাবে পরিশ্রম করেছিলেন হেলেনের জন্ত। তাঁর এই পরিশ্রম সার্থক হয়েছিল। ১৯৩০ সালে হেলেন সসম্মানে স্নাতক হলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে হেলেনের স্কুল ও কলেজের শিক্ষা ইংলিশ ব্রেইল প্রথায় সম্পন্ন হয়েছিল। অন্ধদের লেখাপড়া শেখবার জন্য এইটিই হলো শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। তিনি যখন স্নাতক হলেন তখন ইংরেজী ভিন্ন লাতিন, গ্রীক, ফরাসী ও জার্মান— এই চারটি ভাষা সুন্দর ভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন।

দীর্ঘাঙ্গী, সুগঠিত দেহ ও সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারিনী হেলেন কেলার, শিক্ষান্তে, যখন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁকে দেখা গিয়েছে একজন একনিষ্ঠ সমাজ সেবিকার ভূমিকায়। চক্ষু দিয়ে তিনি দেখতে পেতেন না সত্য, কিন্তু তাঁর মনের দর্পণে তাঁর আশপাশের যাবতীয় ঘটনা ও বস্তু নিখুঁত ভাবেই প্রতিফলিত হতো। মনের দৃষ্টি দিয়ে তিনি সবকিছু দেখতে ও বুঝতে পারতেন। অনুভূতি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ, ধারণা শক্তি অসাধারণ এরই সাহায্যে তাঁর চারপাশের চলমান জীবন ধারাকে তিনি স্পর্শ করতে পারতেন গভীরভাবেই। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তি ফিরে না পেলেও, উত্তরকালে মিস কেলার এক বিশেষ পদ্ধতির চিকিৎসার ফলে বাকশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন।

বাইবেলের উপদেশ মিস কেলারের জীবনে, তাঁর বহুবিধ কর্মপচেষ্টার মধ্যে রূপায়িত হয়েছিল। পৃথিবীর অন্ধদের জন্য তিনি একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন এবং বাণী প্রচারের বক্তৃতা দিয়ে যে টাকা পেয়েছেন তাই দিয়ে ঐসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার নির্বাহ হতো। হেলেন কেলার সারা পৃথিবীতে কম বেশি অন্ধদের জন্য পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন এবং হাজার হাজার নরনারী ঐসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত হয়ে সমাজকল্যাণ কাজে তাদের জীবন সার্থক করেছে।

১৯৫৫ সালটি মিস কেলারের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছরের ১৬ এপ্রিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন সভায় তাঁকে সম্মানিত স্নাতক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হেলেনের চক্ষে পরম শ্রদ্ধার পাত্র। আমেরিকায় গিয়ে কবি তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁকে একবার শান্তিনিকেতনে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন; একবার ভারত ভ্রমণের সময়ে তিনি শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন।

রবীন্দ্রনাথ এমন দৃষ্টি দিয়ে আর কেউ কখনো দেখেছেন কিনা সন্দেহ। হেলেন কেলার ঠিক তাই ছিলেন। সারা পৃথিবীর অন্ধদের কাছে তিনি প্রেরণা ও প্রেমের একটি প্রতীক হিসাবে সম্পূজিতা হয়েছেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীকূলে এই রকম দৃষ্টান্ত বিরল বললেই হয়

স্বামী বিবেকানন্দ

(১৮৬৩-১৯০২)

ঈশ্বর-প্রেমিক বিবেকানন্দ সকলের আগে ছিলেন একজন মানব-প্রেমিক। নিপীড়িত মানবাত্মার জন্যই বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি পৌষ-সংক্রান্তির দিন সূর্যোদয়ের ছ-মিনিট আগে উত্তর কলকাতার শিমুলিয়া বা সিমলা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন নরেন্দ্রনাথ। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, মা—ভুবনেশ্বরীদেবী। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। জন্মের পর মা নাম রেখেছিলেন বীরেশ্বর। এই নামটি পরে 'বিলে' ডাকনামে দাঁড়ায়। দত্ত বংশের কৃতীসন্তান বিশ্বনাথ দত্ত। প্রতিভাধর পুরুষ। আইনের ব্যবসায় করতেন। খুব নাম-ডাক ছিল এ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের। তাঁর মাসিক আয় ছিল প্রচুর টাকা—দান-ধ্যানও ছিল তেমনি। ইতিহাস ও সংগীত ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। উদারচেতা বিশ্বনাথ বহু আত্মীয় ও দরিদ্রকে প্রতিপালন করতেন। মা ভুবনেশ্বরী ছিলেন তেজস্বিনী ও করুণাময়ী। গরীব-দুঃখী কখনো তাঁর কাছ থেকে খালি হাতে ফিরত না। তিনি নিয়মিত পূজা-অর্চনা ও শাস্ত্রপাঠ করতেন।

পিতামাতার বহু সদ্গুণের অধিকারী হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। ছেলেবেলা থেকে তাঁর চরিত্রে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে সেগুলি হলো: অপর মেধা সত্যনিষ্ঠা সাহসী ও স্বাধীনচেতা মনোভাব, সঙ্গীতপ্রীতি আর খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ। ধ্যান ধ্যান খেলা, ঠাকুর-দেবতার পূজা করা, সাধুসন্ন্যাসী দেখলেই ছুটে যাওয়া—এসবই ছিল বালকটির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটি গুণ তরুণ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। স্কুলের বিতর্ক ও আলোচনা সভা, জিমন্যাস্টিক, খেলাধুলাতে পরিচালক, নেতা, বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে গানবাজনা শিখে রাগপ্রধান ও ভজন গীতিমার্গে প্রথম শ্রেণীর গায়ক, নাটকে কুশলী অভিনেতা। আবার পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত ভিন্ন ধরণের বই পড়ার ফলে তরুণ বয়সেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত চিন্তাশীল।

নরেন্দ্রনাথ ১৮৭৯ সালে মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। অতঃপর তিনি ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৮৮১ সালে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে এফ. এ. পাশ করেন। দুই বছর বাদে এই কলেজ থেকেই তিনি স্নাতক হন। কৈশোরের শেষাবস্থা থেকে তাঁর মধ্যে যে ধর্মস্পৃহা জেগেছিল তা-ই তরুণ নরেন্দ্রনাথকে টেনে এনেছিল ব্রাহ্মসমাজে। সত্যের সন্ধানে তিনি তন্ন তন্ন করে পাঠ করতেন পাশ্চাত্য দর্শন। ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা যদি সত্যবস্তু, তবে তার বাস্তব রূপ কি—এই প্রশ্নেই উদ্বেলিত হয়েছিল তাঁর মন।

এমন সময়ে দেখা হলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে, কলকাতায় সুরেন মিত্রের বাড়িতে। তারিখটা ১৮৮১ সালের ৬ নভেম্বর। নরেন্দ্রনাথ তখন এফ. এ.

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দ্বিতীয় দর্শন দক্ষিণেশ্বরে প্রায় আড়াই মাস বাদে। এখানে তাকে দেখামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন, এই যুবক নর-ঋষির অবতার, মানুষের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। সেদিন নরেন্দ্রনাথ সরাসরি প্রশ্ন করলেন তাঁকে: আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন? উত্তর পেলেন: আমি তাঁকে দেখতে পাই, তোমায় যেমন দেখছি তার চেয়েও স্পষ্টভাবে তাঁকে আমি দেখি।

এই ঘটনার পর থেকেই তাঁর জীবনে আসে পরিবর্তন। নরেন্দ্রনাথ দত্তের খোলস থেকে বেরিয়ে এলেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। এই সন্ন্যাসী পরিব্রাজকরূপে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে, সমাজের সকল স্তরের পরিচয় গ্রহণ করার পর ১৮৯৩ সালে চলে যান আমেরিকা। সেইখানে চিকাগো শহরে সেপ্টেম্বর মাসে হয়েছিল একটি বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন। সেই সম্মেলনে ভারতের হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন ও বেদান্তের উদার বাণী প্রচার করে সমগ্র পাশ্চাত্য দেশের নর-নারীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন তিনি। এখান থেকে শুরু হয়েছিল সন্ন্যাসীর জীবনে এক নতুন অধ্যায়। ১৮৯৬ সাল থেকে নিউইয়র্ক শহরকে তাঁর কর্মের প্রধান কেন্দ্র করে তিনি প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। এখানে স্থাপন করলেন বেদান্ত সোসাইটি। পাশ্চাত্য দেশে অদ্বৈত বেদান্তের প্রথম দুর্গ। অজস্র বক্তৃতা করে, ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আমেরিকার নরনারীর হৃদয়ের মধ্যে এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন।

তারপর তিনি এলেন ইংলণ্ডে ১৮৯৫ সালের মাঝামাঝি। লণ্ডনকে কেন্দ্র করে তিনি য়ুরোপ মহাদেশে বেদান্তের বাণী প্রচার করে, এখানকার নর-নারীর প্রাণেও জাগিয়েছিলেন এক অভূতপূর্ব আলোড়ন। অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দু সন্ন্যাসীর যশোগানে পরিপূর্ণ হয় ইংলণ্ডের আকাশ-বাতাস-সকলেই মুগ্ধ হয় তাঁর বক্তৃতা ও ধর্মোপদেশ শুনে। এইখানেই তাঁর বক্তৃতা শুনে আকৃষ্ট হয়েছিলে এক এক বিদুষী আইরিশ মহিলা যিনি তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেন এবং ভারতবর্ষে এসে গুরুর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইনিই ভগিনী নিবেদিতা। আমেরিকা ও য়ুরোপে প্রায় চার বছর ধরে অক্লান্তভাবে বেদান্ত আর শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করে, ১৮৯৬ সালের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ যশের মুকুট মাথায় নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। যে চার বছরকাল তিনি আমেরিকা ও য়ুরোপে অদ্বৈত বেদান্ত 'বাণী প্রচার করেছিলেন তার ফলে পাশ্চাত্য দেশের নর-নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা দিয়েছিল পরিবর্তন। তৎকালীন পাশ্চাত্য জগতের উপর তাঁর প্রচার কার্য যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এইভাবেই তিনি ভারতবর্ষকে ওদেশের মানুষের সম্মুখে ধর্মগুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন তার তুলনা নেই।

স্বদেশে ফিরেও তাঁর কাজের বিরাম ছিল না। পরিব্রাজক জীবনে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন হিন্দুসমাজের সর্বস্তরে পুঞ্জীভূত গ্লানি—নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চ

বর্ণদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বৈষম্য মূলক ব্যবহার এর ফলে জাতির জীবনে যে অবক্ষয় এসেছিল তাই দূর করবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সমস্ত কর্মশক্তি, চিন্তাভাবনা নিয়োজিত করেছিলেন। দরিদ্র নারায়ণের সেবায় দেশের শিক্ষিত তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে স্বামীজী সমাজসেবার আদর্শ প্রবর্তন করে আমাদের সমাজ জীবনে এক নতুন তরঙ্গ তুলেছিলেন। তিনি যে একজন কত বড়ো মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসী ছিলেন তা আমরা জানতে পারলাম যেদিন শোভাবাজারের সংবর্ধনা সভায় দেশের তরুণদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন: 'আমি তোমাদের কাছে এই গরীব, অশিক্ষিত, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য আমার অন্তরের সহানুভূতি আমার সকল প্রয়াস দায়স্বরূপ অর্পণ করছি। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর, তাহলেই বুঝব তোমরা আমাকে যথার্থ ভালবাস। জেনো দরিদ্র নারায়ণের সেবার চেয়ে আর কোনো বড়ো ধর্ম নেই। তাদের উন্নতিই আমার দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্ন।

বেলুড়ে গঙ্গার তীরে স্থাপন করলেন গুরুর নামাঙ্কিত একটি মঠ ও মিশন। এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন ইষ্টদেবকে। এই মঠ স্থাপন করার ব্যাপারে তাঁর মার্কিন শিষ্য ও শিষ্যারা প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন। মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করার পর স্বামীজী প্রচার কার্যের সুবিধা হবে বলে বাংলা ও ইংরেজিতে দুখানা মাসিক পত্রিকা বের করলেন। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয় ইংরেজি 'প্রবুদ্ধ ভারত' আর পরের বছরে বাংলায় 'উদ্বোধন'। তাঁর দুজন গুরুভাইয়ের উপর পত্রিকা দুটি সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। মঠ স্থাপিত হওয়ার পর একদিন গুরুভাইদের তিনি বললেন: 'ব্যক্তিগত ধ্যান-তপস্যা বা মুক্তিলাভের চেষ্টা এখন থাক। এসো আমরা সবাই ঠাকুরের ভক্তিপাথ সাধন করি—চলো যাই শিক্ষাবিস্তার আর সেবার কাজে। ভারতের কল্যাণের জন্য এমন একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আমি গড়ে তুলতে চাই যারা ভগবানের নয়। মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে।'

আজ ভারতবর্ষে কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রমগুলি নিঃশব্দে স্বামী বিবেকানন্দের মানবসেবার আদর্শের বাণী প্রচার করে চলেছে। এদেশের সমাজে মেয়েদের জন্য তেমন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। স্বামীজী তাঁর মানস-কন্যা ভগিনী নিবেদিতাকে পুরোভাগে রেখে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন বাগবাজারে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়টির নাম সবাই জানে—নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়। স্বামীজি এই স্কুলটির সকল দায়িত্ব তাঁরই উপর দিয়েছিলেন।

বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন—এই দুটিই বিবেকানন্দের প্রধান কর্মকীর্তি। মঠ ও মিশন স্থাপিত হওয়ার পর থেকে তাঁর কাজ খুব বেড়ে যায়। মঠের প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে তিনি নির্বাচিত করেছিলেন তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র। তখন থেকে তাঁর কিছুমাত্র বিশ্রাম ছিল না। সেই গুরুভার পরিশ্রম তাঁর কর্মক্লান্ত দেহে বেশিদিন সহ্য হলো না। তবু উনিশ শতকের শেষ বছরটিতে (১৮৯৯) তিনি আবার পৃথিবী ভ্রমণে বের হলেন। ১৯০০ সালে

প্যারিসের একটি আন্তর্জাতিক ধর্মসভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ইতিহাস, ধর্ম ও বিজ্ঞান—এই তিনটি বিষয়ের এই স্মরণীয় আন্তর্জাতিক অধিবেশনে দুজন বাঙালি সন্তান ভারতের গৌরব পতাকা তুলে ধরেছিলেন। ধর্মে—বিবেকানন্দ; বিজ্ঞানে—জগদীশচন্দ্র বসু। এঁরা দুজনেই সেদিন নিজ নিজ প্রতিভায় পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মুগ্ধ করেছিলেন।

১৯০১। অক্টোবর মাস। বিবেকানন্দের শরীর তখন খুবই অসুস্থ। তবু অসুস্থ শরীরেও তাঁর কাজের বিরাম ছিল না। মঠের উন্নতির কথা চিন্তা করা, ক্রমাগত লোকজনকে উপদেশ দেওয়া, শিষ্যদের তৈরি করা—এইসব কাজের ভেতর দিয়ে সন্ন্যাসীর জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত হয়। মঠকে জনপ্রিয় করবার জন্য তিনি খুব ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতির প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর কর্মক্লান্ত ও রোগজীর্ণ দেহ এইবার যেন চিরবিশ্রাম লাভের জন্য ব্যাকুল হলো। ১৯০২, ৪ঠা জুলাই। ঠাকুরের সন্ধ্যারতি হয়ে গেছে। মঠের দ্বিতলে তাঁর শোবার ঘরটিতে গঙ্গার দিকে মুখ করে ধ্যানে বসেছেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। হাতে জপের মালা। রাত নয়টায় মহাপ্রয়াণ করলেন বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ দিন।

বাংলা তথা ভারতবর্ষে এক নবযুগের সূচনা করে দিয়ে, দরিদ্রনারায়ণের সেবায় তাঁর স্বদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের সামনে কর্মের এক নতুন আদর্শ স্থাপন করে, মহাপ্রয়াণ করলেন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও স্বদেশ প্রেমের নবীন বিগ্রহ, নরকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর মতন একজন চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই না ভারতের নবজাগরণ অমনভাবে সার্থক হতে পেরেছিল। মনে রাখতে হবে, স্বামীজী শুধু ভারতের নন, সমগ্র জগতের। নিপীড়িত মানবাত্মার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। তাই শুধু আধ্যাত্মিক মুক্তিই তাঁর কাম্য ছিল না। জীবনের যত সমস্যা মানুষকে বিব্রত করে। সব সমস্যার উপরেই তিনি আলোপাত করেছেন।

স্বামীজীর আর একটি অবদান, কারো কারো মতে শ্রেষ্ঠ অবদান, 'কর্মে পরিণত বেদান্ত' (Practical Vedanta)। আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ ভারতবাসীর জীবনে কালো ছায়া বিস্তার করেছিল, সেই ভেদ দূর করে তিনি উপস্থাপিত করলেন কর্মে পরিণত বেদান্তের বলিষ্ঠ চিন্তাসূত্র। জাতির জীবনে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত বেদান্তকে আশ্রয় করে ভবিষ্যতের মহিমময় ভারতকে গঠন করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন। 'Each nation has a main current in life ; in India it is religion.'

রামকৃষ্ণ-ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত স্বামী বিবেকানন্দ আর্ত, পীড়িত, দীন, দরিদ্র মানুষকে যেমন ভালবেসেছিলেন তেমন বোধহয় আর কেউ বাসেননি। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এই খাঁটি মানবপ্রেম মানবতাবাদের মধ্যে যে গভীর ব্যঞ্জনা দান করেছে, এরই দ্বারা উদ্ভাসিত হয়েছে নবযুগের দিগন্ত, সম্ভবত এইজন্যই স্বামীজীর নিবিড় স্বাজাত্যবোধ ও আগ্রাসী জাতীয়তাবোধ কোন সময়েই মানবতার বিশ্বজনীন মঙ্গলাদর্শের পরপন্থী হয়নি। তাঁর জলন্ত স্বদেশপ্রেম তাঁর উদার বিশ্বপ্রেমেরই পরিপূরক।

জহরলাল নেহরু

(১৮৮৯-১৯৬৪)

'আমি নিজেকে, নিজের শক্তি ও ক্ষমতাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছি ভারতের সেবায়। এই কথা চিন্তা করে আজ, এ জীবন সায়াহ্নে, অপরিসীম আনন্দ বোধ করি।' স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জওহয়লাল নেহরু বলেছিলেন এইকথা তাঁর লোকান্তর গমনের দশ বছর আগে। আধুনিক ভারতবরর্ষের ইতিহাসে তো বটেই, এমনকি পৃথিবীর ইতিহাসেও তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থকেবে।

১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর এলাহাবাদে তিনি জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁর জন্মের ঠিক তিন বছব আগে স্থাপিত হয়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। উত্তরকালে নেহরু-পরিবারের এই শিশুটিই কংগ্রেসের সেবক, সৈনিক ও নেতারূপে দেশবাসীর চিত্ত জয় করেছিলেন। পিতা—মতিলাল নেহরু ; মা—স্বরূপরাণী। নেহরু তাঁর পিতামাতার সর্বজ্যৈষ্ঠ সন্তান এবং একমাত্র পুত্র ছিলেন। মতিলাল ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী। শক্তি, সাহস ও প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। তিনি কোনো স্কুলে পড়েন নি। তাঁর শৈশবেব শিক্ষা ইংরেজী ভাষাতেই আরম্ভ হয়েছিল।

১৯০৫ সালে ষোল বছব বয়সে জওহবলাল তাঁর পিতামাতা ও চার বছরের বোন বিজয়লক্ষ্মীর সঙ্গে ইংলণ্ড যাত্রা কবলেন।

১৯০৫ সালের বড়দিনে লণ্ডনের বিখ্যাত হ্যাবো স্কুলে ভর্তি হলেন জওহরলাল, প্রায় দু'বছব তিনি এখানে পড়েছিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিস্টার উডের বাড়িতে তাঁব থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। হ্যারো স্কুলে ছাত্র হিসাবে নেহরু শিক্ষকদের খুব প্রিয় ছিলেন। স্কুলের মনোরম পরিবেশের মধ্যে মনযোগের সঙ্গে অধ্যযনে নিবিষ্টচিত্ত হয়ে থাকতেন তিনি। এখানকার ছাত্রজীবনে গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত পাঠ করে কিশোর জওহবলালেব মনে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তিনি পবাধীনদেশের মানুষ—গ্যাবিবল্ডিব মতো তিনিও একদিন তাঁর স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবেন না ?—এই ধরনের চিন্তা ছাত্রজীবনেই জওহরলালের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্বদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর যেসব খবর বিলেতের কাগজগুলিতে বেরুতো তিনি সেগুলি যত্নের সঙ্গেই পাঠ করতেন। হ্যারোতে বসেই তিনি দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক সংবাদ, তিলক, লাজপৎরায়, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের সংবাদ রাখতেন। 'বেশ বুঝতে পারতাম ভারতে রাজনৈতিক জাগরণ দেখা দিয়েছে।' বুঝতে পারতাম, ভারতের আত্মা যেন এই দুর্বার প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে শৃঙ্খলমোচনের সংকল্প গ্রহণ করেছে। এইসব সংবাদ আমাকে রীতিমতো চঞ্চল করে তুললো।'

হ্যারোর পাঠ শেষ হলে নেহরু ভর্তি হলেন ট্রিনিটি কলেজে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এই কলেজটি ইংলণ্ডের একটি সেরা কলেজ। তখন তাঁর বয়স আঠারো। যে তিনটি বছর তিনি কেমব্রিজে পড়েছিলেন সেই তিন বছর ইংলণ্ডের মানসলোকে দেখা দিয়েছিল এক প্রবল চেতনা। সেই চেতনার উত্তাপ স্পর্শ করেছিল তরুণ জওহরলালের মনকে। ১৯১০ সালে তাঁর কেমব্রিজে পড়া শেষ হয়। ন্যাচুরাল সায়ান্স ট্রাইপসে নেহরু দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ করলেন। কেমব্রিজের পাঠ শেষ করে তিনি লণ্ডনে আইন পড়তে থাকেন। এখানে কাটলো আরো দুটি বছর। ১৯১২ সালে তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করলেন। প্রায় আট বছর কাল প্রবাসে অতিবাহিত করে তিনি ভারতে ফিরলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সবে দুবার এলাহাবাদে এসেছিলেন। এইভাবে হ্যারো, কেমব্রিজ ও লণ্ডনে পড়াশুনা করে নেহরু যখন কৃতবিদ্য হয়ে দেশে ফিরলেন তখন তাঁর বয়স বাইশ-তেইশ বছর।

দেশে ফিরে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হওয়ার জন্য নেহরু এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগদান করলেন। কিন্তু কয়েকমাস যেতে না যেতে তাঁর ব্যারিস্টারির মোহ দূর হলো। আকৃষ্ট হলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলের প্রতি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সার্ভেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে' তিনি যোগদান করলেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে যে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন এবং সেইখানেই জওহরলাল তাঁকে প্রথম দেখেন। এই বছরেই বাসন্তী পঞ্চমীতে তাঁর বিয়ে হয় কমলার সঙ্গে।

১৯২১ সাল। নাগপুরে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন বসলো। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতে আরম্ভ হয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। এক বছরের মধ্যে দেশে স্বরাজ আসবে সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তরুণ জওহরলাল। ঠিক এমনি সময়ে আর একজন দেশপ্রেমিক বাঙালি তরুণ দেশের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্র বসু। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই ত্রিশ হাজার কংগ্রেস নেতা ও কর্মী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলো। দণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন পিতা ও পুত্র—মতিলাল নেহরু ও তাঁর একমাত্র পুত্র জওহরলাল। লক্ষ্ণৌ জেলে তাঁদের বন্দীজীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁরা জেলে থাকতেই গান্ধীর নির্দেশে মাঝপথে আন্দোলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারাগারে বসে এই সংবাদ পেয়ে জওহরলাল যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর আত্মজীবনীতে এই কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। কারাদণ্ডের নির্দিষ্ট তারিখের অনেক আগেই তিনি কারামুক্ত হলেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই আমেদাবাদে আন্দোলনের নেতা গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন ১৯২২, ১০ মার্চ। আদালতে তাঁর বিচারের সময় জওহরলাল উপস্থিত ছিলেন। বিচারে গান্ধীর ছ'বছর কারাদণ্ড হয়।

১৯২২ সালে বিলিতে কাপড়ের দোকানে সহকর্মীদের দোকানে সহকর্মীদের নিয়ে পিকেটিং করার জন্য জওহরলাল আবার গ্রেপ্তার হলেন। আদালতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। বিচারে এবার তাঁর এক বছর নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হলো। চলে গেলেন তিনি লক্ষ্ণৌ জেলে। জেলে বসেই জানতে পারলেন যে কংগ্রেস আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেছে আর কংগ্রেস দুই দলে ভাগ হয়ে গেছে —একদল চাইছেন পরিবর্তন, অন্য দল এর বিরোধী। প্রথম দলের পুরোভাগে আছেন মতিলাল ও দেশবন্ধু। এঁরা দুজনে সিদ্ধান্ত করলেন এবার আইন সভার ভেতরে গিয়ে দ্বৈতশাসন অচল করতে হবে। এরই পরিণতি ছিল স্বরাজ্য দল। ১৯২৩ সালে জানুয়ারির শেষভাগে জওহরলাল জেল থেকে মুক্তি পেলেন। এইবার তিনি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক পদে বৃত হলেন। এতদিন তিনি ছিলেন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক, এখন সর্ব ভারতীয় সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে তাঁর কাজ শতগুণ বেড়ে গেল এবং কংগ্রেসের পরিবর্তন বিরোধী দলের (No changer) মধ্যে থেকেই কংগ্রেসের কাজ করতে থাকেন। তখন আনন্দভবনের একাংশ মতিলাল কংগ্রেসকে দান করেছেন। সেই অংশের নাম রাখা হয় স্বরাজভবন।

১৯২৫ সালের শেষ ভাগে কমলার কঠিন অসুখ করলো। তাঁর চিকিৎসার জন্য নেহরু ইউরোপে এলেন। সঙ্গে আট বছরের মেয়ে ইন্দু। ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী—তাঁদের একমাত্র সন্তান। সুইজারল্যাণ্ডের একটি স্বাস্থ্যনিবাসে কিছুকাল থাবার পর কমলা একটু সুস্থবোধ করেন।

১৯২৭ শেষ হয়ে এলো। লক্ষ্ণৌতে অবস্থানকালে খবরের কাগজে জওহরলাল একদিন সাইমন কমিশন নিয়োগের সংবাদ পাঠ করলেন। ১৯১৭ সালে যখন নতুন শাসন-সংস্কার (মণ্টেগুচেমসফোর্ড রিফর্ম) প্রবর্তিত হয় তখন পার্লামেণ্ট থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে দশ বছর বাদে ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা তদন্ত করে দেখা হবে। যে কমিশনকে এই তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারই নাম সাইমন কমিশন। ১৯২৭-এর শেষভাগে নেহরু ভারতে ফিরে এলেন ও কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে যোগদান করেন। এই অধিবেশনেই ঠিক হয় যে সাইমন কমিশন বর্জন করা হবে। হয়েছিলও তাই। ১৯২৮ সালে এই কমিশন ভারতে এলে পরে সবাই বয়কট করলো। কমিশন সর্বত্রই বিরূপ অভ্যর্থনা পেলো। এই বছরে জওহরলাল পাঞ্জাব, মালাবার, দিল্লী ও যুক্তপ্রদেশের চারটি প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তখন থেকেই তিনি দেশের যৌবনশক্তির প্রতীকরূপে তিনি যুবকদের হৃদয়ে ধীরে ধীরে স্থানলাভ করতে থাকেন।

১৯২৯ সালটি নেহরুর জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বছরে লাহোর কংগ্রেসে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এর পর তিনি আরও তিনবার কংগ্রেসের সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনায়

ও ১৯৪২ সালে ঐতিহাসিক আগস্ট বিপ্লব শুরু হওয়ার প্রাক্কালে তিনি কারাবরণ করেন। তারপর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ লাভ করে তার ঈপ্সিত স্বাধীনতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করেন নেহরু। সেদিন জাতির উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন: 'ভারত, ভারতের নরনারী এবং পৃথিবীর মানুষের সেবায় উৎসর্গ করার শপথ আজ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ভারতের সেবা মানেই লক্ষ কোটি ভারতবাসীর সেবা।'

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহরু তাঁর জীবনের শেষ ষোল সতেরো বছর ভারতবাসীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন নিরলসভাবে। স্বাধীন ভারতের রূপকার হিসাবে তিনি অনেক কাজ করে গেছেন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছেন—শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভবপর করেছেন। স্বাধীন ভারতের কর্ণধাররূপে তাঁর সাফল্য সত্যিই বিস্ময়কর। স্বাধীনতার দুই বছর চার মাস বাদে প্রবর্তিত হয় একটি নতুন শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রে ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৫১ সালে হলো প্রথম সাধারণ নির্বাচন। স্বাধীন ও প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও জওহরলাল নেহরু।

দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রী উপস্থাপিত করলেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। তখন থেকেই ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে ভারত এগিয়ে যেতে থাকে শিল্পোন্নয়নের পথে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক রূপ আজ বদলে গেছে। ভূমি-সংস্কার, কম্যুনিটি ডেভলেপমেন্ট, শিক্ষার বিস্তার, শিল্পের প্রসার এইভাবে সর্ববিধ উন্নতি সাধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহরু চিন্তা করেছেন যত, কাজও করেছেন তত বেশি। সেদিন তাঁর দেশবাসী তাঁর মাথায় পরালো প্রধান মন্ত্রিত্বের মুকুট। সেদিন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করেছেন।

১৯৬৪, ২৭ মে, বুধবার। সমস্ত ভারতবর্ষ সচকিত হয়ে শুনল যে তাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আর নেই। তারে ও বেতারে সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। সেদিন বেতারে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন। তিনি বলেছিলেন: 'Jawaharlal Nehru was one of the greatest figure of our generation, an outstanding statesman whose services to the cause of human freedom are unforgettable······An epoch in our country's history has come to a close'.

সুভাষচন্দ্র বসু

(১৮৯৭—?)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন সুভাষচন্দ্র। বিপুল বীর্য-সত্তার নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে। বাঙালীর বহু তপস্যার ফল সুভাষচন্দ্র।

১৮৯৭, ২৩ জানুয়ারি উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন সুভাষচন্দ্র বসু। পিতা—জানকীনাথ বসু, মা—প্রভাবতী দেবী। চব্বিশপরগণার কোদালিয়া গ্রামে বসু পরিবারের আদি নিবাস। জানকীনাথের কর্মস্থল ছিল কটক; সেখানে তিনি আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। সুভাষচন্দ্র পিতামাতার ষষ্ঠ সন্তান।

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র বিলাত যান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য। এখানে এসে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। আট মাসের মধ্যেই তৈরি হয়ে তিনি যথা-সময়ে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিলেন এবং উত্তীর্ণদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন। ১৯১৯ থেকে ১৯২১-এর মার্চ মাস পর্যন্ত ইংলণ্ড সুভাষ চন্দ্রের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। এরপর তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সসম্মানে দর্শন শাস্ত্রে ট্রাইপস্ (Tripos) পাশ করেন। আই, সি, এস, পাশ করলেন বটে কিন্তু সিভিল সার্ভিসের সোনার শিকল পায়ে পরলেন না। বিলাতে থাকতেই তিনি ঠিক করেছিলেন যে, দাসত্ব নয়, দেশসেবাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। গান্ধীর নেতৃত্বে তখন শুরু হয়েছে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। বাংলাদেশে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যিনি তখন দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। বিলাতে থাকতেই তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে দেশবন্ধুকে একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লিখলেন: 'আপনি আজ বাংলা দেশে স্বদেশ-সেবা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক। আপনারা যে আন্দোলনের বন্যা তুলিয়াছেন তাহার তরঙ্গ চিঠিপত্র ও খবরকাগজের ভিতর দিয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া আমি নিজেকে মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিতে চাই।'

দেশ সেবার কন্টকাকীর্ণ পথই তিনি বেছে নিলেন। এইবার শুরু হলে সুভাষচন্দ্রের বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক জীবন। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল স্কুল কলেজ, আইন আদালত প্রভৃতি বর্জন করা। ছাত্রদের জন্য দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠা করলেন বিদ্যাপীঠ নামে একটি জাতীয় কলেজ। তাঁকেই বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ করা হলো। বিদ্যাপীঠ কিন্তু বেশি দিন চলেনি। দেশের কাজে নেমেই সুভাষচন্দ্র খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী পরতে শুরু করেন। দেশবন্ধুর কাছ থেকেই তিনি রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সময়ের মধ্যে তিনি গুরুর রাজনৈতিক ভাবধারার অনেকখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

দেশবন্ধু তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের প্রচার-সচিবের কাজও করতে বললেন। এই কাজে তাঁর কর্মকুশলতা দেখে সবাই বিস্মিত হয়। দেশবন্ধুর সম্পাদনায় যখন (১৯২৩) বেরুলো নতুন ইংরেজী দৈনিক 'Forward', সুভাষচন্দ্র তখন হলেন তার প্রধান কর্মকর্তা।

১৯২১ সালের বড়দিনে ইংলণ্ডের যুবরাজ কলকাতায় এলেন। কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল ভারত পরিদর্শনে যুবরাজ যখন আসবেন তখন তাঁকে কোন রকম সংবর্ধনা জানানো হবে না। সব প্রদেশেই তিনি বিরূপ অভ্যর্থনা পান জনসাধারণের কাছ থেকে। কলকাতায় তাঁকে বয়কট করার ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। এই সময়ে (১৯২১, ডিসেম্বর) সংশোধিত ফৌজদারী আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী দমননীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইনী ঘোষিত হয়। বহু কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রও ধৃত হন এই আইনে। তাঁদের ছয়মাসের জেল হয়। সুভাষচন্দ্রের জীবনে সেই প্রথম কারাদণ্ড। ১৯২২ সালে দেশবন্ধু গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন এবং আইনসভায় প্রবেশ করার প্রশ্নে কংগ্রেসের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি 'স্বরাজ্য' দল গঠন করেন। মতিলাল নেহেরু এই নতুন দলের সভাপতি হন।

বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে স্বরাজ্যদল আশাতীতভাবে জয়লাভ করলো। ১৯২৪ সালেই দলের হাতে এলো কলিকাতা পৌরসভা। দেশবন্ধু এর প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন আর প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হলেন সুভাষচন্দ্র। ঐ পদের বেতন ছিল মাসিক তিন হাজার টাকা, কিন্তু সুভাষচন্দ্র দেড় হাজার টাকার বেশি নিতেন না এবং সে টাকাও তিনি খরচ করতেন দুঃস্থ ছাত্রকর্মী ও কল্যাণ কর্মে নিযুক্ত বিবিধ প্রতিষ্ঠানের জন্য। ১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের ফলে সুভাষচন্দ্র অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে ধৃত হন। এবার বিনা বিচারেই তিনি নির্বাসিত হন সুদূর ব্রহ্মদেশে। সেখানে মান্দালয় জেলে তিনি দীর্ঘকাল বন্দী জীবন যাপন করেন। তাঁর সঙ্গে আরো সাতজন ছিলেন।

১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। সভাপতি—মতিলাল নেহরু। কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এত বড়ো অধিবেশন আর কখনো দেখা যায় নি। এর বৈশিষ্ট্য ছিল এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র স্বয়ং। দেশবাসী প্রত্যক্ষ করলো সুভাষচন্দ্রের এক নতুন মূর্তি। উত্তরকালে নেতাজীরূপে তিনি যে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন তারই সূচনা দেখা গিয়েছিল ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে। শুধু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক রূপে নয়, কংগ্রেসের এই স্মরণীয় অধিবেশনে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে (এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন জওহরলাল নেহরু) তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এনেছিলেন। ১৯৩০, ২৩ জানুয়ারি কলকাতায় একটি স্বাধীনতা মিছিল

পরিচালনা করবার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়; বিচারে এক বছর কারাদণ্ড হলো।

১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলাতে গোল টেবিল বৈঠক থেকে গান্ধী ফিরলেন শূন্য হাতে। তখন ভারতসরকার কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপক দমননীতি চালবার জন্য প্রস্তুত হন। জাহাজ থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন—গ্রেপ্তার হলেন অন্যান্য নেতারা। বোম্বাই যাওয়ার পথে কল্যাণ রেল স্টেশনে গ্রেপ্তার হলেন সুভাষচন্দ্র। এই সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। ১৯৩২-এর শেষে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দেয়। অবশেষে সরকার তাঁকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে পাঠালেন। এইসময় তিনি ভিয়েনার একটি স্যানোটোরিয়ামে থাকতেন। এইখানে বসেই তিনি লিখেছিলেন—'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'।

১৯৩৮ সালটি সুভাষচন্দ্রের জীবনে তথা ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তখন তাঁর বয়স একচল্লিশ বছর। দেশ তখন তাঁর মতো একজন মনে-প্রাণে সংগ্রামী নেতার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কামনা করছিল। কংগ্রেসের এই অধিবেশন বসেছিল হরিপুরায়। এটাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক অভিষেক। তাঁর ভাষণে তিনি বলেছিলেন: আমাদের এই সংগ্রাম কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়—পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ করাই হলো আমাদের লক্ষ্য। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য নয়, পৃথিবীর সমগ্র মানবতার মুক্তির জন্য আমাদের এই সংগ্রাম।' এমন কথা এর আগে বা পরে কংগ্রেসের কোন সভাপতির মুখে আমরা শুনিনি। ১৯৩৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হলেন। ত্রিপুরীতে বসেছিল এই অধিবেশন। বিশ্ব-ইতিহাসের এটি ছিল একটি অবিস্মরণীয় বৎসর। এই বছরের শরৎকালেই ইউরোপে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কংগ্রেসের আপোষকামী দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিরোধিতা ও চক্রান্তের ফলেই তিনি সভাপতির পদে ইস্তফা দেন এবং কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

সরকার দেখলেন সুভাষচন্দ্র ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছেন। কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র উদ্বেগ ছিল না। ইউরোপে যুদ্ধ তখন ঘোরালো হয়ে উঠেছে। ১৯৪০, ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্রকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হলো। কিন্তু তাঁকে কর্মহীন বন্দীজীবন বেশিদিন যাপন করতে হলো না। জেলেই তিনি আমৃত্যু অনশন আরম্ভ করবেন বলে বড়লাটকে এক চিঠিতে জানিয়ে দিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর এই চিঠিখানি তাঁর Political Testament বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই চিঠিতেই তিনি লিখেছিলেন: 'জীবন পেতে হলে জীবন দিতে হয়।' এর দুদিন বাদেই তাঁকে স্বগৃহে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর ১৭ জানুয়ারি, ১৯৪১, গভীর রাত্রিতে তিনি প্রহরারত এলগিন রোডের বাড়ি থেকে মৌলভীর ছদ্মবেশে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কলকাতা ত্যাগ করেন।

এরপর তাঁর জীবননাট্যের যবনিকা উঠল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে যেখানে, জার্মানি থেকে সাবমেরিন করে বিপৎসংকুল সাত সমুদ্র অতিক্রম করে, এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এইখানেই তিনি ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীদের নিয়ে গঠন করেছিলেন ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বা আজাদ হিন্দ বাহিনী আর আজাদ হিন্দ সরকার। ভারতের বাইরে তিনি স্বাধীন ভারতের পত্তন করে ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেন। তিনি এই বাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন ও আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বিস্তৃত হয়েছিল এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেন এখানে মিত্র বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। ঠিক সেইসময়ে সুভাষচন্দ্র এই রণাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছিলেন। বেতারে তিনি ভারতবাসীকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি এইবার বাইরে থেকে শেষ আঘাত হানবেন ব্রিটিশ শক্তির ওপর।

১৯৪৩, ২১ অক্টোবর গঠিত হয় আজাদ হিন্দ সরকার। সেদিন তিনি ঘোষণা করলেন : 'আমি—সুভাষচন্দ্র বসু—আজ এই শপথ করছি যে, আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি আজাদ হিন্দ সরকারের সেবা করব এবং ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ আমি সংগ্রামরত থাকব। ঈশ্বর, স্বদেশ ও স্বজাতির নামে আমি এই শপথ গ্রহণ করলাম।' রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি এই সরকারের জাতীয় সংগীত ছিল। এখন থেকে সুভাষচন্দ্রকে সকলে 'নেতাজী' বলে সম্বোধন করতে থাকেন। আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নেতাজীকে সর্বপ্রথম আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তোজো।

১৯৪৪ জানুয়ারি। আরম্ভ হয় আজাদ হিন্দ সরকারের 'দিল্লী চলো' অভিযান তখন রেঙ্গুনে সরকারের প্রধান দপ্তর স্থানান্তরিত হয়েছে। ভারত ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে আরম্ভ হয় আজাদ হিন্দ সৈন্যের বহু প্রতীক্ষিত যুদ্ধ। ঐদিন ভারতীয় জাতীয় বাহিনী মণিপুর-ইম্ফল আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হয়। সেদিন (৩রা ফেব্রুয়ারি) পদাতিক সৈন্যদের বিদায় জানিয়ে নেতাজী তাদের বললেন : 'দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ—চলো দিল্লী।' দুর্গম ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে নেতাজী তার বাহিনী নিয়ে এলেন সিঙ্গাপুরে। নেতাজী রেঙ্গুন পরিত্যাগ করে সিঙ্গাপুরে চলে এলেন। এইখান থেকে তিনি অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ চালাবার সংকল্প করলেন। কিন্তু ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসের মাঝা মাঝি মিত্রশক্তির হাতে জাপানের চূড়ান্ত পরাজয় সমস্ত আশা উদ্যম নির্মূল করে দিল। ১৭ আগষ্ট একটি বিমানে নেতাজী সিঙ্গাপুর ত্যাগ করলেন। কোথায় যাবেন কেউ জানে না। তদন্ত করেও এই সংবাদের চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যাবার আগে তিনি আজাদী সৈন্যদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন : পৃথিবীতে এমন ক্ষমতা কারো নেই ভারতকে অধীন করে রাখে—তার স্বাধীনতা অবধারিত।

এর ঠিক দু'বছর পরেই ভারতবর্ষ লাভ করে তার ঈপ্সিত স্বাধীনতা।

